চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ

জয়শ্রী প্রকাশন
কলিকাতা-৪৭

প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ, ১৩৫৮

প্রকাশক :
বিজয় নাগ
জয়শ্রী প্রকাশন
২৫১এ।৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস রোড,
কলিকাতা-৪৭

বিক্রয় কেন্দ্র :
জয়শ্রী প্রকাশন
১৮এ, টেমার লেন,
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও,
৭২।১, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

আমার নিবেদন

ভারতের বরেণ্য সন্তান দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন পরলোকগমন করিয়াছেন। ইতিমধ্যে তাঁহার কয়েকখানি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তথাপি এতদিন পরে আবার তাঁহার আর একখানি জীবনীগ্রন্থ প্রণয়নে হাত দেওয়ার কারণ অমৃতে কাহারও অরুচি হইতে পারে না। মহাপুরুষ দেশবন্ধুর জীবনীও অমৃত তুল্য। তাঁহার মহত্ব আর বিরাটত্ব, যাহার পদপ্রান্তে তিনি চিরশান্তিতে নিদ্রিত রহিয়াছেন সেই হিমালয়ের মতই বিরাট। সেই কারণেই পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত হইতে তাঁহার উদার অভ্যুদয় আর উন্নত চরিত্রের জ্যোতি সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

১৯২৫ সালের ৫ই নভেম্বর দেশবাসী দেশবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব পালন করিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁহার ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে, আবার কোথাও তাঁহার ফটো এবং তৈলচিত্র মালা-চন্দনে ভূষিত করিয়া তাঁহার মহা-জীবনী আলোচিত হইয়াছে। অথচ এই মহান জননায়কের স্মৃতির প্রতি এতদিন জাতীয় কর্তব্য পালনে আমরা অবহেলা করিয়াছি। তাই তাঁহার স্মৃতিকে জাতির আগামী জীবনে অনির্বাণ রাখিবার গুরুদায়িত্ব বহন করিয়াই পূর্বোক্ত অপরাধ স্খালন করিতে হইবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে স্বরাজের জন্য, যে মানব-মুক্তির জন্য এবং জাতির যে সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য পবিত্র হোম-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজ কি আসিয়াছে? সেই স্বরাজের মধু-স্বাদ কি দেশবাসী পাইয়াছে?—পায় নাই। সুতরাং তাঁহার সেই অসম্পূর্ণ হোম-যজ্ঞের পূর্ণতার জন্য সমিধ্ সংগ্রহ করাই দেশবাসীর প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত। এই পবিত্র কর্ম-প্রবাহে যাহারা প্রবাহিত হইতে

চাহেন তাহাদের হাতেই এই জীবনীগ্রন্থ তুলিয়া দিবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা !

কিন্তু মহাপুরুষের জীবনী রচনা করা সত্যই এক দুরূহ কার্য। যিনি এই কার্যে প্রবৃত্ত হন তিনি অনেক সময় নিজের রুচিমত নায়ককে দেবতা এবং অধি-দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করিয়া ফেলেন অর্থাৎ ভক্তি আর শ্রদ্ধার প্লাবনে বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া স্তুতিবাদের মন্ত্র লেখেন নতুবা সেই নায়কের জীবনের কোন ঘটনা যদি দেশীয় কোন ধর্ম বা সংস্কারকে একটু আঘাত করিয়া থাকে তবে জীবনীকার মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া নায়ক যাহা নন তাহাকে তেমন ভাবে নিন্দনীয় করিয়া তুলিতে পঞ্চমুখ হইয়া ওঠেন। এই প্রসঙ্গে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল : If they are emotionally stirred by a great man they will often go to any length in idolising him and will not rest till they make him a god or a demi-god (I am reminded of a warder in the Alipur Central Jail in 1922 who referring to the report of the incarceration of Mahatma Gandhi, said that that was impossible because Gandhiji being a Mahatma or a devotee (god) could assume the body of a bird and fly away from prison). On the contrary if a particular trailt in his character offends their prejudices, they will sometimes lose all sense of proportion and propriety in running him down and holding him up to public condemnation. So far as the actual biographies of India's great men are concerned, one may say that they are mostly Boswellian in character.

সুতরাং মহাপুরুষের জীবনী লেখায় জীবনীকারের গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে। স্তুতিবাদ বা প্রশস্তিও গীত হইবে না আবার অযথা নিন্দাও করা হইবে না ইহাই হইবে জীবনীকারের ধর্ম। ইংলণ্ডের কমন্স সভার বিগত দিনের এক মাননীয় সদস্য মিঃ পিট-এর কথা এখানে স্মরণযোগ্য : Paint me as I am.'

দেশবন্ধুর জীবনী সম্বন্ধে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন, "Such a biography of the late Deshbandhu Chitta Ranjan Das has yet to be written. Whether it will ever be written is more

than I can tell. In my case, to attempt such a biography is neither my purpose nor within my limited powers. My object at present is a more modest one—to give a picture of the man as I saw him and as he appealed to me. I must confess that I did not see much of him, if one considers his life as a whole--for my closer contact with him covered a period of a little over 3 years from August 1921 to October 1924.

But those were among the richest years of his life from the view point of self-fulfilment, and they were also momentous years in the recent history of India. Consequently these sketchy glimpses of the life of the Deshbandhu will probably have an objective significance and value--particularly to his future biographer as also to the future historian of the Indian Nationalist Movement.

Ever since the unexpected and tragic demise of the Deshbandhu in June 16, 1925, I have felt an urge to write something about him. But I have always been restrained by a feeling of extreme unfitness for such an important task. "When I was writing my book, "The Indian struggle 1929-34" in Europe in the year 1934, I could not avoid reference to him —his life, work and character. At that time I felt more than ever before that inspite of many manifold shortcomings I should make a serious effort to write my reminiscences of that great man and that too at an early date, for with the lapse of time, my memory of events and impressions was getting blurred. The decision to undertake this sketchy portraiture was then made and all that remained was to find the necessary leisure. While I was in Europe, besides being handicapped by ill-health, I had several irons in the fire and occasional travelling to undertake. My present incarceration—thanks to

the Government of India—which commened on the 8th April, 1936, has given me the much needed respite. Thus on the 16th June, 1936, eleven years after the Deshbandhu laid down his mortal frame, do I begin this work.

উপরে উদ্ধৃত এই ইংরাজীর যথাসম্ভব বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইল: স্বর্গত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ঐরূপ জীবনীগ্রন্থ অদ্যাবধি লেখা হয় নাই। ভবিষ্যতে কখনও লেখা হইবে কি-না তাহা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নহে। ঐরূপ জীবনীগ্রন্থ লিখিতে চেষ্টা করা আমার উদ্দেশ্যও নহে, উহা আমার সীমিত ক্ষমতায় সম্ভবও নহে। বর্তমানে আমার উদ্দেশ্য নিতান্তই সাধারণ, তাঁহাকে যেমনটি দেখিয়াছি এবং তিনি আমার কাছে যেমন প্রতিভাত হইয়াছিলেন তাহারই একটি বিবরণ দিতে চাই। তাঁহার সমগ্র জীবন ধরিলে আমি তাঁহার অনেক কিছুই দেখি নাই তাহা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে কারণ তাঁহার সহিত আমি তিন বৎসরের কিছু অধিক কাল ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ছিলাম,—১৯২১ সালের আগস্ট মাস হইতে ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত।

আত্মোপলব্ধির দিক হইতে বিচার করিলে ঐ সময়ই ছিল তাঁহার জীবনের সুবর্ণ-যুগ এবং ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসের দিক হইতে বিচার করিলে ঐ সময় ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাল। স্বভাবতই দেশবন্ধুর জীবনের এই খণ্ড বিক্ষিপ্ত চিত্রগুলি সম্ভবতঃ একটি বিশেষ অর্থ বহন করে বিশেষতঃ তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনীকারের কাছে এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের কাছে।

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন তারিখে দেশবন্ধুর আকস্মিক এবং মর্মান্তিক বিয়োগের পর হইতেই আমি তাঁহার সম্পর্কে কিছু লিখিবার জন্য আকুল আগ্রহ বোধ করিতেছি। কিন্তু এইরূপ একটি গুরুত্বপুর্ণ কর্তব্য সম্পাদনে নিজেকে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বোধ করিয়া সেই কর্তব্য সম্পাদনে বিরত রহিয়াছি। ১৯৩৪ সালে ইউরোপে আমি যখন আমার গ্রন্থ "ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ১৯২৯-১৯৩৪" লিখিতে ব্যাপৃত ছিলাম তখন দেশবন্ধুর জীবন, কর্ম এবং চরিত্রের উল্লেখ না করিয়া পারি নাই। ঐ সময় আমি তীব্রতরভাবে উপলব্ধি করিলাম যে, আমার অসংখ্য ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ঐ মহান পুরুষের জীবন-স্মৃতি লিখিবার জন্য আমাকে সবিশেষ যত্নবান হইতে হইবে এবং

উহা অতি শীঘ্রই প্রণয়ন করিতে হইবে কারণ যতই বিলম্ব হইবে ততই স্মৃতিপট হইতে ঘটনা এবং তাহার প্রভাব অস্পষ্ট হইয়া যাইবে। এই খণ্ড বিক্ষিপ্ত চিত্র অঙ্কিত করিবার সংকল্প আমি তখনই গ্রহণ করিলাম এবং প্রয়োজনীয় অবকাশ লাভ করাই একমাত্র সমস্যা হইল। যখন ইউরোপে ছিলাম আমার রুগ্ন দেহের প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও অনেকগুলি কাজেও আমার হাত দেওয়া ছিল, তাহা ছাড়া প্রায়শ ভ্রমণে নিযুক্ত থাকিতে হইত। আমার বর্তমান কারারুদ্ধ অবস্থা যাহা ১৯৩৬ সালের ৮ই এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, আমাকে ঐ প্রয়োজনীয় অবকাশ দিয়াছে এজন্য ভারত সরকারকে সাধুবাদ জানাইতেছি। দেশবন্ধুর এই নরদেহ ত্যাগের ১১ বৎসর পরে আজ ১৯৩৬ সালের ১৬ই জুন আমি এই কার্যে ব্রতী হইলাম।

দেশবন্ধুর জীবনের খণ্ড বিক্ষিপ্ত চিত্র বলিতে দেশগৌরব উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার সাহিত্য কীর্তি, মামলায় অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন, ১৯১৬ সাল এবং তাহার পরবর্তী সময় ও নবজীবন।

অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক, অনন্যসাধারণ রাষ্ট্রনেতা এবং বহুমুখী প্রতিভায় ভাস্বর এই মহানায়কের মহাজীবনী প্রণয়ন করিতে বসিয়াও সেই দিক হইতে আমি শঙ্কিত তদুপরি নিজের অক্ষমতা ও অসামর্থ্যের কথাও ভাবিয়াছি তথাপি নিরস্ত হই নাই। কিন্তু তিনি ঠিক যেমনটি ছিলেন ঠিক তেমনটি অঙ্কিত করিতে পারিয়াছি কি-না সে-বিষয় পাঠকবর্গ ই শ্রেষ্ঠ বিচারক।

আদি যুগে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য নিজের যাহা কিছু সব মৈত্রেয়ীকে বুঝাইয়া দিতে উদ্যত হইলে মৈত্রেয়ী উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাং"। অর্থাৎ জাগতিক সম্পদ সম্পদই নহে। পারিবারিক ঐতিহ্যে, সাহিত্যে ও কাব্য-যশে এমন কি আইন-ব্যবসায়ে সাম্রাজ্যের সম্পদের মত অপরিমেয় অর্থাগমের মধ্যে তাই চিত্তরঞ্জনও শান্তি পান নাই। তাই ঐ সব জাগতিক যশ-ঐশ্বর্যকে জীবনের পশ্চাতে ফেলিয়া মানুষের সেবারূপ অমৃত পিপাসায় পিপাসার্ত হইয়া তিনি দেশের লক্ষ কোটি মানুষের মুক্তি-যুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করিলেন। এই অমৃত পথের যাত্রীর জীবনীগ্রন্থ তাই জাতির অগ্রগতির পথ আলোকিত করিয়া তুলিবে।—যে-পথে অসীম ধৈর্য আর সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তিনি জীবনে জয়লাভ করিয়াছেন সেই পথে ধৈর্য আর সাহস লইয়া সকলকে জয়ী হইতে অনুপ্রাণিত করিবে; যে সহৃদয় অন্তরের অধিকারী হইয়া তিনি দুঃখীর দুঃখে কাঁদিতেন,

সকলের হৃদয়কে তেমন কুসুম-কোমল করিতে সাহায্য করিবে,—যে সর্বত্যাগী ভোলানাথের মত নিঃস্বার্থ ভাব লইয়া তিনি দেশ জননীকে পূজা করিয়াছেন, সকলকে তেমন নিঃস্বার্থ হইয়া দেশকে পূজা করিতে, জাতিকে গঠন করিতে আহ্বান জানাইবে। এই আশাতেই দেশবন্ধুকে আবার নূতন করিয়া স্মরণ করিতেছি, ধ্যান করিতেছি এবং পূজা করিতেছি।

পরিশেষে এই গ্রন্থ প্রণয়নে যাহারা আমাকে উৎসাহ ও সাহায্য করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ। ইহা ছাড়া প্রিমিয়ার পাবলিসিটি সোসাইটির শ্রীসত্যেন রায়, জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীসুধীর ব্রহ্ম আমাকে পুস্তকাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া আমি তাহাদের ধন্যবাদ জানাই।

নিবেদক,

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—

(১) দেশবন্ধু স্মৃতি : ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

(২) দেশবন্ধু : মণি বাগচি

(৩) দেশবন্ধু স্মৃতি : দিলদার

(৪) মৃত্যুহীন প্রাণ : সাহানা দেবী

(৫) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

(৬) বসুমতী লাইব্রেরী

(৭) সুভাষচন্দ্রের পত্রাবলী

উৎসর্গ

ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের শহীদদের
উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি

সূচীপত্র

চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন	···	১
জীবনের উপাদান	···	৫
ছাত্র জীবন	···	১১
আইনজীবী	···	২২
রাজনৈতিক জীবন	···	৪৬
সাহিত্য প্রাঙ্গণে	···	৩৫৯
মানুষ চিত্তরঞ্জন	···	৪১১
রসরাজ চিত্তরঞ্জন	···	৪৭৯
চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জনের জীবন-পঞ্জী	···	৪৮৭
দেশবন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি	···	৪৯৩
কবিকুলের শ্রদ্ধাঞ্জলি	··	৫৩২
সংবাদ-পত্র জগতের শোকপ্রকাশ	···	৫৩৪
পরিশিষ্ট (১)	···	৫৪৯
পরিশিষ্ট (২)	···	৫৫৭

চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে ভারতের বিশেষতঃ বাংলামায়ের পবিত্র ক্রোড়ে কয়েকজন মহাপুরুষ-সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃভূমির মুখমণ্ডল উজ্জ্বল মহিমায় মহিমান্বিত করিয়াছেন। শিক্ষা-দীক্ষায়, ধর্মে-কর্মে এবং জ্ঞান গরিমায় তাঁহারা ছিলেন সমুন্নত আবার জলন্ত দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবোধের গভীর টান ও প্রখর চেতনায়ও তাঁহারা ছিলেন উদ্বুদ্ধ। তাই ব্যক্তিগত শিক্ষা-দীক্ষা, বিপুল বিষয়-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সে-জীবনকে পশ্চাতে রাখিয়া জন-জীবনের মধ্য-মঞ্চে দাঁড়াইয়া তাঁহারা মনে করিতেন, কি যেন তাঁহাদের নাই ; যেন দেহ আছে প্রাণ নাই,—নাই প্রাণের স্পন্দন ! —না থাকারই কথা। কারণ তাঁহারা যে মর্মে মর্মে সাম্যবাদী রুশোর মতই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, "Man is born free but every where he is in chain." ভারত ছিল তখন পরাধীন। সেই পরাধীন ভারতের গ্লানি তাঁহাদের অন্তরে অন্তরে তীব্র অপমান বোধের জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছিল তাই তাঁহারা হইয়াছিলেন মুক্তিপাগল !—মুক্তির দূত !! হইয়াছিলেন রাজনৈতিক ক্ষ্যাপা দুর্বাসা !

ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই মুক্তিপাগল মহান পুরুষসিংহদের মধ্যে অনেকেই আজ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। যে পবিত্র-ফল লাভের আশায় তাঁহারা জীবনব্যাপী মুক্তি সেনার সজ্জায় সজ্জিত হইয়া প্রাণপণ যুদ্ধ করিতেছিলেন, ফলপ্রাপ্তির পূর্বেই তাঁহারা মৃত্যুর শীতল স্পর্শে কালের কবলে চির নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়াছেন। কেহ কেহ আবার ফলপ্রাপ্তির শুভ-মুহূর্তে আমাদের মাঝে থাকিয়া কোটি কোটি ললনার উলুধ্বনি আর অসংখ্য শঙ্খধ্বনি শুনিয়া পরমতৃপ্তিতে মন-প্রাণ জুড়াইয়াছেন। তিনি ভাগ্যবান। বৃক্ষ রোপণ করিয়া সেই বৃক্ষের ফললাভ এবং উহা আস্বাদন করা সৌভাগ্যের লক্ষণ বৈ-কি ! কিন্তু যাঁহারা জমিকে উপযুক্তরূপে প্রস্তুত করিবার জন্য

অক্লান্ত পরিশ্রমে ঘর্মাক্ত কলেবর হইয়া আরও দ্বিগুণ উদ্দীপনায় বীজ বপণ করিয়া দিনের পর দিন সাধকের তপস্যার মত জল সিঞ্চন করিতে করিতে বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে চারাগাছ, চারাগাছ হইতে শাখাপ্রশাখায় বিস্তারিত পুর্ণাঙ্গ এক বিশাল মহীরুহে পরিণত করিয়া ফল আস্বাদনের পূর্বেই বিদেহী হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি কি আমাদের কোন কর্তব্যই নাই? রূপকের অন্তরালে আবৃত না রাখিয়া কথাটিকে প্রত্যক্ষভাবেই বলা যাইতে পারে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় যাঁহারা আকাঙ্ক্ষিত হইয়া জীবনকে তুচ্ছজ্ঞানে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পূর্বেই ধরা-ধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমাদের পক্ষে কি তাঁহাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত? আমরা গঙ্গার পবিত্র তোয়োধারায় অবগাহন করিয়া দেহ শীতল করিব, গঙ্গার পবিত্র উদক পান করিয়া মনের পুঞ্জীভূত মালিন্য বিদূরিত করিয়া শুচি-শুদ্ধ হইব অথচ আমাদেরই উপকারার্থে গঙ্গাকে যিনি মর্তে বহন করিয়া আনিয়াছেন সেই মহাপরোপকারী ভগীরথকে স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির মিশ্রিত অর্ঘ বহন করিয়া কৃতজ্ঞতায় তাঁহার পদপ্রান্তে মস্তক অবনত করিব না? আমরা কি এতই অকৃতজ্ঞ?

না—আমরা কৃতঘ্ন নই। বৃক্ষ রোপন করিয়া যিনি ফল আস্বাদনের পূর্বেই চিরবিদায় লইয়া গিয়াছেন সেই বৃক্ষের প্রথম ফল দেবতাকে প্রিয় মনে করিয়া তাঁহারই আত্মার উদ্দেশ্যে দেবতার সম্মুখে নৈবেদ্য সাজাইয়া দেই। তাঁহারই উদ্দেশ্যে নিবেদন করি অন্তরের উৎসারিত প্রেম-প্রীতি আর ভক্তি-শ্রদ্ধার পবিত্র অঞ্জলি। কানন হইতে চয়ন করা কোন ফুল নহে, নহে মালঞ্চের মালতী-লতার সুরভিত ফুল, ফুল-কলি, তথাপি এ কথা, আজিকার এই লেখা, অন্তরের ব্যথা-কাঁটার বৃন্ত ছেদিয়া গোলাপের মত প্রস্ফুটিত হইয়া একটি অঞ্জলি হইয়া উঠুক ইহাই প্রার্থনা। ইতিপূর্বে আমাদের সকলের মনোবেদনার একটি স্বচ্ছ প্রকাশ বিদ্রোহী কবি অথবা কবি-বিদ্রোহী নজরুল ইস্‌লাম তাঁহার ব্যথার বীণায় সশ্রদ্ধ সুরের অঞ্জলি তুলিয়া ধরিয়া বলিয়াছেন,

"কাঁদিছে ধরার তরুলতাপাতা, কাঁদিছে পশুপাখী,
ধরার ইন্দ্র স্বর্গে চলেছে ধূলির মহিমা মাখি।"

বিয়োগ-ব্যথায় ব্যথাতুর হইয়া মানুষ কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিন্তু এ-বিয়োগ এমন বিরাট বিয়োগ এবং এ-মৃত্যু এমন মহান মৃত্যু যে, শুধু মানুষ নহে, নিখিল ধরার অরণ্য-বনানী, পশু-পক্ষী সকলেই বুকভাঙ্গা ব্যথায় রোরুদ্য-

মান। নজরুল বলিয়াছেন, তিনি ছিলেন ধরার ইন্দ্র। হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্র অনুযায়ী স্বর্গে যে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী আছেন তাঁহাদের রাজা হইতেছেন 'ইন্দ্র'। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মহাপ্রয়াণে নরুজল ইস্‌লাম চিত্তরঞ্জনকেও ধরার ইন্দ্ররূপে অভিহিত করিয়াছেন। সহস্র বিলাপে কাঁদিয়া কাঁদিয়াও যখন তাঁহার শোকের কান্নার গতি অবরুদ্ধ হইল না তখন আবার তাঁহার ব্যথার বীণায় নূতন করিয়া ছড়্ চালাইলেন :

ছন্দগানের অতীত হে ঋষি, জীবনে পারিনি তাই
বন্দিতে তোমা', আজ আনিয়াছি চিত্ত-চিতার ছাই।

জীবিতকালে দেশবন্ধুকে প্রাণের ষোড়শ উপচারে বন্দনা করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার মহাপ্রস্থানের পর নজরুলের চিত্ত অনুশোচনার অনলে দগ্ধ হইয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল। তিনি কাব্যের ছন্দে ছন্দে তাঁহার অনুশোচনা আর সেই চিত্ত-চিতার ছাই দেশময় তখন ছড়াইয়া দিয়াছেন। ছন্দ-গানের অতীত যে ঋষি, যাঁহার ললাটতলে ছিল ত্যাগের দেদীপ্যমান তপন আজ সেই যুগ-ভীষ্ম, অরিন্দম, দাতাকর্ণ, মহাকবি ও মহাজ্ঞানীর জন্ম শতবার্ষিকীর শুভদিন কালের চক্রে আবর্তিত হইয়া আমাদের সম্মুখে সমাগত। দেশবাসীর সঙ্গে আমিও তাঁহার পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই,—জানাই অন্তরের শ্রদ্ধা 'একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে'। মর্মে মর্মে অনুভব করি, তুমি আছ, তুমি থাকিবে, তুমি অমর,—তোমার আত্মার বিনাশ নাই। যে-মৃত্যুহীন প্রাণ লইয়া তুমি আসিয়াছিলে, তোমার মৃত্যুর দিন বলিতেছি না,—তোমার বিদায়ের দিনে সেই মৃত্যুঞ্জয় প্রাণই দেশে দেশে, ঘরে-ঘরে রাখিয়া গিয়াছ। সে প্রাণ তো অনির্বাণ শিখা! সে প্রাণ তো চিরঞ্জীব। তাই মহান পুরুষসিংহের মহা-প্রয়াণের দিনে, দেশ যখন জীবন-সিন্ধু মথিত করিয়া শোকের অতল সায়রে নিমজ্জিত, দেশ-মাতার আয়ত বক্ষ ক্রন্দন নীরে সিক্ত, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তখন আন্তরিক বেদনায় কাঁদিয়া উঠিলেন,

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান॥"

রবীন্দ্রনাথ এবং কাজী নজরুল ইস্‌লাম কবি। কবি কাব্যবীণার তারে তারে করুণ-সুরে বিলাপ জানাইয়া সেই রাজর্ষির উদ্দেশ্যে অঞ্জলি তুলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু অ-কবির পক্ষে সেই মহামানবের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পথ সহজ নয়।

তাহা ছাড়া তিনি ছিলেন এত বিরাট, এত মহান যে, তাঁহার জীবনের সমগ্র ঘটনাপঞ্জী সংগ্রহ করা এবং অবগত হওয়া সম্ভব নহে।—কে পারে মহাসাগরের সব সংবাদ সংগ্রহ করিতে? অভ্রংলহি, গগনচুম্বী হিমালয়ের পাদদেশে দণ্ডায়মান হইলে হিমালয়ের বিরাটত্বের কাছে যেমন নিজেকে অতি তুচ্ছ, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে হইয়া মানুষের অহং-ভাব বিদূরিত হয়, সাগর-সঙ্গীত রচয়িতা দেশবন্ধুর মহা-জীবনী লিখিতে বসিয়াও আজ আমার তদ্রূপ অবস্থা হইয়াছে। তিনি কত বিরাট,—আমি তাঁহার তুলনায় অতি ক্ষুদ্র, তিনি আকাশের মত উঁচু, আমি তাঁহার কাছে তৃণাদপি নীচু, তথাপি যত ক্ষুদ্রই হই না কেন, সূর্যের পানে আপন ক্ষুদ্রবৃন্তে সূর্যমুখীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মত, আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের এই শুভ সুযোগকে আমি অবহেলায় পরিত্যাগ না করিয়া একটি কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি ধরিতে ইচ্ছুক। আমার এই প্রচেষ্টা হয়ত পূর্ণাঙ্গ জীবনী অথবা উহার বিস্তৃত আলোচনার সাফল্যে সাফল্যমণ্ডিত হইতে না পারে তথাপি বিজ্ঞান-তাপস অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন সে-কথাই এই স্থানে উল্লেখ করিয়া রাখি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্র চিত্রণের সময় তিনি বলিয়াছেন, খুদ্রকে বৃহৎ আকারে দেখাইবার নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে সত্য কিন্তু বৃহৎকে ক্ষুদ্র আকারে দেখাইবার জন্য আজ পর্যন্ত কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই। দেশবন্ধুর জীবনী লিখিতে বসিয়া না-হয় সেই প্রচেষ্টাই করিলাম, সিন্ধুকে দেখাইতে চাহিতেছি একটি বিন্দুর মধ্যে।

"It is a regret that you are on the Bench and I am at the bar. Were it elsewhere, I could have given you the proper reply'. অর্থাৎ ইহা দুঃখের বিষয় যে আপনি বিচার আসনে রহিয়াছেন এবং আমি আছি এখানে, যদি অন্য স্থান হইত তবে আমি ইহার উপযুক্ত উত্তর দিতে পারিতাম'—ইহাই ছিল বিচারকের মুখের উপর চিত্তরঞ্জনের বীরোচিত উত্তর। আত্ম সম্মানের উপর কোনদিন কেহ আঘাত করিলে, রাজদরবারেই হউক বা কোন সামাজিক পরিবেশে অথবা কোর্ট-কাছারিতেই হউক চিত্তরঞ্জন উহা নীরবে কখনই সহ্য করেন নাই। উপরোক্ত উক্তি তিনি করিয়াছিলেন আলিপুর মোকদ্দমার সময় জজ সাহেব হঠাৎ চিত্তরঞ্জনের argument এর সময় বলিয়া ফেলিয়াছিলেন 'Non-sense.' কথাটি শুনিয়াই তিনি ক্রোধে জলিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার এই বীরত্ব এবং আত্মসম্মান সম্বন্ধে সচেতনভাব বংশানুক্রমে তাঁহার রক্তের ধারায় প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। কালীমোহন দাশ মহাশয়ও এমনই এক উত্তর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের একজন মেজাজী বিচারপতি স্যার লুই জ্যাক্সন-এর কোর্টে কালীমোহন বক্তৃতা দিতেছিলেন। যদিও তিনি নির্ভুল ইংরাজীই বলিতেছিলেন তথাপি লুইস্ বলিয়াছিলেন, "Mind your English Kalimohon Babu"—অর্থাৎ কালীমোহন বাবু আপনার ইংরাজী ঠিক হইতেছে না। বিচারপতি আর কোথায় যাইবেন। ক্রুদ্ধ কালীমোহন সংযত ভাষায় অত্যন্ত গুরুগম্ভীরভাবে সংগে সংগে উত্তর দিয়াছিলেন, "Never mind my English, my Lord, it is good, mind the soundness of my argument"—ইংরাজীর দিকে নজর না রাখিয়া আমি যে যুক্তি আরোপ করিতেছি, তাহাই লক্ষ্য করুন। শুধু ইহাই নহে, ক্রোধের বহ্নি প্রকাশ করিলেন পরবর্তী কথায়, "I am surprised, my Lord, that after so many years of exeprience as a district judge, I cannot make you understand what a student of law.can very well follow."

উচ্চ আদালতের একজন বিচারপতিকে আদালতের মধ্যে দাঁড়াইয়া argument করিবার সময় এমন কথা বলার যে শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন তৎকালীন পরিবেশেও কালীমোহনের তাহা ছিল। শুধু কালীমোহনই নহে, দেশবন্ধুর পিতা ভুবনমোহন ও অপর খুল্লতাত দুর্গামোহনও আত্মসম্মানে সচেতন এবং অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। তবুও পিতা ভুবনমোহন সম্বন্ধে তাহার চরিত্রের মাধুর্যপূর্ণ বীরত্বের একটু কাহিনী উল্লেখ না করিলে চিত্তরঞ্জনের জীবনী গঠনের উপাদান বিষয়ে অনুল্লেখ থাকিয়া যাইবে। সুতরাং অতি সংক্ষেপে ঘটনাটুকু বিবৃত করা যাইতেছে : একটা খুনী আসামী তাহার দণ্ড হ্রাসের জন্য হাইকোর্টে মিঃ জাষ্টিস্ নরিসের আদালতে আপীল করিয়াছিল। ভুবনমোহন আপিলাণ্টের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া অপূর্ব যুক্তি প্রদর্শন করিতেছিলেন। কিন্তু ভুবনমোহন তাঁহার কাগজ 'Bengal Public opinion'-এ এই বিচারপতির এক বিচার সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া এক মূল্যবান সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই লেখায় বিচারপতি নরিস ভুবনমোহনের প্রতি স্বাভাবিকই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আপিলাণ্টের পক্ষ সমর্থন করায় নরিস তাহার অসন্তুষ্টির প্রতিশোধ লইবে, ভুবনমোহনের argument-এর সময় নরিসের অমনযোগ দেখিয়া ভুবনমোহন তাহা নিশ্চিত করিয়া বুঝিয়াছিলেন। তাই ভুবনমোহন আসামীর দিকে চাহিয়া, ধর্মের দিকের চাহিয়া এবং নিজের কর্তব্যের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন, আপনি মাননীয় বিচারপতি, মোকদ্দমার সময় আসামীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। উহার জেল ফাঁসি আপনার উপর নির্ভর। আমার উপর আপনার ব্যক্তিগত অসন্তোষ থাকিতে পারে কিন্তু আমার অনুরোধ তাহা যেন মোকদ্দমার বিচার্য বিষয় অতিক্রম করিয়া আসামীর উপর না পৌছায়। তাহা যদি পৌছায় তবে আপনার অন্যায় হবে এবং পবিত্র ধর্মাধিকরণের মাননীয় উচ্চাসন কলঙ্কিত হইবে। এ-আসনকে আর ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের জের টানিয়া মসীলিপ্ত করিবেন না।'

ভুবনমোহনের দৃপ্ত ভাষণ ও সৎ সাহসের পরিচয় পাইয়া মিঃ নরিস অত্যন্ত খুশী হইয়া সত্য সত্যই নিরপেক্ষ বিচার করিয়া আসামীকে মুক্তি দিয়াছিলেন।

নিয়ম অনুসারে গোলাপের গাছে গোলাপ ফুলই প্রস্ফুটিত হয় কিন্তু সব গোলাপই আকৃতিতে, প্রকৃতিতে এবং সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে সমানভাবে ফুটিয়া ওঠে না। ব্যতিক্রম হয়-ই। সমাজ-সংসারেও দেখা যায়, সর্বক্ষেত্রে পিতার

মত পুত্র হয় না। চিত্তরঞ্জনের ক্ষেত্রে পিতার মতই পুত্র এ-কথাটি সত্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে বরং বলা যায়, যশে মানে চিত্তরঞ্জন পিতাকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। ভুবনমোহন পুত্রের নিকট তাঁহার এই পরাজয়ে কত যে গর্ব বোধ করিতেন তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আবার চিত্তরঞ্জনও ভুবনমোহনের পুত্র বলিয়া ঠিক তেমন গর্ব অনুভব করিতেন। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্য সম্বন্ধে বিচার বিশ্লেষণ করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত করা যাইবে যে, চিত্তরঞ্জনের জনক-জননী উভয়েই সর্বতোভাবে উপযুক্ত ছিলেন। ভুবনমোহন ছিলেন আত্মীয় বৎসল, দাতা, দেশপ্রেমিক এবং চারিত্রিক মাধুর্যে মণ্ডিত, উপরন্তু তিনি ছিলেন কবি, কীর্তনীয়া এবং সঙ্গীতজ্ঞ। মাতৃদেবী নিস্তারিণী ছিলেন জ্যোতির্ময়ীরূপিনী সাধিকা, তিনি ছিলেন মহিমময়ী, দানশীলা। তাঁহার সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের তৃতীয়া ভগ্নী প্রমীলাদেবীর স্বামী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছিলেন, "চিত্তের অনেক সদগুণ ছিল সন্দেহ নাই কিন্তু তাঁহার মার কাছে তা 'অতিসামান্য।" চিত্তরঞ্জনের এক খুল্লতাত জ্ঞানেন্দ্রমোহন বলিয়াছিলেন, "সকলেই ভাবিত বৌঠাকুরুণ আমাকে সকলের অপেক্ষা বেশী ভালবাসেন।" ললিতবাবু নামে দেশবন্ধুর এক খুল্লতাত ছিলেন। তিনি বলিতেন, "সমদর্শিতা ছিল বৌঠাকুরুণের প্রধান গুণ।" প্রকৃতপক্ষে নিস্তারিণী দেবীর মত এমন গরীয়সী মাতৃরূপ খুব কমই দেখা যায়। সুতরাং দেব-দেবীর মত পিতামাতার সমস্ত গুণ চিত্তরঞ্জনের মধ্যে থরে-বিথরে একটির পর আরেকটি করিয়া সজ্জিত ছিল যাহা তাঁহার বয়ঃবৃদ্ধির সংগে সংগে দেশবাসীর সম্মুখে প্রকাশিত হইতেছিল,—সে গুণরাজির ইয়ত্তা নাই। স্বর্গের দেব-দেবীগণ তাঁহাদের সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ অংশটুকু দান করিয়া স্বর্গরাজ্যের অপূর্ব সুন্দরী তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। চিত্তরঞ্জনকেও ঠিক তেমনিই বলা যায় যে, তেলিরবাগ বাগিচায় যে সমস্ত ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া দেশবাসীগণকে তাহার গন্ধ বিতরণ করিয়া আমোদিত করিয়াছেন চিত্তরঞ্জন তাহাদেরও শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যকণা এবং মধুময় গন্ধটুকু লইয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর শনিবার বেলা ৪টা ৪৮ মিনিটের সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভুবনমোহন তখন কলিকাতা পটুয়াটোলা লেনে একখানা ভাড়া-বাড়ীতে বসবাস করিতেন। দেশবন্ধুর বাল্যকাল কলিকাতার ভূমিতেই পরিপুষ্ট তথাপি এ কথাও ঠিক যে সংখ্যাগণনায় কম হইলেও তিনি তাঁহার পৈতৃক বাসভূমি ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অধীনে

তেলিরবাগ গ্রামে কয়েকবার গিয়াছেন। তাহাতেই সেখানকার প্রকৃতির যে শিক্ষা তাহা তিনি মন ভরিয়া, প্রাণ ভরিয়া এবং বুক ভরিয়া গ্রহণ করিয়া আনিয়াছেন। উহার প্রান্তরের বিশালতা তাঁহার সীমিত বুকে সীমাহীন বিশালতা আনিয়া দিয়াছিল। তরঙ্গময়ী পদ্মা তাঁহাকে একাধারে শিক্ষা দিয়াছিল তেজ, গর্জন এবং অন্য দিকে শিক্ষা দিয়াছিল স্নিগ্ধ ও শান্তভাব আর কোমলতা। ধ্বংস আর কীর্তিনাশের প্রতিরূপ পদ্মার গুরুগর্জন, খরস্রোতের বিদ্যুৎ তাঁহার মনে অমিত তেজ আর সিংহের বিক্রম আনিয়া দিয়াছিল। আবার তেলিরবাগের দেহ শীতল করিতে পদ্মার প্রশস্ত বুকের দক্ষিণা বাতাস, গ্রীষ্মের দাবদাহ বিদূরিত করিতে গৈরিক বর্ণের বরফ সম শীতল জল! যত দূর চক্ষু যায় ততদূর ধু-ধু করা বুক-ভরা তরঙ্গ-ভঙ্গ পদ্মার গৈরিক জলরাশি কৈশোরের চিত্ত প্রাণেও কি কোন গৈরিক-সংবাদ বহন করিয়া আনিয়া দিয়াছিল? তাঁহার পরবর্তী জীবনের কীর্তন সংগীত কি ঐ গৈরিক জলরাশির অবদান?

দ্বিতীয়তঃ বিক্রমপুরের তেলিরবাগ। সত্য সত্যই এখানকার পুরবাসীগণ যে বিক্রমশালী ছিলেন তাহাও সর্বজন বিদিত। শুধু দুই এক শতাব্দীর ইতিহাস ধরিয়া নহে, শত শত বৎসরের এমন কি বৌদ্ধযুগের প্রভাতকাল হইতে সেখানকার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, বিক্রমপুরের ফসল সোনার ফসল। বাংলার কৃষ্টি ও সম্পদের গোলাঘর, প্রাচীন এমন কি বর্তমান সভ্যতার জন্মভূমি। বিক্রমশিলার জগদ্বিখ্যাত মহাবিহারের অধ্যক্ষ বিখ্যাত বৌদ্ধমহাতান্ত্রিক, মনীষী পরমতত্ত্বজ্ঞানী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ এই বিক্রমপুরের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া এখানকার ধূলিকণাকে পুণ্যরজে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধযুগ ছাড়িয়া মুঘলযুগের দিকে দৃকপাত করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিক্রমপুরের জমিতে যেমনই সোনার ফসল ফলিয়া চলিয়াছে, মুঘলযুগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার বার ভুঁইঞার মধ্যে চাঁদ রায়, কেদার রায়ের বীর গাঁথা আর গৌরব মণ্ডিত ঘটনাবলী আজও মানুষের মনে মনে গাঁথা হইয়া রহিয়াছে। তারপরে সেদিনের দুয়ারে দাঁড়াইলেও দেখা যায়, ভারতীয় নারী সমাজের কণ্ঠ-হার, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কুল-গৌরব কবি ও দেশ-প্রেমিকা সরোজিনী নাইডু, জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞান-তাপস জগদীশ চন্দ্র বসু। রাজকার্যে যাঁহারা নিযুক্ত থাকিয়া উচ্চ সম্মানের আসন অলঙ্কৃত

করিয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যাও অসংখ্য। তবে তখনকার পরিবেশে কোন বাঙালীর পক্ষে হাইকোর্টের বিচারপতি হওয়া অত্যন্ত সম্মান ও যোগ্যতার পরিচায়ক বলিয়া জষ্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষের নামই শুধু উল্লেখ করা হইল।

যাহা হউক তেলিরবাগ বাগিচার সব কুসুমের সুগন্ধ, বিক্রমপুরের বিক্রম আর পদ্মার অমিত গর্জন ও দুর্বার গতি লইয়াই চিত্তরঞ্জন জীবনব্যাপী যে পথে চলিয়াছেন সে-পথের উভয় পার্শ্বে কৃতকার্যের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। যে পথে তিনি গিয়াছিলেন সে-পথের সকলকে তুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। এখানেও সুন্দর এক ছন্দ আর মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এক শুভক্ষণে ভূমিষ্ঠ শিশুর নামকরণ করা হইয়াছিল, 'চিত্তরঞ্জন'। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাম শুধু নামই, শুধু নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে চিহ্নিত করিবার জন্য একটি সংকেত মাত্র; জীবনের ছন্দে নামের অর্থ ও গন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হুমায়ুনের পলাতক অবস্থায় আকবরের জন্ম। আনন্দিত হুমায়ুন পলাতক অবস্থায় অর্থাভাবে সঙ্গীদিগকে প্রচুর মিষ্টি খাওয়াইতে না পারিয়া সঙ্গে যে কস্তুরী ছিল তাহা হইতে একটু একটু করিয়া সঙ্গীদিগকে দিয়া বলিয়াছিলেন, প্রার্থনা করি, আমার এই পুত্রের মান ও যশ যেন এই কস্তুরীর গন্ধের মত চারিদিকের বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে। হুমায়ুনের প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছিস। ভুবনমোহন প্রকাশ্যে প্রার্থনা না জানাইয়া হয়ত আন্তরিক প্রার্থনান্তে নবজাতকের নাম রাখিয়াছিলেন 'চিত্তরঞ্জন'। সত্যই নামের সঙ্গে সারাজীবনের কর্মে তাহার অর্থ এমন অক্ষরে অক্ষরে প্রস্ফুটিত হইয়া সমগ্র দেশবাসীর চিত্তকে সব দিক হইতে রঞ্জিত করিয়া গিয়াছেন সে-কথা ভাবিলে ভুবনমোহনের নামকরণ সার্থক। মনে হয়, তিনি ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন।

এই নিখিল চিত্তরঞ্জনকারী চিত্তরঞ্জন জীবনের একটি সত্য ঘটনাকে দুই একবার রহস্যের অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন **'I appeared at the examination, but headed the list of the unsuccessful'.** জীবন যাঁহার কৃতকার্যতায় পরিপূর্ণ তিনি অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। এই অকৃতকার্যতা তাঁহার জীবনে ভাল কি মন্দ করিয়াছিল বা দেশের পক্ষে উহা শুভ কি অশুভ হইয়াছিল তাহার বিশদ আলোচনা এ-স্থানে না করিয়া পরবর্তী অধ্যায়ে উপযুক্ত পরিবেশে করা হইবে। কিন্তু ঘটনাটি সংক্ষেপে এখানে উল্লিখিত করা যাইতেছে। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করিবার পর চিত্তরঞ্জন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ড গিয়াছিলেন। প্রথমবারে পরীক্ষা দিতে দিতে তিনি আশানুরূপ

ফল করিতে পারিবেন না বলিয়া বাকী পরীক্ষাগুলিতে উপস্থিত হন নাই। ইহার পর তিনি আবার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়াছিলেন কিন্তু যাহা পূর্ব হইতেই অদৃষ্টে লিখিত তাহা কেহই মুছিয়া ফেলিয়া ললাটপটে ইচ্ছামত নূতন লিখা লিখিতে পারে না। চিত্তরঞ্জনও পারেন নাই। পরেও চিত্তরঞ্জন পাশ করিতে পারিলেন না। এই পরীক্ষার প্রকৃতি ভিন্ন ধরনের। সাধারণ পরীক্ষার মত পাশ নম্বর পাইলেই যে সে পাশ করিল তাহা নহে। যে কয়েকজন সিভিলিয়ান সরকারের আবশ্যক, মেধা অনুসারে পর পর নির্দিষ্ট সেই কয়েকজনকে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। সে-বৎসর গ্রহণ করা হইয়াছিল পঞ্চাশজনকে। চিত্তরঞ্জনের নম্বর ছিল একান্ন অর্থাৎ যাহারা সে-বৎসর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়া অকৃতকার্য হইয়াছিল চিত্তরঞ্জন তাহাদের মধ্যে প্রথম হইয়াছিলেন। তবুও চিত্তরঞ্জনের ভাগ্যাকাশে একটু রবি-রশ্মির ঝিলিক্ দৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ পঞ্চাশজনের মধ্যে একজন ডাক্তারী পরীক্ষায় অযোগ্য হইয়া বাতিল হইয়া গেলে এবং অন্য একজন অন্যত্র চাকুরী পাইয়া সিভিল সার্ভিসে যোগ দিল না। সুতরাং চিত্তরঞ্জনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন,—কিন্তু তাহাও নহে। তদানীন্তন ভারতসচিবের কাছে চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধে পূর্বেই গোপনে সংবাদ পৌঁছিয়াছিল। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি স্যার রিচার্ড গার্থ খুল্লতাত কালীমোহনবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন এবং ভুবনমোহনের সঙ্গেও তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় ছিল। তিনি নিজেও চিত্তরঞ্জনের বিষয়টি লইয়া ভারতসচিবের নিকট তদ্বির করিয়াছিলেন কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভুবনমোহনকে তিনি ইংল্যাণ্ড হইতে চিঠি লিখিয়াছিলেন, "আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু তোমার ছেলের রাজনৈতিক মতামতের জন্য কৃতকার্য হইতে পারি নাই। যাহা হউক আমি আশা করি ব্যারিস্টারী করিয়াই শ্রীমান চিত্ত জীবনে যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিবে, হৃদয়ভঙ্গ হইও না, জানিবে ইহাই ভগবানের অভিপ্রেত।"

পরিশ্রম করিয়া পড়াশুনা করিবার পর অকৃতকার্য হইলে সত্য সত্যই মন ভাঙ্গিয়া যায়, অপরের কোন উপদেশে সেই মনের বিষাদ সহজে দূরীভূত হয় না। চিত্তরঞ্জনের শৈশবকাল হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার ছাত্র-জীবন পর্যন্ত পর্যালোচনা করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহাতে তিনি কোন পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইবার মত মেধাহীন ছিলেন না।

ছাত্র জীবন

পটুয়াটোলার ভাড়া-বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া ভুবনমোহন ভবানীপুরে কাঁসারীপাড়া রোডে এলগিন রোডের সম্মুখে 'বিজলী হাউস' এবং তৎপরে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া বকুলবাগানের মোড়ের বাড়ীতে উঠিয়া আসেন। এই ভবানীপুরেই তাঁহার শিক্ষা-জগতে প্রথম প্রবেশ। লণ্ডন মিশনারী স্কুলের ছাত্র চিত্তরঞ্জন। লেখাপড়ায় যাহাকে বলে অত্যুজ্জ্বল তাহা তিনি বাল্যকালে ছিলেন না। আবার মন্দও তিনি ছিলেন না কারণ ঐ মিশনারী স্কুলের সপ্তম শ্রেণী হইতে ডব্‌ল প্রমোশান না পাইয়া তিনি মনোবেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন। লেখাপড়া সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না জন্মাইলে ডব্‌ল প্রমোশান না পাওয়ার জন্য তিনি মনের সব অব্যক্ত ভাষাকে চোখের জলের মাধ্যমে লোককে জানাইতেন না। অসন্তুষ্ট হইলেন স্কুলের উপর। লণ্ডন মিশনারী স্কুলেরই শিক্ষক জগৎহরি সেন মহাশয় তাঁহার গৃহশিক্ষক ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিন না তবুও চিত্তরঞ্জনকে অন্য স্কুলে ভর্তি করাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু সেখানকার ফল হইল আরও শোচনীয়। পুত্রকে তো মানুষ করিতেই হইবে, সুতরাং ভুবনমোহন জগৎহরি সেন মহাশয়কেই পুনরায় ডাকিয়া আনিয়া বলিয়াছিলেন, "ওর ঐ স্কুলে এক বর্ণও শিক্ষা হয় নাই; আপনাদের ওখানে ডব্‌ল প্রমোশান না পাইয়া বড়ই মুষড়িয়া গিয়াছে।"

জগৎবাবু তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না এবং তাঁহারই চেষ্টা এবং যত্নে পুনরায় লণ্ডন মিশনারী স্কুলেই চিত্তরঞ্জনের শিক্ষাজীবন চলিতে থাকে।

স্কুল-জীবনের সেই দিনগুলিতে চিত্তরঞ্জন লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তাঁহার আর একটি প্রকৃতি ছিল সহপাঠী ও স্কুল-বন্ধুদের লইয়া দল বাঁধা। এ বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা যাদুমন্ত্রের সফলতার মত। সকলেই তাঁহার মতে এবং পথে আসিয়া এক সূত্রে গাঁথা হইত। এমন দৃষ্টান্ত কেহ দেখাইতে পারিবে না যে তিনি কোনদিন কাহারও সঙ্গে বচসা করিয়া মনোমালিন্য করিয়াছেন বরং বলা যায় অপর বন্ধুদের মধ্যে মনোমালিন্য হইলে তিনি মাঝে উপস্থিত থাকিয়া উহার মীমাংসা করিয়া মিলন ঘটইয়া দিতেন। ইহাই

ছিল তাঁহার প্রকৃতি। প্রকৃতি ছিল নিজের টিফিনের সব কিছু কখনই একা না-খাওয়া, অপর বন্ধুদের দিতেন। এমন অনেক দিন গিয়াছে যে, বাড়ী হইতে কি টিফিন দেওয়া হইয়াছে তাহা না দেখিয়া তিনি বন্ধুদের তুলিয়া তুলিয়া দিয়া দেখিয়াছেন যে নিজের জন্য অবশিষ্ট কিছুই নাই।—বলিয়াছেন, "বারে! সব-ই যে ফুরিয়ে গেল!"—তা যাউক। টিফিন খাইয়া যতটুকু উদর পূর্তি হইত এবং সুস্বাদু খাদ্যবস্তুর আস্বাদনে রসনার যেটুকু তৃপ্তি তাঁহার হইত, না খাইয়াও তিনি তাহার চাইতে বেশী তৃপ্তিলাভ করিতেন। দানে যে তৃপ্তি শৈশবের শিশুমনেই তিনি তাহা অনুভব করিতে আরম্ভ করেন। শৈশবের সে দিনগুলিতে তাঁহার কোন জিনিসের উপর যদি অন্য কোন বন্ধু লোভ করিত তিনি সংগে সংগে সে-জিনিস তাহাকে দিয়া দিতেন।

শৈশবের এই নিম্নশ্রেণীতে জগৎহরি সেন মহাশয় তাঁহার গৃহ-শিক্ষক ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি যখন ষষ্ঠশ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন তখন পূর্ণ হালদার মহাশয় তাঁহার গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত হন। জীবনযুদ্ধে জয়ী হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও চিত্তরঞ্জন তাঁহার এই গৃহ-শিক্ষককে ভুলিয়া যান নাই। প্রয়োজনের মুহূর্তে তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছেন। হালদার মহাশয়কে তিনি কয়েক সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া গৃহ নির্মাণ করিয়া দেন এবং দৈনন্দিন জীবন-যাপনের আয়ের পথকে সুগম করিবার জন্য কালীঘাটের মা-কালীর পূজা বিষয়ে হালদার মহাশয়ের ভাগের ব্যাপারটিকে তিনি পাকা-পাকি ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ছাত্রাবস্থাতেই চিত্তরঞ্জন দল বাঁধিতে ভালবাসিতেন। আবার ছন্দে-ছন্দে কবিতা সৃষ্টির আনন্দেও তিনি তাঁহার মনকে ভরিয়া তুলিতেন। তাঁহার উৎসাহ ও উদ্দীপনায় স্কুলে তিনি কবিতা সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। স্কুলে যে বিতর্ক সভা হইত তিনি তাহাতে অবশ্যই যোগদান করিতেন এবং সেই বয়সেই তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়কে সুন্দর যুক্তিদ্বারা বন্ধুদের বুঝাইয়া মুগ্ধ করিয়া ফেলিতেন। আবার কবিতা সভাতেও তাঁহার অংশই ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিজে কবিতা লিখিতেন এবং বন্ধুদের কবিতা লিখিবার জন্য উৎসাহিত করিতেন। লিখিত সেই সব কবিতা কবিতা-সভায় পাঠ করা হইত এবং গুণাগুণ বিচারে আলোচনা করা হইত। অধিকাংশ দিনই চিত্ত-রঞ্জন স্বরচিত কবিতা পাঠ করিতেন এবং যেদিন কোন কারণবশতঃ কবিতা

লিখিতে পারিতেন না সেদিন অন্যান্য কবিদের দেশাত্মবোধক কবিতা আবৃত্তি করিতেন। তাহার মধ্যে তাঁহার প্রিয় কবি ছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রঙ্গলাল। হেমচন্দ্রের ভারত-সঙ্গীত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল এবং রঙ্গলালের অনেক কবিতাও তিনি মুখস্থ বলিতেন। বলিতেন :

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়।……

কবিতাটি তিনি প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন। কিন্তু স্কুল-জীবনেই বাল্য এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণে তিনি যে মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন সে বীজ-মন্ত্রের গুরু ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। ছাত্র জীবনে অঙ্ক আর বিজ্ঞানে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না, সাহিত্যেই তাঁহার অনুরাগ ছিল বেশী। ফলে সে-বয়সেই কাব্য-চিন্তায় মনের ব্যস্ততা থাকায় ছাত্র জীবনের অঙ্ক আর বিজ্ঞানের ক্লাসগুলিতে তিনি মনোযোগ দিতে পারিতেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহার সহপাঠী এবং একসঙ্গে খেলাধূলা করিতেন, বসবাস করিতেন এমন দুইজন খুল্লতাত রাখালবাবু এবং সম্পর্কিত ভাই ললিতমোহন সেন মহাশয় বলিয়াছেন, "চিত্ত ক্লাসের পড়াশুনার প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না, মাস্টার পড়াইতেন তিনি বঙ্কিমবাবুর বই পড়িতেন অথবা কবিতা লিখিতেন।"

[দেশবন্ধু স্মৃতি : ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত]

প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তখন তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান। সারা মনের প্রবল আগ্রহ লইয়া তিনি বঙ্কিমের সমস্ত বই পড়িতেন, বিশেষতঃ 'কমলাকান্ত' ও 'আনন্দমঠ'। আনন্দমঠের সন্তান এবং কমলাকান্তের কথাগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ তাঁহার মনকে গভীরভাবে ভাবাইয়া তুলিত। তখন হইতেই উহার স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাঁহার মনের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। ইহা ছাড়া তিনি অন্যান্য বিখ্যাত লেখকের ইংরাজী ও বাংলা বই কিনিয়া মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া উহার বিষয় বস্তু দ্বারা নিজেকে সম্পদশালী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এ চেষ্টা চলিয়াছে বৎসর ব্যাপিয়াই। কিন্তু স্কুলের পরীক্ষায় তো পাশ করিতেই হইবে। সুতরাং পরীক্ষার দুই তিন মাস পূর্বে আবার ততোধিক মনোযোগ পূর্বক গভীর রাত জাগিয়া পাঠ্য পুস্তকে মনোনিবেশ করিতেন।

পরীক্ষায় কৃতকার্যও হইয়াছেন এমন কি স্কুল জীবনে তিনি দুইবার 'ডব্‌ল প্রমোশান' পাইয়াছিলেন। এক বৎসরে দুই বৎসরের ফল লাভ। এই 'ডব্‌ল প্রমোশান' তাঁহার কবি-মনে এক সুন্দর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তিনি তখন হইতেই অল্প সময় ব্যয় করিয়া দ্বিগুণ ফললাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় মনকে গঠন করিয়া চলিতে লাগিলেন। পরবর্তী কালে এমন দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

Preparatory class এর পর **Entrance class.** চিত্তরঞ্জন যে বৎসর **Preparatory class** এ পড়েন তিনি সেই বৎসরই **Private** ছাত্র হিসাবে **Entrance** পরীক্ষা দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। সেই অনুসারে নিয়মমাফিক **School Inspector** এর অফিসে গিয়ে **Test** পরীক্ষাও দিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই বৎসর ১৮৮৪ খ্রীঃ অঃ **Entrance** পরীক্ষা হইল না। সুতরাং পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৮৮৫ খ্রীঃ অঃ শিক্ষাবিভাগের নূতন নিয়মানুসারে এপ্রিল মাসে **Entrance** পরীক্ষা হইলে তিনি উক্ত পরীক্ষা দেন এবং কৃতকার্য হন।

উচ্চতর শিক্ষার জন্য চিত্তরঞ্জন প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান হইতে ফার্স্ট-আর্ট ও ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, বি. এতে অনার্স পাইবেন কিন্তু অল্পের জন্য তাঁহার সে-মনোবাসনা পূর্ণ হয় নাই, অবশ্য সে জন্য যে কোন সঙ্গত কারণ ছিল না তাহা নহে। যেমন স্কুলে তেমনি কলেজে পড়ার সময়ও পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত বই পড়ার নেশা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। যেমন বাংলা তেমন ইংরাজী। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বঙ্কিমচন্দ্র এবং ইংরাজ লেখকের মধ্যে Keats, Shelly এবং Swinburne. পরবর্তী জীবনে তাঁহার অনেক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পরিলক্ষিত হইলে তিনি উত্তরে উহা অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, ইংল্যাণ্ডের কবি Swinburne কেই তাঁহার ভাল লাগে। যাহা হউক, পড়ার নেশা ছাড়াও স্কুলের কবিতা-সভার মত কলেজেও তিনি **Students Association** এর একজন সক্রিয় সভ্য ছিলেন। পুরাতন এলবার্ট হলে এই সভার অধিবেশন হইত। বিভিন্ন বিষয় আলোচনা এবং নির্দিষ্ট কোন বিষয় সম্বন্ধে সভ্যদের মধ্যে বিতর্ক সভা হইত। বিখ্যাত বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই **Association** এর সভাপতি ছিলেন।—উহার সম্পাদক ছিলেন ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয়। আর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ছিলেন উহার সহ-সম্পাদক। কলেজেও তাঁহার

সহপাঠী ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক যতীন্দ্রনাথ সিংহ, স্যার বি. সি. মিত্র (ভূতপূর্ব এড্‌ভোকেট জেনারেল বিনোদচন্দ্র মিত্র) ও সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (জাষ্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পুত্র) ইত্যাদি। সুরেন্দ্রচন্দ্র বলিয়াছেন, "কলেজে ডিবেটিং ক্লাবে তাঁহার খুব নাম ছিল।" অন্য একজন সহপাঠী প্রিয়শঙ্কর মজুমদার (হাইকোর্টের উকিল) বলিয়াছেন, "চিত্তবাবু ইংরাজীতে খুব **strong** ছিলেন ও ভালো বক্তৃতা করিতে পারিতেন, কিন্তু অঙ্ক বা বিজ্ঞানের প্রফেসর প্রশ্ন করিলেই বলিতেন "**I have but a hazy idea about this.**" পারিবারিক আবহাওয়ায় চিত্তরঞ্জনের ভগ্নীগণও বলিত, "দাদা তুমি নাকি শুনেছি খুব ভাল বক্তৃতা দিতে পার! তুমি আবার কি বক্তৃতা দাও?"

উত্তরে তিনি মুখে কিছু বলিতেন না কিন্তু অনেক কিছু বলিতেন স্নিগ্ধ, শান্ত একটি হাসিতে, উজ্জলতায় চোখ দুইটি উঠিত জ্বল জ্বল করে। বক্তৃতার মাধুর্যে মুগ্ধ করিতেন বাইরের সকলকে আর তাঁহার ঐ নির্বাক উজ্জ্বল, উচ্ছল হাসি মুগ্ধ করিত বাড়ীর সকলকে।

১৮৯০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করিয়া চিত্তরঞ্জন আরও উচ্চতর শিক্ষা এবং ভারতীয় চাকুরি-ক্ষেত্রের উচ্চতম লোভনীয় পদমর্যাদা লাভ করিবার আশায় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্য ইংল্যাণ্ডে যান।

জলপথে জাহাজে যাত্রা। জাহাজখানির নাম ছিল 'রেভেনালী'। চিত্তরঞ্জনের একই কেবিনে সহযাত্রী ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এবং আর ছিলেন জি. পি. রায় মহাশয়, পরবর্তী কালে যিনি **Director General of Post Offices** হইয়াছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ এম. এ. পাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং দীর্ঘ জলপথে কাব্য আর সাহিত্য আলোচনায় পথকে পথ বলিয়াই মনে হয় নাই। আলোচনা করিলেন রবীন্দ্রনাথ, **Shelly, Keats** এবং **Swinburne** এবং দেখিলেন প্রকৃতির শোভা আর সীমাহীন নীল জলরাশি। কিন্তু বন্ধুদের এই আলোচনার মাঝেও ধ্যানী, মৌন, কবি চিত্তরঞ্জন নিজের মনটাকে 'একলা' করিয়া সমুদ্রের বিশাল বুকের বুকভরা উর্মিমালার মধ্যে যে সুমধুর সঙ্গীতের সুর শুনিয়াছিলেন তখনই কি তাঁহার মনের নিভৃতে সাগর-সঙ্গীতের আগমন ধ্বনি বাজিয়া উঠিতেছিল!

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য হইবার জন্য চিত্তরঞ্জন 'রেন এবং

গার্নারের কোচিং ইনষ্টিটিউশনে' পড়িতেন এবং প্রফেসর রীড, যিনি চিত্তরঞ্জনকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তাঁহার বাড়ী গিয়াও মাঝে মাঝে পড়িয়া আসিতেন। কিন্তু তবুও প্রথমবার কয়েকটি পরীক্ষা দিবার পর যখন পরীক্ষা আশানুরূপ হয় নাই বলিয়া বুঝিতে পারিলেন তখন তিনি আর পরীক্ষা দিলেন না। কিন্তু পরবর্তীকালে পরীক্ষা পাশের নম্বর পাইয়াও যে পাশ নয়, অন্ততঃ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ব্যাপারে তাহার প্রমাণ তাঁহার জীবনে রহিয়াছে, যাহার জন্য তিনি রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "I appeared at the examination but headed the list of the unsuccessful."

কিন্তু চিত্তরঞ্জনকে অকৃতকার্য করিয়া রাখিবার জন্য একখানি রাজনৈতিক হাত যে foul play করিয়াছিল সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। ছোট্ট ছোট্ট দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। বোম্বাইয়ের একখানি কাগজের সম্পাদক ছিলেন মিঃ জেমস্ ম্যাকলিন্। ইনি পরবর্তী সময়ে পার্লামেণ্টের একটি সভ্যপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ভদ্রলোক ঘৃণাভরে উক্তি করিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষে আবার সভ্যতা কোথায়, আদর্শ কি? হিন্দু-মুসলমান তো গোলামের জাতি বই আর কিছুই নয়।"

চিত্তরঞ্জন এমন অপমানজনক কথা নিঃশব্দে হজম না করিয়া ইহার প্রতিবাদে মুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এমন আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, মিঃ ম্যাকলিন্ তাহার উক্তির জন্য ক্ষমা চাহিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ লালমোহন ঘোষ মহাশয় পার্লামেণ্টের সভ্যপদ পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। পরে দাদাভাই নৌরজী পার্লামেণ্টের সভ্যপদ লাভ করিবার জন্য নির্বাচন প্রার্থী হইয়াছিলেন। যাহাতে তিনি নির্বাচিত হন সেই জন্য তখনকার ভারতীয় ছাত্রগণ যে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে ইহা ছিল খুবই স্বাভাবিক। চিত্তরঞ্জনও তাই তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ঠিক সেই সময়ে লর্ড সেলসবেরী দাদাভাই নৌরজী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "That blackman of India." Blackman কথাটির মধ্যে যে অপমান ও ঘৃণার ভাব লর্ড সেলসবেরী উদ্গার করিয়াছিলেন চিত্তরঞ্জন তাহাও নীরবে হজম না করিয়া সমুচিত উত্তর দিয়াছিলেন। সুতরাং তেমন যুবককে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগ দিতে দেওয়া? বুকভরা যাহার জ্বলন্ত দেশপ্রেম তেমন যুবককে যৌবনের প্রথমেই তাহার স্বদেশের একটি

জিলার জিলা-শাসক নিযুক্ত করা !—তাই বুঝি হাইকোর্টের ভূতপূর্ব চিফজাষ্টিস্, কালীমোহন এবং ভুবনমোহন উভয়ের বন্ধু স্যার রিচার্ড গার্থ বিলাতের বাড়ীতে বসিয়া চেষ্টা করিয়াও চিত্তরঞ্জনের জন্য কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে গিয়া বিলাতের সেই ছাত্রজীবনের দিনগুলিতে চিত্তরঞ্জন বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার মধ্যেই তাঁহার স্বদেশ-প্রেম এবং আত্মসম্মান বোধের বীজ লুকায়িত ছিল। ভারতীয় যুবকের সেই বক্তৃতাবলী লণ্ডনের ইংরাজী কাগজে মুদ্রিত হইয়াছিল যাহা হইতে দেশবন্ধুর খুল্লতাত ভ্রাতা সুকুমাররঞ্জন দাশ দুই একটি বক্তৃতা পুনরায় মুদ্রিত করিয়াছেন। উহার কিছু অংশ নিম্নে দেওয়া হইল: "Gentlemen, I am sorry to find it given expression to in parliamentary speeches on more than one occassion that England conquired India by the sword, and by the sword must she keep it! (shame) England, gentlemen, did no such thing, it was not her swords and bayonet that won for her this vast and glorious empire, it was not her military valour that achieved this triumph (cheers), England might well be proud of. But to attribute all this to the sword and then to argue that the policy of the sword is the only policy that ought to be persued in India, is to my mind absolutely base and quite unworthy of an Englishman."

কিন্তু শিক্ষার্থী হিসাবে বিলাত গিয়া চিত্তরঞ্জন ওখানকার শিক্ষকগণের শিক্ষাদানের নিজস্বধারা বা মৌলিকত্ব সম্বন্ধে অনেকের কাছেই সুখ্যাতি করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন তাঁহার সেখানকার এক প্রফেসার মিঃ কারভিথ রীড সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, রীড একদিন তাঁহাকে "Idealism and Realism in Art" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য বলিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধের বিষয়বস্তুকে বৃহদাকারে দেখাইয়া সেই সময়েই Mr. Adam Goose সাহেবের একখানি পুস্তক বাজারে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ লিখিবার পক্ষে সহায়কারী হইবে মনে করিয়া চিত্তরঞ্জন ঐ পুস্তকখানি একবার

দেখিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু অধ্যাপক তাহাতে অমত করেন এবং তাঁহাকে ভাবিয়া লিখিবার জন্য সাত দিন সময় দিয়া বলিয়াছিলেন, "No, my boy, never do that. Think on the subject. I give you seven days time."

নির্দিষ্ট দিনে অধ্যাপক Carvath-এর হাতে প্রবন্ধটি পৌঁছাইলে উহা পড়িয়া তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া চিত্তরঞ্জনকে বলিয়াছিলেন, "তোমার প্রবন্ধটা খুব ভালো হয়েছে আর এতে Adam Goose-এর অনেক ভাবনাধারা প্রতিফলিত দেখ্‌ছি।"

বিলাত গিয়া তিনি ইংরাজের যাহা সদগুণ তাহার প্রশংসা করিয়াছেন আবার ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব করিবার লালসায় বুরোক্রাসীর যে নির্মম ব্যবহার দেখিয়াছেন উহার প্রতিবাদেও মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। শিক্ষা-জীবনের এই সব বাদ, প্রতিবাদ, অভিজ্ঞতা এবং বিলাত প্রবাসী হইয়াও তিনি যখন ব্যারিষ্টার হইয়া দেশের মাটিতে ফিরিয়া আসিলেন, বাড়ীর আবহাওয়ায় উপস্থিত হইলেন তখন তিনি ঠিক যেমনটি গিয়াছিলেন ঠিক তেমন, যেমন চিত্তরঞ্জন বিলাত গিয়াছিলেন ফিরিয়া আসিলেন ঠিক সেই চিত্তরঞ্জন। যেখানে সাহেব সাজিতে হইয়াছিল তিনি সেখানে তেমন সাজিয়াছিলেন। বাড়ী ফিরিয়া ভক্তিভরে পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজনদের পদধূলি মাথায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিধান করিলেন বাঙালীর পোশাক—ধুতি ও চাদর। তারপর বড় একখানা থালায় সকল বোনেদের লইয়া এক সঙ্গে মেঝেতে বসিয়া খাইতে লাগিলেন বাঙালী ও বাংলার নিজস্ব পদ্ধতিতে।

সচরাচর যেমন দেখা যায় এইখানে তাহার ব্যতিক্রম হইল। বিলাতী পরিবেশ চিত্তরঞ্জনকে সাহেব বানাইতে পারিল না। শুধু বিলাতী শিক্ষা, আসা-যাওয়ার পথে পথে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং পারাপারহীন অতলান্ত সমুদ্রের সুনীল ফেনিল জলরাশি তাঁহার মনকে অপূর্ব এক সম্পদে বিভূষিত করিয়াছিল।

'What is lotted cannot be blotted,' অদৃষ্টের লিখন কেহ মুছিয়া ফেলিতে পারে না। চিত্তরঞ্জন বিলাত গিয়াছিলেন 'ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস' পরীক্ষায় পাশ করিবার মনোবাসনা লইয়া কিন্তু একজন স্বদেশপ্রেমিক যুবক যদি I. C. S. হয় তবে তো ইংরেজের পক্ষে ভয়ের কথা! তাই হইতে

পারেন নাই বা হইতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু চিত্তরঞ্জন একবার হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "বাঁধা মায়না কোন ঝঞ্ঝাট ছিল না, থাকিতাম ভাল, অনেক ভাল কাজ হত"। কিন্তু ঐ What is lotted......দেশমাতার সেবায় যিনি পূর্ব হইতেই পূজারী নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন তাঁহাকে দিয়া অন্য কাজ কে করাইতে পারে? অবশ্য ভারতের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত অসংখ্য না হইলেও বিরল নহে! ঋষি অরবিন্দ I. C. S. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও ঘোড়ায়-চড়া বিদ্যায় কৃতকার্য হইতে না পারিয়া সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হইতে পারেন নাই। তৎপরে সুভাষচন্দ্র। তাঁহার তো কোন বিষয়েই ত্রুটি ছিল না। পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, ঘোড়ায় চড়া ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে সমান দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া পরিপূর্ণ I. C. S. কিন্তু তিনিই চাকুরী গ্রহণ করিলেন না। সব চাইতে কঠিন পরীক্ষায় সম্মানের সহিত পাশ করিয়া স্বেচ্ছায় তাহা পরিত্যাগ করিলেন। একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, যোগাযোগটা বড় অপূর্ব এবং ইঙ্গিতপূর্ণ। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামী বিবেকানন্দকে প্রথমবার যখন দেখেন তখনই বলিয়াছিলেন, "তোর জন্যেই তো অপেক্ষায় আছি"। দুই-য়ে এক। এখানেও কেহ কাহারও সঙ্গে পরামর্শ করিয়া চাকুরীতে যোগদান করেন নাই, কিন্তু ঘটনাচক্রে অথবা কাহারও অদৃশ্য হাতের নিপুণ ঘুঁটি চালনায় চাকুরী গ্রহণ করিয়া, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন না থাকিয়া এক মন, এক প্রাণ এবং এক মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া মায়ের পূজার আয়োজন করিতে সকলেই এক বেদীমূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বংশ-পরিচয়

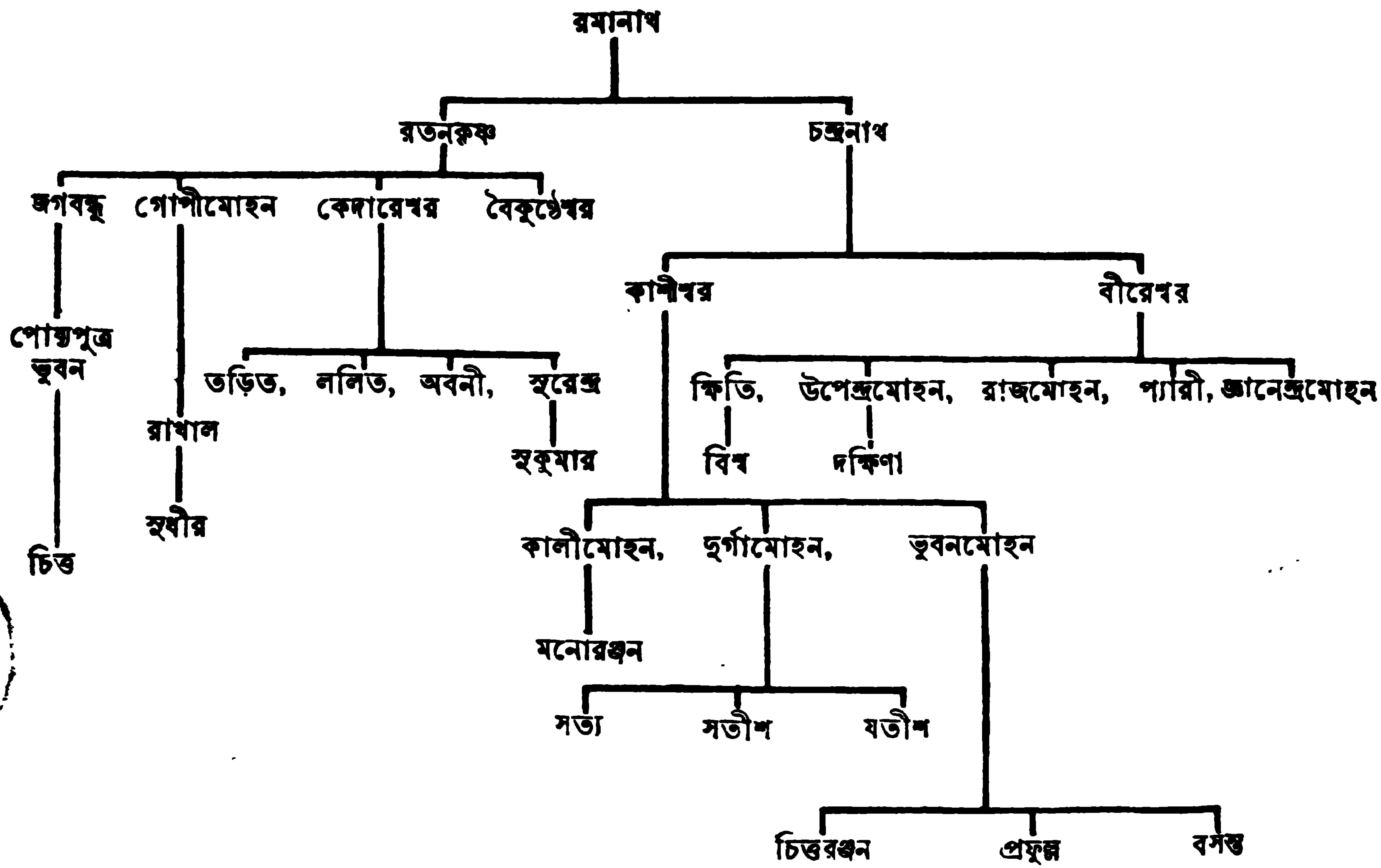

52489
13.1.72
AGARTALA

কে কি ছিলেন ঃ

১।	জগবন্ধু	সরকারী উকিল
২।	কাশীশ্বর	সরকারী উকিল
৩।	কালিমোহন	
৪।	দুর্গামোহন	তিন সহোদর ভাই
৫।	ভুবনমোহন	হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন
৬।	সত্য	দুর্গামোহনের তিন পুত্র। সকলেই
৭।	সতীশ	ব্যারিষ্টার। সতীশ ভারতীয় ব্যবস্থা
৮।	যতীশ	পরিষদের "ল" মেম্বার। যতীশ রেঙ্গুন হাইকোর্টের জজ
৯।	**চিত্তরঞ্জন**	ভুবনমোহনের তিন পুত্র।
১০।	প্রফুল্ল	তিন জনই ব্যারিষ্টার।
১১।	বসন্ত	প্রফুল্ল পাটনা হাইকোর্টের জজ্
১২।	বীরেশ্বর	মোক্তার
১৩।	উপেন্দ্রমোহন	
১৪।	রাজমোহন	বীরেশ্বরের পুত্র
১৫।	জ্ঞানেন্দ্রমোহন	আইন ব্যবসায়ী
১৬।	কেদারেশ্বর	সবজজ্
১৭।	গোপীমোহন	বর্ধমান রাজবাড়ীর মোক্তার
১৮।	তড়িতমোহন	কেদারেশ্বরের পুত্র
১৯।	ললিতমোহন	উকিল
২০।	সারদারঞ্জন	রাজমোহনের পুত্র আইন ব্যবসায়ী
২১।	আশুতোষ	ললিতমোহনের পুত্র আইন ব্যবসায়ী

আইনজীবী

চিত্তরঞ্জন হইলেন আইনজীবী, ব্যারিষ্টার। সাধারণ লোকের হিসাবে ইহাই স্বাভাবিক যে, আইনজ্ঞের পরিবারে আইনজ্ঞই জন্মগ্রহণ করে। শুধু আইনজ্ঞ পরিবার বলিলে অত্যন্ত কম করিয়া পরিবারের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয়। বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষ এমন কি পৃথিবীর ইতিহাসেও এমন একটি আইনজ্ঞ পরিবার আছে কি-না সন্দেহ। মাত্র তিন চার পুরুষের মধ্যে বাবা, কাকা, জ্যাঠামহাশয়, ভাই, জ্যাঠতুত ভাই, ভাইয়ের ছেলে ইত্যাদি মিলাইয়া কুড়ি বাইশ জন আইনজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন সরকারী উকিল, হাইকোর্টের উকিল, ব্যারিষ্টার, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের 'ল'-মেম্বার, রেঙ্গুন হাইকোর্টের জজ, পাটনা হাইকোর্টের জজ, সব-জজ, হাইকোর্টের মোক্তার এবং বর্ধমান রাজবাড়ীর মোক্তার ইত্যাদি। ইহাদের বিশেষত্ব ছিল এই যে, যিনি যখন যেখানে আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন তিনি সেই 'বারের' তখনকার সময়ে শ্রেষ্ঠ আইন-জীবী ছিলেন। এই সব আইন-বিদদের মধ্যে অবশ্য চিত্তরঞ্জনই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। পাঠকগণের সুবিধার জন্য চিত্তরঞ্জনের বংশ পরিচয়ের তালিকা এবং কে কি ছিলেন তাহা দেখাইবার জন্য চেষ্টা করা হইল।

প্রকৃতপক্ষে আইনজ্ঞ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও চিত্তরঞ্জন কিন্তু আইন-ব্যবসাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। তাঁহার এই অনিচ্ছা শৈশব অবস্থা হইতেই। অভিভাবকগণ বাড়ীর ছেলেদের যেমন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন ঠিক তেমন মন লইয়া জ্যাঠামহাশয় দুর্গামোহন একদিন চিত্তরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বড় হইলে তুমি কি হইবে?"

উত্তরে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, "উকিলরা সব জুয়াচোর হয়, আমি কিছুতেই উকিল হইব না।"

"তাহা হইলে তোমার বড় জ্যাঠা, আমি, তোমার বাবা সব জুয়াচোর?"

"তোমরা কি কর জানি না কিন্তু উকিল ব্যবসায় পসার করিতে হইলে জুয়াচুরি ছাড়া উপায় নাই।"

আই. সি. এস পরীক্ষা দিতে গিয়াও তিনি কৃতকার্য হইতে পারিলেন না, হইলেন ব্যারিষ্টার। কিন্তু আইন ব্যবসাও তাঁহার মনঃপুত ছিল না সে-কথা শৈশবের দিনেও যেমন প্রকাশ করিয়াছেন পরবর্তী সময়েও তেমন করিয়া বলিয়া চলিয়াছেন। একবার কাকা জ্ঞানেন্দ্রদাশকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কাকা! শুনতে পাই তুমি নাকি সব মোকদ্দমা হাতে নাও না। খারাপ মোকদ্দমা হলে ছেড়ে দাও,—তা করো কেন? তুমি মোকদ্দমা হাতে না নিলে মক্কেল টাকা খরচ করবেই, অন্য উকিল কেস হাতে নেবেই। বরং মক্কেলকে প্রথম বলবে, মোকদ্দমা খুব ভাল। মোকদ্দমার মাঝপথে বলবে মামলাটা তো ছিল ভালোই কিন্তু হাকিমটি মনে হচ্ছে ভাল নয়। আর যদি মোকদ্দমায় তুমি হেরেই যাও তবে বলবে, হাকিমটা একেবারেই বোকা। আইনের কিছুই বোঝে না তাই হারিয়ে দিয়েছে।"

আবার এই কাকার কাছেই চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন, "It is the greatest tragedy in my life that I have been drawn to a profession that I do not like." কবির কথাটি চিত্তরঞ্জনের জীবনে যেন মূর্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।'

যাহা তিনি চাহেন নাই সে-আইনব্যবসায়েই তাঁহাকে প্রবেশ করিতে হইল। কিন্তু 'সাধু যাহার ইচ্ছা ভগবান তাহার সহায়'। চিত্তরঞ্জনের ব্যবসা যে শুধু তাঁহার জন্যই নহে, উহার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ যে অপরের উপকারার্থে ব্যয়িত হইয়াছে সেজন্য ঈশ্বর তাঁহাকে প্রকৃত পক্ষেই প্রচুর পরিমাণে দিয়াছন এবং ১৮৯৩ খ্রীঃ অঃ আইন ব্যবসায়ে প্রবেশ করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে তাঁহার দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাও ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতাই বলিতে হইবে। বীর যোদ্ধা নেপোলিয়নের বিখ্যাত উক্তির মত 'I came, I saw and I won'—আদালতে প্রবেশ করিয়া তিনি বিজয়ী হইয়াছিলেন।

ঘটনাটি এই: একটি পত্রিকার সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আলিপুরের কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন মোক্তার বাবুকে মারিয়াছিলেন। ইহার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দায়ের করা হইল। হাকিম ছিলেন আবদুল কাদের সাহেব। আশুতোষ বিশ্বাস ছিলেন হাকিমের খুব প্রিয় পাত্র এবং আসামী তাহাকেই তাহার পক্ষে কৌশলী নিযুক্ত করিলেন।

সে-কারণেই ফরিয়াদী পক্ষে কেহ দাঁড়াইতে উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাঁড়াইলেন। আসামী পক্ষের আশুবাবু প্রথমে চিত্তরঞ্জনকে পরাজিত করিবার জন্য খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু চিত্তরঞ্জন উহাকে প্রতিযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিয়া হাকিম সাহেবকেই আক্রমণ করিলেন, "আশুবাবুর উপর আপনার পক্ষপাতিত্বে কোন উকিল কৌন্সিলী আপনার ঘরে এই মোকদ্দমা লইয়া দাঁড়াইতে সাহসী হয় না।"

মোকদ্দমায় আশুবাবু জিতিয়াছিলেন কিন্তু ফলাফল বিচার্য নহে। চিত্তরঞ্জন যে পদ্ধতিতে মোকদ্দমাটি পরিচালিত করিয়াছিলেন এবং হাকিমকে তাহার পক্ষপাতিত্বের কথা হাটে হাড়ি ভাঙ্গিবার মত আদালতের জনারণ্যে প্রকাশ করিয়া দিলেন ইহাতে অন্যান্য আইনজীবীদের পক্ষে ভবিষ্যতের অনেক সুবিধা হইয়াছিল। হাকিম সাহেবও বুঝিয়াছিলেন যে, বয়সে যুবক হইলেও চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত দক্ষ আক্রমণকারী এবং তাঁহার argument যুক্তিসম্মত।

মোকদ্দমায় হারিয়া গেলেন চিত্তরঞ্জন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জয়জয়কার হইল তাঁহারই,—হাকিমকে শুনাইয়া দিয়াছেন যাহা এতদিন কেহ তাহাকে শুনাইতে পারে নাই। কথাটি ছড়াইয়া পড়িল আদালতের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। সেই সঙ্গে সুনাম ছড়াইয়া পড়িল চিত্তরঞ্জনেরও।

তৎপরে ভূকৈলাস রাজাদের প্রায় মোকদ্দমা, অনেক ejectment suit, প্রবেট মোকদ্দমা এবং মফঃস্বল শহর নোয়াখালির একটি চুরির মোকদ্দমায় তাঁহার সুনাম চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এমন কয়েকবার হইয়াছে যে, ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের সওয়াল-জবাব শুনিবার জন্য দূর দূর হইতে আইন বিষয়ে উৎসাহীগণ এবং জনসাধারণের মধ্য হইতেও অনেকে কাছারীতে উপস্থিত হইয়াছে।

একবার কোন একটি মোকদ্দমার ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেট্ মিঃ কারিগিলের সংগে তাঁহার বেশ কথা কাটাকাটি হইয়াছিল। মিঃ কারগিল্ চিত্তরঞ্জনকে অবজ্ঞাভরে বাবু; বাবু বলিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন। চিত্তরঞ্জন 'বাবু' সম্বোধনটি পছন্দ করেন নাই। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "You should address me just as English people used to address me both here and in England or as judges in the High Court address

me. You may call me 'Mr. Das' or 'counsel' just as you please."

চিত্তরঞ্জনের এমন মনোবল বা তাঁহার তখনকার দিনের Argument শুনিয়াও তাঁহার সহপাঠী হাকিম যতীন্দ্রনাথ সিংহ এবং স্যার বিনোদচন্দ্র প্রভৃতি বন্ধুগণ তখনই ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। প্রশংসার সংগে প্রচুর অর্থ সমাগমও তাঁহার হইয়াছিল।

ইহার পরে চিত্তরঞ্জনের জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা দেখা যায়। বিখ্যাত বিখ্যাত রাজনৈতিক মামলাগুলি তিনি তখন হাতে লইয়া উহার সুষ্ঠু পরিচালনা করেন।

১৯০৬ সালের কথা। 'বন্দেমাতরম্' নামে একখানি ইংরাজী কাগজ ছিল। অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় উহার সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি লিখিতেন। কিছুদিন পরে "Politics for Indians" এবং পরে "Jugantar Case" প্রবন্ধ বাহির হইলে প্রধান সম্পাদকরূপে অরবিন্দ ঘোষ রাজরোষে পতিত হন এবং কাগজের ম্যানেজার ও প্রিণ্টারসহ অরবিন্দের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়ায় যে, বিপিনবাবু সাক্ষী প্রদান করিলে অরবিন্দবাবুর নিশ্চিত কারাবাস। কাগজটিও উঠিয়া যাইবে; সুতরাং মাঝে আসিয়া উপস্থিত হইলেন চিত্তরঞ্জন। তিনি বিপিনবাবুকে সাক্ষী হিসাবে হলপ করিতে নিষেধ করিলেন এবং তাহাতে যদি বিপিনবাবুর কারাবাস হয় তবে তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজে বহন করিতে রাজী হইলেন। হইলও তাহাই। সাক্ষীর আসনে দণ্ডায়মান হইয়া বিপিন পাল বলিয়াছিলেন "I have Conscientious objections to take part or swear in these proceedings." উকিল এমন কি স্বয়ং হাকিম পর্যন্ত যতবার তাঁহাকে হলপ লইবার জন্ত অনুরোধ বা আদেশ করিয়াছিল ততবারই বিপিনবাবু বলিয়াছিলেন, "I refused to answer any question in Connection with the Case."

মোকদ্দমায় বিপিনবাবুর ছয়মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল, তাহার কারণ একান্তই রাজরোষ। কিন্তু চিত্তরঞ্জন আদালতে দেশ-প্রেম সম্বন্ধে এমন এক অন্তরস্পর্শী বক্তৃতা দিয়াছিলেন যে হাকিম এবং উকিলগণ অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আসামী যে জবাব দিয়াছিলেন চিত্তরঞ্জন উহা পাঠ করিলেন,

"I honestly believe that prosecutions like that of "Bandemataram" are unjust and injurious because they are subversive of the rights of people and injurious because they are Calculated to stiple freedom of thought and speech, nor are they justified in the interests of the public peace...."

তিনি পড়িতে লাগিলেন, "If a man who acts according to the dictates of his Conscience is to be prosecuted, then all that he can say is that in the history of nations no right was ever Secured anywhere in the world except through suffering of the individuals. I stand upon my right which is the birth right of every human being to say that my Conscience is against this and my Conscience tells me in emphatic language not to assist in a prosecution of this iniquitous character and if for this I am to be punished, "well let it be so."

তখন 'সন্ধ্যা' নামে আর একটি কাগজ ছিল। এই কাগজটির মাধ্যমে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে স্বদেশ প্রেমের বীজ বপন করিতেছিলেন। ইহার জন্য সরকারী কড়া নজর কাগজটির উপর ছিলই তদুপরি ১৯০৭ সালের ১৩ই আগস্ট তারিখে "এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে" নামক একটি প্রবন্ধের জন্য পুলিশ আসিয়া ঐ অফিস খানাতল্লাসী করে এবং উপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হয়।

স্বদেশের সেবা-কার্যে উপাধ্যায় নিজেকে যে-ভাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন চিত্তরঞ্জন সে-কারণেই তাঁহার প্রতি খুব শ্রদ্ধাবান ছিলেন। সুতরাং তিনি উপাধ্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া কোর্টে দাঁড়াইলেন। বিচার হওয়ার কথা পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট, বিখ্যাত কিংস্‌ফোর্ডের এজলাসে। কিন্তু মামলাটি যাহাতে অন্য বিচারকের আদালতে স্থানান্তরিত হয় সেই মর্মে চিত্তরঞ্জন হাইকোর্টে একটি আবেদন পত্র পেশ করেন কিন্তু মহামান্য হাইকোর্ট তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করেন। উপাধ্যায় ইহাতে আরও অপমানিত বোধ করিলেন এবং ঐ বিচারে তিনি সহযোগিতা না করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া চিত্তরঞ্জনের মুসাবিদায় একখানি দরখাস্ত পাঠাইয়া দেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য উহার অংশ

বিশেষ নিম্নে তুলিয়া দেওয়া হইল, "I accept the entire responsibility of the paper and the article in question. But I don't want to take any part in the trial, because I do not believe that in Carrying out my humble share of this God-appointed mission of 'swaraj' I am in any way accountable to the alien people who happen to rule over us and whose interest is and must necessarily be in the way of our true national development."

[দেশবন্ধুস্মৃতি : ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত],

কবি বলিয়াছেন, "ঋষির নয়ন মিথ্যা হেরে না,
ঋষির রসনা মিছা না কহে।"

ব্রহ্মবান্ধব যেন ঋষির দৃষ্টিতে সত্য দর্শন করিয়া ভবিষ্যৎ বাণী পূর্বাহ্ণেই প্রচারিত করিয়াছিলেন। মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। একদিন সরকারী অনুবাদককে চিত্তরঞ্জন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে এমন আক্রমণাত্মক জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে, হাকিম কিংস্‌ফোর্ড অত্যন্ত চটিয়া যাইতেছিলেন। তাহার ক্রোধের মাত্রা এমন পর্যায়ে গিয়া পৌঁছিয়াছিল যে, পাঁচটা বাজিয়া যাওয়ার পরও তিনি আসন ছাড়িয়া না উঠিয়া চিত্তরঞ্জনের অনিচ্ছায়ও জেরা চালাইয়া যাইতে বলিলেন কারণ তিনি আর সময় দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

সারাদিনের শ্রমে চিত্তরঞ্জন ক্লান্ত, তিনি আর পারিতেছিলেন না। সেই সকাল ৯টায় খাইয়া আসিয়াছেন। এক ঘণ্টা টিফিনের জায়গায় হাকিম সেদিন নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া আধ ঘণ্টা সময় দিয়াছিলেন মাত্র। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে চিত্তরঞ্জন হাইকোর্টে গিয়া জলযোগ করিয়া আসিতে পারেন নাই। সুতরাং কিংস্‌ফোর্ডের অনিচ্ছায়, যখন প্রায় ছয়টা বাজিতে চলিয়াছিল চিত্তরঞ্জন বলিয়া উঠিলেন, 'আমি চলিলাম, আমি এত ক্লান্ত যে আমি আর পারি না।'

কিংস্‌ফোর্ডের মনোগত ভাব বুঝিতে তখন আর কাহারও বিলম্ব হইল না। সকলেই নিশ্চিত হইল যে উপাধ্যায়ের জেল। চিত্তরঞ্জনও বলিলেন, "আপনার অদৃষ্টে জেল আছেই।"

উপাধ্যায়ের নির্ভীক উত্তর, "আপনি নিশ্চয় জেনে রাখুন, ইংরাজের এমন সাধ্য নাই যে আমাকে জেল দেবে।"

ব্রহ্মবান্ধব তখন কঠিন রোগে ভুগিতেছিলেন। চিকিৎসার জন্য ক্যাম্বেল

হাসপাতালে গেলে সেখানে তাঁহার অস্ত্রোপচার করা হয় এবং তাহাতেই তাঁহার মুক্ত-আত্মা দেহের আবরণটুকু ভেদ করিয়া, কিংস্‌ফোর্ডের স্তূপীকৃত নথি-পত্র পশ্চাতে ফেলিয়া সত্য সত্যই ইংরাজের আদালতকে চিরতরে অবমাননা করিয়া চলিয়া গেলেন।

ইহার পর চিত্তরঞ্জনের হাতে আসে,—আসে নয় বলা যায় তিনি হাতে নেন 'Alipur Bomb Case'. ইংরাজের ধারণা হইল ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে বাঙলার যুবকবৃন্দ ক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে তাই তাহারা দেশের সরকারের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করিয়া যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত। এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী কিংস্‌ফোর্ড-ভ্রমে মজঃফরপুরের উকিলের স্ত্রী মিসেস্ কেনেডি ও তাহার কন্যাকে হত্যা করেন। ঐ দিনই অর্থাৎ ১৯০৮ সালের ১লা মে ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন এবং প্রফুল্ল চাকী সাব্-ইন্সপেক্টার নন্দলাল ব্যানার্জীর হাতে ধরা পড়িয়া নিজের রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। সরকার তখন বিব্রত, চতুর্দিকে পুলিশ, গুপ্তচরেরা অনিমেষ চোখে রাতের পর দিন এবং দিনের পর রাত পাহারা দিয়া চলিয়াছে। ২রা মে তারিখে, কোন্ সূত্রে কে জানে, মুরারীপুকুর বাগানের ধূলিকণা পর্যন্ত রেহাই পাইল না। ষড়যন্ত্রের আয়ুধ গুপ্ত অস্ত্র-শস্ত্র পুলিশের হাতে গিয়া পৌঁছিল। আর পুলিশের হাতে গিয়া পৌঁছাইল বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ২৬জন স্বদেশ-প্রেমিক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যুবকবৃন্দ।

বাঙলার অপর প্রান্তেও সে-সময় গুপ্ত ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ হইয়াছে। চন্দননগরের মেয়রের প্রতি সেই সময় বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ঢাকার তখনকার ম্যাজিস্ট্রেট্ মিঃ এলেনের প্রতি এই সময়ই গুলি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে আহত করা হয়।

আসামীগণকে দায়রায় সোপর্দ করা হইল। আলিপুরের অতিরিক্ত জজ মিঃ বিচ্ ক্রফ্‌টের কোর্টে আসামীগণের বিচার শুরু হয়। অন্যতম আসামী নরেন গোঁসাই ইতিপূর্বে রাজসাক্ষী হইয়া অরবিন্দকেও ঐ ষড়যন্ত্র-মোকদ্দমায় একজন বড় ষড়যন্ত্রকারীরূপে প্রকাশ করে।

অরবিন্দের তখন অর্থাভাব। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে তাঁহার Counsel ব্যোমকেশ চক্রবর্তী এবং কুমুদ চৌধুরী একে একে তাঁহাকে ছাড়িয়া

গেলে অরবিন্দ তখন নিরুপায় হইয়া পড়েন। সেই সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ অরবিন্দের মোকদ্দমাটি হাতে নিবার জন্য চিত্তরঞ্জনের কাছে আসিয়া উপস্থিত হন।

ইতিপূর্বে রাজনৈতিক মোকদ্দমাগুলিতে চিত্তরঞ্জন **Counsel** নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার সুনাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সুতরাং তিনিও আশা করিয়াছিলেন যে অরবিন্দের কেস্ তাঁহাকেই গ্রহণ করিবার জন্য বলা হইবে। বলা হইল ঠিকই কিন্তু প্রথম দিকে নহে। অরবিন্দের টাকার অভাবে তাঁহার **Counsel** তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে পর তাঁহাকে ডাকা হইল। চিত্তরঞ্জন ইহাতে খুব ব্যথিত হইয়াছিলেন। কারণ তিনি ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন যে অরবিন্দের মোকদ্দমা তাঁহার হাতে আসিবেই। পূর্ব হইতেই এমন নিশ্চিত হওয়ার একটি কারণ ছিল। চিত্তরঞ্জন 'প্লান্চেট্' আনিতেন। একদিন টেবিলে বসিয়া তিনি 'প্লানচেট্ আনিলেন। সে আত্মা বলিল, 'অরবিন্দের মোকদ্দমা আপনাকেই নিতে হবে।' বার বার ঐ এক কথা।

চিত্তরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে বলিতেছেন? তখন উত্তর হইল, 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।'

যাহা হউক, চিত্তরঞ্জনের আইন ব্যবসায়ে তখন পসার ক্রমেই জমিয়া উঠিতেছিল। তখন তাঁহার মাসিক আয় পাঁচ-ছয় হাজারের কম নহে। যত বেশী পরিশ্রম করিবেন অর্থের সমাগম ততবেশী হইবে। ইহা জানিয়াও চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধা ও নিজস্ব দেশ-প্রীতির উন্মাদনায় বিনা পারিশ্রমিকে সেই কঠিন পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহার আর্থিক ক্ষতি হইল বটে কিন্তু তিনি সেদিকে একটুও ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। প্রায় এক বৎসরকাল এই মোকদ্দমা চলিয়াছিল। এই দীর্ঘ সময়ে চিত্তরঞ্জন একমুখী মন নিয়া যে কাজ করিয়াছিলেন তাহার তুলনা বিরল। আর্থিক দিকেও জানা গিয়াছে যে, বিভিন্ন খাতে তিনি ঐ সময় প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দেনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ঋণী হওয়ার কারণ ঐ মোকদ্দমা চলাকালীন সময়ে চিত্তরঞ্জন শুধু দায়রা আদালত আর হাইকোর্ট করিয়াছেন। অন্য কোন নূতন মোকদ্দমা, অন্ততঃ সংসার নির্বাহের জন্যও যে টাকার প্রয়োজন তাহা মনে করিয়াও, গ্রহণ করেন নাই; সবই ঋণ।

বরোদা হইতে বাঙলা দেশে ফিরিয়া আসিয়া অরবিন্দ মনে প্রাণে দেশ-

সেবার ব্রত গ্রহণ করেন। বাঙলার আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাঙালী যুবকের দেশ-প্রেম সব কিছুই তিনি অগ্নিগর্ভ ভাষায় 'বন্দেমাতরমের' পাতায় পাতায়-নিবন্ধ করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। লিখিয়াছিলেন, 'Political freedom is the life breath of a nation. It means the fulfilment of our national life. In fact, the true aim of the nationalist movement is to restore the spritual greatness of the nation by the essential preliminary of its political generation. Our object, our claim is that we shall not perish as a nation, but live as a nation.

[Bandemataram : 1907]

চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের লেখাগুলি বার বার গভীর মনযোগের সহিত পড়িয়া মোকদ্দমাটি পরিচালনা করিয়াছিলেন। অরবিন্দ যে একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন তাঁহার সওয়ালে তাহাই পরিষ্কার রূপে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিলেন। বলিলেন, অরবিন্দ ধার্মিক এবং ধর্মপথে তাঁহার সাধনাই তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের উৎস। তাহা ছাড়া অরবিন্দের মন-প্রাণ এবং ধর্মপথে জীবন যাপন করা সবই ভারতীয় বেদান্তের পথ ধরিয়া পরিচালিত।

মোকদ্দমায় অরবিন্দ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের পরিশ্রম, অরবিন্দকে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহার আপ্রাণ প্রচেষ্টা এবং সাধনা দেখিয়া অরবিন্দ বলিয়াছিলেন,—"আমার উদ্ধারের জন্য স্বয়ং নারায়ণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।"

এক কালের বিখ্যাত সাহিত্যিক নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় বলিয়াছেন, "জজ বীচ্ ক্রফ্ট ও আমরা একসঙ্গে ক্রিকেট্ খেলিতাম কিন্তু এই মোকদ্দমার সময় তিনি প্রায়ই আসিতে পারিতেন না, অথবা যেদিন আসিতেন দেরী হইত। আমি বলিতাম, 'তুমি এত দেরীতে আসো কেন?' তিনি তাহাতে হাসিয়া বলেন, এ কথা তোমার চিত্তকে ব'লো, দশটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত সে আর উঠিতে দেয় কই?"

[দেশবন্ধু স্মৃতি : ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত]

Argument করিবার সময় বেলা দশটা হইতে বৈকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত চিত্তরঞ্জন জজ সাহেবকে এজলাস হইতে উঠিতে দেন নাই। একটানা

চার মাসের উপর শুনানী। তথাপি চিত্তরঞ্জন আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারিলেন না। অরবিন্দ খালাস হইলেন বটে কিন্তু উল্লাসকর দত্ত, বারীন্দ্র ঘোষের মৃত্যুদণ্ড এবং অন্য অন্য আসামীগণের কাহারো যাবজ্জীবন দীপান্তর কাহারো বা দীর্ঘদিন কারাবাস।

অরবিন্দ কাঁদিয়া আকুল। তাঁহার মুক্তি তাঁহার কাছে মুক্তি নহে,—উহা অর্থশূন্য। মর্মান্তিক বেদনায় বিধুর চিত্তরঞ্জনও। সমমর্মিতার অন্তরখানি লইয়া অরবিন্দের কাছে আসিয়া সান্ত্বনা দিলেন, 'আপনি আমার উপর বিশ্বাস রাখুন, স্থির জানিবেন, বারীন্দ্রকে আমি মৃত্যুদণ্ড কিছুতেই পাইতে দিব না। আমি আবার সকলের পক্ষ হইয়াই এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন জানাব।'

যে কথা সেই কাজ। সংসারের কথা, পরিবারের কথা চিত্তরঞ্জন তখন ভুলিয়া গিয়াছেন। ঐ সময় তাঁহার সব চাইতে ছোট সহোদরা মুরলার বিবাহের দিন ধার্য হয়। ব্যবসায়ে তাঁহার উপার্জন নাই, উপরন্তু দেনা। তথাপি মায়ের মন বিচার করিয়া তিনি মাকে বলিলেন, 'মুরলার বিবাহে তোমার যত টাকা ব্যয় করিতে ইচ্ছা হয় করিতে পার।' নিঃসন্দেহে ঐ ব্যয়ের টাকা ঋণের টাকাই। কিন্তু সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। পুরাতন মোকদ্দমাকে নূতন করিয়া, নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে দাঁড করাইয়া প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিংস ও জজ কার্নডাফের আদালতে পর পর ৪৮ দিন শুনানী চালাইয়া যান। প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স দেশবন্ধুর এই সুষ্ঠুভাবে মোকদ্দমা পরিচালনা দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যে সুখ্যাতি করিয়াছিলেন নিম্নে তাহার কয়েকটি লাইন তুলিয়া দেওয়া হইল :

I desire in particular to place on record my high appreciation of the manner in which the Case was presented to the Court by their leading advocate Mr. C R. Das.

[37 Cal. P467. Emp. Vss. Barindra Ghosh]

প্রধান বিচারপতি সুখ্যাতি করিলেন চিত্তরঞ্জনকে। চিত্তরঞ্জনের ইহা ব্যক্তিগত জয় নিশ্চয়ই কিন্তু আসামীগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়াও তিনি যে মোকদ্দমার অন্তরালে দেশ-সেবার মহান ও পবিত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সে-যুদ্ধেও তিনি জয়ী হইলেন। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বারীন্দ্র ও উল্লাসকর

যমরাজার সিংহ দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিলেন। অন্যান্য আসামীগণের অনেকের শাস্তি লাঘব হইয়াছিল। নীচে আসামীগণের নাম, দায়রায় প্রদত্ত দণ্ড এবং পরে হাইকোর্টে আপীল করিবার পর চিত্তরঞ্জনের অক্লান্ত পরিশ্রমে কাহার দণ্ড কত হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল:

দায়রা আদালতে প্রদত্ত দণ্ড	আসামীর নাম	আপীলের পর হাইকোর্টের দণ্ড
মৃত্যু	বারীন্দ্র কুমার ঘোষ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর
মৃত্যু	উল্লাসকর দত্ত	ঐ
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	বিভূতি ভূষণ সরকার	দশ বৎসর দ্বীপান্তর
"	সুধীর কুমার সরকার	৭ বৎসর "
"	ইন্দ্রনাথ নন্দী	খালাস
"	অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য	৭ বৎসর দ্বীপান্তর
"	ঋষিকেশ কাঞ্জিলাল	১০ " "
১০ বৎসর দ্বীপান্তর	পরেশচন্দ্র মৌলিক	৭ " "
"	শিশির কুমার ঘোষ	৫ " "
"	নিরাপদ রায়	৫ " "
৭ বৎসর দ্বীপান্তর	বালকৃষ্ণ হরিকানে	খালাস
"	সুশীল কুমার সেন	"
১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড	কৃষ্ণ জীবন সান্যাল	"

ইহার পর চিত্তরঞ্জন ঢাকা ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করেন। সরকার যে মোকদ্দমাটি আনয়ন করেন তাহার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এই: এখানেও সেই বঙ্গভঙ্গই। পূর্ববঙ্গ সরকারের অভিযোগ, পুলিন বিহারী দাস, বঙ্কিমচন্দ্র রায় ইত্যাদি ৪৪ জন যুবক সরকারকে অমান্য করিয়া উহাকে গদিচ্যুত করিবার জন্য গুপ্তভাবে অস্ত্রচালনা শিক্ষা করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে শুধু ঢাকাতেই নহে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে তাহারা অনুরূপ গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূর্ববঙ্গের যুবকবৃন্দকে এ-সব প্রতিষ্ঠানের সভ্য করিয়া ক্রমশই শক্তিবৃদ্ধি করিয়া চলিতেছে। প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ঢাকার দক্ষিণ

মৌশগুি অঞ্চলের "ভূতের বাড়ী" নামে অভিহিত একটি পোড়োবাড়ী, মধ্যপাড়ায় 'জ্ঞান-বিকাশিনী,' নারায়ণগঞ্জে 'ব্রতী-সমিতি, 'সাঠির পাড়া সমিতি', পাবনার সিরাজগঞ্জ সমিতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে মূল বা প্রধান ছিল "ভূতের বাড়ী"। উহাই ছিল হৃদপিণ্ড। ওখান হইতে সমগ্র দেহের শিরা-উপশিরায় রক্ত প্রবাহের মত সব সমিতি-গুলিতে বল, বুদ্ধি ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হইত। এই সব সমিতি পরিচালনার জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হইত তাহা ঐ যুবকবৃন্দই পূর্ববঙ্গের বিভিন্নস্থানে ডাকাতি করিয়া সংগ্রহ করিত। ডাকাতি-লব্ধ অর্থদ্বারা তাহারা অস্ত্র তৈয়ারী করিত অথবা গোপনে ক্রয় করিত।

মোকদ্দমাটি হাতে লইবার সময় আইনজীবিগণ যেমন মোকদ্দমার বিষয়বস্তু আদ্যোপান্ত শুনিয়া থাকে, চিত্তরঞ্জনও তেমন শুনিলেন,— যেন সাধারণ শ্রোতা। কিন্তু মোকদ্দমাটি যখন তিনি সাজাইলেন তখন দেখা গেল যে, তিনি গভীর ভাবেই সব শুনিয়াছিলেন এবং যাহা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য তিনি সেই সব পয়েণ্ট এবং যুক্তি সংগ্রহ করিয়া আসামীগণকে defend করিবার জন্য সর্বাধিক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আদালতের রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। আইনের বিষয়ও দিনের পর দিন, রাতের পর রাত জাগিয়া তিনি যে কত অসংখ্য আইনের পুস্তক এবং বিভিন্ন সময়ে বিচারকদের 'রায়' দেখিয়া লইলেন তাহারও ইয়ত্তা নাই। সব দেখিয়া শুনিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, পুলিন দাসের গুরু ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহার লেখা হইতেই পুলিন দাস অনুপ্রাণিত। যুবকগণের চাই মনের বল। মনোবল দৈহিক স্বাস্থ্য হইতেই উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং স্বাস্থ্য-চর্চা করিয়া ও স্বাস্থ্য গঠন করিবার জন্য পুলিন দাস যুবকবৃন্দকে আহ্বান জানাইতেন। দ্বিতীয়তঃ আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল। সে-কারণে হিন্দু যুবকগণের সুস্থ এবং সবল সুঠাম দেহের প্রয়োজন হইয়াছিল। সে-কারণটি, হিন্দুর দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিবার কাজে যাহারা প্রবৃত্ত ছিল তাহাদিগকে তাহাদের সে-কাজে বাধা প্রদান করা। সে-সময় জামালপুরে হিন্দুর দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল। কুমিল্লাতেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিচ্ছিন্ন হইয়া দাঙ্গা হইয়াছিল এবং পূর্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানে হিন্দুদের মান-সম্মান, নারীজাতির সম্ভ্রম নিরাপদ ছিল না। সুতরাং এই সব অন্যায় অত্যাচার এবং অবিচারের প্রতিকারের আশায় পরমুখাপেক্ষী

হইয়া না থাকিয়া পুলিন দাস বাংলার যুবকবৃন্দকে স্বাস্থ্য-সম্পদে সম্পদশালী হইয়া মানুষের মত মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। উহাই ছিল তাহার সমিতির উদ্দেশ্য।

কিন্তু ইংরাজের চোখে ইহা ষড়যন্ত্র, আইন-অমান্য করা এবং অমার্জনীয় অপরাধ। অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ চিত্তরঞ্জন তাহা বলিবেন কেন? তিনি এমনভাবে তৈয়ারী হইয়াছিলেন যে, প্রথমেই কুঠারাঘাত করিলেন অভিযোগকারীকে। বলিলেন, অভিযোগ আনয়ন করিবার অধিকারই তাহাদের নাই। দেশবন্ধু বলিলেন, সরকারের অনুমোদন (Government Sanction) ছাড়া আসামীগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা আনয়ন করা যায় না। তখন পূর্ববঙ্গ সরকার আইনানুগ Government নহে, উহা বিধিসম্মত পথে British Parliament কর্তৃক অনুমোদিতও নহে সুতরাং ষড়যন্ত্রের এই অভিযোগ মোকদ্দমা টিকিতে পারে না। ইহা ছাড়া সরকার পক্ষের সাক্ষীগণকে যেমন পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর, গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারী এবং Hand writing Expert-দের চিত্তরঞ্জন প্রায় চার মাস এমন করিয়া জেরার বাণে জর্জরিত করিয়াছিলেন যে, তাহারা শেষ পর্যন্ত ঠিক মত উত্তর দিতে না পারিয়া মনোবল হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কখন চিত্তরঞ্জন কোন্ ঘটনার কোন্ পয়েন্ট লইয়া যে নূতন জেরা শুরু করিবেন তাহা ছিল তাহাদের কাছে বিপদের মত। এত বড় বিরাট মোকদ্দমায় বিপুল আকার নথি-পত্র, পাহাড়ের মত স্তূপীকৃত ফাইল কিন্তু অপূর্ব স্মরণশক্তি তাঁহার, সম্পূর্ণ নথিখানা যেন তাঁহার মুখস্থ। কোন পাতায় কোন পয়েন্ট রহিয়াছে সবই তাঁহার নখদর্পণে। তাহা হইতে সব তুলিয়া তুলিয়া, অনুশীলন সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন লেখার উদ্ধৃতি, সমাজ-সংসারে মানুষের জীবনের রহস্য, বিগত দিনের কোন্ মোকদ্দমায় কোন্ বিচারক কি 'রায়' প্রদান করিয়াছিলেন, সব মিলাইয়া তিনি এমন এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে আদালতে উপস্থিত অন্যান্য আইনজীবিগণ, উপস্থিত জনমণ্ডলী সব যেন বিস্ময়ে অভিভূত! সকলে বুঝিল, ইংরাজের ঐ মোকদ্দমা মিথ্যা ঘটনার উপর সাজান, উহা বাংলার যুবকবৃন্দকে নির্মম অত্যাচারের জালে জড়িত করিয়া, তাহাদের মনোবল ভাঙ্গিয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। সব শুনিয়া এসেসারগণ মোকদ্দমা সম্বন্ধে তাহাদের সুচিন্তিত লিখিত অভিমত প্রদান করিলেন। মতামত লিখিবার সময়

তাহাদের কানে দেশবন্ধুর অকাট্য যুক্তি, গুরুগম্ভীর অথচ সুললিত কণ্ঠের সেই কথাটিই বার বার কানে ভাসিয়া আসিতে লাগিল, "হিন্দুগণ পড়িয়া পড়িয়া অন্যায় ভাবে মার খাইবে আর একজন নির্বিবাদে তাহাদের উপর উদ্ধত লাঠির আঘাত করিয়া হত্যা করিবে ইহা সহ্য করা সম্ভব হয় কি করিয়া ? পুলিন দাস তাহার অনুগামীদের লইয়া সেই মার ঠেকাইতে চাহিয়াছিলেন শুধু, সে বা তাহারা লাঠির আঘাতে অপরকে ধরাশায়ী করিতে চাহেন নাই, চাহিয়াছেন আত্মরক্ষা করিতে। আত্মরক্ষার অধিকার সর্বদেশে, সর্বকালে, সব মানুষেরই আছে—সেই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া কি ষড়যন্ত্র ? তাহা কি অপরাধ !!"

বিচারপতি 'রায়' প্রদান করিতে কয়েকটি দিন বিলম্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পূর্বেই জজ সাহেব একদিন চিত্তরঞ্জনকে নিভৃতে ডাকিয়া জানাইয়া দিয়াছিলেন মিঃ দাশ ! আপনি জয়ী। এসেসারগণ আপনার সব যুক্তি মানিয়া লইয়াছেন। তাহারা জানাইয়াছেন, আসামীগণের কোন অপরাধ নাই। তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমা হইতে তাহারা সম্মানের সহিত মুক্তি পাইয়াছেন।

শুনিয়া এতটুকু ভাবান্তর হইল না চিত্তরঞ্জনের। প্রেসিডেন্সী জেলে পাঞ্চজন্য শঙ্খধারী শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ যেমন পূর্ব হইতে নিজের সম্বন্ধে একটা চরমপ্রাপ্তি এবং পরম নিশ্চিন্ততা লাভ করিয়াছিলেন চিত্তরঞ্জনের মনের ভাবও যেন তখন ঠিক তেমনিই হইয়াছিল। এমন শুভ ও গৌরবময় জয়ের সংবাদ শুনিয়াও তাঁহার মুখে এতটুকু গর্ব ও অহঙ্কারের প্রতিক্রিয়া ফুটিয়া উঠিল না। যেন তিনি জানিতেন, যেন পূর্ব হইতেই নিশ্চিতরূপে জানিয়াছিলেন যে, জয় তাঁহার হইবেই . উহা তাঁহার কাছে একটি পুরাতন সংবাদ।

এই কথাটির সত্যতা প্রকাশ পাইল তাঁহার পরবর্তী কার্যের মধ্যেই। সরকারীভাবে জজ সাহেবের 'রায়' প্রকাশিত হইবার পূর্বেই চিত্তরঞ্জন তাঁহার দল-বল লইয়া ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে তাঁহার জন্য নূতন মক্কেল ও মোকদ্দমা তীর্থের কাকের মত অপেক্ষায় রহিয়াছিল।

বর্তমান অধ্যায়ে চিত্তরঞ্জনের আইনজীবী জীবনের বিখ্যাত বিখ্যাত

কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হইল। নিম্নে আরও কয়েকটি বিখ্যাত মোকদ্দমার উল্লেখ করা হইতেছে। ইহা ছাড়া ব্যবসায়ী জীবনে তিনি কত অসংখ্য Case হাতে নিয়াছেন, উপদেশ দিয়াছেন তাহা তেমন বিখ্যাত নহে বলিয়া উল্লিখিত হইল না। ইহাতে তাঁহার যেমন ফৌজদারী সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জিত হইয়াছিল, দেওয়ানী বিষয়েও তাঁহার অভিজ্ঞতার পরিধি তাহা হইতে কম ছিল না। আদালতের ভিতরে ও বাহিরে আইনজীবী বন্ধু-বান্ধবগণ তাই ভাবিত, এ যেন একেবারে সব্যসাচী, দুই দিকেই সমান অধিকার,— সমান অভিজ্ঞতা।

ষড়যন্ত্র মোকদ্দমাগুলির মধ্যে আলিপুর বোম্-কেস্, মুরারীপুকুর বা ঢাকা ষড়যন্ত্র যেমন ফৌজদারী মোকদ্দমা হিসাবে বিখ্যাত, দেওয়ানী বিভাগে আবার ডুমরাওন Case ঠিক তেমন বিখ্যাত। মোকদ্দমাটি যখন আরম্ভ হয় তখন সাধারণ মানুষের মধ্যেও একটা প্রবল ঔৎসুক্য জাগিয়া উঠিয়াছিল,—কে মোকদ্দমায় জয়লাভ করে !—কি হয় !!

ডুমরাওন মোকদ্দমার বিষয়বস্তু অতি অল্প কথায় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে: রাধাপ্রসাদ সিংহ ছিলেন ডুমরাওনের মহারাজা। তাহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না, ছিল দুইটি কন্যা। যথাসময়ে দুই রাজ পরিবারে দুই কন্যার বিবাহ হয়। কন্যাদের প্রতি তাহার বুকভরা স্নেহ ছিল কিন্তু রাজ্য আর সম্পত্তির বিষয়ে তিনি ছিলেন কঠোর। তাহার মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি কন্যাদের মারফৎ অন্য রাজ পরিবারের বিষয়ীভূক্ত হয় ইহা তিনি চাহেন নাই। সুতরাং তাহার মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রী যাহাতে ডুমরাওন, বাকসার ও জগদীশপুরস্থ উজ্জয়িনী পরিবারের কোন নাবালক পুত্র সন্তানকে দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে সেই মর্মে একখানি দত্তক নামা রাখিয়া যান। পরে মহারাজা যে উইল করেন তাহাতেও রাণীকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার ক্ষমতার কথা উল্লেখ থাকে। ১৮৯৪ খ্রীঃ অঃ মহারাজা স্যার রাধাপ্রসাদের মৃত্যু হয়। রাণীর মৃত্যু হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। রাণী তাহার মৃত্যুর একদিন পূর্বে পরলোকগত মহারাজার ইচ্ছানুযায়ী জগদীশপুরের জগপ্রসাদ সিংহের পুত্র জঙ্গবাহাদুর সিংহকে দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। মহারাণীর পরলোকগমনের পর তাহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকারের হাতে (কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্) গিয়া বর্তায়।

এ গেল একদিকের চিত্র। অন্যদিকের চিত্রটি হইল,—মহারাজার জ্যেষ্ঠা-কন্যার বিবাহ হয় মান্দার রাজার সহিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবাহের অল্পকাল পরেই তাহার মৃত্যু হয়। কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয় রেওয়ার রাজপরিবারে। মহারাণীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা ছিল তাহার সমগ্র সম্পত্তি রেওয়ার রাজার সংগে বিবাহিতা ঐ কনিষ্ঠা কন্যাকেই অর্পণ করেন। কিন্তু মহারাজার উহা অনভি-প্রেত ছিল বলিয়া মহারাণীর সে-ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। পরে ইচ্ছা ছিল নিজেদের বংশের অর্থাৎ জ্ঞাতি রাজেশ্বরী প্রসাদের পুত্র কেশোপ্রসাদকে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন কিন্তু রাজেশ্বরী প্রসাদ ঐ প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়া দাঁড়াইল যে, মুখ দেখা-দেখি প্রায় বন্ধ। কেশোপ্রসাদকে মহারাণীর কাছে যাওয়াও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়া-ছিল। মহারাণীর অসন্তুষ্টির মাত্রা তাহাতে আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি তখন, কেশোপ্রসাদ যাহাতে ঐ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয় তাহার চেষ্টায় অসুস্থ অবস্থায় জঙ্গ বাহাদুরকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। গ্রহণের দিনটি ছিল ১৯০৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর অর্থাৎ মহারাণী বেণীপ্রসাদ কোঁয়ারের মৃত্যুর মাত্র একদিন পূর্বে।

এই দত্তকের বিরুদ্ধে কেশোপ্রসাদ অভিযোগ দায়ের করিয়া নিজেকে রাজগড়ের মালিক বলিয়া আদালতে আর্জি পেশ করেন। কেশোপ্রসাদ চিত্তরঞ্জনকে মাসিক দশ হাজার টাকা পারিশ্রমিকে নিজের পক্ষে Counsel নিযুক্ত করেন এবং যদি মোকদ্দমায় জয়লাভ করিতে সমর্থ হন তবে একটি মকররী সম্পত্তি, যাহার বাৎসরিক আয় অনুমান পঞ্চাশ হাজার টাকা, তাহা চিত্তরঞ্জনকে প্রদান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হন।

মোকদ্দমাটি লইয়া চিত্তরঞ্জনের ও. পরিশ্রমের অন্ত নাই। —যেন মহাপুণ্য অর্জনে তাঁহার সাধনা চলিতেছিল। চিন্তা-ভাবনা, যুক্তি-বিশ্লেষণ সব সমন্বয়ে তিনি মোকদ্দমাটিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি পয়েণ্টের উপর সাজাইয়া তোলেন: প্রথমতঃ বংশগতধারা অনুযায়ী প্রকৃত অধিকারী কেশোপ্রসাদ সিং-কে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যেই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘদিন অসুস্থ রাণীর মৃত্যুর পূর্বদিন, যেদিন স্বাভাবিকই তিনি মানসিক সুস্থ অবস্থায় ছিলেন না বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, সেদিন ঐ দত্তক গ্রহণ করা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ মহারাজার মৃত্যুর পর দীর্ঘ-

তের বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। দত্তক গ্রহণের ইচ্ছা থাকিলে রাণী মহারাজার মৃত্যুর সংগে সংগেই উহা গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাহা ছাড়া ছোট লাট বাহাদুর স্যার জন উডবরণ ও স্যার ফ্রেজারও রাণীকে দত্তক গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন তাহাতেও রাণী তখন দত্তক গ্রহণে তাহার সম্মতি জ্ঞাপন করেন নাই। সুতরাং সেই রাণী মৃত্যুর পূর্বদিন দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন ইহা একান্তই একটা সাজান ঘটনা। উপরন্তু হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী দত্তক গ্রহণের সময় যে আচার-অনুষ্ঠান এবং যাগ-যজ্ঞাদি অবশ্যই করণীয় ও-ক্ষেত্রে তাহার কিছুই অনুষ্ঠিত হয় নাই। পরিশেষে যে দত্তক দান করে, গ্রহীতার নিকট হইতে সে যে একটা দান গ্রহণ করিয়া থাকে ঐ ক্ষেত্রে সে দান গ্রহণ হয় নাই সুতরাং ঐ দত্তক গ্রহণ করাটা হিংসা পরায়ণ এবং স্বার্থান্বেষী কয়েকজন লোকের কু-অভিলাষ প্রসূত একটি যোগসাজস ছাড়া আর কিছুই নহে।

মোকদ্দমায় চিত্তরঞ্জন জয়লাভ করেন। কিন্তু ইহা অতীব দুঃখের বিষয় যে, যদিও মোকদ্দমা চলাকালীন সময়ে কেশোপ্রসাদ চিত্তরঞ্জনকে প্রতিশ্রুতি-মত মাসিক দশ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দিয়াছিলেন সত্য কিন্তু বৎসরে পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের যে মকররী সম্পত্তি তাহাকে প্রদান করিবার কথা ছিল কেশোপ্রসাদ জয়লাভ করিয়া তাহার সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নাই।

কিন্তু ইহাই ডুমরাওন মোকদ্দমার শেষ নহে। কথায় বলে, যে সংসারে একবার মোকদ্দমা প্রবেশ করে সে-সংসার হইতে মোকদ্দমা আর বিদায় লইতে চাহে না। এ-কথাটির সত্যতা এখানেও আবার প্রমাণিত হইল। নূতন পর্যায়ে ডুমরাওন ষ্টেট্ লইয়া আবার মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। তখন ১৯১৪ সাল। স্বর্গগত মহারাজা রাধাপ্রসাদের কনিষ্ঠা কন্যা বাউজুই, যিনি তখন রেওয়ার রাণী, তিনি এই মর্মে মোকদ্দমা রুজু করিলেন যে, তিনি হইতেছেন সত্যি সত্যি রাজগড়ের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। কারণ তিনি মৃত রাজার একমাত্র জীবিত সন্তান এবং কেশোপ্রসাদ সে বংশের পুত্র সন্তান বটে তবে মৃতরাজা রাধাপ্রসাদের সংগে কেশোপ্রসাদের নৈকট্য সম্পর্ক না থাকিয়া উহা অনেক পুরুষ দূরত্বে গিয়া পৌঁছিয়াছে। সুতরাং কেশোপ্রসাদের দাবীর কোন যৌক্তিকতা নাই এবং তাহাকে যে রাজগড়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও বে-আইনী।

দ্বিতীয় পর্যায়ে এই মোকদ্দমা আরম্ভ হইলে কেশোপ্রসাদ অত্যন্ত বিব্রত হইয়া বিপন্ন বোধ করিলেন। তখন চিত্তরঞ্জনের সম্মুখে আসিবার মত তাহার মুখ বা মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। পঞ্চাশ হাজার টাকার মকররী সম্পত্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াও, জয়ী হওয়ার পরেও সে তাহার সে-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। তখন চিত্তরঞ্জনের নিকট উপস্থিত হইতে হইলে কেশো-প্রসাদকে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে হয় কিন্তু আর্থিক দিক হইতে চিন্তা করিয়াই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, কেশোপ্রসাদ চিত্তরঞ্জনের নিকট যাইতে সাহসী হন নাই। কিন্তু Counsel তো দিতেই হইবে। নিরুপায় হইয়া কেশোপ্রসাদ স্যার এস. পি. সিংহ ও বি. সি. মিত্রকে তাহার Counsel নিযুক্ত করিলেন। অপর পক্ষ রেওয়ার রাণী নিযুক্ত করিলেন চিত্তরঞ্জনকে। প্রথম পর্যায়ে ডুমরাওনের মোকদ্দমায় চিত্তরঞ্জন পাইয়াছিলেন মাসিক দশহাজার টাকা আর এই দ্বিতীয় পর্যায়ে রাণী তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন দৈনিক পনের শত টাকা ফি দিয়া। দুই পক্ষের রথী-মহারথীর শক্তিশালী যুক্তি-বাণের কাটাকাটি। দুই-চার দিন নহে,—দুই এক মাস-ও নহে। জিলা বিচারক ম্যাক্‌ফারসনের এজলাসে প্রায় ছয় মাস দুই পক্ষের লড়াই। মোকদ্দমার দিন আদালত ভর্তি অন্যান্য আইনজীবিগণ দাশমহাশয়ের সওয়াল-জবাব শুনিতে আসিয়া ভিড় জমায়। জনসাধারণের ঔৎসুক্য তাহাদিগকে আনিয়া দাঁড় করাইত আদালতের প্রাঙ্গণে: অনেকে আসিত সি. আর. দাশকে দেখিতে।

অবশ্য মোকদ্দমাটি আর চালাইবার প্রয়োজন হইল না। দুই পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী মধ্যস্থ হইয়া মোকদ্দমাটির একটা মীমাংসার প্রস্তাবে উপস্থিত হয় এবং দুই পক্ষ নিজেদের মধ্যে সর্ত অনুযায়ী মোকদ্দমাটি মিটমাট করিয়া লয়। সেই সর্ত অনুযায়ী কেশোপ্রসাদ রেওয়ার রাণীকে বাৎসরিক প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের একটি সম্পত্তি দান করিলে বাউজুই রাজগড়ের পৈতৃক সম্পত্তির উপর যে দাবী লইয়া মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিলেন সেই দাবী পরিত্যাগ করেন।

কিন্তু অর্থই অনর্থের মূল। কেশোপ্রসাদ তখনও নিশ্চিন্ত হইয়া সম্পত্তির ভোগ-দখল করিতে পারিলেন না। নূতন করিয়া আবার ১৯১৭ খ্রীঃ অঃ ডুমরাওনের অশান্তির সৃষ্টি হইল। আরম্ভ হইল তৃতীয় পর্যায়ে মোকদ্দমা।

বার বার আদালত-গৃহে একই ডুমরাওনের মোকদ্দমার আবির্ভাব।

এই মোকদ্দমা ব্রহ্মদেশের একটি সম্পত্তিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠে। ঐ সম্পত্তি ষ্টেটের টাকা দিয়া ভূতপূর্ব মহারাজা রাধাপ্রসাদের দেওয়ান জয়-প্রকাশ ক্রয় করিয়াছিল। মহারাজার মৃত্যু হইল, জয়প্রকাশও পরলোকগমন করিল। সত্তর হাজার টাকা ক্রয়-মূল্যের ঐ সম্পত্তি তখন চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তিতে উন্নীত হইয়াছিল এবং উহা হইতে যে বার্ষিক আয় হইতেছিল সে-অর্থের পরিমাণও কম নহে। জয়প্রকাশের পুত্র হরিহরপ্রসাদ নিজেই উক্ত সম্পত্তির আদায়-ওয়াশিল করিতেছিল এবং ভোগ-দখলী সত্বে অধিকারী ছিল। কেশোপ্রসাদ ব্রহ্মদেশের ঐ সম্পত্তির অধিকারীরূপে হরিহর প্রসাদকে আর সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। সুতরাং হরিহরপ্রসাদকে ঐ দখলীকার সত্ব হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য আদালতের স্মরণাপন্ন হইলেন।

কেশোপ্রসাদের তরফ হইতে চিত্তরঞ্জনের কাছে লোক আসিয়া ঐ মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করে। কথাবার্তাও ঠিক হয় যে, মোকদ্দমার সমস্ত কাগজ-পত্র দেখিবার জন্য 'ফি' হিসাবে চিত্তরঞ্জনকে বিশ হাজার টাকা দেওয়া হইবে। ওদিকে হরিহরপ্রসাদেরও খুব ইচ্ছা ছিল যে চিত্তরঞ্জনকে সে তাহার পক্ষে Counsel হিসাবে দাঁড় করায়। শেষ পর্যন্ত মোকদ্দমা চলাকালীন প্রত্যেক মাসে পঁচিশ হাজার টাকা এবং 'ফি' হিসাবে ষাট হাজার টাকা ধার্য হওয়ায় চিত্তরঞ্জন কেশো-প্রসাদের পক্ষাবলম্বন করিবেন বলিয়া সাব্যস্ত হয়। কিন্তু কলিকাতায় অন্যান্য নাম-করা আইনজীবিদের সঙ্গে কথা বলিয়া কেশোপ্রসাদ যখন বুঝিতে পারিল যে উহার চাইতে কম টাকায় Counsel নিযুক্ত করা যাইতে পারে তখন সে তাহার পূর্বোক্ত মতের পরিবর্তন করিয়া আর চিত্তরঞ্জনের দ্বারস্থ হইল না। কিন্তু অঘটন ঘটে। তাহার Counsel কেস চলিতে থাকা অবস্থায় অন্যত্র যাইতে বাধ্য হওয়ায় কেশোপ্রসাদ বিপদেই পড়িয়া গেল। নিরুপায় কেশো-প্রসাদ তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া চিত্তরঞ্জনের নিকট আসিতেই বাধ্য হইল। আইনজীবী আইনজীবী-ই; অভিমান সহকারে চিত্তরঞ্জন তাহাকে ফিরাইয়া না দিয়া প্রতি মাসে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা 'ফি' গ্রহণ করিয়া কেশোপ্রসাদের অনুরোধে সাড়া দিলেন। এক্ষেত্রে টাকার অঙ্কই চিত্তরঞ্জনের নিকট তখন একমাত্র লোভনীয় ও বিবেচ্য বিষয় ছিল না। এক ডুমরাওন সম্পত্তি লইয়া

তিন দফা নূতন নূতন মোকদ্দমার অভিনবত্বই তাঁহাকে বেশী আকৃষ্ট করিয়াছিল।

মহারাজ যে সম্পত্তি ক্রয় করিবার জন্য টাকা দিয়াছিলেন উহা দুই পক্ষই স্বীকার করে কিন্তু প্রশ্ন তাহা লইয়া নহে। মোকদ্দমা গড়িয়া ওঠে অন্য প্রশ্নে। প্রশ্নটি হইল, মহারাজা দেওয়ানকে যে ঐ টাকাটা দিয়াছিলেন উহা কি যৌতুক স্বরূপ না রাজকার্যের জন্য? হরিহরপ্রসাদ বলে, মহারাজা তাহার পিতা জয়প্রকাশকে ঐ টাকা যৌতুক হিসাবে দিয়াছিলেন। আর কেশোপ্রসাদের কথা হইল, রাজকার্যের জন্যই মহারাজা রাজ-ষ্টেট্ হইতে ঐ টাকা দিয়াছিলেন। উহাই হইল মোকদ্দমার বিষয়বস্তু। শব্দ দুইটি হইল এন্‌জানি ও এয়ান্‌ত্। চিত্তরঞ্জন বলিলেন, 'এন্‌জানি' অর্থাৎ I sanction. sanction অর্থ রাজ-কার্যের জন্যই মঞ্জুর করা হইয়াছে বুঝায়। অপর পক্ষ বলিল, 'এন্‌জানি' নহে উহা 'এয়ান্‌ত্' অর্থাৎ দান স্বরূপ মঞ্জুর করিলাম।

চিত্তরঞ্জন বলিলেন, রসায়ন দ্রব্যের সাহায্যে 'এন্‌জানি'-র ন ও জ এর নোক্তা (বিন্দু) অতি চাতুর্যের সহিত হরিহরপ্রসাদের তরফ হইতে তুলিয়া দিয়া উহাকে 'এয়ান্‌ত্' করা হইয়াছে। এ-প্রসঙ্গে হাইকোর্টের জজ জাহিদ সুরাউর্দ্দী, আরবী ভাষার অধ্যাপক সিরাজী সাহেব এবং যাহারা উক্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাহারা বলিলেন, কথাটি 'এন্‌জানি'। অপর সার বেগ ও হস্তলিপি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ক্রষ্টার অভিমত প্রকাশ করিলেন, কথাটি 'এয়ান্‌ত্'।

চিত্তরঞ্জন ষ্টেটের কাগজ-পত্র, হিসাবের বহি এমন ভাবে তুলিয়া ধরিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, ঐ টাকাটা রাজকার্যের জন্যই ব্যয় করা হইয়াছিল। অপর পক্ষে হরিজীর কৌন্সিলী ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং এন্, সরকার। তাহারাও তাহাদের যুক্তি মত বিচারককে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে তাহাদের অভিমতই ঠিক। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের ঐন্দ্রজালিক যুক্তিতেই বিচারপতি কেশোপ্রসাদকে মোকদ্দমায় ডিক্রী দিয়াছিলেন।

কিন্তু না,—আপীল হইল। সুতরাং আবার হাইকোর্টে দৌড়াদৌড়ি। সরকার মহাশয় আবার argument করিবেন, আবার নূতন যুক্তি, নূতন ভাবনা। চিত্তরঞ্জন সকলকে নিশ্চিন্ত করিবার জন্য বলিলেন, "তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। আমি এমন সব দিক দিয়া প্রত্যেকটি বিষয় চিন্তা করিয়াছি, যে যাহা বলিবে দশ দিক হইতে আমি তাহা খণ্ডন করিতে পারিব।"

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ডুমরাওনের এই আপীল কেসে চিত্তরঞ্জন আর তেমন মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই কারণ চিত্তরঞ্জন তখন নাগপুরে অসহযোগ ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁহার ব্রত গ্রহণ তো গ্রহণই, অন্যের মত দুই নৌকায় পা দেওয়া নহে। মহাত্মা গান্ধীজী অবশ্য মহারাজার পক্ষে এই আপীলের মোকদ্দমাটি চালাইয়া যাইবার জন্য চিত্তরঞ্জনকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। সেই অনুসারে দেশবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে ঐ মোকদ্দমার ব্যাপারে তিন চার বার পাটনা গিয়াছিলেন কিন্তু অসহযোগ ব্রত এবং অন্যান্য কারণে তিনি আর ঐ মামলা পরিচালনার দায়িত্ব নিজের হাতে রাখিতে পারেন নাই। কেশোপ্রসাদের সন্দেহ হইল, চিত্তরঞ্জন হয়তো আরও অধিক টাকা পাওয়ার জন্য ঐরূপ করিলেন। শোনা গিয়াছে, কেশোপ্রসাদ তখন আরও প্রচুর অর্থ দিবে বলিয়া চিত্তরঞ্জনের কাছে প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু তাহা বৃথা। চিত্তরঞ্জন যাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা মনে-প্রাণেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে-ব্রতের কাছে যে কোন অধিক পরিমাণ অর্থই অতি তুচ্ছ।

ব্যারিষ্টার সি আর. দাশ। যখন তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে প্রথম প্র্যাক্‌টিস্ করিতে আসেন তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৩ বৎসর। মাত্র ২৫ বৎসর তিনি আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন। আবার যে সমস্ত মোকদ্দমায় তিনি পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই তাহার হিসাব করিলেও দেখা যাইবে অঙ্কটি বহু লক্ষ টাকায় গিয়া পৌঁছিবে। তাহার মধ্যে সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম্, আলিপুর বোমা কেস, ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু এখানে মাত্র আর দুই একটি মোকদ্দমার উল্লেখ করিয়া তাঁহার আইনজীবী জীবনের অধ্যায়কে শেষ করিতে চাই কারণ তাহা না হইলে তাঁহার আইনজীবী জীবন লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে একখানি বৃহদাকার পুস্তকে পরিণত হইতে পারে।

বিনা পারিশ্রমিকে চিত্তরঞ্জনের আর একটি বিখ্যাত রাজনৈতিক মোকদ্দমার কথা বলা হইতেছে। উহা কুতুবদিয়া রাজবন্দীদের মামলা। সেই অগ্নিযুগের রক্তলেখা দিনগুলি। মায়ের চরণের শিকল মুক্ত করিতে দুর্জয় সাহসী বাংলার যুবকবৃন্দের বুকে পুঞ্জীভূত আগুন। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে এই যুবকবৃন্দের সতের জনকে ভারতরক্ষা আইনে বন্দী করিয়া চট্টগ্রামের সর্পসঙ্কুল

একটি গ্রাম কুতুবদিয়া-য় অন্তরীণ রাখা হইয়াছিল। মৃত্যুকে তাহারা ভয় করেন না, কিন্তু সাপের কামড়ে মৃত্যু? তাহা কেন? প্রাণ দেবেন মহান কাজে। প্রাণ তো দেবেন বলিয়াই তাহারা দেশের কাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই বলিয়া সাপের কামড়ে নয়। তাই তাহারা সাপের ভয়ে কুতুবদিয়া হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন এবং চট্টগ্রাম শহরে আসিয়া উপস্থিত হন। সরকারের দৃষ্টিতে উহা অমার্জনীয় অপরাধ। একে অগ্নিযুগ, প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কাল তাহাতে আবার অন্তরীণ অবস্থা হইতে পলায়ন। সরকার উহাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজ্জু করিয়া দিলেন।

এই আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিলেন চিত্তরঞ্জন। দৈনিক যাহার অন্ততঃ হাজার, দেড়হাজার টাকা আয় সেই আইনজীবী প্রায় এক পক্ষকাল বিনা পারিশ্রমিকে ঐ মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে চট্টগ্রাম শহরে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শুধু পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই তাহা নহে, প্রয়োজন মত ঐ মোকদ্দমা পরিচালনায় নিজের পকেট হইতে অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

অনেক পরিশ্রম করিয়া চিত্তরঞ্জন কেসটি সাজাইলেন। গুরুগম্ভীর অথচ সুললিত কণ্ঠে চিত্তরঞ্জন সওয়াল-জবাবে বিচারককে ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, সরকার রাজবন্দীদের যে দোষে দোষী সাব্যস্ত করিয়া অভিযোগ দায়ের করিয়াছেন প্রকৃতপক্ষে তাহারা সে দোষে দুষ্ট নহেন। রাজবন্দীগণ পলাতক নহেন। তাহারা পূর্বে আইন সঙ্গত পথে কর্তৃপক্ষের নিকট অন্যত্র বদলীর প্রার্থনা জানাইয়া অনেক আবেদন নিবেদন করিয়াছেন কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। অথচ সর্পসঙ্কুল স্থান, কখন যে সর্পাঘাতে কাহার প্রাণ যায়। মানুষের কাছে তাই মানুষের জীবন ভিক্ষার প্রার্থনা অরণ্যে রোদন হইলে তাহারা সশরীরে জিলা শহরে আসিয়া জিলা-শাসকের নিকট নিজেদের খাদ্য পানীয় এবং বাসস্থানের বিপদের কথা জানাইতে আসিয়াছেন। সুতরাং রাজবন্দীগণ সরকারী আদেশ ও আইন অমান্য করেন নাই, তাহাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে তাহা সর্বৈব মিথ্যা।

চট্টগ্রামের দায়রা জজের আদালতে এই মামলা চলিয়াছিল। তখনকার পরিবেশ এবং রাজবন্দীদের বিরুদ্ধে সরকারের আনীত মামলা,—চিত্তরঞ্জন যতই যুক্তিপূর্ণ, বুদ্ধিমত্তা ও সওয়াল-জবাবের চাতুর্য দেখান না কেন, বিচারক কিন্তু তাহাতেও বিগলিত হইল না। তবে তাহার মন যে একে-

বারে পাষাণ-গড়া ছিল না তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল রায় প্রকাশিত হইলে। রাজবন্দীদের মাত্র দুই মাস করিয়া জেল হইয়াছিল।

জানা গিয়াছে চিত্তরঞ্জন যখন রাজবন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তিনি তখন চোখের জল সংবরণ করিতে পারেন নাই। এক হাতে চোখের জল মুছিয়া অন্য হাতে তিনি রাজবন্দীগণকে মিষ্টি খাইবার জন্য অনেক টাকা দান করিয়া আসিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া ১৯১৫ সালে ভাগলপুরে লছমীপুর মোকদ্দমা, ১৯১৬ সালে সাঁওতাল পরগণার ডুমকা জিলার অন্তর্গত মহেশপুর রাজ সংক্রান্ত মোকদ্দমা, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে গাইকোয়াড়ের কন্যা ইন্দুমতী যিনি ছিলেন কোচবিহারের মহারাণী তাহার মামলা যাহা কোচবিহার 'Jewellery theft Case' নামে অভিহিত সেই মোকদ্দমা, ১৯১৬ সালেই অমৃতবাজার পত্রিকা মামলা, ঐ বৎসরেই ১০ই আগষ্ট তারিখে দেবব্রত ব্রহ্মচারী নামক জনৈক ব্যক্তিকে সিঁপিতে খুন করার মামলা যাহা 'ট্রাঙ্কখুন' মোকদ্দমা নামে পরিচিত ইত্যাদি বহু ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমা পরিচালনা করিয়া ভারতের শীর্ষ আইন-জীবী হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি বহু আরজী, মোকদ্দমা বিষয়ে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা, জবাব দানের মুসাবিদা এবং আইনের জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়ে বহু মামলা-মোকদ্দমার বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার আইনজীবী জীবনকে যদি বিচার-বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যাইবে যে, আইনজ্ঞের আড়ালে তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক। আইনের পথকে তিনি জীবনের চরম পথরূপে প্রথম গ্রহণ করিতে পারেন নাই কিন্তু সে-পথে যখন পা দিয়াছেন তখন সে পথে দৃঢ় পদক্ষেপেই চলিতে হইবে সে-শিক্ষা তিনি বাল্যকালেই তাঁহার মাতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। অম্লের প্রতি চিত্তরঞ্জনের বাল্যকালে খুব আসক্তি ছিল। মাতা নিস্তারিণী দেবী উহা ঠিক মনে করেন নাই। পুত্রকে শিক্ষা দিলেন, কোন জিনিসের প্রতিই আসক্তি থাকা উচিত নহে, যাহার প্রতি আসক্তি তবে তো তাহার দাস হইয়া যাইতে হয়। আবার যখন যাহা করিতে হইবে তাহার প্রতি আসক্তি না থাকিলে তাহাতেও কৃতকার্য হওয়া যায় না। সুতরাং মায়ের এই শিক্ষাকে চিত্তরঞ্জন বাল্যেই মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আইন-ব্যবসা তাঁহার মনঃপূত না হইলেও তিনি আইন-ব্যবসা করিয়াই জীবনের পথ আলোকিত

করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। আইনের নিয়ম-বিষয়ে এবং প্রাণ-শূন্য আদালত প্রাঙ্গণে তিনি তাঁহার প্রাণের প্রদীপ জ্বালাইয়া সে স্থানকে উজ্জ্বল করিলেন। সেই আলোর দ্যুতিতে দেখিয়াছেন নূতন আলো, নূতন দিগঞ্চল। গুপ্ত সমিতির Case গুলিতে পাইয়াছিলেন জীবনের গন্ধ যেমন পাইয়াছিলেন আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন। বাড়ীতে লেখা একখানা চিঠিতে তিনি জানাইয়াছিলেন, "I heard the bullet's whistle and believe me, there is something charming in the sound". অর্থাৎ বুলেটের শব্দের মধ্যে তিনি জীবনের নূতন সঙ্গীত শুনিতে পাইয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনও গুপ্ত সমিতির প্রত্যেকটি মোকদ্দমায় দেশপ্রেমের গন্ধে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন। এখানে চিত্তরঞ্জন একজন মহান Architect বা Engineer. ইটালীর প্রবীণ কবি, ১৯৫৯ সালের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সালভাতোর কোয়াসিমোদো বলিয়াছিলেন, 'মানুষের রূপান্তর কবির প্রধান কাজ'। তাই দেখা গিয়াছে যে আইনজীবী চিত্তরঞ্জনের মনের গভীরে যে কবি-চিত্তরঞ্জন কাব্য-বীণা বাজাইয়া চলিয়াছিল তাহার সুরে সুরেই তিনি আইনজীবী চিত্তরঞ্জনকে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন দেশ প্রেমিকরূপে তাই দেশবাসী ব্যারিষ্টার সি. আর. দাশকে বলি National Lawyer.

রাজনৈতিক জীবন

রাজ্য আর রাজা লইয়া রাজনীতি। মাকে ভালোবাসা হইতেই রাজনীতির জন্ম। চিত্তরঞ্জন তাঁহার রক্তমাংসের মা এবং মাটির মা উভয়কেই অন্তরের উজাড় করা ভালোবাসা লইয়া পূজা করিতেন। মায়ের বুকের পীযূষধারায় দেহ-মন পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। দেশ-মাতার আলো-বাতাস আর ফল্গুধারার মত প্রবাহিত মাটির রস তাঁহার সেই দেহ মনকে সবল, নির্ভীক আর তেজে-বীর্যে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে। তাই দেখা গিয়াছে, চিত্তরঞ্জন তেজস্বী রাজনীতিবিদ। যখন তিনি ছাত্র তখনও, যখন তিনি আইনজীবী তখনও। বলা যায়, জন্মলগ্নের পর যখন তাঁহার দেহ মনে চেতনার চৈতন্য ধারা প্রবাহিত হইতে শুরু করিয়াছে তখন হইতেই সেই চৈতন্যধারার সঙ্গে রাজনীতি তথা দেশপ্রেম ওতঃপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং জীবনের কোন ক্ষেত্রেই রাজনীতি ছাড়া চিত্তরঞ্জনকে কল্পনা করা যায় না। তবে উহার প্রকাশ মাত্রার তারতম্য আছে। যেমন আইনজীবী জীবনেও তাঁহার রাজনৈতিক জীবন চলিতেছিল। আদালতের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়াও তিনি রাজনৈতিক নেতার মত বক্তৃতা করিয়া চলিয়াছেন। পৃথিবীর এক সমাজতন্ত্রী মনিষী সিডনী ওয়েব বলিয়াছেন, "The Bar and the platform are the two Principal instruments of modern democracy." চিত্তরঞ্জন প্রথম ছিলেন Bar-এ। সুতরাং তাঁহার আইনজীবী-জীবন রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করিবার দ্বার মাত্র. উহা ছিল রাজনৈতিক মঞ্চে প্রবেশ করিবার একটি সিঁড়ি। গীতার অনুসরণকারী তিনি। শ্রীমদ্‌ভাগবৎ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন: বাসাংসী জীর্ণানী যথা বিহায়। নবানী গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি অর্থাৎ ছিন্নবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মানুষ যেমন নূতন বস্ত্র পরিধান করে সেইরূপ চিত্তরঞ্জন আইনজীবী জীবনকে ছিন্নবস্ত্রের মত পরিত্যাগ করিয়া রাজনৈতিক জীবনকে নূতন বস্ত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। ছিন্নবস্ত্রের উপর মানুষের মায়া থাকে না কিন্তু আইনজীবী জীবন যাহা তাঁহার জীবিকা নির্বাহের একমাত্র পথ তাহাকে পরিত্যাগ করা সত্যই আশ্চর্যের বিষয়। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চিত্তরঞ্জন যখন আইন-ব্যবসা পাকাপাকিভাবে পরিত্যাগ করিয়া দেশের

মুক্তির জন্য পরিপূর্ণভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন তখন তাঁহার মাসিক আয় ৫০।৬০ হাজার টাকা এবং পরবর্তী বৎসরের জন্য বহু লক্ষ টাকার Case জমা হইয়াছিল। আদালত পরিত্যাগ করিয়া জীবনকে করিলেন জীবিকাশূন্য—আর সে জীবন পরিপূর্ণ করিলেন রাজনীতিতে।

১৯০৫ সাল। বাংলাদেশে তখন বঙ্গভঙ্গের যুগ। জর্জ নাথানিয়েল কার্জন তখন ভারতবর্ষের বড়লাট এবং গভর্ণর জেনারেল। ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব হইতেই তিনি ভারতবিদ্বেষী ছিলেন। ভারতবর্ষে আসিলে তাহার আরও সুযোগ মিলিল। প্রশাসনিক কার্যের সুবিধা হইবে এই অজুহাতে তিনি বাংলাকে ভাগ করিতে চাহিলেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগকে ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকার জেলা দুইটির সংগে মিলিত করিয়া, 'পূর্ববঙ্গ' আর প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগসহ বিহার উড়িষ্যা সমেত 'বাংলা' প্রদেশ গঠন করিবার প্রস্তাব পার্লামেন্টের অনুমোদনের জন্য বিলাত পাঠাইলেন। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রশাসনিক সুবিধা নহে, বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনা ও জাগ্রত দেশপ্রেম এবং হিন্দু-মুসলমানের প্রীতি-বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া দেশপ্রেমের চেতনাকে শ্বাসরোধ করিয়া বন্ধ করিয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু বাংলার জনসাধারণ তাহা সহ্য করিবে কেন? জনগণ জাগ্রত হইলেন,—দেখা গেল নব জাগরণ। এই জাগরণের স্রোতে উৎপত্তি হইল আগুনের লেলিহান শিখা এবং তাহা হইতেই উৎপত্তি হইল বাংলার "স্বদেশী আন্দোলন"।

এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রতিবাদে কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে টাউন হলে এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই নবজাগরণের পরিবেশে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করিলেন। ঠিক এই সময়ই চিত্তরঞ্জনের অন্যতম অন্তরঙ্গ শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয় চিত্তরঞ্জনকে জানাইয়াছিলেন যে, এই মহান কাজের জন্য সুবোধ মল্লিক মহাশয় কিছু টাকা দান করিতে পারেন। শুনিয়া চিত্তরঞ্জন খুশীতে আত্মহারা হইয়া লাফ দিয়া উঠিলেন। বলিলেন, এই হইল সত্যিকারের দেশপ্রেম। চিত্তরঞ্জন আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি সংগে সংগে গাড়ী করিয়া ছুটিলেন পটলডাঙ্গার বিখ্যাত মল্লিক বাড়ী, সোজা উপস্থিত হইলেন সুবোধ মল্লিকের সামনে। এক পবিত্র কাজের জন্য মিলন হইল দুইটি মহান অন্তরের।

সুবোধচন্দ্র মল্লিক ও চিত্তরঞ্জন। প্রায় দুই ঘণ্টা দুইজনের নিভৃত আলোচনা। আলোচনা করিয়া চিত্তরঞ্জন এক লক্ষ টাকা দানের পাকা কথা আদায় করিয়া আনিলেন। তাঁহার সারা বুকে তখন আনন্দ আর ধরে না।

পরের দিনই পান্তির মাঠে প্রায় পনের হাজার লোকের সমাবেশ। সেই বিশাল সভায় সুবোধ মল্লিক যে National School-এর জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিবেন উহা ঘোষণা করা হইল এবং ঐ দানের জন্যই মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা সুবোধ মল্লিককে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন।

এদিকে অরবিন্দ মাসিক হাজার টাকা বেতনের চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া মাসিক মাত্র পচাত্তর টাকা বেতনের শিক্ষকতা গ্রহণ করিতে ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। অরবিন্দের এমন স্বার্থত্যাগ সেদিন চিত্তরঞ্জনকে অরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই অরবিন্দ সর্বদাই তাঁহার মনে মনে থাকিতেন। পরবর্তী সময়ে অরবিন্দ যখন ন্যাশানাল কলেজের চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া জাতীয়তাবাদীদলের মুখপত্র 'বন্দেমাতরম্' কাগজের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন তখন চিত্তরঞ্জন প্রায়ই 'বন্দেমাতরম্' অফিসে উপস্থিত হইয়া অরবিন্দের সংগে দেখা করিতেন। বন্দেমাতরম্-এর অফিস ছিল ক্রীক্ রো-তে।

দেখা গিয়াছে, গুণীর আদর ও উপযুক্ত মর্যাদা দান করিতে চিত্তরঞ্জন কখনই কার্পণ্য করেন নাই। তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কেও আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। যে কারণে তিনি উহা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন সে ঘটনাটি এই: স্বদেশী আন্দোলনের প্রচণ্ড তরঙ্গমালা তখন ইংলণ্ডের তটভূমিতে আঘাতের পর আঘাত হানিয়া চলিয়াছে। এই আন্দোলনকে প্রশমিত করিবার জন্য ইংলণ্ডেশ্বর বাংলাদেশকে ভাগ না করিবার এক ঘোষণা করিলেন। ইহাতে আন্দোলনকারীদের মনোবাসনা পূর্ণ হইয়া তাহারা জয়যুক্ত হইলেন ঠিক কিন্তু ইংরাজের রাজনৈতিক দাবার ঘুঁটি অচল অবস্থায় রহিল না। বাহ্যতঃ বাঙালীকে জয়ী করিয়া ভিতরে ভিতরে বাংলা ও বাঙালীকে ধ্বংস করিবার এক নির্মম চক্রান্ত উহার মধ্যে নিহিত রাখা হইল। ঘোষণায় ইহাও বিঘোষিত হইল যে, ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত করা হইল উপরন্তু বাংলার ক্রোড় হইতে বিহার এবং উড়িষ্যাকে ছেদ্ করিয়া ভিন্ন প্রদেশ গঠন করা হইল। এই অঙ্গচ্ছেদের

জন্য অর্থনৈতিক দিক হইতে বাংলার যে কতখানি ক্ষতি হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয় কারণ খনি প্রধান অনেকগুলি অঞ্চল বাংলার বাহিরে চলিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সভ্যতার উপরেও চরম আঘাত হানা হইল।

এই রাজধানী স্থানান্তরের ব্যাপারে সেদিন বাংলার আর কোন নেতৃবৃন্দের তেমন কোন প্রতিবাদের কণ্ঠ গুরু-গম্ভীরভাবে গর্জিয়া ওঠে নাই শুধু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছাড়া। ১৯১২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণের সভায় (১৯১১ সালে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়।) তিনি বলিয়াছিলেন, "Bengal has been for more than a century the leading province of India ; Calcutta has been the Capital in name no less than in fact, of a great empire ; and now these high distinctions are all at once passing away from us. Calcutta, Bengal are discrowned and cannot he!p feeling dissolate."

'কন্‌ভোকেশন্ স্পীচ' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জন উহা পাঠ করিয়া তাঁহার মনের ম ত একজন মানুষ পাইয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত খুশী ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই আনন্দ ও খুশীর অভিব্যক্তি স্বরূপ তিনি স্যার আশুতোষকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইয়া একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। উহাতে লিখিয়াছিলেন, "Let me frankly state that you have boldly and adequately given expression to the grievous bereavement that lives heavy on our minds due to the transfer of the Capital from Calcutta to Delhi."

১৯০৬ সালে বরিশালে এক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্ম-বান্ধব, অরবিন্দ, বিপিন পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চিত্তরঞ্জন এই কনফারেন্সে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহার এক বৎসর পরেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহা অনুষ্ঠিত হয় কলিকাতায়। চিত্তরঞ্জন একশত টাকা চাঁদা দিয়া উহার অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু মতানৈক্যের সৃষ্টি হইল সভাপতি নির্বাচন পর্বকে কেন্দ্র করিয়া। নরমপন্থীগণ বৃদ্ধ দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতি করিতে চাহিলেন। চিত্তরঞ্জন

সভাপতি পদে চাহিয়াছিলেন লোকমান্য তিলককে। এই লইয়া দুই দলে মতবিরোধ। এই বিরোধের মূলে চিত্তরঞ্জন রহিয়াছেন জানিয়া মডারেটগণের নেতা সুরেন্দ্রনাথ অসন্তুষ্ট হইয়া চিত্তরঞ্জন ও তাঁহার অনুগামীগণকে সদস্যপদ হইতে নাম কাটিয়া দিয়াছিলেন, এবং দাদাভাই নৌরজীকেই সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। দুঃখিত হইয়া অধিবেশন চলা কালীন সময়ে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া পুরুলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন এবং অধিবেশন শেষ হইলে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। লোকমান্য তিলক, ডাঃ মুঞ্জে এবং খাপার্দে প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতাগণ তখন চিত্তরঞ্জনের রসা রোডের বাড়ীতে অতিথি।

এর পর ১৯০৬ সালের ১৬ই অক্টোবর চিত্তরঞ্জনের জীবনে একটা উল্লেখ যোগ্য দিন। বঙ্গ বিভাগ তখন সরকারীভাবে অনুমোদিত হইয়াছে। ইহার প্রতিবাদে দার্জিলিংয়ের হিন্দু হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। চিত্তরঞ্জন সে সময়ে দুর্গোৎসবের ছুটী উপলক্ষে দার্জিলিংয়ে বিশ্রামের জন্য গিয়াছিলেন। যোগাযোগটি ছিল সুন্দর। সে সময়ে ভগিনী নিবেদিতাও দার্জিলিং-এ উপস্থিত ছিলেন। চিত্তরঞ্জন ও নিবেদিতা উভয়েই সেই সভায় উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া দেশ-প্রেমের যে পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন তাহার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হইল: "আমাদের দেশে আজকাল অল্পসংখ্যক অতি বিজ্ঞ লোকের মত ছাড়িয়া দিলে প্রায় সকলেই মনে করেন যে এই নূতন জীবন সঞ্চার যাহাকে আমাদের সংবাদপত্র সকল স্বদেশী আন্দোলন নামে অভিহিত করিয়াছেন--ইহাই অচিরে আমাদের এই অধঃপতিত দেশের মুক্তির একমাত্র কারণ হইয়া উঠিবে। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী দারিদ্র্য বিনাশ করতে হইলে এই স্বদেশী আন্দোলনই একমাত্র উপায় এবং সেই কারণেই এই আন্দোলন অবশ্য বাঞ্ছনীয়। এই কথা আজকাল আমাদের দেশের অনেক কথার মত একেবারে মিথ্যা না হইলেও সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে। জাতীয় দারিদ্র্য সমস্ত জাতীয় অধঃপতনের অঙ্গমাত্র, সমস্ত জাতীয় অধঃপতনের সঙ্গে ইহার একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে, এবং এ কথা অতি সত্য যে, সমস্ত জাতির উন্নতি না হইলে এ দারিদ্র্য কিছুতেই ঘুচিবে না; কিন্তু এই যে নবজীবন সঞ্চারিণী আশা—যাহা আমাদের সমস্ত দেশটাকে সচকিত করিয়া

তুলিয়াছে, ইহা কি একমাত্র দারিদ্র্য বিনাশের কারণ? ইহার মধ্যে কি গভীরতর সত্য নিহিত নাই? ইহা কি আমাদের চক্ষে আঙুল দিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতেছে না? ইহা কি সমস্ত বাঙালী জাতির শ্রবণ-বিবরে এক আশ্চর্য অপূর্ব স্বাধীনতা-সঙ্গীত ঢালিয়া দিতেছে না?

আমার কাছে এই নব আন্দোলন যে যে কারণে সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ এই যে ইহা ফলত ও মূলত বাঙালী জাতির আত্মনির্ভর পথে প্রথম পদক্ষেপ। এই কারণেই আমার ধ্রুব ধারণা যে, এই আন্দোলনের সফলতার উপরেই আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা নির্ভর করিতেছে। জগতের ইতিহাস বার বার প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, একজাতিকে অন্যজাতি হাতে ধরিয়া স্বাধীনতা তুলিয়া দিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন আপনার মুক্তি আপনাকেই সাধন করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জাতির মুক্তিও সেই জাতিকে সাধন করিয়া লইতে হইবে। সহস্র বৎসর ধরিয়া অন্যজাতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলেও প্রকৃত মুক্তির পথ কখনও মিলিবে না।

আমরা এতদিন ধরিয়া ইংরাজের মুখাপেক্ষা হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম ইংরাজ আমাদের সকল দৈন্য ঘুচাইবে। ইংরাজ আমাদিগের সকল লজ্জা নিবারণ করিবে এবং আমাদিগকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়া তুলিবে। এখন সে কথা যদিও স্বপ্নের মত মনে হয়, কিন্তু ইহা অবশ্য সত্য যে, একদিন আমরা ইংরাজের বাক্‌চাতুরীতে মুগ্ধ হইয়া শুধু মাত্র তাহার মুখের কথার উপরে আমাদের সকল আশা-ভরসার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলাম। তাহার যথাযথ কারণও ছিল। ইংরাজ যখন প্রথম আমাদের দেশে আসে তখন নানা কারণে আমাদের জাতীয় জীবন দুর্বলতার আধার হইয়াছিল। তখন আমাদের ধর্ম একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে চিরপুরাতন চিরশক্তির আকর সনাতন হিন্দু ধর্ম কেবল মাত্র মৌখিকযন্ত্রের আবৃত্তি ও আড়ম্বরের মধ্যে আপনার শিব-শক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। অপর দিকে যে অপূর্ব প্রেম ধর্মবলি মহাত্মা চৈতন্য সমস্ত বাঙলা দেশকে জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রেমধর্মের অনন্ত মহিমা ও প্রাণ-সঞ্চারিণী শক্তি কেবলমাত্র মালা ঠেকাইতে নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছিল; আর আমাদের সমগ্র ধর্মক্ষেত্র শক্তিহীন শক্তি ও প্রেমশূন্য বৈষ্ণবের ধর্মশূন্য-কলহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখন নবদ্বীপের চিরকীর্তিময়

জ্ঞান গৌরব কেবলমাত্র ইতিহাসের কথা—অতীত কাহিনী; বাঙালীর জীবনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। এইরূপে কি ধর্ম কি জ্ঞানে বাঙালী তখন সর্ববিষয়ে প্রাণহীন মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি বাঙালীর বল বীর্য পর্যন্ত তখন নিতান্ত কৃতঘ্নের মত সমস্ত বাঙালী জাতির গলদেশে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা চালাইতে ব্যস্ত ছিল।

এমন সময়ে সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ইংরাজ বণিকবেশে আগমন করিয়া আমাদেরই জাতীয় দুর্বলতাকে আশ্রয় করিয়া দুই একদিনের মধ্যেই রাজত্ব স্থাপন পূর্বক আপনার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দান করিল। আমরা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম এবং আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্বলতা নিবন্ধন আমরা শুধু ইংরাজের রাজত্বকে নয়, সমগ্র ইংরাজ জাতিকে ও তাহাদের সভ্যতা ও তাহাদের বিলাসকে দুই হাতে আকড়িয়া ধরিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের সেই দুর্বলতার জন্যই বোধহয় আমাদের চক্ষু ইংরাজী সভ্যতার সেই প্রখর আলোকে সংযতভাবে ধারণ করিতে পারে নাই। আমরা একেবারে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। অন্ধকারাক্রান্ত দিগভ্রান্ত পথিক যেমন বিস্ময় ও মোহবশত আপনার পদপ্রান্তস্থিত সুপথকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া বহুদূর দুর্গম পথকে সহজ ও সন্নিকট মনে করিয়া সেই পথেই অগ্রসর হয়, আমরাও ঠিক সেইরূপ নিজের ধর্ম কর্ম সকলই অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নিজের শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া আমাদের নিজের সাহিত্যের প্রতি একেবারে দৃকপাত না করিয়া, আমাদের নিজের ইতিহাসের ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে অসংযতভাবে ধাবমান হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম ইংরাজের রাজনৈতিক সাহিত্যের সহিত আমাদের জাতীয় সাহিত্যের কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। আমরা মোহমুগ্ধ হইয়া একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, ইংরাজের ইতিহাস ইংরাজের জাতীয় জীবনের প্রতিমা আমাদের নহে; ইংরাজের সাহিত্য ইংরাজেরই জাতীয় জীবন পুষ্ট করিতে পারে। তাহার সহিত আমাদের জাতীয় জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই; ইংরাজের ঐশ্বর্য বৃদ্ধিতে আমাদের মাতার দৈন্য কিছুতেই ঘুচে না ও ইংরাজের গৌরবে আমাদের লজ্জা কিছুতেই নিবারণ হয় না; ইহা অতি সোজা কথা—অত্যন্ত সরল কথা। কিন্তু সমস্ত জাতীয় জীবন দুর্দশাগ্রস্ত হইলে বোধহয় এমনই করিয়া

অতিশয় সরল সত্য অত্যন্ত দুর্বোধ হইয়া ওঠে। এমন করিয়া ক্রমে ক্রমে আমরা ইংরাজের ক্ষমতা দেখিয়া আত্মজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলাম।

আর আমরা ভুলিয়াছিলাম ইংরাজের Pax Britanica ইংরাজ রাজনীতি হইতে উৎপন্ন এক অভিনব অনির্বচনীয় মহাশান্তি। এই মহাশান্তির প্রসাদে আমরা গ্রামে গ্রামে গোয়েন্দারূপী পঞ্চায়েত বেষ্টিত, সহরে সহরে অতি ধীর শান্ত বহু শিষ্টাচারসম্পন্ন লাল পাগড়ীওয়ালার কোমল করুণ রুলের স্পর্শে সর্বদাই শান্তিরসে নিমগ্ন, জেলায় জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেটের দল আমাদে শান্তির উপায় অন্বেষণ করিতে সদা সর্বদা ব্যস্ত হইয়া চাবুক হস্তে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং ডিভিসনে ডিভিসন কমিশনারবৃন্দ এই অদ্ভুত শান্তি পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বেড়াইতেছেন আর রাজধানীতে কখনও বা শৈলশৃঙ্গে ইহাদের হর্তা-কর্তা বিধাতা অতিশয় শ্রম-শ্রান্ত ও ভাবনা-ক্লান্ত ঘর্মাক্ত কলেবর আমাদের ছোটলাট বাহাদুর দ্বিতীয় নেপোলিয়ানের ন্যায় নৃত্য সভায় পর্যন্ত সঙ্গীতের তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে কি করিয়া যে এই বাঙালী জাতির শিরায় শিরায় এই মহাশান্তির অহিফেন প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে সেই ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া সারা হইতেছেন। হায়রে ব্রিটিশ রাজ্যের শান্তি, হায় আমরা অভাগা!

আজ ভগবৎ প্রসাদে আমাদের জাতীয় জীবন হইতে মরণচ্ছায়ারূপী এই মহামায়া কুহেলিকা অপসৃত হইয়া গিয়াছে। এই নবোন্মেষিত জাতীয়ত্বের প্রভাতালোকে আমাদের জাতীয় জীবনের সত্য অবস্থা আমাদের চক্ষুর সম্মুখে সুন্দর—পরিষ্কার রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজ আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্তের দপ্তর বর্ণিত শীর্ণকায় কুকুরের মত শুধু করুণ নেত্রে ও প্রার্থনাপূর্ণ দৃষ্টিতে ইংরাজের পানে শত সহস্র বৎসর ধরিয়া চাহিয়া থাকিলেও ইংরাজ তাহার পাতের মাছের কাঁটাখানি উত্তমরূপে চুষিয়া আমাদের মুখের কাছে ফেলিয়া দিতে পারে, কিন্তু যাহাতে আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, যাহাতে আমাদের জাতীয় জীবন পুষ্ট হয় এমন কিছুই দিবে না। আজ বিধাতা আমাদিগকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, আপনার চরণে ভর করিয়া আপনি না দাঁড়াইতে পারিলে কোনদিন আমাদের মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে না।"

চিত্তরঞ্জন তখনও প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন নাই। তবুও

দেশবাসীর পক্ষে হাই অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে তিনি ইংরাজ রাজত্ব সম্বন্ধে এবং বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষকে নিয়ে যাহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন দার্জিলিংয়ের ঐ হিন্দুহলে তাহা দেশবাসীব কর্ণগোচর করিবার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

হিন্দুহলের এই মহাসভায় নিবেদিতাও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভারত প্রেমিকা নিবেদিতা। বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পর অরবিন্দের সংগে নিবেদিতার পরিচয় হব। অরবিন্দ তখন বরোদায। সেখানেই নিবেদিতা অরবিন্দের মুখে চিত্তরঞ্জনেব সম্বন্ধে অনেক সুখ্যাতি শুনিযাছিলেন। কলিকাতা আসিয়া তাই নিবেদিতা রসা রোডের বাডীতে চিত্তরঞ্জনের সংগে পরিচিত হইয়া চিত্তরঞ্জনের মধ্যে একটা সত্যিকারেব দেশভক্ত সেবকের মন দেখিতে পান। অরবিন্দের মুখে শুনিয়া চিত্তবঞ্জনের উপব যে শ্রদ্ধা তাঁহার মনে জন্মিযাছিল, সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয হওযাব পব নিবেদিতার শ্রদ্ধার ডালি আরো কানায কানায পবিপূর্ণ হইযা ওঠে। ইহার পর আলিপুর বোমার কেসের সময় চিত্তরঞ্জন যখন বিনা পারিশ্রমিকে অরবিন্দের কৌসুলী-রূপে দাঁডাইযাছিলেন, নিবেদিতা তখন অনেকের নিকট ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দার্জিলিংয়েব এক রাস্তায় চিত্তবঞ্জনের সংগে হঠাৎ নিবেদিতার সাক্ষাৎ হইলে নিবেদিতা তাহার হাতের রক্ত-গোলাপটি চিত্তরঞ্জনের সার্টের উপব আঁটিয়া দিযা বলিয়াছিলেন, "I know you to be great, but I did not know that you were so great."

দেশবন্ধুও আবার ভারতপ্রেমিক নিবেদিতার প্রশংসায় মুখরিত হইয়া তাঁহার অনেক বন্ধুর কাছে বলিয়াছিলেন, "Nivedita was truly a great soul. Miss Noble was really a roble woman."

নিবেদিতা ছাডাও চিত্তবঞ্জনের রাজনৈতিক জীবনে যে তিনজন দেশভক্ত সন্তান তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছেন তাহারা হইতেছেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র পাল এবং অরবিন্দ। বিপিন পাল ছিলেন বিখ্যাত বাগ্মী, অতি ধীর এবং রাজনীতিতে দার্শনিক ভাবাপন্ন। শ্যামসুন্দব ছিলেন মহান, তিনি ছিলেন উদার, আর অরবিন্দ ছিলেন ধর্মপ্রাণ, ভারতের নিজস্বধর্মে বিশ্বাসী,—বিপ্লবী। কিন্তু দেশ-সেবার ব্রতে তাঁহারা একই মঞ্চে অবতীর্ণ। ইহাদের সমস্ত গুণরাজির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবে চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক জীবন পরিপুষ্ট। অবশ্য ইহা

অনস্বীকার্য যে দেশবন্ধুর মনীষা, উজ্জ্বল প্রতিভা, বিরাট ব্যক্তিত্ব উহা তাঁহার নিজস্ব,- উহা তাঁহার উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ রূপে বর্ষিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ১৯০৬ সালের কলিকাতা কন্‌ফারেন্স হইতে তিনি ব্যথিত মন নিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। অথচ বিলাতে ছাত্রাবস্থায় তিনি দাদাভাই নৌরজীর গুণগ্রাহী ও একান্ত ভক্ত ছিলেন, সেই তিনিই কলিকাতায় নৌরজীকে সভাপতি করিবার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। অদৃষ্টের পরিহাস! অত্যন্ত বেদনাভরা মন নিয়াই তিনি এই নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

ইহার পরবর্তী বৎসর মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নরমপন্থীদল এবং চরমপন্থীদলের মধ্যে বিরোধের মাত্রা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং উহা এমন স্তরে গিয়া পৌছিয়াছিল যে মেদিনীপুর সম্মিলন আহ্বান করাই বৃথা হইল,--সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইতে পারিল না।

ফলে এই মতবিরোধ এবং মনোমালিন্য চলিতে থাকিলে এবং সুরাট কংগ্রেসের পরবর্তী সময়ে কংগ্রেসের এই নরম ও চরমপন্থীদের বিরোধ আরও প্রকটতর আকার ধারণ করে। এই পরিস্থিতির জন্য মনোবেদনায় চিত্তরঞ্জন দীর্ঘদিন কংগ্রেস রাজনীতি হইতে দূরে সরিয়া ছিলেন। সে-সময়টাও কম নহে,—বলা যায় প্রায় এক যুগ। এই অনুপস্থিতির জন্য বিরুদ্ধবাদীগণ চিত্তরঞ্জনকে দোষারোপ করিয়াছিলেন। তাহা করুক। তিনি এই দীর্ঘ সময়ে দ্বৈত জীবনের সাধনায় ব্যস্ত ছিলেন। একদিকে আইন ব্যবসা এবং অন্যদিকে আইনের নীরস পথকে রসে সিক্ত করিবার জন্য বাণীর আরাধনায় মগ্ন থাকিয়া কবিতা কুসুমে মালঞ্চ সাজাইয়াছিলেন। আইনজীবী জীবনেও তিনি তখন শীর্ষস্থানে। নজরুল ইসলাম লিখিয়াছেন:

"লক্ষ্মী দানিল সোনার পাপড়ি, বীণা দিল করে বাণী"

আদালতের অঙ্গনে তাঁহার যে জীবন-বীথি তাহার সব মুঞ্জরিত কলি তখন কৃতকার্যতার প্রস্ফুটিত-কুসুমে পরিণত। তিনি কবি চিত্তরঞ্জন আর ব্যারিস্টার মিঃ সি. আর. দাশ।

এদিকে কংগ্রেসের পটভূমিকার দিকে একটু দৃষ্টিপাত করা দরকার। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের অন্যতম গঙ্গাধর তিলককে ১৯০৮ সালে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ইংরেজ-রাজের আদালতের রায় অনুসারে তাঁহার

জেল হয়। তিলক তাঁহার কারাজীবনের দিনগুলি মান্দালয় জেলের অন্তরালে অতিবাহিত করেন। অরবিন্দও তাঁহার জেল জীবনের অবসানে কারামুক্ত হইয়া রাজনীতি-ক্ষেত্রে আর প্রত্যাবর্তন করিলেন না। ধার্মিক বিপ্লবী অরবিন্দ। তিনি তাঁহার মনকে একমুখী করিয়া যোগসাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। নরমপন্থী সুরেন্দ্রনাথ, ব্যবহারে অত্যন্ত বিনম্র হইয়া ইংরাজের দিকেই অধিকতর ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং চিত্তরঞ্জনের সহমর্মী ও সহকর্মী হইয়াও বিপিন পাল অত্যন্ত নরমপন্থী হইয়া পড়িলেন। বিদেশী হইয়াও যিনি খাঁটি ভারতীয় রূপে ভারতের জন্যে মন-প্রাণ নিবেদন করিয়াছিলেন সেই বিপ্লবী বীরাঙ্গনা নিবেদিতার জীবন-দীপ সেই সময়েই নির্বাপিত হইয়াছিল। তদুপরি বাংলার বিপ্লবী, বিদ্রোহী, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যোদ্ধাগণ তখন একের পর এক কারাগারে নিক্ষেপিত হইয়া কারাগার পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ তখন অভিনেতার অনুপস্থিতিতে প্রায় শূন্য।

এই শূন্যতাই আবার পরিপূর্ণতার জন্য মানুষের মনের গভীরে আসিয়া আঘাত হানিল। নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধ এবং মতদ্বৈধ ছিল বটে কিন্তু সেই মতদ্বৈধের জন্য বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চ শূন্য হইয়া খাঁ-খাঁ করিবে ইহা কোন নেতার পক্ষেই অভিপ্রেত ছিল না। তাহাদের মত বিরোধ ছিল কিন্তু প্রত্যেকে প্রত্যেকের মূল্য বুঝিতেন। বুঝিতেন বলিয়াই দুই বিরুদ্ধবাদী নেতার মিলন সম্ভবপর হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ অগ্রণী হইয়া আসিলেন তখন ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাস। ভবানীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মিলন সেই বৎসর অনুষ্ঠিত হয়। চিত্তরঞ্জনকে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবার জন্য অনুরোধ জানান হইল এবং তিনিও সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। এই সম্মিলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথের অবদান যথেষ্ট। তিনি নিজে চিত্তরঞ্জনকে মঞ্চে নিয়া গিয়া দেশবাসীর কাছে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানাইয়া দেন।

এই সম্মিলন বাংলার রাজনৈতিক অভিধানে ভবানীপুর সম্মিলন নামে অভিহিত। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সূক্ষ্ম বিচারে ইহাই প্রমাণিত হইল যে ইহা চিত্তরঞ্জনের এক বিরাট জয়। হয়তো এই জয়ের আনন্দে তাঁহার পূর্বের সব ব্যথার কাঁটা গোলাপ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আর প্রকৃত পক্ষেও বলা যায়, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মিলনীর এই সভায় সভাপতিত্ব করিতে গিয়া

চিত্তরঞ্জনের যেন পাকাপাকি ভাবে রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করিবার উৎসবের মধ্যে দিয়া তাঁহার অভিষেক অনুষ্ঠিত হইল। ইউরোপের আকাশে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটা। বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও নিরবচ্ছিন্ন নহে,—চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে মতবিরোধ,—সুতরাং সেই পরিস্থিতিতে এই সভার গুরুত্ব ছিল অনেক। ব্যক্তিগত চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক জীবনে এবং বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেও।

ইহা ছাড়া এই সভার গুরুত্বের আরও কারণ ছিল। প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণ লইয়া তখন সরকার চুল-চেরা বিচার করিত এবং এই সভাপতির ভাষণের মূলকথা গ্রহণ করিয়াই ভারতীয় কংগ্রেসের মূলনীতি নির্ধারিত হইত। এই কারণেই প্রদেশস্থ সরকার প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মিলনীর দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিত। ১৯১৭ সালের এই এপ্রিলের সম্মিলনীর উপরও কড়া নজর রাখা হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জন খাঁটি বাঙালী। বাংলাভাষাতেই তিনি তাঁহার ভাষণ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার এই মূল ভাষণকে ইংরাজীতে অনূদিত করিবার জন্য এক বন্ধুর উপর ভার দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা লইয়া সরকারের দিক হইতে এক বিপদের কালো ছায়া ঘনাইয়া আসিল। সম্মিলনীর পূর্ব দিন পুলিশ-কমিশনার সাহেব ঐ অনুবাদককে লালবাজারে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সংবাদটি চিত্তরঞ্জনের কানে পৌঁছাইতে বিলম্ব হইল না। তিনি তখন অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং গভীর চিন্তা শেষে অনুবাদকের কথা চিন্তা করিয়াই তাঁহার মূল ভাষণের (যাহার ইংরাজী অনুবাদ করিতে দেওয়া হইয়াছিল) একটি কথাও বাদ না দিয়া উহা সম্পূর্ণটাই সভাপতির ভাষণ হিসাবে পাঠ করিলেন।

রাজনৈতিক পটভূমিকায় চিত্তরঞ্জনের এই ঐতিহাসিক ভাষণটার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'বাংলার কথা'। পূর্বে ভাষণ দেওয়া হইত ইংরাজীতে,—সম্মিলনীর নামও বলা হইত ইংরাজীতেই 'Provincial Conference'। তখন হইতেই সে রীতির পরিবর্তন হইল। সভাপতির ভাষণ বাংলায় এবং সত্য সত্যই বাংলার কথাই। তাহা ছাড়া ভাষণে চিত্তরঞ্জনের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বচ্ছ একটা প্রতিচ্ছবিও উহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।—আর যেন ভাষণটার সর্বাঙ্গ জুড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের

বঙ্গদর্শনের যাহা সত্য তাহা সবই যেন নূতনরূপে মূর্তি ধরিয়া চিত্তরঞ্জনের ভাষণের মাধ্যমে আসিয়া আবার উপস্থিত হইল। ভাষণটিতে ছিল কংগ্রেসের মাধ্যমে দেশকে লইয়া, জাতিকে লইয়া চিত্তরঞ্জনের যে ইচ্ছা তাহার একটি সুষ্ঠুরূপ,—তাঁহার দেশ-গঠন এবং জাতিগঠনের আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রকাশ।

চিত্তরঞ্জনের সেই ভাষণটি উদ্ধৃত করিবার পূর্বে তাঁহার ভাষণটিকে কেন্দ্র করিয়া যে মুখরিত আলোচনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার একটু উল্লেখ এখানে করা হইতেছে। আলোচনা করিয়াছেন রোণাল্ডশে। লর্ড রোণাল্ডশে তাঁহার 'The heart of Aryabarta' পুস্তকে চিত্তরঞ্জনের এই সভাপতির ভাষণকে কেন্দ্র করিয়াই একটি অধ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অভিভাষণের সর্বাংশের সহিত রোণাল্ডশে একমত হইয়া দেশবন্ধুকে সমর্থন জানাইতে পারেন নাই সত্য তথাপি চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক অভিমত এবং চিন্তাধারাকে তিনি যে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন তাহা যথার্থই চিন্তার বিষয়।

অথচ এদিকে আবার আশ্চর্যের বিষয় এই যে প্রদীপের নীচেই অন্ধকার বা বলা যায় 'গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না'। সুরেন্দ্রনাথ,—যাঁহার প্রচেষ্টায় এই প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মিলন অনুষ্ঠিত, তিনি তাঁহার 'A Nation in Making' গ্রন্থে চিত্তরঞ্জনের এই ভাষণের কথা আলোচনা করা দূরে থাক চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধেও উদার মনের পরিচয় প্রদান করেন নাই। সেখানে তিনি তাঁহার মডারেটদের কথাই আলোচনায় মুখর হইয়া বিরুদ্ধবাদী শ্যামসুন্দর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, তিলক বা বাগ্মী বিপিন পাল সম্বন্ধেও উদার নীতি গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। তিনি সেখানে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে দলের অতলে ডুবাইয়া দিয়াছেন।

কিন্তু নারায়ণের যিনি সেবা করেন, নারায়ণের কৃপায় তাঁহার শিলা জলে ভাসে। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে উদার মনের পরিচয় দিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ না হইলেও তখন চিত্তরঞ্জন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, তিনি বাংলার নেতা,—বাঙালীর পথ প্রদর্শক। এই পথের সন্ধানই তাঁহার 'বাংলার কথা' নামক ভাষণে তিনি দিয়াছেন।

তিনি বলিলেন, "আজ বাঙালীর মহাসভায় আমি বাংলার কথা বলিতে আসিয়াছি। দেশের নায়ক হইবার অধিকারের যে অহংকার তাহা আমার নাই। কিন্তু আমার বাংলাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভাল-

বাসিয়াছি। যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য, সকল অযোগ্যতা, অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার বাংলার যে মূর্তি, তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানস-মন্দিরে সেই মোহিনীমূর্তি আরো জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। যে সত্য আমার হৃদয়ে জ্বলিতেছে, যাহাকে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে হইলে যে পাটোয়ারী বুদ্ধির আবশ্যক তাহা আমার নাই আর নাই বলিয়া তার জন্য কোন অনুতাপও হয় না। তাই আজ যে কথাগুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি. সেই কথাগুলি প্রিয়ই হউব আর অপ্রিয়ই হউক, অম্লান বদনে অকুণ্ঠিত চিত্তে আপনাদের কাছে নিবেদন করিব।

আমি যে আপনাকে বাঙালী বলিতে একটা অনির্বচনীয় গর্ব অনুভব করি, বাঙালীর যে একটা নিজের সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, কর্ম আছে, ধর্ম আছে. বীরত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে। বাঙালীকে যে অমানুষ বলে, সে আমার বাংলাকে জানে না।

বঙ্কিম সর্ব প্রথমে বাংলার মূর্তি গড়িলেন। বঙ্গজননী দর্শন করিলেন। সেই 'সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম্' তাহারই গান গাহিলেন। সবাইকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ, দেখ এই আমাদের মা, বরণ করিয়া ঘরে তোল'। কিন্তু আমরা তো সে মূর্তি দেখিলাম না, সে গান শুনিলাম না। তাই বঙ্কিম আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন. 'আমি একা মা, মা, বলিয়া রোদন করিতেছি'।

সাধক যাহার সাধনা করেন তাহার কাছে সেই মূর্তি অতি প্রিয় এবং পবিত্র। চিত্তরঞ্জন বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলাকেই নিজের মনের মন্দিরে স্থাপন করিয়া পূজা করিয়া চলিয়াছিলেন। তাই তিনি তাহার ভাষণে বলিতে লাগিলেন, "বাঙলার যে জীবন্ত প্রাণ তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের ভক্তি সবই যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল, ইহা প্রভুর জীবন গৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল। জ্ঞানদাসের গান, গোবিন্দদাসের গান, লোচনদাসের গান, সবই যেন একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের ধ্বনি প্রাণের মধ্যে জাগিতে লাগিল। রামপ্রসাদের সাধন সঙ্গীতে আমরা মজিলাম। বুঝিলাম রামমোহনের তপস্যার নিগূঢ় অর্থ কি? বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্তি সেই:

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
তংহি প্রাণা শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

সেই মাকে দেখিলাম চিনিলাম। বঙ্কিমের গান আমাদের "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।" বুঝিলাম রামকৃষ্ণের সাধনা কি—সিদ্ধি কোথায় —বুঝিলাম, কেশবচন্দ্র কেন তাহার ডাক শুনিয়া ধর্মের তর্করাজ্য ছাড়িয়া মর্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম, বাঙালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রীষ্টান হউক, বাঙালী বাঙালী। বাঙালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে।"

* * * *

"প্রথমেই হয়ত অনেকেরই মনে হইবে যে, এই মহাসভা শুধু রাজনৈতিক আলোচনার জন্য, এই সভায় বাংলার কথার আবশ্যক কি? এই প্রশ্নই আমাদের ব্যাধির একটি লক্ষণ। সমগ্র জীবনটাকে টুকরো টুকরো করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া আমাদের শিক্ষা দীক্ষা ও সাধনের স্বভাববিরুদ্ধ। আমরা ইউরোপ হইতে ধার করিয়া এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি এবং ধার করা জিনিস ভাল করিয়া বুঝি নাই বলিয়া আমাদের অনেক পরিশ্রম, অনেক চেষ্টাকে সার্থক করিতে পারি নাই। যে জিনিসটাকে রাজনীতি বা Politics বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহার সঙ্গে কি সমস্ত বাংলা দেশের সমগ্র বাঙালী জাতির একটা সর্বাঙ্গীণ সম্বন্ধ নাই? কেহ কি আমাকে বলিয়া দিতে পারে আমাদের জাতীয় জীবনের কোন্ অংশটা রাজনীতির বিষয়, কোন্ অংশটা অর্থনীতির ভিত্তি, কোন্ অংশটা সমাজনীতির প্রাণ, আর কোন্ অংশটা ধর্ম সাধনের বস্তু? জীবনটাকে মনে মনে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া, এই সব মনগড়া জীবনখণ্ডের মধ্যে কি আমরা অলক্ষ্যে প্রাচীর তুলিয়া দিব? এই কাল্পনিক প্রাচীর বেষ্টিত যে কাল্পনিক জীবন খণ্ড ইহারই মধ্যে কি আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা আন্দোলনের যে বিষয়। তাহাকে কি বাঙালী জাতির যে জীবন, সেই জীবনের সব দিক্ দিয়া কি দেখিতে চেষ্টা করিব না? যদি

না দেখি, তবে কি সত্যের সন্ধান পাইব ?···বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের অর্থ এই যে, আমাদের দেশে রাজা-প্রজায় যে সম্বন্ধ, তাহা পরীক্ষা করা ও কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাই বিচার করা।"

* * * *

আমাদের যে রাজনৈতিক আন্দোলন, ইহা একটা প্রাণহীন, বস্তুহীন, অলীক ব্যাপার। ইহাকে সত্য করিয়া গড়িতে হইলে বাংলার সব দিক দিয়াই দেখিতে হইবে। বাংলার যে প্রাণ, তাহারই উপর ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাই আজ এই মহাসভায় কয়টি বাংলার কথা বলিতে আসিয়াছি।···

বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি বাঙলা। সেই সৃষ্টিস্রোতের মধ্যে একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি অনন্তরূপ লীলাধরের রূপ বৈচিত্র্যে বাঙালী একটি বিশিষ্ট রূপ লইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাংলা সেই রূপের মূর্তি। আমার বাংলা সেই বিশিষ্ট রূপের প্রাণ। যখন জানিলাম মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন সেইরূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম, সে রূপ বিশিষ্ট, সে রূপ অনন্ত। তোমরা হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও কর, আমি সেই রূপের বালাই লইয়া মরি।"

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত

"ঐ যে মা ডাকিতেছেন—সাবধান· ঐ যে বাংলার কৃষক সমস্ত দিন বাংলার ক্ষেত্রে আপনার কাজ ও আমাদের কাজ শেষ করিয়া দিবা অবসানে ঘর্মাক্ত কলেবরে বাংলার কুটীরে কুটীরে বাংলার গান গাইতে গাইতে কুটীরে ফিরিতেছে। উহারা মুসলমান হউক, শূদ্র হউক, চণ্ডাল হউক উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ। অহঙ্কারী! মাথা নোয়াও, তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ! অবিশ্বাসী! তোমার শুষ্ক প্রাণে আবার বিশ্বাস জাগাও, জাগাও। তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ! ডাক! ডাক! সবাইকে ডাক। প্রাণের ডাক শুনিলে কেহ কি না আসিয়া থাকিতে পারে? ওঠ! জাগ! ডাক! আপনার কল্যাণকে জাগাও. বল এস ভাই, তুমি মুসলমান হও, খ্রীষ্টান হও, শূদ্র হও, চণ্ডাল হও তোমাকে আলিঙ্গন করি। এ যে আমার কাজ, এ যে তোমার কাজ, এ যে মায়ের কাজ। একবার তবে ডাকার মত ডাক, দেখিবে সকলেই আসিবে। দেখিবে সকলের কার্যই সার্থক হইবে। আমি আবার বলি, ওঠ, জাগ, ডাক। আপনার কল্যাণকে জাগাও।

"আমার স্বদেশবাসীর নিকট আমার প্রাণের নিবেদন এই যে, বাংলার কথা যেন অচিরে বাঙালীর কার্যে পরিণত হয়। সমবেত চেষ্টা চাই, সকলের উদ্যম চাই। বাঙালীর স্বার্থত্যাগ চাই। এই যে জীবন-যজ্ঞ, ইহা শুদ্ধ চিত্তে, পবিত্র প্রাণে আরম্ভ করিতে হইবে। ইহাতে বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিতে হইবে। ধর্মক্ষেত্রে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না। নিরাশ হইলে চলিবে না। যে অধিকার আজি আমরা দাবী করিতেছি তাহা যুক্তি সঙ্গত ন্যায় সঙ্গত আমাদের স্বভাব ধর্ম সঙ্গত, মানুষের স্বাভাবিক অধিকার সঙ্গত, আমাদের ধর্ম সঙ্গত, জগতের ধর্ম সঙ্গত। এই অধিকার হইতে আমাদের কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না। একবার এস আমরা সকলে সমস্বরে বলি,— চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের তাই চাই"। একবার এস হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সমস্বরে বলি, 'চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের তাহা চাই"। একবার এস ব্রাহ্মণ, বৈদ্য কায়স্থ, শূদ্র চণ্ডাল, সব একত্র হইয়া সমস্বরে বলি, "চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের তাহা চাই"। সকল প্রজা যখন এক হইয়া, আন্তরিক মিলনে মিলিত হইয়া বলে, 'চাই' জগতে এমন কোন রাজশক্তি নাই—যাহা সেই সমবেত আকাঙ্ক্ষার অপ্রতিহত বেগ রোধ করিতে পারে। এস ভাই খ্রীষ্টান, খ্রীষ্টের নামে প্রাণে প্রাণে বল "চাই"। এস ভাই মুসলমান এস ভাই হিন্দু তুমি নারায়ণের নামে প্রাণকে সাক্ষী রাখিয়া বল 'চাই' ঐ যে মা ডাকিতেছে—এস। এস, সবাই এস। সম্মুখে বিস্তৃত কার্য, এস, এস সবাই এস, বল ঈশ্বর। বল আল্লা। বল নারায়ণ, বল বন্দে মাতরম্"।

জাতির প্রতি অসীম ভালোবাসা না থাকিলে এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না। চিত্তরঞ্জন চাহিয়াছিলেন বাঙালী জাগুক। তাহার যে অধিকার আছে তাহা রক্ষা করুক।—তাহার সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, ধর্ম আছে এবং বীরত্ব রহিয়াছে,—সব কিছুর সমন্বয়ে বাঙালী জগতের মাঝে তাহার যে বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে সে-স্থানে সম্মানের সঙ্গে অধিষ্ঠিত হউক ইহাই ছিল তাঁহার কামনা। অপূর্ব আবেগ আর আবেদনে তিনি দেশের জনসাধারণের মনের পরিবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন।—চাহিয়াছেন বিদেশী সরকারকে তোষামোদ না করিয়া মানুষের মন দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠুক—যুবশক্তির

বৈদ্যুতিক শক্তি ধর্মে-কর্মে-জ্ঞানে-বিজ্ঞানে দেশের ও দশের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত হউক। বাঙালী জাতির প্রতি মন-প্রাণ উজাড় করা দরদ অপূর্ব ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করিতে করিতে তাঁহার মন প্রাচীন কালের দিকে ছুটিয়া গিয়াছে—সেই সুপ্রাচীন কালে আমাদের দেশের গতি-প্রকৃতি কেমন ছিল তাহাও তিনি নূতন করিয়া সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন: "আমাদের কৃষিকার্য হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় সামাজিক ব্যবহার পর্যন্ত আমাদের সকল ভাব ভাবনা সকল চেষ্টা ও সাধনার সঙ্গে আমাদের ধর্মের কি সম্বন্ধ ছিল ও আছে তাহার বিচার অবশ্য কর্তব্য। সেদিকে চোখ না রাখিলে সব দিকই যে অন্ধকার দেখিবে। সব প্রশ্নই যে অকারণে অস্বাভাবিকভাবে জটিল ও কঠিন হইয়া উঠিবে। সেই দিকে দৃষ্টি না রাখিলে কোন মীমাংসাই সম্ভবপর হইবে না।"

চিত্তরঞ্জনের দৃষ্টি সর্বদিকেই ছিল। তাঁহার মন ছিল উন্মুক্ত, দৃষ্টি ছিল প্রখর। সামাজিক ব্যবহার বলিতে তাহার অর্থ ছিল ব্যাপক: শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায়-জাগরণে এবং দৈনন্দিন জীবনের কর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও বাংলার সর্বাঙ্গীণ মূর্তি সব সময়ে তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া থাকিত। তাই তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের গ্রাম সমূহ ম্যালেরিয়ায় উৎসন্নে যাইতেছে। পল্লীসমাজ সভ্যতা সাধনার কেন্দ্রস্থল, এই কেন্দ্রস্থল যদি ব্যাধিদুষ্ট হইয়া তাহার সঞ্জীবনী শক্তি হারাইয়া ফেলে, তাহার ফলে সমস্ত জাতিটাই অক্ষম ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই অস্বাস্থ্যতা নিবন্ধন পল্লীগ্রাম ক্রমশঃই জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে, একদিকে ম্যালেরিয়া আতঙ্ক, আর একদিকে বড় বড় সহরে বিলাতী ব্যবসা-বাণিজ্যের লোভ মোহ, কাজেই বড় বড় সহরগুলো এক একটা বৃহৎ অজগর সর্পের মত গ্রামবাসীদের টানিয়া টানিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে, সুতরাং আমাদের প্রথম কার্য গ্রামের ও দেশের স্বাস্থ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু কেন আমাদের এই দুরবস্থা? পল্লীর স্বাস্থ্য হারান মানে মানুষের স্বাস্থ্য হারান। সেই স্বাস্থ্য সম্পদ হারাইয়া কেন আমাদের এই অধঃপতন। চিত্তরঞ্জন সে সম্বন্ধে আবার বলিয়া চলিয়াছেন: "হায় দুর্ভাগা বাঙালী! আমরা বণিকের যূপকাষ্ঠে আমাদের শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য সকলই বলি দিলাম। আমাদের ঘরে ঘরে চরকা ভাঙ্গিয়া গেল, আমাদের হস্তপদ ছিন্ন করিলাম, জীবন্ত অগ্নিতে সবই দাহ করিয়া দিলাম। আমাদের ঘরের লক্ষ্মীকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলাম। Industrialism ধীরে ধীরে চোরের মত

আমাদের গৃহে প্রবেশ করিল। আমরা যে অক্ষম, তাই দোষ কারো নয়, দোষ আমাদেরই, আমরা স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিলাম। অনাচারে, অশ্রদ্ধায়, শক্তিহীনতায়, ভক্তিহীনতায়, আমাদের গৃহধর্মকে, আমাদের স্বভাব-ধর্মকে বিসর্জন দিলাম।

কিন্তু সবই ত ছিল। আমার বাংলার ঘরে ধান ছিল, ঘরের গাই দুধ দিত, জলাশয় মাছ দিত, তৃণশ্যামশস্যক্ষেত্র, গোচারণ ভূমি ছিল, গাছের ফল ছিল, খড়ের ছাউনীর ঘর ছিল, সুনীল আকাশ ও সবুজ গাছের ও মাঠের পানে চাহিলে চোখ জুড়াইয়া যাইত। চাষা সারাদিনের পরিশ্রমের পর ঘর্মাক্ত কলেবরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা ঘরে মেঠোসুরে প্রাণের গান গাহিতে গাহিতে ফিরিয়া আসিত। বাঙলার পুকুরের জল তখন মিঠা ছিল। চাষা বৎসরের ছয় মাস তাহার পেটের জন্য খাটিত, তাহার ঘরে ধানের মরাই ছিল, বাকী ছয় মাস সে গৃহস্থালী করিয়া বাঙলার স্বভাব-ধর্ম সঙ্গত চিরকালের অভ্যাসবশত. নানাবিধ পণ্যদ্রব্য তৈয়ারী করিত। সেই পণ্যদ্রব্যই বিশ্বের হাটে-হাটে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিত। সে চাষা এখন নাই, সে গৃহস্থালী এখন নাই, সে গৃহধর্ম নাই, আর সে গৃহও এখন নাই। ঘরে চাল নাই, গরু দুধ দেয় না, তৃণশ্যাম ক্ষেত্র শুখ্না কাঠ হইয়া ফাটিতেছে, ঘরে সন্ধ্যাদীপ পড়ে না, দেবতা উপবাসী—সেবা হয় না, মেয়েরা—তুলসী তুলসী নারায়ণ তুমি তুলসী বৃন্দাবন—মাত্র বলিতে বলিতে তুলসী তলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়া আর ভক্তিভরে প্রণাম করে না - গৃহস্থ পেটের দায়ে হালের গরু বেচিয়া কোন রকমে খাইয়া বাঁচে। জলাশয় শুকাইয়া কাদা হইয়াছে, জলকষ্টে—বিশুদ্ধ জলের অভাবে নানা প্রকার ব্যাধি আসিয়া চাষার সে স্বাভাবিক স্ফূর্তি একেবারে নষ্ট করিয়াছে, তাহার যে সহজ সরল স্বাভাবিক জীবন ছিল তাহা হারাইয়া উৎকট ব্যাধি লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। যে সুখ তাহাদের ছিল তাহা আর নাই, নাগপাশ অস্থিতে, অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায় অবশ হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু কেন, দেশ আছে, দেশের আদর্শ চলিয়া গেল, জাতি আছে, জাতির প্রাণ, সঞ্জীবনী শক্তি ভাসিয়া গেল। সে গ্রাম নাই কেন? পল্লী নাই কেন? বাঙলার যে শত শত গ্রাম লইয়া সমাজ ছিল, সে সমাজ নাই কেন? খর্ব, নগ্ন, স্বাস্থ্যহীন, রুক্ষকেশ, কঙ্কালসার প্রাণীর দল ক্ষয়গ্রস্ত মরণাহত

পশুর মতন পানাপুকুরের ধারে পথে পড়িয়া ধুকিতেছে কেন? আর যে বাঙালীর মেয়ে আধপেটা খাইয়া লোক চক্ষুর অন্তরালে চোখের জল চোখে শুকাইতেছে, তাহার কথা ভাবি না কেন?

"হায়, সে কালে যখন গ্রামে গ্রামে দুর্গোৎসব হইত, পল্লীতে পল্লীতে বারমাসে তের পার্বণ ছিল, তখন সকল গৃহস্থ সকল গ্রাম কেমন এক পরিবার হইয়া উঠিত, সুখদুঃখে আনন্দ উল্লাস, উৎসব একসঙ্গে ভাল করিয়া উপভোগ করিতাম, এখন সে আনন্দ কই, সে উৎসব কই?

হায়, একটা প্রবল সভ্যতার সংঘাতে আমরা শক্তিহীন আরও দুর্বল শতছিন্ন হইয়া, নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছি। আহারে ব্যবহারে, আচারে বিচারে, ভাষায় ভাবে, ধর্মেকর্মে সমস্ত জীবনক্ষেত্রে প্রতিপদক্ষেপে বিলাতের অনুকরণ করিয়াছি। কিন্তু আবার পল্লী গ্রামকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও সঞ্জীবিত করিতে হইবে, অস্বাস্থ্যতা দূর করিতে হইবে, কৃষক যাহাতে সুস্থ শরীরে বার মাস পরিশ্রম করিতে পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে, গ্রামে গ্রামে জলকষ্ট নিবারণ করিতে হইবে, নতুন পুষ্করিণী খনন করিতে হইবে, পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে হইবে, বনজঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইবে, পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এ. চাষাকে কম সুদে তাহার আবশ্যকীয় টাকা ধার দিবার জন্য গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসীদের উপকারের জন্য তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ছোটখাট ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই আমাদের কাজ। আর এই কাজে সকলকে ডাকিতে হইবে। ডাক! ডাক! সবাইকে ডাক! প্রাণের ডাক শুনিলে কেহ কি না আসিয়া থাকিতে পারে? ওঠ, জাগ, আপনার কল্যাণকে জাগাও। বল এসো ভাই, তুমি মুসলমান হও, খ্রীষ্টান হও, শূদ্র হও, চণ্ডাল হও তোমাকে আলিঙ্গন করি—এযে আমার কাজ, এযে তোমার কাজ, এযে মায়ের কাজ।"

সভাপতির মামুলী অভিভাষণ নহে—উহা ছিল চিত্তরঞ্জনের প্রাণের কথা, মনের কথা। তিনি বাঙালীকে ও বাংলাকে যে কতখানি ভালোবাসিতেন তাহার প্রমাণ তাঁহার ভাষণের প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে পরিস্ফুট। এতদিন রাজনীতি ছিল রাজনীতি ই, দামী ধুতিজামা পরিহিত উপর শ্রেণীর কিছু লোকের একটা খেলা। বিদেশী সরকারের সঙ্গে একটু যোগাযোগ আর সভা-সমিতিতে দাঁড়াইয়া কিছু নরম ও গরম, অবাস্তব অলীক অথচ সস্তায়

হাততালি পাইবার মত বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন। যে রাজনীতির অধ্যায় তাহারা বই-পুস্তকে পাঠ করিয়াছেন কার্যক্ষেত্রে তাহারা সেই মুখস্থ অধ্যায় তোতাপাখীর মত বলিয়া চলিয়াছেন কিন্তু ছাপান অক্ষর আর বাস্তবের মাঝে যে দুস্তর ব্যবধান। প্রকৃত পক্ষে যাহারা তখন রাজনীতি করিতেন তাহাদের সংগে দেশের জনসাধারণেরও ততখানি ব্যবধান বিদ্যমান রহিয়াছিল। চিত্তরঞ্জন তাঁহার নিজের মনের কথাই 'বাংলার কথা' অভিভাষণের মাধ্যমে দেশের মানুষের মধ্যে এই ব্যবধান দূর করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহার কাছে ছিল মানুষ মানুষ নর নারায়ণ। তাই শহরের, পল্লীর—গ্রামের অর্থাৎ দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণ-সাধনে তিনি ভবানীপুর সম্মেলনে দাঁড়াইয়া মহান ডাক দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সকলকে ডাকিয়া বলিয়াছেন :

মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে ,

দেশের কাজ দশের হাতের স্পর্শে সমৃদ্ধ হইয়া ওঠে। চিত্তরঞ্জন ডাক দিলেন, দিলেন মহান ডাক, বিলাতি রাজনীতি পরিত্যাগ করিয়া মনকে ঘরমুখী করিয়া ঘরকে ভালো করিয়া বাঁধ, ঘরই তো গ্রাম , গ্রামই তো সমাজ! সমাজই তো দেশ! এই দেশের সমৃদ্ধি দেশবাসীর স্বাস্থ্যে, চাষার লাঙলে আর শহরের শিল্পক্ষেত্রের কলকারখানায়। তাই মহান ডাকের মাধ্যমে ঐ মহান উদ্দেশ্য সাধনে তিনি ভাঙ্গা মনে অথচ বুকভরা আশা নিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে অথচ ভবিষ্যতের আশায় চোখে আনন্দাশ্রু লইয়া তিনি তাঁহার আন্তরিক আবেদন মানুষের কানে, মনের কানে, কালের কানে রাখিয়া গিয়াছেন। দেশবন্ধু বলিয়া চলিয়াছেন : "আমাদের অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশী বিপদ যে, আমরা ক্রমশঃই আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, আচার ব্যবহার অনেকটা ইংরেজী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রাজনীতি বা Politics শব্দটি শুনিবামাত্র আমাদের দৃষ্টি আমাদের দেশ একেবারে অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ডে গিয়া পঁহুছায়। ইংরাজের ইতিহাসে এই রাজনীতি যে আকার ধারণ করিয়াছে আমরা সেই মূর্তিরই অর্চনা করিয়া থাকি। বিলাতের জিনিসটা আমরা যেন একেবারে তুলিয়া আনিয়া এই দেশে লাগাইয়া দিতে পারিলে বাঁচি। এই দেশের মাটিতে

তাহা বাড়িবে কি-না, তাহা ত একবারও ভাবি না।……ইউরোপে রাজনীতির যত স্কুল আছে, সব স্কুলের কেতাবে ও কোরাণে যত ধারাল বাক্য আছে, একেবারে এক নিশ্বাসে মুখস্থ করিয়া ফেলি, আর মনে করি এইবার আমরা বক্তৃতা ও তর্কে অজেয় হইলাম, দেখি আমাদের শাসন কর্তারা কেমন করিয়া আমাদের তর্ক খণ্ডন করেন। মনে করি, রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু তর্ক-বিতর্কের বিষয়, বক্তৃতার ব্যাপার মাত্র। আমরা বক্তৃতা করিয়া, তর্ক করিয়া জিতিয়া যাইব। আমাদের সকল উদ্যম ও সকল চেষ্টার উপরে আমাদের ধার করা কথার ভাব লাগাইয়া দিই। যাহা স্বভাবতঃ সহজ সরল তাহাকে মিছিমিছি বিনাকারণে জটিল করিয়া তুলি। শুধু যাহা আবশ্যক তাহা করি না, দেশের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহি না, বাঙলার কথা, বাঙালীর কথা ভাবি না, আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে সর্বতোভাবে তুচ্ছ করি। কাজেই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন অসার, বস্তুহীন। তাই এই অবাস্তব আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাণের যোগ নাই, এই কথা হয়তো অনেকে স্বীকার করিবেন না।”

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, চিত্তরঞ্জনের অভিভাষণের মূল কথাটি পল্লীগ্রামের রুগ্নদেহে নবজলধারা বর্ষণ করিয়া পুনরায় পুষ্ট ও সতেজ করিয়া তোলা। ভারতীয় কংগ্রেসের চিন্তাধারায় ‘গাঁও মে কংগ্রেস’ কথাটি ছিল কিন্তু দেখা যাইতেছে তাহারা যখন ঐ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন চিত্তরঞ্জন তাহাদের পূর্বেই ঐ মতাবলম্বী হইয়া পথের নির্দেশ দিয়াছেন। দেশবন্ধু বলিয়া চলিলেন: “বাংলার কথা যেন অচিরে বাঙালীর কার্যে পরিণত হয়। সমবেত চেষ্টা চাই, বাঙালীর স্বার্থত্যাগ চাই। এই যে জীবন যজ্ঞ ইহা শুদ্ধচিত্তে পবিত্রপ্রাণে আরম্ভ করিতে হইবে। সকল বিদ্বেষ, সকল স্বার্থ ইহাতে আহুতি দিতে হইবে। কর্মক্ষেত্রে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না। যে অধিকার আজি আমরা দাবী করিতেছি তাহা যুক্তি সঙ্গত, ন্যায় সঙ্গত আমাদের স্বভাব ধর্ম সঙ্গত। এই অধিকার হইতে কেহ আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।”

১৯০৪ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এলবার্ট হলে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সে বক্তৃতার কিছু সুর চিত্তরঞ্জনের ভাষণেও ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিত্তরঞ্জন চাহিয়াছেন একজাতি, এক প্রাণ, একতা। বিশ্বকবির মনের ভাবের সঙ্গে

দেশবন্ধুর মনের তারও একসুরে বাঁধা।

দীর্ঘ অভিভাষণ। ভাবিয়া চিন্তিয়া অভিভাষণটি লিখিতেও দীর্ঘ সময় লাগিবার কথা। বিশেষতঃ চিত্তরঞ্জন তখন সাহিত্য চর্চায় ব্যস্ত থাকায় তাঁহার সময়েরও অভাব ছিল। তথাপি সাহিত্য চিন্তাকে সাময়িকভাবে দূরে রাখিয়া দেশ ও দেশবাসীর জীবনের খাঁটি সত্যকে লোকের সমক্ষে তুলিয়া ধরিবার জন্ম সময় করিয়া লইলেন। দেশবন্ধু অভিভাষণটি মুখে বলিয়া যাইতে লাগিলেন আর সুরেন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় উহা লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। মাত্র দুই দিনে দুই সিটিং-এ। প্রথম দিনই অর্ধেকের বেশী, দ্বিতীয় দিনে বাকী অংশ। নিজে একবার পড়িলেন এবং বাড়ীর সকলকে ডাকিয়া উহা তাহাদিগকে পড়াইয়া শুনাইলেন। কিন্তু যখন সভাপতিরূপে অভিভাষণটি পড়ে তিনি শেষ করিয়াছিলেন তখন স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ ও হরদয়ালবাবু চিত্তরঞ্জনের নিকট ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে আন্তরিকভাবে আশীর্বাদ জানাইয়াছিলেন।

সেই আশীর্বাদ যেন সত্যি সত্যি অমোঘ আশীর্বাদে পরিণত হইয়া চিত্ত-রঞ্জনের জীবনের গতিকে নূতন এক দিগঞ্চলের দিকে পরিচালিত করিল। ভবানীপুর সম্মেলন তাঁহাকে আনিয়া দাঁড় করাইল বাংলার প্রাণকেন্দ্রে। তখন হইতেই চিত্তরঞ্জন বাংলাদেশের নেতা—অধিনায়ক বলা যায়। তখনকার সমস্ত ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের তিনি ছিলেন শক্তিশালী নেতা: তিনিই ছিলেন মস্তিক! ভবানীপুরের সেই সভাপতির মঞ্চ হইতেই তাঁহার জয়ের রথ বিজয় গৌরবে ভারতের দিকে দিকে গৌরব নিশান উড়াইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

এ-প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় এই বলিয়া দাবী করিয়াছেন যে, দেশবন্ধুকে তিনিই রাজনীতির পথে টানিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার দাবীর কারণ, বরিশাল কনফারেন্সের মনোমালিন্যের পর তিনিই বারবার তাঁহার কাছে আসিয়া সভাপতি হওয়ার জন্য তাঁহার সম্মতি আদায় করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিত্তরঞ্জন অভিমানভরে দূরে সরিয়া রহিয়াছিলেন আর সেই অভিমান ভাঙাইতে সুরেনবাবু বারবার আসিয়াছিলেন তাহা নহে। চিত্তরঞ্জন সেই সময়ে সাহিত্যচর্চায় গভীরভাবে নিমগ্ন ছিলেন, তাই তাঁহার সময় ছিল না। চিত্তরঞ্জন জেল হইতে মুক্তিলাভ করিলে তাঁহাকে একটি সংবর্ধনা সভায় সংবর্ধিত করা হয়। সেই সময় সুরেনবাবু ঐরূপ কথা বলিলে দেশবন্ধু স্বয়ং উহার প্রতিবাদ

জানাইয়াছিলেন আর জানাইবার কথাও। তাঁহার দেহের শিরায় শিরায়, রক্তের অণু-পরমাণুতে কবেই বা রাজনৈতিক চেতনা না ছিল?

১৯১৪ সাল হইতেই ভারতের আবহাওয়া নানা দিক হইতেই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যেমন রাজনৈতিক দিক হইতে তেমন অর্থনৈতিক দিক হইতেও। ইউরোপে তখন প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিয়াছে। বাংলার রাজনৈতিক আকাশও দুর্যোগপূর্ণ। এই সব রাজনৈতিক দুর্যোগের প্রতিবাদে চিত্তরঞ্জন একাই একশ হইয়া প্রবল প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইউরোপের এই যুদ্ধে প্রায় দেড় শত কোটি টাকা এই গরীব দেশ ভারতবর্ষ হইতে শুষিয়া লইয়া ইংরাজের সাহায্যে যুদ্ধের তহবিলে গিয়াছে। ভারতীয় যুবকবৃন্দকে সৈন্যবিভাগে ভর্তি করাইয়া গোলাগুলির মুখে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে,— তাহাতে কত যে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নেই। ঠিক এই কারণেই গঙ্গাধর তিলক সেই পরিবেশে যে সমস্ত বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি শুধু একটিমাত্র দাবীর উপর জোর দেন যে, যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষের নিকট হইতে ইংরাজ যে পরিমাণে সাহায্য পাইয়াছে তাহাতে তাহাদেরও ভারতবর্ষে ভারতীয়দের হাতে অধিকতর পরিমাণে রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া উচিত। ভারতের এমন প্রত্যাশা কোনমতেই অযৌক্তিক নহে কারণ ইউরোপের যুদ্ধের বহু চাহিদা অর্থ দিয়া, সম্পদ দিয়া এবং জনবল দিয়া সে মিটাইয়াছে। যুদ্ধের শেষভাগেও তাহারা ভারতবাসীকে খুশী করিবার জন্য অনেক মিষ্টি কথা ও গণতন্ত্রের বড় বড় কথা শুনাইয়াছে কিন্তু সেই যে কথায় বলে 'কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরাইলে পাজী,'—এখানেও অবস্থা হইল তেমন। যুদ্ধশেষে ইংরাজের অন্য মূর্তি। যুদ্ধকালীন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার কোন রকম লক্ষণ তাহাদের কাছ হইতে পাওয়া গেল না। ফলে ভারতের মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

ঐ মানসিক অবস্থা হইতেই অ্যানী বেশান্ত এবং তিলক মহারাজ ভারতের জন্য স্বায়ত্বশাসন দাবী করিয়া 'হোমরুল লীগ' প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা আর একটি রাজনৈতিক দল। কিন্তু কথা হইতে পারে যে ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেস থাকিতে আবার 'হোমরুল লীগ' নামে আর একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন হইয়াছিল কেন?—হইয়াছিল, কারণ কংগ্রেস দল তখন নামে মাত্রই—কার্যত তখন যাহারা কংগ্রেসের পুরোভাগে ছিলেন,

তাহারা ছিলেন ইংরাজ সরকারের উপর আস্থাশীল এবং কোন কার্যের জন্য শক্তি ও বল প্রয়োগের পরিবর্তে আবেদন নিবেদনের পক্ষপাতি। কংগ্রেসের কর্তাস্থানীয়দের মধ্যে এই মনোবৃত্তি থাকার জন্যই দেশবন্ধু ১৯০৬ সাল হইতে প্রায় এক যুগ কাল কংগ্রেসের বাহিরে ছিলেন।

যাহা হউক, আনী বেশান্ত তখন ভারতের জন্য স্বায়ত্বশাসন দাবী করিয়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। ভারতের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ আর এক বিদেশিনী ভগিনী নিবেদিতার মত এই বিদেশিনী আনী বেশান্ত তখন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া চলিয়াছেন,—উদ্দেশ্য চরম লক্ষ্য 'হোমরুল'।

ভারতের যাহা ইচ্ছা ইংলণ্ডের তাহা অনিচ্ছা। বেশান্ত আর তিলক চান 'হোমরুল'। ইংরাজ তাহা দিতে চাহেন না। সুতরাং ১৯১৭ সালের ১৬ই জুলাই মাদ্রাজের শাসনকর্তা লর্ড পেটল্যাণ্ডের আদেশ অনুযায়ী বেশান্তকে উটকামণ্ডে অন্তরীণ রাখা হয়।

বাংলাদেশে তখন দেশবন্ধু তাঁহার অনুগামী অর্থাৎ ন্যাশানালিষ্ট দলসহ 'হোমরুল লীগে' যোগদান করিয়াছিলেন। সুতরাং বেশান্তের এই অন্তরীণ রাখার বিরুদ্ধে সারা ভারতের যে জনমত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল বাঙলাদেশে উহার ঢেউ দেখা দিল প্রবলতর আকারে। দেশময় প্রতিবাদ আর সভা-সমিতি। ২৫শে জুলাই কলিকাতার 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে' ইহার প্রতিবাদে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত বিরক্ত সহকারে বলিয়াছিলেন: I do not think the god of Humanity was Crucified only once. Tyrants and oppressors have cruci fied humanity again and again and every outrage on humanity is a fresh nail driven through his sacred flash (Hear, Hear). বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও এই সভায় আনী বেশান্তকে অন্তরীণ রাখার প্রতিবাদে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।'

'হোমরুলের এই আন্দোলন তখন প্রবলভাবেই চলিতে লাগিল। বাংলার আন্দোলনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতেছিলেন চিত্তরঞ্জন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলের সভার পর স্থির হইল 'টাউন হলে' আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু সরকার টাউন হলে সভা অনুষ্ঠিত হইবার অনুমতি মঞ্জুর করিলেন না। ইহাতে জন-চিত্ত আরও ক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। ইংরাজ

সরকার চাহিল আগুন চাপা দিয়া রাখিতে কিন্তু তাহা কি সম্ভব ? অনেকে আদেশ অমান্য করিয়া কারাবরণ করাও শ্রেয় মনে করিলেন। কিন্তু কারাবরণই তো সমস্যার সমাধান নহে, বাহিরে থাকিয়া জনচিত্তে স্বায়ত্তশাসনের তৃষ্ণা জাগাইয়া তোলাই তখনকার প্রধান কাজ। কাজও চলিল সে-পথেই। এ সম্বন্ধে আত্মচরিতে ভারতের প্রথম প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদ যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন : The promise to grant the right of self determination was not forth coming, so an agilation for home rule was started in 1917 by Annie Bessant and Lokamanya Tilak. The Home Rule League was founded with branches throughout India and the country was swept by an unprecedented awakening. The Government was frightend and interned Annie Bessant and two of her colleagues.

চিত্তরঞ্জন তখন দেশের এই বিক্ষুব্ধ জনচিত্তের কথা রোনাল্ডসেকে জানাইবার জন্য শ্যামসুন্দরবাবু ও সুরেন্দ্রবাবুকে টাকা পাঠাইয়াছিলেন। দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার মধ্যে যে ধূমায়িত অগ্নি প্রজ্বলিত হইবার মুখে সে কথা তাহারা রোনাল্ডসেকে জানাইলেন। অবশ্য ইহাতে ফল হইয়াছিল এইটুকু যে পূর্বে ৬ই আগষ্ট টাউন হলে যে সভা অনুষ্ঠিত হইবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই তখন সে অনুমতি পাওয়া গেল। সেই অনুসারে ২৪শে আগষ্ট টাউন হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় দেখা গেল একটা মিলনের দৃশ্য! দেখা গেল, মডারেটগণ ও ন্যাশানালিষ্ট সম্প্রদায় বা তখনকার 'হোমরুল লীগের' সম্প্রদায় যুক্তভাবে সভায় উপস্থিত হইয়া প্রতিবাদের ভাষায় মুখর হইয়া উঠিয়াছেন।

আনী বেশান্তের অন্তরীণ হওয়ার প্রায় এক মাস পরে প্রচারিত হইল যে মিঃ এডুইন মণ্টেগু ভারতবর্ষে আসিবেন এবং ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে কি করা যাইতে পারে তাহার একটা ব্যবস্থা করিবেন। "তিনি যে ঘোষণাটি করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে নিম্নের এই অংশটুকু ছিল : "The Policy of His Majesty's government with which the Government of India are in complete accord, is that of increasing association of Indians in every branch of the

administration and the gradual development of the self governing institution with a view to the progressive realisation of responsible Government in India as an integral of the British Empire".

এখানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এডুইন মণ্টেগুর যে ঘোষণা তাহা ভূতপূর্ব ভারত বিদ্বেষী গভর্ণর জেনারেল লর্ড-কার্জন এবং অষ্টিন চেম্বারলেনের খসড়া অনুযায়ী। ইংরাজ সরকারের এই ঘোষণা ভারতবর্ষকে ভালোবাসিয়া নহে বা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য ভারতবর্ষব্যাপী যে 'হোমরুল' আন্দোলন দুর্বার গতিতে চলিতেছিল সে ভয়ে ভীত হইয়াও নহে, উহার প্রকৃত কারণ অন্যত্র নিহিত। যুদ্ধের পরে ইউরোপের যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার প্রভাব তো ছিলই উপরন্তু আর একটি কারণ রাশিয়ার বিপ্লবের পর জারের পতন। এ সম্বন্ধে India To day গ্রন্থে R. Palme Dutt যাহা লিখিয়াছেন তাহার একটু অংশ উল্লেখ করা হইতেছে: The rapid Transformation of the world situation in 1917, following the Russion Revolution, affected the whole tempo of events and fount its speedy reflection in the relations of British and India.

ভারতসচিব মণ্টেগুর ঘোষণার মধ্যে যাহা ছিল তাহার সারমর্ম এই যে, একেবারে নয়, ক্রমে ক্রমে তাহারা ভারতবর্ষে দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিবেন এবং আরও একটু কথা যুক্ত ছিল যে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেণীর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঐ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিবার জন্য তিনি সদলবলে ঐ বৎসরের (১৯১৭ সাল) শেষের দিকে ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছিবেন।

উক্ত ঘোষণায় মডারেটগণ আন্তরিক খুশীতে ভরিয়া উঠিলেন কিন্তু জাতীয়তাবাদী দল এ ঘোষণাকে তেমন সমাদরে বরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহা বলিয়া তাহারা নীরব হইয়া এক স্থানে বসিয়া থাকিতেও পারিলেন না। 'হোমরুল' কি, কেন তাহারা উহা দাবী করেন এবং উহা দেশের পক্ষে কতখানি প্রয়োজন তাহা দেশময় সর্বত্র জনসাধারণের মধ্যে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলেন। জাতীয়তাবাদী দলের অন্য অন্য নেতৃবৃন্দও ছিলেন সন্দেহ নাই কিন্তু উহার প্রধান হোতা ছিলেন চিত্ত-

রঞ্জন। হাইকোর্টেও তখন দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে প্রায় আড়াই মাসের ছুটি। ছুটি না থাকিলেও কিছু আসিয়া যাইত না। চিত্তরঞ্জন এক মনে রাজনীতিতে প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। তিনি বাহির হইলেন বাংলার জিলায় জিলায়, পল্লী-বাংলার সকল ভাই-বোনদের কাছে। নিজেকে বিলাইয়া দিলেন দেশের কাজে। চিত্তরঞ্জন তখন অন্য মানুষ, নিজের স্বার্থের ভাবনা নাই, মনেও জাগে না তাঁহার ভোগবিলাসের কথা। অক্লান্ত কর্মী চিত্তরঞ্জন পরিশ্রমকে পরাভূত করিয়া ঝড়ের বেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও বরিশাল।

উহার কয়েক দিন পূর্বে ২রা অক্টোবর মেছুয়াবাজারে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তখন দেশে ভারতরক্ষা আইন বলবৎ হইয়াছে। ঐ আইনের বলে জাতীয়তাবাদী দলের শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীকে অনেক দিন কালিম্পং-এ অন্তরীণ রাখা হইয়াছে। মহম্মদ আলীকেও অন্তরীণ রাখা হইয়াছিল। মহম্মদ আলীর অন্তরীণের প্রতিবাদেই মেছুয়াবাজারের ঐ সভা। চিত্তরঞ্জন ঐ সভায় জলন্ত দেশপ্রেম নিয়া ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন এবং আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের দেশ-প্রীতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধার পরিচয় জ্ঞাপন করেন। সেই সঙ্গে এই ভারতরক্ষা আইনে যে সকল নেতৃবৃন্দকে অন্তরীণ রাখা হইয়াছিল শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর নামটি ছিল সেই তালিকার সর্বশেষে। তাঁহার উল্লেখ করিয়াও দেশবন্ধু বলিয়াছিলেন :"The last name is that of Babu Shyam Sundar Chakraborty. I have had personal acquintance with him. I have been bound with him by ties of friendship and I can assure you gentleman, that Shyam Sunder Chakraborty is incapable of having done anything which deserved his inturnment."

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ঐ সভায় তিনি পূর্ববঙ্গের দেশপ্রেমের কথাও অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রশংসার সুরে বলিয়াছিলেন : "আজ পূর্ববঙ্গে এমন কোন গৃহ নাই, এমন কোন পরিবার নাই, যেখানে অন্ততঃ একজন বালক বা যুবক দেশান্তরিত হয় নাই। এই সমস্ত লোক বিনা বিচারে, বিনা প্রমাণে নির্বাসিত. আজ পূর্ববঙ্গে প্রতিগৃহে হাহাকার, প্রতিগৃহে বিষাদ-কালিমা।"

জাতীয়তাবাদী দল 'হোমরুল' চাহিয়াছিলেন। অন্য অন্য অনেকে ছিলেন যাঁহারা ইহার সমর্থন করেন নাই। কিন্তু Anglo-Indianপণ রীতিমত

বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। ভারতবর্ষে ভারতীয়গণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করুক ইহা তাহাদের সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ছিল এবং সময়ও সুযোগ বুঝিয়া তাহারা ইহার প্রতিবাদ করিতেও দ্বিধা করে নাই। দেশবন্ধু ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন! তিনিও Anglo Indians-দের উদ্দেশ্যে তাই বলিয়াছিলেন: "If these Anglo Indians want to make India their home, let them do so and we will work hand in hand with them in the interest of the Indian Empire. But if these little minded Traders come here to make money and all their interest lies in how best to make it, I say they are no friends of India, they have got no legitimate right to oppose the granting of self-Government to the people of India. I say to them, come here if you want—make money if yon can, go away in peace if you want to go."

মেছুয়াবাজারের এই সভার পর দেশবন্ধু ময়মনসিংহে উপস্থিত হন। দিনটি ছিল ১৯১৭ সালের ১০ই অক্টোবর। সভাস্থল পরিপূর্ণ, লোকে লোকারণ্য। সকল মানুষের চোখে-মুখে নূতন তৃষ্ণা, দেশবন্ধুর নিকট হইতে তাহারা জানিতে চাহে, শুনিতে চাহে। দেশবন্ধুও তাহাদের শুনাইলেন: "Wherever the interest of the country required my services, I have never lagged behind. With me work for my country is no imitation of Europian Politics". তিনি বলিতে লাগিলেন, "দেশই আমার ধর্ম, আমার চিরজীবনের আদর্শ—ঐ দেশ। দেশ বলিলে আমি আমার সম্মুখে আমার ভগবানকে দেখিতে পাই। আপনারা দেশ ও রাজনীতি পৃথক করিবেন না। আপনাদের শিক্ষাদীক্ষা ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত যথেষ্ট সংস্রব আছে। উহা আপনাদের ধর্মের অভিব্যক্তি। এ-দেশের মধ্যে এমন লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন মানব জীবন পৃথক পৃথক বিভাগে বিভক্ত। তাঁহাদের মতে রাজনীতি স্বতন্ত্র পদার্থ। তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, মানুষের আত্মা সর্বত্র সমান। প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মা যেমন এক, জাতির প্রাণও তেমনি এক।"

তারিখটার দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে চিত্তরঞ্জনের

এই রাজনৈতিক গতি তখন উল্কার মত ছিল। আজ এখানে কাল ওখানে। ১০ই অক্টোবর ছিলেন ময়মনসিংহে, ১১ই অক্টোবর গিয়া পৌছিলেন ঢাকা। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে ঢাকার বক্তৃতাটিও বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি সেখানে বলিয়াছিলেন: "স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে অধিকার দিবেন, কতটুকু অধিকার চাহিলে তাহা গভর্ণমেণ্ট শুনিবেন তাহা ভাবিবার আবশ্যকতা নাই। দেশের মঙ্গলের জন্য যতটুকু আবশ্যক তাহাই চাহিতে হইবে—ভীত হইবেন না, দেশের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা নির্ভয়ে দাবী করিতে হইবে। রাজপুরুষগণ যে ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন স্বার্থ, অশিক্ষিতের সংখ্যা বাহুল্য স্বায়ত্তশাসনের পরিপন্থী বলে নির্দেশ করেন, আমি বলি সেই জন্যই স্বায়ত্তশাসন চাই। এই জাতিগত ধর্মগত. বর্ণগত বৈষম্য দূর করিতে ও দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্যই আমরা স্বায়ত্তশাসন চাই—এই সমস্ত অনৈক্য দূর করিতে স্বায়ত্তশাসন একমাত্র পন্থা।"

চিত্তরঞ্জন ঢাকা হইতে তখন যাত্রা করেন বরিশাল। সর্বত্রই স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে জনমতকে জাগ্রত করাই ছিল তখন তাঁহার একমাত্র ব্রত। বরিশালে যে বিরাট জন সভা হইয়াছিল তাহাতে চিত্তরঞ্জন তাঁহার উদাত্ত স্বরে বলিয়াছিলেন, "ইহা হিন্দুর স্বায়ত্তশাসন হইবে না, ইহা মুসলমানের স্বায়ত্তশাসন হইবে না, ইহা জমিদারের স্বায়ত্তশাসন হইবে না—উহা হইবে প্রজার স্বায়ত্তশাসন—ইহাতে সকলের স্বার্থ সমানভাবে অক্ষুণ্ণ থাকিবে।"

অপূর্ব কথা! চমৎকার আশ্বাস! পাছে মুসলমানদের মনে এই স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হয় সেই সন্দেহ নিরসনের জন্যই চিত্তরঞ্জন উপরোক্ত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বরিশালের বক্তৃতা শেষে চিত্তরঞ্জন চট্টগ্রাম গিয়াছিলেন। সেখানেও তাঁহার বক্তৃতার উদ্দেশ্য ও মূলকথা ছিল দেশ, জাতি ও স্বায়ত্তশাসন। উহার বিরুদ্ধে যাহারা গিয়াছেন চিত্তরঞ্জন তাহাদের সমালোচনা করিতে ছাড়েন নাই কারণ তাহার নিকট দেশ-ই ছিল বড়। চট্টগ্রামে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বিরুদ্ধবাদী মডারেটগণের কথা উল্লেখ করিয়া সুরেন্দ্রনাথের সমালোচনা করিয়াছিলেন। সমালোচনা করিতে গিয়া তিনি সুরেন্দ্রনাথকে 'Impostor' মানে রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজ পর্যন্ত বলিয়াছিলেন।

এদিকে পশ্চাতের রাজনৈতিক পটভূমিকাকে একটু স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরা দরকার। মডারেটগণের সংগে চরমপন্থীদের কখনও মিলন হয় আবার কখনও তাহাতে ফাটল ধরে। জাতীয় কংগ্রেসের এই দুই দল তখন দুই মতাবলম্বী। ১৯১৫ সালে মডারেটদলের স্তম্ভ ফিরোজ সা মেটা এবং অন্য আর একটি শক্তিশালী স্তম্ভ গোপাল কৃষ্ণ গোখেলের মৃত্যু হয়। তাঁহাদের মৃত্যুতে মডারেটদল স্বাভাবিকই অনেকখানি শক্তিহীন হইয়া পড়ে এবং ইহারই পরিণামে পুনরায় ঐ দুই দলের মধ্যে মিলন সম্ভব হইয়া ওঠে এবং ইহাও স্বাভাবিক হইয়া ওঠে যে, জাতীয় কংগ্রেসের পরিচালনার ভার তখন চরমপন্থীদের হাতে আসিয়া পৌছায় অর্থাৎ আনি বেশান্ত, গঙ্গাধর তিলক ও চিত্তরঞ্জন তখন ভারতের কংগ্রেসের কর্ণধার। ইহারই অনিবার্য ফলস্বরূপ দেখা যায় যে চরমপন্থীদের স্বায়ত্তশাসন দাবী তখন শুধু বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া উহা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দাবীরূপে রূপ পরিগ্রহ করিয়া সর্বভারতীয় দাবীতে পরিণত হইয়াছে। ওদিকে আবার আর একটি মিলন বন্ধন স্থাপিত হয়। তখন ১৯১৬ সাল। শাসনকার্যে আইন-কানুন পরিবর্তনের জন্য কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ একত্রিত হইয়া একটি দাবী উত্থাপিত করে। পশ্চাতের এই পটভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। হয়ত ইহা মনে করিয়াও হইতে পারে,—হাউস্ অফ্ কমনস্-এ মণ্টেগু ভারতবর্ষের শাসনের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, "The machinery of the Government of India is too wooden, too, iron, too inelastic, too antediluvian to be of any use for the modern purposes we have in view."

মণ্টেগু ছিলেন তখন Asst. Secretary of State for India এবং অষ্টিন চেম্বারলেন ছিলেন Secretary of State for India. ভারত শাসন যন্ত্র অত্যন্ত পৌরাণিক এবং অচল এবং এই বাস্তব সমালোচনার জন্যই অষ্টিন চেম্বারলেনকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল এবং তাহার স্থলে নিযুক্ত হইলেন মণ্টেগু। ভারতসচিব রূপেই মণ্টেগুর ঘোষণা। ইতিহাসের দিকে ফিরিয়া তাকাইলে ভারত সচিব মণ্টেগুর ঘোষণাটির মূল্য নানা দিক হইতে বিচার করা যায়। ইহার মধ্যে নূতনত্ব ছিল। তিনিই ভারতের শাসন যন্ত্রকে অতি পুরাতন, মান্ধাতার আমলের বলিয়াছেন। পূর্বের কোন রাজ প্রতি-নিধির মুখ হইতে এমন ঘোষণা-বাণী শোনা যায় নাই। উপরন্ত তিনি সদম্ভে

ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতের সর্বদলের প্রতিনিধিদের সংগে রাজনৈতিক অধিকার ও শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করিবেন প্রচারিত হইলে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি চাপা আনন্দের স্রোত বহিতে থাকে। মণ্টেগু যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন বা ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ইহাতে অনেকেই যে খুশী হইয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ রহিয়াছে। তাহাদের মতে উহা ইংরাজ-শাসন কালের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অনেকেই মনে করিলেন, এতদিন ইংরাজ যাহা করিয়াছে,—এবারে হয়তো সত্যই তাহাদের মনের পরিবর্তন হইয়াছে এবং রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার কিছু অমৃত-ফল লাভ করা যাইবে। মডারেটদলের নেতা সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন আশাবাদী। তিনি মণ্টেগুর এই ঘোষণা এবং সদলে তাহার ভারতবর্ষে আগমন উপলক্ষে তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন: "The pages of Anglo.-Indian history were strewn with the fragments of broken promises, but perhaps a new chapter was now to be opened."

ভারত সচিবের ভারতবর্ষে আসা তাহার ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে না। উহা নির্ভর করে ভারতসম্রাট এবং পার্লামেন্টের অনুমোদনের উপর। যথা সময়ে সম্রাটের অনুমোদন লাভ করিয়া এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুমোদন লইয়া ১৯১৭ সালের ৯ই নভেম্বর, মণ্টেগু সাহেব ভারতবর্ষের মাটি বোম্বাই নগরে পদার্পণ করিলেন।

স্বাভাবিকই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আবহাওয়া তখন চঞ্চল।—একটু আশার দোলা, আবার সন্দেহের ছোঁয়া; কি পাওয়া যাইবে, কতটুকু পাওয়া যাইবে,—সকলের মনেই এক হিসাব। দল দুইটি মডারেট ও চরমপন্থী। মডারেট নেতৃবৃন্দের মধ্যে ফিরোজ শা মেটা ও গোপালকৃষ্ণ গোখেল তখন পরলোকগমন করিয়াছেন। অপর দুই প্রধান সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসু উভয়েই সম্মানিত রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং মডারেটদলের মধ্যে একমাত্র সুরেন্দ্রনাথই ছিলেন কথা বলার মত। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে সত্য কথাটি বলিলে বলিতে হয় যে, তাঁহার সত্তায় ভিতরে রাজনৈতিক চেতনা তো নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু যে দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই চেতনার বহিঃপ্রকাশ হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। তাহার চাইতে বলা যায় তিনি

ছিলেন বিরাট বাগ্মী। সুতরাং সুরেন্দ্রনাথের যদি কোন ত্রুটি থাকে তাহা ছিল তাঁহার রাজনৈতিক বিচার বিশ্লেষণের,—বাগপটুতার নহে। কথা তিনি বলিতে পারিতেন এবং ভালোভাবেই বলিতেন কিন্তু যাহা বলিতেন তাহার রাজনৈতিক মূল্য ভারতবর্ষের হিসাবের খাতায় কতটুকু ছিল উহাই বিচার্য।

আর একদিকে 'হোমরুল লীগ' অর্থাৎ চরমপন্থী বা জাতীয়তাবাদী দলের গঙ্গাধর তিলক ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। যেমন তাঁহাদের প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তেমন তাঁহাদের বাক্‌চাতুর্য! তাঁহারা তখন অন্তরীণ রাখার বিরুদ্ধে এবং স্বায়ত্তশাসন দাবী করিয়া ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটাছুটি করিতেছেন। তাঁহারা ব্যস্ত। তাই ইংরাজ সরকারের দৃষ্টি তখন এই দুই সর্ব-ভারতীয় নেতার উপরই নিবদ্ধ। ইঁহাদের আচরণেও তাহারা মৌলিক পার্থক্য অনুভব করিলেন। মণ্টেগু সাহেব আসিলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ তাহার কাছে চিঠি লিখিয়া নিজেদের বক্তব্য বলিবার জন্য সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া আবেদন জানাইয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনকেও মণ্টেগু সাহেবের নিকট ঐরূপ আবেদন করিবার জন্য তাহার দলের কেহ কেহ উপদেশ দিয়াছিলেন। উত্তরে চিত্তরঞ্জন জানাইয়াছিলেন, "বিনা আহ্বানে যাইব না। তাঁহারা কেন আমাকে ডাকিয়া পাঠান না? আমাদের মতামত কি তাঁহারা জানিতে পারিতেছেন না।"

মণ্টেগু-মিশন ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা আসিয়া পৌছিল। তৎপর নেতৃবৃন্দের সংগে কথাবার্তার পালা। চিত্তরঞ্জনের উপরোক্ত ঐ উক্তির পর ভূপেন্দ্রনাথ বসুর মধ্যস্থতায় চিত্তরঞ্জনের নিকট মণ্টেগু মিশনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহ্বান আসিল।

এই সময়ে স্বায়ত্তশাসনের পদ্ধতি এবং ধারা নির্দেশ করিয়া একখানি পুস্তক লিখিত হয়। পুস্তকখানির রচয়িতা ছিলেন লাওনেল কারটেজ নামক একজন সাহেব।

ঐ পুস্তকে বর্ণিত ধারা এবং নির্দেশ অনুযায়ীই চিত্তরঞ্জনের সহিত মণ্টেগু মিশনের প্রায় তিন ঘণ্টা আলাপ আলোচনা চলে। চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, "এই রিফরমস্ বিধিমত কার্যে পরিণত হওয়া সম্ভব হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেশবাসীর হাতে যাহাকে বলে সত্যিকারের স্বায়ত্তশাসন (Provincial Autonomy) সেই স্বায়ত্তশাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এবং কর্তব্য না আসে।"

গঙ্গাধর তিলকও মণ্টেগু মিশনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং জাতীয়তাবাদী দলের চিন্তাধারায় কথাও বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে বলা চিত্তরঞ্জনের মত তেমন দৃঢ়, জোরাল এবং যুক্তিপূর্ণ ছিল না। তাই জানা গিয়াছে —যে, চিত্তরঞ্জনের ঐরূপ জোরাল এবং যুক্তি তথ্য সহকারে স্বায়ত্তশাসন দাবীর ব্যাখ্যা শুনিয়া মণ্টেগু সাহেবের ভাবের পরিবর্তন হইয়া মুখের চেহারাই নাকি অন্য রকম আকার ধারণ করিয়াছিল। বাংলার লাটবাহাদুর রোনাল্ডসে সাহেব চিত্তরঞ্জনকে ঐ রিফরম্ অনুসারে দেশের কাজ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন কিন্তু যাহা মনঃপূত নহে তেমন কাজ তাঁহাকে দিয়া করান কোন দিনই কাহারো দ্বারা সম্ভব হয় নাই। চিত্তরঞ্জন তাই রোনাল্ডসের মুখের উপরই সোজাসুজি তাঁহার অভিমত জানাইয়া দিয়াছিলেন, শাসন সম্বন্ধে এই সংস্কারের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল (This reform is unworkable.)

চিত্তরঞ্জনের মুখ হইতে এমন মুখের মত জবাব শুনিয়াছিলেন বলিয়াই রোনাল্ডসে সাহেব বলিয়াছিলেন, 'Mr. Das is an astute Politician.'

রোনাল্ডসের পরে মণ্টেগু সাহেব নিজেও স্বায়ত্তশাসনের স্বরূপ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের নিকট তাঁহার মতামত জানিতে চাহিয়াছিলেন। স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে দেশবন্ধুর ধারণা ছিল স্বচ্ছ। তিনি সহজ, সরল এবং অকপট ভাষায় জানাইয়াছিলেন যে, তখনকার পরিস্থিতি বিবেচনায় রেলপথ এবং সৈন্যবিভাগ ব্রিটিশরাজের হাতে থাকিতে পারে আর বাকী সবই ভারতীয়দের হাতে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাহা ছাড়া এই রিফর্ম অচল, চলিতে পারে না। গভর্ণর জেনারেল লর্ড চেম্‌সফোর্ড বলিলেন, চলিবে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য আপাততঃ আরম্ভ করিতে পারেন, যদি ভাল চালাইতে পারেন, সব দিকেই ক্ষমতা পাইবেন।

উত্তর দিলেন চিত্তরঞ্জন : I Can't understand how experiment will prove successful in an unworkable scheme. If we work upon it, we are bound upon this scheme and that will be a stronger argument to you for not giving us anything.

Mr. Montagu : I want to pass the rest of my life in doing good to India, please accept.

প্রায় এক ঘণ্টা এইরূপ আলোচনা এবং মত বিনিময় চলিল কিন্তু কার্যতঃ

চিত্তরঞ্জন যখন তাঁহার মতবাদ হইতে একটুও সরিয়া আসিলেন না তখন মণ্টেগু মুখে হাসি লইয়া বলিলেন, you are unasasiliable. We must have another meeting with you. In case we can not, kindly send your scheme to us in black and white for consideration."

কিন্তু আলাপ-আলোচনা বন্ধ হইল না। বাংলায় গভর্ণর রোনাল্ডসে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে কথা চালাইবার জন্য মিঃ গোবলের মারফৎ দেশবন্ধুকে আহ্বান জানাইলেন। দেশবন্ধুও সম্মতি জানাইলেন। উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্তা হইয়াছিল বলিয়া শোনা গিয়াছে তাহার কিছু কিছু অংশ এইরূপ;

রোনাল্ডসে অনেকটা অনুরোধ আর বিনয় সহকারে বলিলেন,— আপনি কেন সময় সময় আসিয়া আমাকে সৎপরামর্শ প্রদান করেন না?

উত্তর দিয়াছিলেন দেশবন্ধু, আপনি আহ্বান করিলেই আমি আসিতে পারি। কিন্তু আপনি কি আমার সঙ্গে পরামর্শ করিবেন? আমার নামে কি রিপোর্ট আছে আপনি জানেন?

রোনাল্ডসে, না, না, আপনি বলুন।

চিত্তরঞ্জন, ও জানেন না রিপোর্ট? আমি একজন Professional mushroom politician. কয়েকটি political case করিয়া কেবল সময়ে অসময়ে দেশের এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় ও গভর্ণমেণ্টকে গালাগালি দিই মাত্র।

রোনাল্ডসে, (সবিস্ময়ে) একথা জানিলে আপনাকে ডাকিয়া অপমান করিতাম না। আপনার বিরুদ্ধে এই রিপোর্ট! যাতে ঐরূপ রিপোর্টে আমার নথিপত্র না কলঙ্কিত হয়, আমি আজই ইহার ব্যবস্থা করিতেছি।

এডুইন মণ্টেগু ভারতবর্ষে প্রায় ছয় মাস কাল অবস্থান করিয়া সমস্ত শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া গেলেন। এই আলোচনায় রাজনৈতিক লাভ-লোকসানের হিসাব ছাড়িয়া দিলেও দেশবন্ধু সম্বন্ধে মণ্টেগুর যে ধারণা বা শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল উহা ভারতবাসী হিসাবে সকলেরই গর্বের বস্তু। মণ্টেগু সাহেব তাঁহার 'An Indian Diary' গ্রন্থে চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে তাঁহার শ্রদ্ধা জানাইতে গিয়া লিখিয়াছেন, "I had a talk with C. R. Das, an extremist, but a most sensible fellow. His demand is complete responsibility at once for local Government.

Das argued very strongly. I argued with him. I implored him. I saw him privately and he added : The half way house is no good ; there is no intermediate stage possible between responsible Government and complete responsibility. He attracted me enormously".

দেশবন্ধু সম্বন্ধে মণ্টেগুর এমন অভিমত সত্যই প্রণিধানযোগ্য। তখনকার ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁহার মতই একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদের একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। এতকাল ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ।—বলা যায় ভারতের রাজনৈতিক গগনের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কিন্তু মণ্টেগু মিশন ভারতবর্ষে আসিলে তিনি তাঁহার উপযুক্ততার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রাখিতে পারেন নাই। তাহার যে পরিণাম তাহা হইল, দেশের মানুষের মনে এতদিন সুরেন্দ্রনাথের যে আসনখানি ছিল তাহা হইতে তিনি সরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন আর সেই শূন্যস্থানে গিয়া বসিলেন চিত্তরঞ্জন। কারণ তিনি দেশ ও দেশবাসীর মনের একান্ত ইচ্ছাকে সুস্পষ্ট দাবীর আকারে মণ্টেগু মিশনের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই উপস্থাপনের ভাব, ভাষা এবং যুক্তি যে অকাট্য ছিল তাহার সত্য প্রমাণ মণ্টেগু সাহেবের কথাতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে,—'He attracted me enormously.' কিন্তু শুধু মণ্টেগুকেই নহে চিত্তরঞ্জন তাঁহার কাজের দ্বারা দেশের জনগণের দৃষ্টিও তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই তো তখন হইতেই দেশের হৃদয় তাহাকে বরণ করিয়া রাখিয়াছিল। আর দেশও ছিল তাঁহার হৃদয়েই। তাই তাঁহার তখনকার সকল কর্ম, সকল চিন্তা সবই ছিল দেশ ও জাতিকে কেন্দ্র করিয়া। এই কারণেই ১৯১৮ সালের জুন মাসে চট্টগ্রামে তাঁহার কণ্ঠে জাগিয়া উঠিয়াছিল, "আমাদের কিছুই নাই—অর্থ নাই, অস্ত্র নাই, শিক্ষা পর্যন্ত নাই, এ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে স্বায়ত্তশাসনের একান্ত প্রয়োজন। শুধু কয়েকজন শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে উহা আবদ্ধ থাকিবে না। দেশের জনসাধারণ, প্রজা ও কৃষক যাহাতে স্বায়ত্তশাসনের সুধাময় আস্বাদ পায়, আমাদের কার্য তাহাই। সমগ্র দেশবাসী যাহাতে স্বাধীনতা সুখ ভোগ করিতে পারে তাহাই আমাদের কামনা। আমি চাই সমষ্টির কল্যাণ, সমগ্র দেশবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও

স্বাধীনতা। আমার কি হইবে, তাহা আমি জানিতে চাহি না। বর্তমান বাঙালীর কি হইবে, তাহাও জানিবার প্রয়োজন নাই, আজিকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহাও ভাবিবার প্রয়োজন নাই। আমি শুধু চাই আমার জাতির কি হইবে। আমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত আমি শুধু এই কামনাই করিতেছি।"

ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে ১৯১৭ একটি স্মরণীয় সাল। ইহাকে ইতিহাসের ভাষায় Transitory period বলা যায় কারণ এই বৎসর কলিকাতায় ভারতীয় কংগ্রেসের দ্বাত্রিংশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে জাতীয় কংগ্রেসের চিন্তাধারা এবং কার্য-প্রণালীর আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। ভিক্ষার সুরে স্বায়ত্তশাসন চাওয়ার দিনও তখন হইতে শেষ হয়, সেখানে ওঠে দাবীর প্রচণ্ড গর্জন।

পূর্বে ১৯০৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার পরে ১৯১৭ সালে পুনরায় কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন। নানা দৃষ্টিভঙ্গি হইতেই এই অধিবেশনের গুরুত্ব ছিল অনেক। প্রথমতঃ দেশময় স্বায়ত্তশাসন দাবীর আন্দোলন প্রবলভাবে তখন চলিতেছিল। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজের এক নিষ্ঠুর প্রকৃতি, অন্তরীণ রাখার বিরুদ্ধে জন-মন ছিল অত্যন্ত উত্তপ্ত তদুপরি ভারতসচিব এডুইন মণ্টেগু মিশনের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে ঘোষণা এবং সদল-বলে তাহার ভারতে আগমন। এই পটভূমিকায় ভারতীয় আশা-আকাক্ষার একমাত্র মুখপাত্র জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন গুরুত্বপূর্ণ বৈ-কি !

অন্তরীণাবদ্ধ আনি বেশান্ত তখন মুক্ত। মণ্টেগু-ঘোষণার পরেই তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। জাতীয়তাবাদী দল প্রস্তাব করিয়াছিল যে, আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে আনি বেশান্তকে সভানেত্রী করা হইবে। কিন্তু বিরুদ্ধ দল মডারেটগণ ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া সাব্যস্ত করিল যে, মামুদাবাদের রাজাকে তাহারা সভাপতি করিবেন। সভাপতি করা লইয়া যেমন দুই দলে মত বিরোধ, ঠিক তেমনি মত বিরোধ দেখা দিল অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান নির্বাচন করা নিয়াও। জাতীয়তাবাদী দল চাহিল রবীন্দ্রনাথকে আর মডারেটগণ চাহিল বহরমপুরের আইনজীবী বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়কে। কিন্তু এই মতবিরোধ বিরোধ অবস্থাতেই দাঁড়াইয়া রহিল না। দুই পক্ষের আলাপ-

আলোচনার মাধ্যমে একটা মীমাংসার পথে আসিয়া তাহারা উপস্থিত হন। ঠিক হইল, জাতীয় দলের ইচ্ছানুযায়ী আনি বেশান্তই অধিবেশনের সভানেত্রী হইবেন এবং মডারেটগণের ইচ্ছামত বৈকুণ্ঠনাথ সেন হইবেন অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান।

অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে তখনও কয়েক দিন দেরী ছিল। মডারেট দলের সঙ্গে জাতীয় দলের যাহাতে নূতন করিয়া আর মতবিরোধ সৃষ্টি না হয় সেই উদ্দেশ্যে চিত্তরঞ্জন সুরেন্দ্রনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অনুরোধ জানাইলেন, "আমরাও কাজ করিতে চাই, আমাদিগকে পদে পদে বাধা দেওয়া কি উচিত? আমরা যদি তৈয়ার হইতে পারি, তবে আপনার অভাবেও দেশের কার্য অপ্রতিহত ভাবে চলিতে পারিবে। বন্ধ হওয়াটা কি বাঞ্ছনীয়?"

চিত্তরঞ্জনের এই কথায় সুরেন্দ্রনাথ সহজ ও সরল হইয়া কোন স্পষ্ট উত্তর করিতে পারিলেন না। তবুও যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতে চিত্তরঞ্জন বুঝিয়াছিলেন যে, যাহাতে মতবিরোধ আর সৃষ্টি না হয় সুরেন্দ্রনাথ তেমন ভাবেই তাঁহার দলকে লইয়া চলিবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যে চিত্রটি দেখা গিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। সে-চিত্রটি পরে রূপায়িত করা হইতেছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উপস্থিত হইয়া শুধুমাত্র একজন দর্শকের ভূমিকায় না থাকিয়া তিনি "ভারতের প্রার্থনা" নামে একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। আর জাতির যাহা চাহিদা সেই স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে যে মূল প্রস্তাব সেই প্রস্তাবটি অধিবেশনে তুলিয়াছিলেন সুরেন্দ্রনাথ এবং তিনিই সভানেত্রী পদের জন্য আনি বেশান্তের নাম অধিবেশনের জনসমক্ষে প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

আনি বেশান্ত হইলেন কলিকাতা মহানগরীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের এই দ্বাত্রিংশ অধিবেশনের সভানেত্রী। স্বাভাবিকই সভানেত্রীর ভাষণে স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধেই যাহা কিছু বলার তাহা বলা হইল। তবে তাঁহার ভাষণে নূতন কথাও শোনা গেল। স্বায়ত্তশাসন প্রদান সম্বন্ধে তিনি সময় নির্ধারণের উপর গুরুত্ব দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ১৯২৩ সালের মধ্যে ভারতবাসীর হাতে স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে আর যদি এ সময়ের মধ্যে সম্ভব না হইয়া বিলম্ব হয়-ই তবে উহা যেন ১৯২৮ সালের সীমা অতিক্রম করিয়া না.

যায় অর্থাৎ দেরী হইলেও ১৯২৮ সালের মধ্যেই স্বায়ত্তশাসন চাই। এতদিন কংগ্রেসের মুখে শুধু দাবীই ছিল কিন্তু তখন দাবী আদায়ের জন্য দিন তারিখ ধার্য করিয়া দেওয়ার মধ্যে কংগ্রেসের দৃঢ়তা ও শক্তির পরিচয়ই পাওয়া গেল।

জনাকীর্ণ কলিকাতা মহানগরীর এই কংগ্রেস অধিবেশন। বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় পাঁচ হাজার প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন, বলা যায় দর্শক সমাগমও হইয়াছিল প্রায় সমান সংখ্যক। ইহার মধ্যে তদানীন্তন কালের বহু বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী বোরখায় আবৃত হইয়া মহম্মদ আলী ও সৌকত আলীর মাতা বাই আম্মা। আর উপস্থিত হইয়াছিলেন মহম্মদ আলী জিন্না, লোকমান্য তিলক মহারাজ, হাসান ইমাম, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মহাত্মা গান্ধী ও মজরুল হক। এই সব মহান নেতৃবৃন্দকে চিত্তরঞ্জন তাহার নিজের বাড়ীতেও আমন্ত্রণ জানাইয়া আনিয়াছিলেন। ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। ১৯০৬ সালের কলিকাতার কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ও লোকমান্য তিলক, খাপদে প্রভৃতি মহারাষ্ট্রদেশীয় নেতৃবৃন্দ তাঁহার অভ্যাগত হইয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন যে বক্তৃতা করিযাছিলেন তাহার কিছু কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হইতেছে: "I want the power to build my own constitution in a way which is suited to this Country and which afterwards will be referred to as the great Indian Constitution. We are all agreed as to the ideal. Let us all gather strength to fight for it. Let us fight with all our might and let us not rest Content till the whole thing is granted to us."

বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন, "আমি চাই সমস্ত ভারতবাসী যেন সমস্বরে বলিতে পারে যে আমাদের শাসনযন্ত্র আমরাই পরিচালিত করিব। ইহা আমাদের জন্মগত অধিকার। কোন শাসন নীতিই যেন এই অধিকার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে না পারে। যে মুহূর্তে তোমরা এই কথা ভাল রকমে বুঝিবে, সেই মুহূর্তেই তোমাদের স্বরাজ লাভ হইবে।"

ভারতের বিপ্লবী কায-কলাপ ও বিপ্লবীদের জাগরণ সম্বন্ধে ইংরাজদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া দেশবন্ধু বলিলেন, "স্বাধীনতার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহে বাধাপ্রাপ্ত

হইয়াই অসহিষ্ণু যুবক বিপ্লববাদে বিশ্বাস করিয়া থাকে। চক্ষের সম্মুখে তাহারা দেখিতেছে জগতে ক্ষুদ্র বৃহৎ এমন জাতি নাই যে স্বাধীনতা লাভের জন্য সচেষ্ট নয়। পরাধীনতার শাসন নিষ্পেষিত মুমুক্ষু ভারতের তরুণ চিত্ত যুবকও সেই স্বাধীনতারই প্রয়াসী। আজ তুমি ইহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান কর, স্পষ্টভাবে বলিয়া দাও শাসন পদ্ধতির পরিবর্তন করিয়া তুমি ইহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিবে, স্পষ্টভাবে বলিয়া দাও তাহাদের মঙ্গলের জন্যই তুমি শাসনযন্ত্র পরিচালনা করিবে; দেখিবে ভারতে বিপ্লবতন্ত্রীর অস্তিত্ব চিরতরে নির্মূলিত হইবে। তুমি সৈন্য চাও, আমি দিব। আজ যদি ইহাদের মুক্তি দাও, আমি ছয় মাস ব্যবসা কর্ম ছাড়িয়া, সমগ্র দেশ হইতে উপযুক্ত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিব, প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি।”

বক্তৃতা প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন আরও বলিয়াছিলেন, “একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এখন সময় এসেছে। এ সময় আর অপেক্ষা করলে চলবে না। প্রভুত্বপ্রয়াসী আমলাতন্ত্রের হাতে যে ক্ষমতা ন্যস্ত আছে, এখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে ভারতবাসীর অর্থাৎ ভারতের জনসাধারণের হাতে তা' অর্পণ করতে হবে। এদেশে দীর্ঘকাল ধরে আমরা আমলাতন্ত্রের প্রভুত্ব ও প্রাধান্যের পরাকাষ্ঠা দে' ছি- -আমরা আর তা দেখতে চাই না। দেড়শো বছরের কুশাসনে আমরা জর্জরিত হয়েছি। আর একদিনও কালবিলম্বের প্রয়োজন নেই। সকল বিষয়ে আমরা দায়িত্বপূর্ণ শাসন-ক্ষমতা চাই। এটা আমাদের পেতেই হবে এবং যতক্ষণ দেশের জনসাধারণের হাতে দেশের শাসনভার দেওয়া না হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা কোনমতেই নিরস্ত হব না, সন্তুষ্ট হব না।”

সুরেন্দ্রনাথসহ মডারেট দলের আরও অনেকে কংগ্রেসের ঐ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও জাতির কল্যাণের জন্য চিত্তরঞ্জনের মনের যে আকুল আগ্রহ তাহা তাঁহার ভাষণের মধ্যে পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিল। দেশের জনগণের মন তখন জাতীয়তাবাদী দলের দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন যে, জাতীয়তাবাদী দলের সংগে যুদ্ধে তাহাদের দলের পরাজয় সূচিত হইয়া কংগ্রেসের মধ্যে তাহাদের প্রভুত্বের দিন সীমিত হইয়া আসিতেছে। রাজনীতিবিদের কাছে প্রভুত্ব হারান মনোবেদনার কারণ বিশেষ করিয়া যে জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্গে তাহাদের মত বিরোধ তাহারা

চতুর্দিকে ক্ষমতা ও প্রভুত্বের জাল বিস্তারিত করিয়া ফেলিতেছে। ইহাতে সুরেন্দ্রনাথ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এই অসন্তুষ্টির ভাব চাপা রহিল না। শীঘ্রই উহার বহিঃপ্রকাশ হইল। চিত্তরঞ্জনের জাতীয়তাবাদী দলের কোন সভ্য যাহাতে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে স্থান লাভ করিতে না পারে সেই জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুধু ইহাই নহে, 'ভারতসভা' হইতেও চিত্তরঞ্জনের দলকে মডারেট দল বহিষ্কার করিয়া দিলেন। নিঃসন্দেহে ইহা অত্যন্ত দুঃখের এবং শোচনীয় ঘটনা। জানা গিয়াছে যে, অত্যন্ত মনোবেদনায় চিত্তরঞ্জন অমৃতবাজার পত্রিকার কোন এক প্রতিনিধিকে বলিয়াছিলেন, "As long as I live, I shall never be able to forget that Mr. Surendranath Banerjee did not even raise his little finger as a protest against this gross outrage."

এত করিয়াও সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তখনও নীরব হইয়া রহিলেন না। তাঁহার মনের জ্বালা, মুখের কথা সবই তাঁহার কলমের মুখে ছদ্মনামে 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। নিজেকে আড়াল করিয়া রাখিলেন 'An old member of the Indian Association' নামের অন্তরালে। লিখিয়াছিলেন, "Mr. Das passing as the leader of the country, let me ask what has been done to aspire to the leadership of the country ? A man is tested by his work and not by his talk."

সুরেন্দ্রনাথের এ কথার জবাব চিত্তরঞ্জন দিয়াছিলেন, দিয়াছিলেন তাঁহার কার্যের মাধ্যমেই কারণ চিত্তরঞ্জনই তখন হইতে দেশের নেতা।

মণ্টেগু মিশনের সম্মুখে পূর্বেও সুরেন্দ্রবাবু উপস্থিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বার (১৯১৮) মার্চ মাসে মিশনের আহ্বানে সুরেন্দ্রবাবু দিল্লীতে তাহাদের সঙ্গে মিলিত হন। স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে সুরেন্দ্রবাবু পূর্বে দৃঢ়তার সঙ্গে দেশের দাবীর কথা বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার সে কথা বিভিন্ন সময়ে তাঁহার সম্পাদিত কাগজ বেঙ্গলীতেও প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে এমন ভাবের কথা বলিয়াছেন যে উহা ভিন্ন কোন রকম সংস্কারই শিক্ষিত ভারতবাসীর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। তিনি বলিয়াছেন, "It is non-sense saying we don't want responsible Government, we are not fit for it. Those who breath a word against it in this crisis

of our national evolution are traitors to their country and God."

(Bengalee NV. 2,1917)

কিন্তু দ্বিতীয়বার মণ্টেগু মিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার পর বেশ লক্ষণীয়ভাবে সুরেন্দ্রনাথের মনের পবিবর্তন হয় এবং তাঁহার কথা-বার্তায় উহা প্রকটভাবে ফুটিয়া ওঠে। তিনি তখন বলিতে লাগিলেন, "আমরা যতটুকু পাই, ততটুকু গ্রহণ করিব এবং কাজ সুরু করিব।" সুরেন্দ্রনাথের মনের এই পরিবর্তিত ভাব লইয়াই তাঁহার দলের সত্যানন্দ বসুর নামে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইবার জন্য প্রচারপত্রও প্রকাশিত হইযাছিল।

ইস্তাহারের প্রতিবাদে আবার ইস্তাহার বাহির হয়। বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন ইন্দু সেন ও বিজয বসু, এই দুই জনের নামে প্রতিবাদের জবাব বাহির হইয়াছিল, "আমরা শাসন সংস্কারের খসড়া সত্বরই পাইব আশা করিতেছি, বাহির হইলেও কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্সের বিশেষ অধিবেশন হইবে। আশা করা যায় যে, তৎপূর্বে সকলেই নিঃসঙ্কোচে স্বীয় মতামত প্রদান করিবেন।"

এই প্রচারপত্রেরও তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছিল। এই সমালোচনা করিযাছিলেন স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ। তিনি তাহার 'বেঙ্গলী' কাগজে লিখিলেন, "The above circular was read with pain and regret. Old people have no-voice, we are wiser than our fathers."

[Bengalee 6th June 1918]

চিত্তরঞ্জনের একটি গুণ ছিল যে তিনি প্রতি পদে, প্রতি কথায ক্রোধান্বিত হইতেন না। কিন্তু ধৈর্যের একটি সীমা আছে। চিত্তরঞ্জনের সে ধৈর্যের সীমা তখন অতিক্রম কবিয়াছে এবং তাঁহার ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। তিনি তখন স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে একখানি ঘোষণা পত্র বাহির করিলেন। এই ঘোষণা পত্রে যাঁহারা সেদিন স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন আর যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা হইতেছেন রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, মতিলাল ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, এ, কে, ফজলুল হক প্রভৃতি। ঐ ঘোষণা পত্র এবং আরও অন্যান্য কাগজ পত্র সহ চিত্তরঞ্জন তখন কুতুবদিয়া অন্তরীণাবদ্ধ আসামীগণের পক্ষাবলম্বনের জন্য

চট্টগ্রাম রওনা হইয়া যান। চট্টগ্রামে ১৮ই জুন তারিখে বিশম্ভর থিয়েটার হলে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে চিত্তরঞ্জন বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং সে-সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন চট্টগ্রামের বিখ্যাত যাত্রা মোহন সেন। ইহার কয়েক দিন পরেই আবার আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে-সভায় তিনি ওজস্বিনী ভাষায় সুরেন্দ্রনাথের স্বরূপ প্রকাশের জন্য বেঙ্গলী কাগজ হইতে তাহার লেখা উদ্ধৃত করিয়া এবং তিনিও যে এক মঙ্গলময় আদর্শের জন্য যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন সে-বিষয় বক্তৃতা দেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "We have been told that the leaders of yesterday were the only people who can lead us I do not deny their claim to lead. I Want them to lead us. But if a man comes and says, look here you will have to do this, it does not matter what the people of Bengal want, I am the leader of Bengal, this has been done by me and it has got to be supported, well then my answer to him is –"Thou imposter" None has got the right, we stand or fall, as we pursue or desist from the popular cause. I am nothing, No leader is anything. The strength belongs to the nation whose representative I am, whose representative every one of us may become. It is not my own strength, it is people's strength. Take your stand on that and we will worship you as a leader, but fall short of that ideal once by hair's breadth, your claim is no longer to be recognised. If I have expressed strongly it is because I have felt deeply. I feel that I have been stabbed to the heart by this attitude, the contempt of public opinion."

ইহার পর অন্য এক সভায় চিত্তরঞ্জন স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "একশত পঞ্চাশ বৎসরের শাসনেও যদি আজ বুরোক্রেসী বলে, আমরা স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা লাভ করি নাই, তবে আমাদিগকে শিক্ষিত করিবার তাহার অক্ষমতাতেই মনে হয় আমাদের শাসন আমাদের হস্তেই

দেওয়া উচিত।"

তিনি আরও বলেন, "আমি সেই সময়ের অপেক্ষা করিতেছি যখন আমরা আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিতে পারিব। আমি সেই সময়ে নশ্বর দেহে বাঁচিয়া থাকি আর না থাকি, আমার সন্তান-সন্ততি জীবিত থাকুক কি না থাকুক, কিন্তু আমি দেখিতেছি অদূর ভবিষ্যতে ভগবদ্ প্রসাদে আমরা এমন শক্তি লাভ করিব যে এক মহিমান্বিত জাতিরূপে আমরা সকল ঐশ্বর্যে ভূষিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখীন হইতে সক্ষম হইব। এই আমার ব্রত, আর আমি বিশ্বাস করি ভগবান এই ব্রতের উদ্‌যাপনে আমাকে এখানে নিয়োগ করিয়াছেন। যদি এই সংগ্রামে মৃত্যুকেও আমার আলিঙ্গন করিতে হয় তাহাতেই বা কি আসে যায়? এই দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু আবার আসিব, আবার সমস্ত শক্তি দেশের কাযে নিয়োগ করিব, যে পর্যন্ত সিদ্ধি লাভ না হয়। আবার এই ভাবেই দেহপাত করিব।"

ইহার পর চিত্তরঞ্জন কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। আর ওদিকে ১৯১৮ সালের ২২শে এপ্রিল সিমলাতে এডুইন মণ্টেগু এবং বড়লাট বাহাদুর লর্ড চেম্‌সফোর্ড তাহাদের যুক্ত রিপোর্ট যাহা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘোষণায় 'মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড' রিপোর্ট নামে অভিহিত তাহাতে সহি করেন। এই স্বাক্ষর পর্ব সম্পাদন হওয়ার প্রায় আড়াই মাস পরে অর্থাৎ ১৯১৮ সালের ৮ই জুলাই তারিখে ঐ রিপোর্ট ভারতবাসীর অবগতির জন্য প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে মণ্টেগু চেম্‌সফোর্ড রিফর্ম রিপোর্টের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে কারণ ইংরাজ শুধু এতদিন ভারতবর্ষে রাজত্বই করিয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষের শাসনের যে সত্যিকারের সমস্যা সে সম্বন্ধে তাহারা এতটুকুও ভাবেন নাই। এই রিপোর্টে সেই দৃষ্টিভঙ্গির একটু পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের শাসনভার ভারতীয়দের হাতে ন্যস্ত করিবার পথে যে সব বাধা রহিয়াছে ঐ রিপোর্টে তাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন। আবার বাধা রহিয়াছে যেমন নিরক্ষরতা, দারিদ্র, শিক্ষিত সমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে পার্থক্য, গণতান্ত্রিক চেতনার অভাব ইত্যাদি ঐ রিপোর্টে তাহারা আলোচনা করিয়াছেন। আবার বাধা রহিয়াছে বলিয়া স্বায়ত্তশাসন দেওয়া চলিতে পারে না তাহাও তাহারা বলেন নাই বরং এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে সত্বরই শাসন যন্ত্রের পরিবর্তন হওয়া দরকার। রিপোর্টে

এক স্থানে বলা হইয়াছে, "unless we are right, in going forward now the whole of our past policy in india had been a mistake. We believe, however that no other policy was either right or possible, and therefore we must now face its logical consequences. Indians must be enabled, in so far as they attain responsibility, to determine for themselves what they want done.

[M. C. Report]

রিপোর্টে আর এক জায়গায় উল্লেখ রহিয়াছে, "Cautious advance towards the progressive realisation of responsible Government" সুতরাং বলা যায়, ইংরাজ-রাজ মানিয়া লইয়াছিল, ভারতবাসীর হাতে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে। তবে সেই পথে ভারতবাসীগণকে পৌছাইয়া দেওয়ার সময় যত্নবান হওয়া দরকার। অনেকের মতে সেই কারণেই এই রিপোর্টকে ভারতের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক না বলিয়া উহাকে আকাঙ্ক্ষায় পৌছাইবার প্রথম ধাপ রূপে অভিহিত করিয়াছেন। তাই দেখা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের শাসন আইন যাহা ১৯১৯ সালে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার মূল ছিল এই রিফর্ম রিপোর্ট এবং এই রিপোর্টের দরুণই পরবর্তী সময়ে দেশবন্ধু এবং গান্ধীজী ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে অগ্রসর হইতে থাকেন।—তবুও ভারতীয় জনগণ এই রিপোর্টকে সাদরে গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়াই মনে হয়, তাহা না হইলে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এই রিপোর্ট সম্বন্ধে নানাবিধ অভিমত প্রকাশ করিবেন কেন? আনি বেশান্ত এই রিপোর্ট সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "The Scheme is unworthy to be offered by England or to be accepted by India."

লোকমান্য তিলক বলিয়াছিলেন, "Montagu scheme is wholly unacceptable. It makes us believe that one morsel of representative Government is more than sufficient to satisfy our hunger for self-Government."

চিত্তরঞ্জন এই স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে তাঁহার মনের কথা অকপটে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "নামে স্বায়ত্তশাসন, অথচ কার্যত: কিছুই নহে, এমন

স্বায়ত্তশাসন আমরা চাহি না।……যদিও মিঃ মণ্টেগু আমাদিগকে বলেন, তোমরা অত এখন পাইবে না, যৎকিঞ্চিৎ—এই এক বিন্দু এখন লও। এ অবস্থায় কি করিব? আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশের লোকের এ সাহস আছে যে, তাহারা বলিতে পারিবে—আমরা উহার কিছুই চাহি না। তোমার দান ফিরাইয়া লও। যদি বুরোক্রেসীর দাসত্বই করিতে হয়, যদি প্রতিপদেই বাধা বিঘ্ন ঘটাইতে চাও, যদি বুরোক্রেসীর ইচ্ছা মাত্রেই আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে, তবে ঐরূপ সংস্কারে আমাদের প্রয়োজন নাই। তোমার জিনিস তুমিই ইংলণ্ডে ফিরাইয়া লইয়া যাও।"

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, সুরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার মণ্টেগু মিশনের সংগে দিল্লী হইতে সাক্ষাৎ করিয়া আসিবার পর বলিতে লাগিলেন "যতটুকুই পাই ততটুকুই গ্রহণ করিব।" সুরেন্দ্রনাথের এই অভিমতে চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। তাই তিনি চট্টগ্রামের বিশ্বম্ভর থিয়েটার হলে সুরেন্দ্রনাথকে ডিগবাজী খাওয়া লোক বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। উহা তাঁহার একপ্রকার রাজনীতি হইতে পশ্চাদবসরণই বলা চলে। প্রকৃত পক্ষে চিত্তরঞ্জন তখন ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রের বা ভারতীয় কংগ্রেসের পুরোভাগে আর সুরেন্দ্রনাথের অস্তগামী অবস্থা। তৎপরবর্তী সময়ে সুরেন্দ্রনাথকে আর রাজনীতি ক্ষেত্রে তেমন দেখা যায় নাই কিন্তু ছিলেন অন্যত্র। মডারেট কনভেন্সনের প্রধান রূপে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে আর দেখা গিয়াছে সংস্কার যখন প্রবর্তিত হইল সেই পরিবেশে বাংলা সরকারের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে। মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে যে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার কথা ইংরাজ সরকার স্বীকার করেন তাহার মধ্যে প্রকৃত পক্ষে মূল জিনিসটিই ছিল না। ক্ষমতা সবই ন্যস্ত থাকিবে কেন্দ্রের হাতে যেমন দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা, আইন, সৈন্য সবই সেখানে। প্রদেশে শুধু ছিঁটে-ফোঁটা। আমলাতন্ত্রকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইবে। গভর্ণর ও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ সাহায্যের জন্য তাহার এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিল থাকিবে এবং অন্য দিকে থাকিবে গভর্ণর ও কাউন্সিলে যাহারা নির্বাচিত হইবেন তাহাদের মধ্য হইতে নিযুক্ত করা কয়েক জন মন্ত্রী—অর্থাৎ প্রদেশে চলিতে থাকিবে দ্বৈতশাসন।

ভারতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে কোন বিষয়

জরুরী আলোচনার জন্য কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন সে পর্যন্ত হয় নাই। এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সাধারণ 'অধিবেশনের জন্য অপেক্ষায় না থাকিয়া উহার সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের জন্য বোম্বাইতে এক বিশেষ অধিবেশনের আহ্বান জানাইলেন। লোকমান্য তিলক তখন পর্যন্ত কোন অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন নাই। চিত্তরঞ্জনের তাই ইচ্ছা ছিল লোকমান্য তিলক ঐ বিশেষ অধিবেশনের সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু তিলক নিজেই উহাতে সম্মতি জ্ঞাপন না করিয়া বলিয়াছিলেন, "Doors should be opened for the seceders"—অর্থাৎ ভিন্নমত পোষণ-কারীদের জন্য দরজা উন্মুক্ত রাখা উচিত।

চিত্তরঞ্জন গান্ধীজীকে এই বিশেষ অধিবেশনের কথা বলেন এবং তাঁহার ইচ্ছা ও চেষ্টাতেই এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের জন্য যাতায়াত টেলিগ্রাম ও অন্যান্য খরচ বাবদ দেশবন্ধু দশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন বলিয়াও জানা গিয়াছে। যাহা হউক, তিলক যখন সভাপতি হইতে রাজী হইলেন না তখন দেশবন্ধু সৈয়দ হাসান ইমামের নাম সভাপতি হইবার জন্য প্রস্তাব করিলে সকলেই উহা অনুমোদন করেন।

কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশন বোম্বাইতে ২৯শে আগস্ট আরম্ভ হয় এবং উহা সেপ্টেম্বর মাসের ১লা তারিখ পর্যন্ত চলে। মডারেটগণ এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা পরে ঐ অধিবেশন বা কংগ্রেস বর্জন করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে প্রধান রাখিয়াই স্বতন্ত্র আর একটা রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি করেন। এই নূতন দলের নাম হইল, "ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল লিবারেল ফেডারেশন"।

চিত্তরঞ্জনের জাতীয়দল মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারের বিরুদ্ধে মত পোষণ করিলেন আর সুরেন্দ্রনাথের এই ফেডারেশন দল ঐ শাসন-সংস্কার ভারতীয়গণ কর্তৃক গৃহীত হউক সেই মতাবলম্বী হইয়া কার্য করিতে লাগিলেন। অধিবেশনে ইহাই প্রমাণিত হইল যে, ফেডারেশনের মতের মূল্য মূল্যহীন। পক্ষান্তরে ইহাও প্রমাণিত হইল যে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতেও চিত্তরঞ্জনের দলের সমর্থকগণই সংখ্যায় অধিক। ঘর এবং বাহির দুই-ই চিত্তরঞ্জনের হাতে, ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে তখন তিনিই প্রধান, তিনিই মুকুটহীন রাজা!

বোম্বাই-র এই বিশেষ অধিবেশন স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে আলোচনার জন্যই আহূত হইয়াছিল। সিদ্ধান্ত হিসাবে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছিল তাহাতে উল্লেখ ছিল, "while the Congress recognises that the proposals constitute an advance, it holds that the proposals as a whole are disappointing and unsatisfactory."

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই প্রস্তাবকে সমর্থন করিয়া অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত বক্তৃতা করিযাছিলেন। লোকমান্য তিলক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "we asked for eight annas of self-Government. The report gives us one anna of responsible Government and says that it is better than the eight annas of self Government.

[Lakamanya Tılak : Pradhan & Bhagat]

সুরেন্দ্রনাথের ফেডারেশন দল বোম্বাইতেই তাঁহাদের দলের আর এক ভিন্ন সভা আহ্বান করিলেন এবং আলোচ্য বিষয় ছিল ঐ একই বিষয়বস্তু, মণ্টেগু চেম্‌সফোর্ড রিফর্ম রিপোর্ট। সভাশেষে তাঁহাদের গৃহীত প্রস্তাবটি হইল, "ইহা সদাশয় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের একটি বড রকমের দান। আমরা ইহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত

১৯১৮ সালের ৮ই জুলাই মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিফর্ম রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং ১৯১৮ সালের ১৯শে জুলাই প্রকাশিত হয় 'রৌলট বিল।' একই দাতার প্রায় একই সময়ে দুই হাতে দুই বিপরীত ফল দান। ইংরাজ যে কতখানি রাজনীতিবিদ, সুচতুর, বলা যায় অত্যন্ত বিচক্ষণ কূটনৈতিক তাহা ঐ রিফর্ম রিপোর্ট ও রৌলট বিল পাশাপাশি স্থাপন করিয়া বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায়।

সুতরাং চিত্তরঞ্জন ঐ বিশেষ অধিবেশনে রৌলট বিল সম্বন্ধেও উহার বিরোধিতা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বাংলার বিপ্লববাদীদের সংগে তাঁহার নাড়ীর সংযোগ ছিল, বাংলার বিপ্লবের ইতিহাস ছিল তাঁহার নখদর্পণে। তাই তিনি বলিয়াছিলেন, "This Repot is Calculated to arm the Government with the same emergency powers for suppressing political activities as it had enjoyed during the war period. The whole Report comes to me as a rude shock."

এই বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজীও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও চিত্ত-রঞ্জনের সুরে সুর মিলাইয়া ঐ অধিবেশনেই বলিয়াছিলেন, "The Report is unjust, subversive of all the principles liberty and justice and destructive of the elementary rights of the individual.'

শুধু এই বক্তৃতাই নহে। গান্ধীজী অসুস্থ অবস্থায় তাঁহার রোগশয্যা হইতেও যাহাতে এই Black Bill (গান্ধীজী নাম দিয়াছিলেন) আইনসিদ্ধ না হয় সেই জন্য বড়লাট বাহাদুর লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডকেও অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ইহাও জানাইয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে ঐ 'বিল' পাশ হইলে সারা ভারতে একটা প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষে বিপ্লবীদের ক্রিয়া-কর্ম অনেক পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। বিশেষ করিয়া বাংলা ও মাদ্রাজে। এই ক্রিয়া-কর্মের একটা সর্বাঙ্গীণ তদন্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা ইংরাজ সরকার অত্যন্ত জরুরী বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯১৪ সালে ইউরোপ খণ্ডে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় তাহারা সেদিকে মনোনিবেশ করিতে না পারিয়া ভারতবর্ষের শান্তি, শৃঙ্খলা এবং আইন যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই উদ্দেশ্যে 'ভারতরক্ষা আইন' নামে একটা সাময়িক আইন পাশ করিয়া সেই আইনের সহায়তায় অনেককে আটক করিয়া রাখে। যুদ্ধ চলাকালীন সময় পর্যন্ত ছিল ঐ আইনের জীবন। যুদ্ধ শেষ হইলে তাহারা তাহাদের পূর্ব মতে ফিরিয়া গেল। ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীদের সম্বন্ধে একটা তদন্ত এবং রিপোর্ট তৈয়ারী করিবার জন্য ইংলণ্ডের হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার সিডনী রৌলটকে সভাপতি করিয়া এবং অপর চারজন সদস্য যথা বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি বেসিল স্কট, মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি কে, শাস্ত্রী, স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র ও স্যার লোভেট ফ্রেজারকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ছয় মাস তাহাদের খোঁজ-খবর, অনুসন্ধানের পর যে রিপোর্ট প্রকাশিত করেন তাহাই ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনে 'রৌলট বিল' নামে পরিচিত। এই বিলটির বিচার করিয়া ভারতবাসীগণ যাহা বুঝিল তাহার মূল কথা এই, যে সমস্ত রাজনৈতিক মোকদ্দমা হইবে তাহার বিচার করিতে জুরিগণের আর প্রয়োজন হইবে না। দ্বিতীয়তঃ সরকারের চোখে যিনি সন্দেহভাজন ব্যক্তি তাহাকে

কোন রকম বিচার না করিয়াই অন্তরীণ করিয়া রাখা চলিবে এবং সেই অন্তরীণাবদ্ধের মেয়াদ প্রাদেশিক সরকারের খুশীর উপর নির্ভর করিবে।

ওদিকে মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে ভারতীয়দের হাতে ক্রমে ক্রমে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার কথা ঘোষণা আর এদিকে সেই ভারতবাসীকে সন্দেহ হইলেই বিনাবিচারে যত দিন অন্তরীণ রাখার আইন ঘোষণা! এই উপলক্ষে Hutchinson তাঁহার The Empire of the Nabobs নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলিয়াছেন, "The contrast between the Montagu chelmsford proposals and the Rowlatt Bills was the contrast between the shadow and the reality."

মহাত্মা গান্ধীজী তখন সবরমতী আশ্রমে। খবরের কাগজে তিনি উহা পড়িয়াছিলেন। পড়িয়া অপমানিতবোধ করিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "আমি যখন সংবাদপত্রে রৌলট কমিটির রিপোর্ট পাঠ করলাম তখন এর সুপারিশগুলি আমাকে রীতিমতো চমকিত করে দিল।" এই দিক হইতে বিচার করিলে, ইহাও এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া অভিহিত করা যায় যে, এই রৌলট বিলকে কেন্দ্র করিয়াই ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীজী এবং দেশবন্ধুর শুভ যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

মহাত্মা গান্ধীজী চলিয়া আসিলেন আমেদাবাদ এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, "Something must be done"

প্যাটেল বলিলেন, এ অবস্থায় আমরা কি করিতে পারি? উত্তর করিয়াছিলেন গান্ধীজী, If even a handful of men could be found to sign the pledge of resistance, and proposed measure is passed into law in defiance of it, we ought to offer Satyagraha at once.

এই উদ্দেশ্যে গান্ধীজী একটি ছোট সভার আহ্বান করিয়াছিলেন। খুব কম সংখ্যক, বেশী হইলে জন কুড়ি লোক উহাতে উপস্থিত হইয়া সত্যাগ্রহ করিবেন বলিয়া স্থির করেন। সত্যাগ্রহ করিবার মানসে, যে প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করিতে হইবে উহার খসড়াও ঐ সভাতেই লিখিত হয়।

ইতিপূর্বে বোম্বাইতে কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে

চিত্তরঞ্জন সংস্কার বিলের সঙ্গে এই রৌলট বিলের সম্বন্ধেও বলিয়াছিলেন। উহার পর কংগ্রেসের নিয়মানুযায়ী ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে চিত্তরঞ্জনই প্রধান। কিন্তু সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। বাংলাব জাতীয়তাবাদী দলের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, আনি বেশান্ত, সর্দার প্যাটেল, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, বি, এন, শর্মা। উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন মডারেট নেতাও।

চিত্তরঞ্জন মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিফর্ম এবং স্যার সিডনী রৌলট কমিটির রিপোর্টের বিরোধিতা করিয়া দিল্লী অধিবেশনে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাঁহার সে বক্তৃতায়ও নূতনত্ব ছিল। কলিকাতায় কংগ্রেসের অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সভানেত্রী আনি বেশান্ত, বিলম্ব হইলেও অন্ততঃ ১৯২৮ সালের মধ্যে জাতির হাতে স্বায়ত্তশাসনের ভার ন্যস্ত করিবার জন্য উল্লেখ করিয়াছিলেন। এখানেও (দিল্লী অধিবেশনে) চিত্তরঞ্জন সেই সময়ের সীমা নির্ধারণের উপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। শাসন সংস্কার সম্বন্ধে তিনি পূর্বেও বিরোধিতা করিয়া বহু স্থানে বহু কথা বলিয়াছেন। এখানেও তাহার ব্যাতিক্রম হইল না বরং বেশ জোরের সংগে বলিলেন, "The greatest opponent of self-Government is not the British Parliament but Indian Civil Service. Introduction of self-Government in this country is the death of Bureaucracy. Can any reasonable man expect that the Bureaucracy will quietly put an end to itself. I therefore ask you to insist that a time limit should be put in the statute."

এই সময়ের সীমা নির্ধারণ সম্পর্কে চিত্তরঞ্জন পনের বৎসর সময়ের কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মূল প্রস্তাব, যাহা পূর্বে বোম্বাই অধিবেশনে পাশ হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ঐ প্রস্তাবের দুইটি শব্দ ব্যবহারে তাঁহার আপত্তির কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল disappointing and unsatisfactory এই শব্দ দুইটি প্রস্তাব হইতে পরিত্যাগ করা হউক। দ্বিতীয়তঃ তিনি সময় নির্ধারণ সম্বন্ধেও চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে একমত হইতে

পারেন নাই। ঐ দুইটি শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে শাস্ত্রী আপত্তি জানাইলে চিত্ত-রঞ্জন উত্তর দিতে উঠিয়া বলিলেন, "I take objection to Shri Shastri's move to delete the words 'disappointing and unsatisfactory.' I ask you to put your hands on your hearts and answer the question for yourselves whether you are satisfied or disappointed."

এতক্ষণের নীরব নিস্তব্ধ সভা চিত্তরঞ্জনের ঐ জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া উঠিল সমস্বরে, না···না আমরা সত্যই নিরাশ হইয়াছি, আমরা সত্যই সন্তুষ্ট নই······আমরা সন্তুষ্ট নই।

শাস্ত্রীর কণ্ঠস্বর, শাস্ত্রীর আপত্তি জনতার সমস্বরের উত্তরে অতলে তলাইয়া গেল। মূল প্রস্তাবটি 'পাশ' হইল অক্ষত দেহে। চিত্তরঞ্জনের জয়জয়কার। তাঁহার এই জয়জয়কার এবং বক্তৃতা সম্বন্ধে বাংলার একজন বিখ্যাত বাগ্মী জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সারাংশ এই: তখন শীতকাল। দিল্লীতে কন্‌কনে শীত। সেদিন দ্বিতীয় দিনের প্রকাশ্য অধিবেশন। শাসন সংস্কার বিলের সমর্থন করিয়া এবং বিরোধিতা করিযা বক্তার পর বক্তা বক্তৃতা দিয়া চলিয়াছেন। রাত গিয়া পৌঁছিয়াছে গভীরে। বারোটা বাজে। তখন বক্তৃতা করিবার জন্য মঞ্চে উঠিলেন চিত্তরঞ্জন। সকলের চোখের ঘুম ছুটিয়া পালাইল, সকলেই সোজা হইয়া বসিলেন, হইলেন সচকিত। ত্রিবাঙ্কুরের বৃদ্ধ দেওয়ান ভি, পি, মাধব রাও সেই শীতের মধ্যেও জিতেন্দ্রলালকে দর্মার ঘরে টানিয়া লইয়া, তাহাকে কাছে বসাইলেন। চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতায় তিনি যে কতখানি মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহারই অভিব্যক্তি স্বরূপ জিতেন্দ্রলালকে বলিলেন, "How beautifully Das S[illegible]d up! I never saw anything like it."

কিন্তু দেশময় বিরোধিতা সত্ত্বেও ইংরাজ যাহা ইচ্ছা তাহা করিলই। ১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ রৌলট কমিটির বিলটি আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ হইল।

আমেদাবাদের সেই ক্ষুদ্র কন্‌ফারেন্সে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গান্ধী যে সত্যাগ্রহের ক্ষুদ্র বীজ রোপণ করিয়াছিলেন সেই বীজ তখন অঙ্কুরিত। পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন। দ্বিতীয়বার আবার তাঁহার সেই

অস্ত্র ধারণ এবং ভারতবর্ষের মাটিতে উহাই হইল তাঁহার প্রথম সত্যাগ্রহ।

৬ই এপ্রিল ভারতের ইতিহাসে একটি নূতন দিন—সেদিন নূতন দিনের নূতন সূর্য উঠিল ভারতের রাজনৈতিক আকাশে। ৬ই এপ্রিল সারা দেশ-ব্যাপী কর্মবিমুখতা। মাঠে-ঘাটে, কলে-কারখানায় কাজ বন্ধ, ঘরে ঘরে উপবাস এবং মানুষের প্রার্থনায় দিনটি অতিবাহিত হইল। মহাত্মা বলিলেন, "Satyagraha is a religious movement. It is a process of purification and penance. It seeks to secure reforms of grievances by Self suffering. A satyagrahi or civil Resister considers laws to be good for the welfare of Society. But there are occasions, generally rare, when he considers Certain laws to be so unjust as to render obedience to them a dishonour, he then openly and civilly breaks them and quietly suffers the penalty for their breach?"

মহাত্মার উপরোক্ত অভিমতের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের যথেষ্ট মনের মিল পাওয়া যায়। 'আলিপুর বোম্ কেস,' 'বন্দেমাতরম্ মোকদ্দমা,' 'কুতুবদিয়া' প্রভৃতি রাজনৈতিক মোকদ্দমাগুলিতে চিত্তরঞ্জন বিপ্লবীদের ক্রিয়া, কর্ম এবং চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ঠিক তেমন কথারই অবতারণা করিয়াছেন। তখন মহাত্মা গান্ধীর বিঘোষিত রৌলট আইনের প্রতিবাদ দিবস ৬ই এপ্রিল কলিকাতার অক্টারনলি মনুমেণ্টের পাদদেশে [বর্তমান শহীদ মিনাব] সেদিনের উপবাসী চিত্তরঞ্জন যে তেজ-বীর্যময় বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা জাতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বলিয়াছিলেন, "সত্যাগ্রহ প্রেমের বল, যদি কেহ স্বদেশকে ভালবাস, স্বজাতিকে ভালবাস, তবে মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারিবে, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। এই আন্দোলন সমগ্র দেশকে লইয়া, এই আন্দোলন প্রেমের আন্দোলন, ধর্মের আন্দোলন। ইহা ইংরাজী রাজনীতিপ্রসূত নহে।"

সত্যাগ্রহী হইবার জন্য যে প্রতিজ্ঞাপত্র রচিত হইয়াছিল উহার অন্তর্নিহিত ভাব আর ভাষা চিত্তরঞ্জনকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং প্রকৃতপক্ষে গান্ধীর সত্যাগ্রহের মধ্যে যে প্রেমের অমোঘ শক্তি লুকায়িত ছিল উহা চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসভরে স্বীকার করেন। তাই বক্তৃতা প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়াছিলেন,

"আজ মহাত্মা করমচাঁদ গান্ধীর দিন। আজ বাঙালীর হৃদয় বেদনা প্রকাশের দিন। আনন্দের দিনে আমরা আত্মহারা হয়ে যাই, কিন্তু দুঃখের দিনে ভগবানের বাণী শুনতে পাই। সত্যাগ্রহ প্রেমের ফল"।......

ভারতের প্রদেশে প্রদেশে শহরে শহরে প্রতিবাদ, প্রার্থনা, হরতাল। জানা গিয়াছে যে গ্রামের ক্ষেত-খামারে কৃষক-মজুর পর্যন্ত হাল চালনা আর মোট বহন করা হইতে বিরত ছিলেন। হরতাল সফল তাই অশান্তি সৃষ্টি হইয়াছিল অনেক স্থানে। দিল্লী, কলিকাতা, অমৃতসর, বোম্বাই ও আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে এই প্রতিবাদী বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশ গুলি বর্ষণ করিয়াছিল। গান্ধীজী স্বাভাবিকই ইহা ভাবিতে পারেন নাই। তিনি খুব বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং জনতা যাহাতে হাতের বাহিরে চলিয়া না যায় সেজন্য পাঞ্জাব ও দিল্লী যাইবার উদ্দেশ্যে বোম্বাই হইতে দিল্লী রওনা হইলেন। বহুস্থানে গুলি চালাইয়া সরকার তখন ক্ষিপ্ত। পথের মাঝেই গান্ধীজীকে অবরোধ করা হইল এবং আটক করিয়া ৯ই এপ্রিল বোম্বাই ফিরাইয়া আনা হইল। সংবাদের গতি দ্রুততম। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত রাষ্ট্র হইয়া গেল গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পুলিশের গুলি বর্ষণ, দমন নীতি এ· সব কিছুর প্রবলতর প্রতিবাদে পাঞ্জাব শক্তিশালী বোমার মত ফাটিয়া পড়িল। ৬ই এপ্রিল অমৃতসর শহরে কোন দুর্ঘটনা ঘটিল না। পরের দিন ৭ই ছিল রাম নবমী। সেদিনের সেই উৎসবে মুসলমানগণ জল দান করিতেছে আর অঞ্জলি ভরিয়া হিন্দুগণ তাহাদের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে। এই দৃশ্য সত্যই সুন্দর। ভারতের দুই সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই মিলনের এই মনোরম দৃশ্য দেখিয়া ইংরাজ সরকার হতবাক হইয়া গেল। তাহারা স্থির করিল, এই মিলন বন্ধন ছিন্ন করিতেই হইবে; ছড়াইতে হইবে এক জাতির মধ্যে অন্য জাতির বিদ্বেষের বিষ। এই উদ্দেশ্যেই ইংরাজের প্রতিটি কার্যকলাপে তখন হইতেই নূতন নীতি 'Divide and Rule' দেখা গেল।

অমৃতসর শহরে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিলন নাটকের নাট্যকার সেখানকার দুই বিখ্যাত ডাঃ কিচলু আর ডাঃ সত্যপাল। তাঁহারা দুই জনই ব্যবসায়ে ডাক্তার। এতদিন তাঁহারা রোগীদিগকে ঔষধ দিয়াছেন। এবার

সরকার তাঁহাদিগকেই নূতন ঔষধ দিয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিল।

ডেপুটি কমিশনার মিঃ আরভিং উভয় ডাক্তারকেই দেশের মঙ্গলের জন্য কোন এক জরুরী আলোচনায় যোগদান করিতে সকাল ৮টার মধ্যে তাহার বাংলোয় যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ পাঠাইল। দেশের সেবায় নিয়োজিত প্রাণ দুই ডাক্তারের। আরভিং-এর নিমন্ত্রণ যে সত্যিকারের দেশের কোন জরুরী আলোচনার জন্য নহে, শুধু মাত্র ছলনা উহারা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। পরিণামে যাহা হওয়ার তাহাই হইল। কোথায় দেশের মঙ্গলের জন্য জরুরী আলোচনার নিমন্ত্রণ! তবে হ্যাঁ, নিমন্ত্রিতদের অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যাওয়ার জন্য পুলিশের গাড়ী প্রস্তুত-ই ছিল। ১০ই এপ্রিল তাঁহাদের দুইজনকে গ্রেপ্তার করিয়া, আলাদা গাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল কোথায় কে জানে!

খবর ছড়াইয়া পড়িল। অমৃতসর শহরের সকলের মুখে মুখে তখন এক অবজ্ঞার কথা,—কি বেইমান ইংরাজ! সব ছুটিয়া গেল আরভিং-এর বাংলোয়। মুখে তাহাদের এক দাবী, এক কথা,—আমাদের নেতাদের আমরা চাই নয়তো আমরা কচু-কাটা করব'।

স্যার মাইকেল ওডায়ার সেই সময় পাঞ্জাবের শাসনকর্তা। সে ঐ উত্তেজনা দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইল এবং সমগ্র পাঞ্জাবে সেই দিনই সামরিক আইন জারি করিল।

এই সামরিক আইন, সরকারের নিষ্ঠুরতম দমননীতি আর পঞ্চনদের বুকের সব মানুষের বুকে বুকে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ আর উত্তেজনার পরিণতি, ১৩ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত ইংরাজের জীবনের সব চাইতে ঘৃণ্য, কলঙ্কিত অধ্যায়, পাঞ্জাবের নিরস্ত্র জনগণের উপর বৃষ্টির মত ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষণ এবং হত্যা। ইতিহাসের পাতায় ইহা স্যার মাইকেল ওডায়ারের আদেশে জেনারেল ডায়ারের জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড।

সারাদেশ আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাইট-হুড্ রূপ রাজমুকুট আন্তরিক দুঃখ ও বেদনায় অত্যন্ত ঘৃণাভরে রাজপ্রতি-নিধির মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। যে ঐতিহাসিক চিঠিখানি রবীন্দ্রনাথ বড়লাট চেমস্‌ফোর্ডকে লিখিয়াছিলেন তাহার যথা সম্ভব বাংলা অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল:

মান্যবরেষু

পাঞ্জাব সরকার স্থানীয় গোলযোগ দমন করিতে যে প্রচণ্ড দমননীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে আমরা ভারতবর্ষে বৃটিশ প্রজা হিসাবে কত যে অসহায় উহাই আমাদের কাছে রূঢ় স্পষ্টরূপে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ঐ হতভাগ্যদের প্রতি যে প্রচণ্ড শাস্তি বিধান করা হইয়াছে এবং ঐ শাস্তি যে পদ্ধতিতে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে আমরা দৃঢ় নিশ্চিত হইয়াছি যে, সাম্প্রতিক কালে অথবা প্রাচীন কালের অল্প কয়েকটি দৃষ্টান্ত বাদ দিলে কোন সুসভ্য সরকারের ইতিহাসে উহার তুলনা বিরল। নরহত্যার সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ সাংগঠনিক ক্ষমতায় বলীয়ান রাজশক্তির নিরস্ত্র, নিঃসহায় জনতার উপর এই আচরণ বিবেচনা করিলে আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত বলিতে পারি যে ইহার কোন রাজনৈতিক সার্থকতা নাই, নীতিগত কোন যুক্তিও নাই। পাঞ্জাবের ভ্রাতা-ভগ্নিগণ যে নির্যাতন, যে অপমান সহ্য করিয়াছেন তাহার বিবরণ নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া ভারতের প্রতিটি কোণে কোণে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু ভারতবাসীর হৃদয়ে ইহাতে যে উদ্বেগ ও বেদনা সঞ্চার হইয়াছে তাহা শাসকবর্গ উপেক্ষা করিয়াছেন। ঐ শাসকবর্গ এই বলিয়া নিজেদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছে যে তাহারা এক উপযুক্ত শিক্ষাদান করিয়াছেন। ইঙ্গ-ভারতীয় পত্রিকাগুলি অধিকাংশ এই নির্মম হৃদয়হীনতাকে প্রশংসা করিয়াছে। কোন কোন ইঙ্গ-ভারতীয় পত্রিকা আমাদের এই নির্যাতন লইয়া এমন কি পরিহাসও করিয়াছে। এবং ইহা করিয়া শাসকবর্গের নিকট হইতে তাহারা বরং প্রশ্রয়ই পাইয়াছে। কোন পত্র-পত্রিকা যদি নির্যাতিতদের সুবিচারের প্রার্থনা অথবা বেদনার কথা প্রকাশ করিয়া থাকে তবে ঐ শাসকবর্গ তাহাকে সযত্নে মুছিয়া ফেলিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। আমরা জানি যে, আমাদের সকল আবেদন বিফল হইয়াছে এবং আমাদের সরকারের রাজনীতিবিদ সুলভ উদার, মহান দৃষ্টিকে, প্রতিশোধ লইবার আকাঙ্ক্ষা, অন্ধ করিয়া দিয়াছে। ঐ শাসকবর্গ নিজ চিরাচরিত ঐতিহ্য এবং বিপুল শক্তির সহিত শোভন-সঙ্গত ভাবে অতি সহজেই উদারতা প্রদর্শন করিতে পারিতেন। এই সকল বিবেচনা করিয়াই, দেশবাসীর জন্য আমার সামান্য করণীয় সম্বন্ধে আমি এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে, আমার লক্ষ-কোটি আতঙ্ক স্তব্ধ মূক দেশবাসীর প্রতিবাদকে আমি সোচ্চার

করিয়া নিজেই উহার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম। এখন সময় আসিয়াছে যখন অবমাননার এই অসঙ্গতিপূর্ণ পরিবেশে সম্মানের সকল নিদর্শন আমাদের লজ্জাকে আরও প্রকট করিয়া তুলিয়াছে, তাই আমি নিজে সকল বিশেষ সম্মানের প্রতীক বর্জিত হইয়া আমার দেশবাসীর পার্শ্বেই দাঁড়াইতে চাই। আমার দেশবাসী দারিদ্র্য পীড়িত, তাহারা অমানুষোচিত লাঞ্ছনা, অপমান সহ্য করিয়া থাকে। এই সকল কারণে মান্যবরকে আমি যথোচিত শ্রদ্ধা ও দুঃখসহকারে অনুরোধ করিতে বাধ্য হইতেছি যে, তিনি যেন আমাকে 'নাইট-হুড' উপাধি হইতে ভারমুক্ত করেন, এই উপাধি আমি মহামান্য রাজা বাহাদুরের নিকট হইতে আপনার পূর্বতন বড়লাট বাহাদুরের মাধ্যমে গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহার হৃদয়বত্তার জন্য আমি আজও শ্রদ্ধাশীল।

কলিকাতা   আপনার বিশ্বস্ত
৬, দ্বারকানাথ ঠাকুর রোড   রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩০শে মে, ১৯১৯

গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অন্যরূপ। ইংরাজের বিরুদ্ধে এমন একসূত্রে গাঁথা, সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভারতবাসীর জাগরণ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনে গান্ধীজী তাঁহার সত্যাগ্রহের পবিত্রতা নষ্ট হইয়া গেল বলিযা মনে করিলেন। 'India Today' গ্রন্থে R. Palme Dutt বলিয়াছেন, "Gandhi took alarm at the situation which was developing. Accordingly he called off the movement at the moment it was begining to reach its height.

চিত্তরঞ্জন গান্ধীজীর সঙ্গে এ-বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ হউক ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। তিনি ১৯১৯ সালে মে মাসে মৈমনসিংহে প্রাদেশিক সম্মেলনীর অধিবেশনে সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়া বিষয় নির্বাচনী সভায় একটি প্রস্তাব পাশ করাইয়া লন কিন্তু প্রকাশ্য অধিবেশনে ঐ প্রস্তাবটি পাশ হয় না। কন্যা এবং জামাতা সুধীর রায় তাঁহার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন। বাসন্তী দেবী তাঁহার পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। জানা যায়, চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন যে, এই সব রিজলিউসন করিয়া কিছু করা যাইবে না। গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসর তো বহু রিজলিউশন করা হইয়াছে,—কি হইয়াছে

তাহাতে। এখন কিছু করিতেই হইবে। জানা গিয়াছে যে, তিনি সত্যাগ্রহ করিয়া কারাবরণ করিতেও সেই সময় প্রস্তুত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার বন্ধু-বান্ধব অধিকাংশই তাঁহাকে উহা হইতে নিরস্ত রাখেন।

এই সময় পাঞ্জাবের সমস্ত ঘটনাবলীর তদন্ত করিবার জন্য সরকার 'হাণ্টার কমিশন' নামে একটি কমিটি গঠন করেন। মতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু প্রভৃতি ভারত বিখ্যাত আইনবিদগণ উপস্থিত থাকিয়া সাক্ষীগণকে জেরা করিবেন বলিয়া ঠিক ছিল। তাঁহারা ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যেমন মাইকেল ওডায়ার, জেনারেল ডায়ার প্রভৃতি উপস্থিত থাকিবেন, সেইরূপ ডাঃ কিচলু প্রভৃতিকেও .কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত করা হউক। কিন্তু সরকার উহাতে সম্মত না হওয়ায় 'হাণ্টার কমিশন' বয়কট্ করা হয়।

কিন্তু ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে নীরব রহিলেন না। সব কিছু তদন্তের জন্য একটি ভারতীয় কমিটি গঠিত হইল। এই কমিটিতে ছিলেন দেশবন্ধু, মতিলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধীজী, আব্বাস তায়বোজী এবং ফজলুল হক্। কিন্তু হক্ সাহেব অন্য কার্যে ব্যাপৃত থাকায় তাহার স্থলে আসেন জয়াকর। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন মহাত্মাজী।

ইতিপূর্বে দেশবন্ধুর সঙ্গে গান্ধীজীর যতটুকু পরিচয় হইয়াছে তাহাতে তিনি দেশবন্ধু সম্বন্ধে তেমন কোন উচ্চ ধারণা পোষণ করিতে পারেন নাই। দূর হইতে দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন এবং ভ'নিয়াছেন যে চিত্তরঞ্জন শুধু বিখ্যাত আইনজীবী, সাহেবী আদব-কায়দায় জীবন যাপন করেন এবং অত্যন্ত বিলাসী। আর তাঁহার দেশপ্রেম? সে সম্বন্ধে গান্ধীজীর স্বচ্ছ ধারণা ছিল না বলিয়াই মনে হয় কারণ চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে তাঁহার লেখাতেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। ১৯২৫ সালের ১৯শে জুন ফরোয়ার্ড কাগজে গান্ধীজী লিখিয়াছিলেন, "পাঞ্জাব ঘটনার অনুসন্ধানের জন্য তিনি পাঞ্জাবে গিয়াছিলেন কিন্তু নিজ ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি রাজার ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। তাহার নিকট শুনিয়াছি যে সেইবার পাঞ্জাবে থাকিবার সময়ে তাঁহার পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।"

ঐ ফরোয়ার্ড কাগজেই গান্ধীজী ২৫শে জুন চিত্তরঞ্জন ও পাঞ্জাব অনুসন্ধান সম্বন্ধে আবার লিখিয়াছিলেন, "১৯১৯ সালে পাঞ্জাব তদন্ত সমিতিতে প্রথম এই মানুষটির সঙ্গে আমার সত্য পরিচয় ঘটে। আমি সমিতিতে ত্রস্ত অন্তঃকরণে,

সন্দেহ সঙ্কুচিত চিত্তে যোগ দিয়াছিলাম। কারণ, তফাৎ থেকে তাঁর ব্যার-স্টারীর যশ ও প্রচুর অর্থোপার্জনের খ্যাতি আমার কর্ণগোচর হয়েছিল ; তিনি মোটরকারে পত্নী ও পরিবারবর্গ সহ এসেছিলেন এবং রাজার হালেই থাকতেন। প্রথমটা এসব দেখে অবশ্য আমি খুশী হইনি। আমি দেখেছিলাম যে আইনের মার-প্যাঁচ বুঝতে, সাক্ষীকে জেরা করে নাজেহাল কর্তে এবং সামরিক আইন সম্মত শাসন প্রণালীর দোষগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল, আমি মনে মনে চিন্তা কর্তে লাগলুম। কিন্তু দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হইবার পর আমার সকল সন্দেহের অবসান হইল এবং আমার আশঙ্কাও দূর হইল। তিনি যেন যুক্তির অবতার ছিলেন এবং আমার যা বলবার ছিল তা খুব আগ্রহের সঙ্গেই শুনলেন। ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লোকেদের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে সম্পর্কিত হওয়া সেই আমার প্রথম। দূর থেকে কেবল নামেই আমাদের চেনা পরিচয় ছিল। কংগ্রেসের ব্যাপারে ইতিপূর্বে আমি বড একটা সংশ্লিষ্ট ছিলাম না। দক্ষিণ আফ্রিকার জন্যে লড়ে ছিলুম বলেই আমার যা একটু নাম ছিল। কিন্তু আমার সহযোগিগণ সকলেই আমার সঙ্গে খুব অসঙ্কোচ ভাবে মেলামেশা করেছিলেন এবং সবচেয়ে বেশী মিশেছিলেন ভারতের এই বরেণ্য সন্তানটি। আমিই তদন্ত কমিটির সভাপতি ছিলাম এবং আমাদের মতেরও প্রায় ঐক্য হয়ে আসছিল তথাপি তাঁর প্রতি যে আমার সামান্য সন্দেহ জেগেছিল সেটুকু দূর করবার জন্য তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে বল্লেন, "যদি কোথাও আপনার সঙ্গে আমার মত না মেলে, সেখানে আমার যা বলবার আছে তা আমি বলব, তবে এটা স্থির জানবেন যে বিচারে যা সিদ্ধান্ত হবে তা আমি মাথা পেতে নেব।" তাঁর কথা শুনে এমন যোগ্য সহযোগী পাবার সৌভাগ্য লাভ করেছি ভেবে, বুক যেন গৌরবে ভরে গেল ; তেমনি আবার নিজের মনের ক্ষুদ্রতার কথা মনে পড়াতে একটু নিজেকে যেন 'ছোট' ভাবতে লাগলুম।"

এই তদন্ত কমিটি প্রায় সাড়ে তিন মাস কাল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তদন্ত কার্য শেষ করেন। এই কার্যে চিত্তরঞ্জনের আগ্রহ, নিষ্ঠা দেখিয়া কমিটির অন্যান্য সভ্যগণ অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি ঐ তদন্ত কার্যোপলক্ষে নিজের পকেট হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়

করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ সাড়ে তিন মাসে তিনি আইন ব্যবসা করিয়া আরো যে কত টাকা উপার্জন করিতে পারিতেন তাহাও ভাবিবার বিষয়।

এই কমিটি যে রিপোর্ট প্রদান করেন তাহাকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একভাগে, দেশের জনগণের কাছে জালিয়ানওয়ালাবাগের ঐ নির্মম নিষ্ঠুর ও অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত বিবরণ উন্মুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে আর অন্যভাগে ঐ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের যে দাবী, সেই দাবী দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ দাবীর মধ্যে ছিল, বড়লাট বাহাদুর লর্ড চেম্‌সফোর্ডের অবিলম্বে পদত্যাগ, প্রত্যক্ষ হত্যাকারী ওডায়ার প্রভৃতির নিষ্ঠুর ক্রিয়া-কর্মের জন্য উপযুক্ত বিচার, রৌলট আইন তুলিয়া লওয়া এবং সামরিক আইনে যে জরিমানা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা প্রত্যার্পণের ব্যবস্থা করা।

আবেদন ঐ আবেদনের পাতাতেই লিপিবদ্ধ রহিল, উপরন্তু হত্যাকাণ্ডের নিষ্ঠুরতাকে ছাপাইয়াও তাহাদের পরবর্তী কার্যের মধ্যে আরও নিষ্ঠুরতর ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া গেল। সরকার কমিটির আবেদন অনুযায়ী অপরাধীদের শাস্তিবিধান না করিয়া তাহাদের কার্যের তারিফ করিয়া পুরস্কার দিলেন। ইহাও জানা গিয়াছে যে, ঐ নিষ্ঠুরতম হত্যাকারীদের স্মৃতি রক্ষার জন্য ইংরেজ মহিলাগণ নৃত্যগীতের ব্যবস্থাও করিয়াছিল।

এদিকে ভারত সম্রাটের সম্মতি সহকারে The Government of India Act, 1919 ডিসেম্বর মাসের ২৪ তারিখে ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল। মণ্টেগু সাহেবও ঐ সঙ্গে, ভারতবাসীগণ যাহাতে উহা গ্রহণ করেন সেই জন্যে এক আবেদন জানান।

ভারতের অবস্থা তখন সহজেই অনুমেয়। Government of India Act, 1919 জারী করা হইল। পাঞ্জাবে মানুষের রক্তে রক্তে গঙ্গা প্রবাহিত হইয়াছে, যাহারা ঐ নিষ্ঠুরতম কার্যের জন্য দোষী তাহাদের ভারতীয় তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী শাস্তি প্রদান না করিয়া উপরন্তু পুরস্কৃত করা হইয়াছে। পারিপার্শ্বিক এই অপমান-আহত অবস্থাতেই অমৃতসরে কংগ্রেসের ৩৪তম অধিবেশন আরম্ভ হইল।

এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য প্রথমে লোকমান্য তিলকের নাম প্রস্তাবিত হইলে, তিনি ঐ প্রস্তাবে তাঁহার সম্মতি প্রদান করিলেন না।

অবশেষে উক্ত সভার জন্য সভাপতি নির্বাচিত করা হইল পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে এবং অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হইলেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। জাতির জীবনে ইহা একটি লজ্জার কথা যে কংগ্রেসের জন্মলগ্ন ১৮৮৫ সাল হইতে লোকমান্য তিলক কংগ্রেসের সেবা করিয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু কোন অধিবেশনেই তাহাকে সভাপতি রূপে আসন অলঙ্কৃত করিতে দেখা যায় নাই। এই কারণে দেশবন্ধু অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া বলিয়াছিলেন, "ওরা লোকমান্যকে কখনো একবার প্রেসিডেন্ট করল না এটা কংগ্রেসের পক্ষে অগৌরবের কথা।"

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে এই অমৃতসর অধিবেশনের গুরুত্ব যথেষ্ট। কংগ্রেস এই সভায় কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহা জানিবার জন্য ভারতবাসী যেমন ব্যাকুল হইয়াছিল তাহার চাইতেও ব্যাকুলতর হইয়াছিল ইংরেজ সরকার। তাহারা যে চিন্তিত হইয়াছিল উহার প্রমাণ পাওয়া গেল তাহাদের কার্যের মধ্যেই। ইতিপূর্বে যে নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল তখন তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইল।

অমৃতসরের এই ৩৪তম অধিবেশনে ভারতীয় কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দকেই উপস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। দেশবন্ধু, গান্ধীজী, লোকমান্য তিলক, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, বিপিন পাল আর কারাগার হইতে সদ্য-মুক্ত মহম্মদ আলি, সৌকত আলি, পাঞ্জাবের ডাঃ কিচলু, লালা হরকিষাণ লাল, পণ্ডিত রামভুজ দত্ত প্রভৃতি।

মডারেটগণ অধিবেশন হইতে দূরে ছিলেন। কিন্তু তাহারা দূরেই থাক্ ইহা ঠিক নয় মনে করিয়াই সভাপতি হিসাবে মতিলাল নেহরু তাহাদিগকে আহ্বান জানাইয়া বলিলেন, "The lacerated heart of the Punjab calls you to come back."

মডারেটগণ বধির হইয়া রহিলেন। তাহারা কংগ্রেস সভাপতির আহ্বানে সাড়া না দিয়া মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিফর্ম একটকে সমর্থন করিয়া সেই অনুযায়ী কাজ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। আর অমৃতসর কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয়বস্তু হইল ঐ Reform Act গ্রহণ করা হইবে না বর্জন করা হইবে সেই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

গান্ধীজী এই শাসন সংস্কারকে অনেকটা গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি ১৯১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 'Young India'-তে লিখিয়া

ছিলেন : I welcome the Royal Proclamation announcing the assent to the Government of India Act, 1919. The Reforms Act coupled with the proclamation is an earnest of the intention of the British people to do justice to India and it ought to remove suspicion on that score. Our duty therefore is not to subject the Reforms to carping criticism but to settle down quietly to work so as to make there success.

গান্ধীজীর এই অভিমতকে চিত্তরঞ্জন কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি ইহার বিরুদ্ধে মতবাদ পোষণ করিয়া Subject Commttee-তে এক প্রস্তাব আনিলেন : The Reforms are inadequate, unsatisfactory and disappointing. মহারাষ্ট্রনেতা লোকমান্য তিলক এবং বিপিন পাল চিত্তরঞ্জনকে সমর্থন করিলেন। সভাতে দেশবন্ধুর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। শুধু এই প্রস্তাবই নহে, কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনে যে প্রস্তাব আনা হইয়াছিল, উহা অনেক ভাবনা ও চিন্তার পরে চিত্তরঞ্জন কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রস্তাবটিকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম,—That the Congress reiterates its declaration of the last year that India is fit for full Responsible Government and repudiates all assumptions and assertions to the contrary. দ্বিতীয়,—That this Congress adheres to the Resolution passed at the Delhi Congress regarding Constitutional Reforms and is of openion that the Reforms Act is inadequate, unsatisfactory and disappointing তৃতীয়,—That this Congress further urges that Parliament should take early stips to establish full Responsible Government in India in accordance with the principle of self-Government.

স্বদেশ-প্রেমিক চিত্তরঞ্জন স্বদেশকে কত গভীর ভাবে ভালোবাসিয়াছিলেন উপরোক্ত ঐ প্রস্তাবের মধ্যে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। অধিবেশনে কে তাঁহাকে সমর্থন করিবে বা কে সমর্থন করিবে না, প্রস্তাবটি রচনা করিবার

সময় তিনি উহা একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই। নিজের অভিমত অকপটে তিনি প্রকাশ করিলেন। বিশেষতঃ পাঞ্জাবের নৃশংস হত্যাকাণ্ড রৌলট আইন এবং মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিফর্মস্ আইন যাহা তিনি কোন মতেই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই, তাঁহার সেই বিদ্রোহী মনের সুদৃঢ় বহিঃপ্রকাশ উপস্থিত জনমণ্ডলীর অন্তরেও গভীর রেখাপাত করিল। ধীর, স্থির স্বভাবসম্পন্ন চিত্তরঞ্জনের এই স্বদেশ প্রেমিক বিদ্রোহী মূর্তি দেখিয়া তাহারা বুঝিল, হ্যাঁ নেতা বটে! তাঁহার আগমনের শুভলগ্ন হইতে রাজনৈতিক পূর্বাকাশে যে অরুণাভা সৃষ্টি হইয়া সারা আকাশের দিগঙ্গনায় বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহা যেন তখন মধ্য দিনের দীপ্তি আর প্রখরতা লইয়া ভাস্বর হইয়া উঠিল। সেদিন ভক্তিতে, শ্রদ্ধায়, আর বিস্ময়ে সকলেই দেখিল ভারতের রাজনৈতিক আকাশে এক নূতন জ্যোতিষ্ক, উঠিল নূতন যুগ-সূর্য! নূতন যুগ-সূর্য বলার কারণ এই যে তবে কি চিত্তরঞ্জন এতদিন কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই?—করিয়াছিলেন কিন্তু এমন করিয়া নহে। এখানে তাঁহার তিন প্রকার কর্মের যোগাযোগ মানুষের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাইয়া দিল যে রাজনীতিই তাঁহার তখনকার ধ্যান, কর্ম ও সাধনা। তাঁহার সেই ত্রিবিধ কর্ম. অমৃতসর কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান, অধিবেশনের সমক্ষে উত্থাপিত হইবে যে মূল প্রস্তাব তাহা রচনা এবং জয়ী হওয়ার আত্মবিশ্বাস লইয়া সংক্রিয় অংশ গ্রহণ করা।

কিন্তু বাধা আসিল। গান্ধীজী মূলপ্রস্তাবটিকে সমর্থন করিতে পারিলেন না। তিনি চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাবের পরিবর্জন, পরিবর্ধন করিয়া একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনিয়া বলিলেন, "The Congress begs loyally to respond to the santiments in the Royal Proclamation and trust that both the authorities and the people will Co-operate so to work the Reforms as to assure the early establishment of full Responsible Government" ইহা বলিয়াই গান্ধীজী তাঁহার বয়ান শেষ করেন নাই। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্মস এক্টের জন্য মণ্টেগুকেও ধন্যবাদ দেওয়ার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন।

একপ্রান্তে দেশবন্ধু এবং অন্যপ্রান্তে গান্ধীজী। রাজনৈতিক এই দুই বিরুদ্ধবাদী পরিস্থিতির মাঝখানে ছিলেন লোকমান্য তিলক। দেশবন্ধুর

শাসন সংস্কার আইন বর্জন করার সমর্থনে তিনি ছিলেন না আবার শাসন সংস্কার আইনের সমর্থন করিয়া দেশবাসীগণ উহার সহিত সহযোগিতা করিয়া চলুক ইহাও তিনি চাহেন নাই। তিনি চলিলেন মাঝপথে। মাঝপথে চলিয়া তিনি তাঁহার ইচ্ছা ও বুদ্ধিমত ভারত সচিব এডুইন মণ্টেগু ও বড়লাট বাহাদুর লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের মারফৎ ভারত সম্রাট ইংলণ্ডেশ্বরকে হোমরুল লীগের পক্ষ হইতে 'Responsive Co-operation এর কথা কৃতজ্ঞতা সহকারে টেলিগ্রাম করিয়া জ্ঞাপন করিলেন। ইহা শুনিয়া চিত্তরঞ্জন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। হোমরুল লীগের পক্ষ হইতে লোকমান্য তিলক যে এমন কার্য করিবেন চিত্তরঞ্জন ইহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। সুতরাং তিলকের কার্যে বাধা দিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন। জাতীয়তাবাদী দলে স্বাভাবিকই একটা আলোড়ন সৃষ্টি হইল।

অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান স্বামী শ্রদ্ধানন্দ উভয় সংকটে পড়িয়া গেলেন। নেতৃবৃন্দের মধ্যে মত বিরোধ বৃদ্ধি হয় ইহা তিনি চাহিলেন না। তাই তিনি দেশবন্ধুর নিকট, মহাত্মাজীর নিকট এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন Reforms Act সম্বন্ধে তিলকের যাহা ব্যাখ্যা তাহা আপনারা তাহার মুখেই শুনুন এবং তাহা শুনিয়া আপনারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

লোকমান্য তখন তাহাই করিলেন। সংস্কারের বিপক্ষে যাহারা ছিলেন-তিলক তাহাদের নিকট তাহার মনের কথা এবং Responsive Co-operation এর ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। আর যাহারা সংস্কারের স্বপক্ষে ছিলেন তাহাদের কাছেও তাঁহার সেই ব্যাখ্যা করিলেন। তিলকের ব্যাখ্যার মূল কথা ছিল যে, কংগ্রেস অধিবেশনে যদি Reforms Act গ্রহণ করা হয় বা বর্জন করা হয় তবে তাহা দেশের জনগণকে সহজ, সরল সত্যে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। আর যদি শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতা করাই স্থির হয় তবে তাহাদিগকে আর অবিশ্বাস করা উচিত নয়।

দূর হইতে শোনা আর মুখোমুখি শোনায় পার্থক্য আছে। তিলকের যুক্তিতে চিত্তরঞ্জন অনেকটা নরম হইলেন। এ প্রসঙ্গে অধিবেশনের সময়ই তিনি বক্তৃতাকালে এক স্থানে বলিয়াছিলেন, "Co-operation when necessary to advance our cause, but obstruction when that

is necessary to advance our cause.

অধিবেশনে যাহা হইয়া থাকে ওখানেও তাহাই হইল। যুক্তি, পরামর্শ ও তর্ক। নিজের মতবাদকে অপরের গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য সকল দলের চেষ্টা অব্যাহত গতিতে চলিল। সুতরাং বিষয় নির্বাচনী সভার সম্মুখে যে প্রশ্নটি সমস্যার আকারে আসিয়া দাঁড়াইল তাহা হইল প্রস্তাবটিকে কেন্দ্র করিয়া। কোন্ ভাষায় প্রস্তাব লিখিত হইবে, কাহার মতামতকে প্রাধান্য দিয়া প্রস্তাব লিখিত হইবে? এক এক জনের এক এক মত। আনী বেশান্ত, লোকমান্য তিলক এবং মহাত্মাজী যে প্রস্তাব রচনা করিলেন তাহা সম্পূর্ণই তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া রচিত হইল।

মহাত্মাজী দেশবন্ধুর প্রস্তাবের উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনিয়াছিলেন বলিয়া তিনি খুব অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। গান্ধীজী যে প্রস্তাব করিলেন চিত্তরঞ্জন তাহা সমর্থন করিতে পারিলেন না। চিত্তরঞ্জনের অভিমত পূর্বেও যাহা ছিল তখনও তাহাই রহিল। তিনি চাহিয়াছিলেন ঐ Reforms Actকে বর্জন করিয়া উন্নততর সংস্কার দাবী করা হউক। গঙ্গাধর তিলক কিন্তু এইবারে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে একমত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। আর অন্য শিবিরে মহাত্মাজীকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করিয়াছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য।

অমৃতসরের এই ৩৪তম কংগ্রেস অধিবেশনের সম্মিলিত নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের এই দুই প্রধানের মতবিরোধে অস্বস্তিবোধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা চাহিলেন এই দুই প্রধানের মূল প্রস্তাবের বয়ানকে কেন্দ্র করিয়া যে মতবিরোধ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা অচিরে দূরীভূত হইয়া একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হউক। সম্পূর্ণ দুই দিন ইহার জন্য চেষ্টা করিয়া অতিবাহিত হইল। অবশ্য চেষ্টা বিফল হইল না। মূল প্রস্তাব, যাহা চিত্তরঞ্জন রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে Inadequate, unsatisfactory and disappointing কথা তিনটি রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া নেতৃবর্গ দেশবন্ধুর সঙ্গে একটি আপোষ করিতে সমর্থ হইলেন। তবে চিত্তরঞ্জনকেও গান্ধীজীর কিছু মত মানিতে হইয়াছিল। ছয় মাসকাল ভারতবর্ষে থাকিয়া মণ্টেগু যে পরিশ্রম করিয়া Reform Act তৈয়ারী করিয়াছেন সেই জন্য তাহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল এবং ভারতবর্ষে যত দিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ শাসনের দায়িত্ব ভারতবাসীর

হাতে না দেওয়া হইতেছে ততদিন ভারতবাসী ঐ Reform Act মানিয়া লইয়া সরকারের সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করিয়া চলিবে—এমন কথাও মূল প্রস্তাবে যুক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, দেশবন্ধু ও গান্ধীজীর এই দ্বৈত যুদ্ধে দুইজনই জয়ী, কেহই কাহারো নিকট পরাজিত হইলেন না।

তখন ভারতবর্ষে খিলাফৎ আন্দোলনের সময়। পৃথিবীর প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক ইংরাজদের পক্ষ সমর্থন না করিয়া শত্রুপক্ষ অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল। ইংরাজ তাই তুরস্কের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। এই ক্রোধের পরিণামে তুরস্কের প্রতি যাহাতে তাঁহারা কোন অত্যাচার, অবিচার না করে সেই আশ্বাসেই ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় যুদ্ধকালীন সময়ে ইংরাজদের সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষে ইংরাজগণ ভারতীয় মুসলমানদের যে আশ্বাস িয়াছিল তাহা পূর্ণ করে নাই। তাহারা বরং অন্যায় এবং অবিচারের হাত বাড়াইয়া তুরস্ককে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে উদ্যত হইয়া রাজধানী কনস্তান্তিনোপলকে এশিয়ায় স্থানান্তরিত করিবার জন্য জিদ্ ধরিল। রাজধানী স্থানান্তরিতের অন্তর্নিহিত অর্থ হইতেছে, মুসলমান সম্প্রদায়ের মহাপবিত্র তীর্থভূমি তাহাদের আওতা হইতে হাতছাড়া হইয়া খ্রীষ্টানদের অধিকারে চলিয়া যাওয়া। মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর ইহা অবিচার, অত্যাচার এবং ধর্মীয় ব্যাপারে অন্যায় হস্তক্ষেপ করা ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহার বিরুদ্ধেই ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে খিলাফৎ আন্দোলন প্রবল শক্তিতে গড়িয়া ওঠে। এই ধর্মীয় আন্দোলনের প্রধান হোতা ছিলেন ভারতের সুপরিচিত আলি ভ্রাতৃদ্বয় সৌকত আলি, মহম্মদ আলি, হাকিম আজমল খাঁ, আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। তখন ১৯২০ সাল। ৩০শে মে খিলাফৎ সমিতি সরকারের সঙ্গে অসহযোগ করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। মহাত্মাজীও খিলাফৎ আন্দোলন সমর্থন করিয়া রাজ-প্রতিনিধি বড়লাট বাহাদুরকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বৃথা। গান্ধীজী নিরস্ত হইলেন না। ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে একটি সাব কমিটির নির্দেশ অনুসারে তখন তুরস্কের প্রতি ঐ অবিচার এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুরতার জন্য আদালত এবং স্কুল-কলেজ বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু গান্ধীজীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা ছিল আইনসভার

সঙ্গেও অসহযোগিতা করা। সুতরাং পুর্ব কমিটির ঐরূপ নির্দেশ না থাকায় তিনি পরবর্তী কংগ্রেসের কাযতালিকার মধ্যে আইন-সভা বর্জনের প্রস্তাবটিকেও পাশ করাইয়া লইতে চাহিলেন।

১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ঐ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সবিশেষ আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বর্তমান সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশনের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত কবিযাছিলেন পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপৎ রায় আর অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন সেদিনকার বাংলার এক নেতা ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, উপস্থিত ছিলেন চিত্তরঞ্জন, বাগ্মী বিপিন পাল এবং মেদিনীপুরের মুকুটহীন রাজা বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। এই বিশেষ অধিবেশন এমনই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, ভারতের সমস্ত প্রদেশ হইতেই ভারতীয় কংগ্রেসের সভ্য এবং প্রতিনিধিগণ আসিয়াছিলেন।

অধিবেশনের সভাস্থল সভ্য এবং প্রতিনিধিবর্গে পরিপুর্ণ। পশ্চাতের পটভূমিকা খিলাফৎ আন্দোলন, পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড, শাসন সংস্কার আইন ও রৌলট আইন। সুতরাং আবহাওয়া অত্যন্ত গরম। সারা ভারতের দৃষ্টি কলিকাতার উপর নিবদ্ধ।

কলিকাতার এই কংগ্রেস অধিবেশনে মূল আলোচ্য বিষয় অসহযোগ আন্দোলন। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ অসহযোগ আন্দোলন সকলেই সমর্থন করিলেন কিন্তু মত বিরোধ দেখা দিল আন্দোলনের ধাবা লইয়া। অহিংসামন্ত্রের পূজারী মহাত্মা গান্ধীজী অহিংসার পথে অসহযোগ আন্দোলনের ধারাকে প্রবাহিত করিবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কিন্তু তাহার এই প্রস্তাবে জাতীয়তাবাদীদল সম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারেন নাই। বাংলার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, বিপিন পাল প্রভৃতি এবং অধিবেশনের সভাপতি পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপৎ রায়ও মহাত্মাজীর ঐ অহিংস অসহযোগের বিরুদ্ধে মতপোষণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মত, অসহযোগ অসহযোগই। যাহারা অন্যায়, অবিচার আর অত্যাচারের নিষ্ঠুর চাকা আমাদের উপর দিয়া চালাইয়া দিতে এতটুকু দ্বিধা করে নাই তাহাদের সঙ্গে অহিংস ব্যবহারের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। সুতরাং আন্দোলন করিতে হইলে সহিংস, হিংসায়, বিপ্লবে, বিদ্রোহে যে কোন উপায়েই হউক এদেশের মাটি হইতে

ইংরাজগণকে তাহাদের তল্পি-তল্পা লইয়া ইংলণ্ডের পথে পাঠাইয়া দিতে হইবে। মোট কথা ইংরাজদিগকে তাড়াইতে হইবে—যে পথেই হউক; হিংসায় হউক বা অহিংসায় হউক।

কিন্তু বাংলার একজন বিখ্যাত নেতার আবার মনের পরিবর্তন এখানে দেখা যায়। তিনি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। চিত্তরঞ্জনকে সমর্থন না করিয়া তিনি মহাত্মাজীর অসহযোগকে সমর্থন জানাইয়াছিলেন। রাজনীতিতে অবশ্য সব সময় সকল নেতা একই মতবাদকে ধরিয়া চলিতে পারে না। অবস্থার বিবর্তনে মনের পরিবর্তন হইয়া যায়।

রৌলট আইন এবং পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের পটভূমিকায় অমৃতসরে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তখন বিক্ষুব্ধ চিত্তরঞ্জন ইংরাজ-সরকারের সহিত সম্পূর্ণ অসহযোগ করিবার জন্য প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী চিত্তরঞ্জনকে তখন সমর্থন করিতে পারেন নাই। তবে উহার কিছুকাল পরেই ঐ কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে সম্পূর্ণ নতুন এক চিত্র ফুটিয়া উঠিল। এই অধিবেশনে স্বয়ং গান্ধীজী ইংরাজ সরকারের সহিত অসহযোগের প্রস্তাব আনয়ন করিলেন।—আর চিত্তরঞ্জন উহা সমর্থন করিলেন।

কিন্তু কথা আছে। চিত্তরঞ্জন সমর্থন করিলেন বটে তবে, সময় ও অসহযোগের ধারা লইয়া দ্বিমতের সৃষ্টি হল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে চিত্তরঞ্জনের রসা রোডের বাড়ী তখন আলোচনায় মুখর। কত রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা এবং সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের আনাগোনায় বাড়ীখানা সবসময় মুখরিত। ১৪৮ নং রসা রোডের বাড়ীখানা তখন ভারতীয় রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রস্থল এবং উহাকে বিগত বাংলার আরও কয়েকখানি প্রসিদ্ধ বাড়ীর সঙ্গে পাশাপাশি রাখিয়া গব বে. ের৷ যাইতে পারে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ী, মধ্য-কলিকাতা অঞ্চলের কলুটোলার রামকমল সেনের বাড়ী, এবং রামবাগানের বিখ্যাত দত্ত মহাশয়দের বাড়ী যেমন বাংলা তথা ভারতীয় জাগরণ ও জাতীয়তাবোধের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে ঠিক তেমনি চিত্তরঞ্জনের এই রসা রোডের বাড়ীও জাতীয়-জীবনে দেশপ্রেমের এক প্রবল উন্মাদনা জোগাইয়া ইতিহাসের পাতায় রাজনৈতিক এক তীর্থভূমিতে পরিণত হইয়া রহিয়াছে।

অমৃতসর কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া আসিবার পর হইতেই চিত্তরঞ্জনের মনের মধ্যে নানা অঙ্কের সূক্ষ্ম হিসাব চলিতেছিল। রসা রোডের বাড়ীতে ঐ উদ্দেশ্যে অনেক ঘন ঘন সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ আলোচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন অনেকের কাছে প্রকাশও করিয়াছেন, "I accept non-co-operation as a Political Creed but I differ with the Mahatma as to the means of achieving it".

চিত্তরঞ্জনের মত পার্থক্যের সম্বন্ধে বলা যায়, অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসাবে ছাত্রগণ স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করুক ক্ষতি নাই তবে তাহাদের স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করাইয়া শুধু রাস্তায় বাহির করাইয়া দেওয়া হইবে তাহা নহে। জাতীয় বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া পড়াশুনার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। অসহযোগ করিয়া ইংরাজের আইন আদালত পরিত্যাগ করিব কিন্তু সেই সঙ্গে পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসার জন্য সালিসী সমিতিরও প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সর্বোপরি তিনি বলিয়াছিলেন, অসহযোগের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে নিশ্চয়ই তবে তখনকার পরিবেশে নহে,—আরও কয়েক বৎসর পরে। কারণ দেশ তখনও তৈয়ারী হয় নাই। গান্ধীজীর সঙ্গে তখন অসহযোগ লইয়া তাঁহার সেইখানেই মতানৈক্য। অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন তাই অসহযোগের বিরোধিতা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধীজীকে মিঃ গান্ধী, মিঃ গান্ধী! বলিয়া অভিহিত করিতে থাকিলে অনেকে আপত্তি তুলিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, Mr Gandhi নহে, Say Mahatma.

জনতার ঐ কথা ছাপাইয়া চিত্তরঞ্জন গর্জন করিয়া উঠিয়াছিলেন, "Why Mahatma? Unless I realise the man as such, I am not going to utter the word Mahatma like a bird taught."

অভিমতটির মধ্যেও চিত্তরঞ্জনের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি অপরের শেখান কথা বলিতে রাজী ছিলেন না। পাচজনে গান্ধীজীকে মহাত্মা বলিয়া চলিয়াছে আর তাহা শুনিয়া তিনিও উহা বলিয়া চলিবেন, তাঁহার মানসিক গঠন তেমন ছিল না। নিজের জ্ঞান বুদ্ধি আর উপলব্ধিতে তিনি যাহা সমীচীন বলিয়া মনে না করিতেন তাঁহাকে দিয়া তাহা করান সম্ভব ছিল না—এমনই ছিল তাহার মনের দৃঢ় অবস্থা! যেমন অসহযোগ

তিনি সমর্থন করিলেও আমলাতন্ত্রকে ধ্বংস করিবার জন্য কাউনসিল বর্জন করিতে তিনি কোন সময়েই সম্মত হন নাই। তিনি মনে করিতেন, কাউনসিলে প্রবেশ করিলে স্বরাজ লাভের পথ সুগম হইবে। বলিয়াছিলেন, "I want to make the councils an instrument for the attainment of swaraj and to use the weapon which is in the hollow of your hands to bring about full complete Swaraj"

অসহযোগ সম্বন্ধে গান্ধীজী চিত্তরঞ্জনের ভাষণে খুব চিন্তিত হইলেন। তিনি চিত্তরঞ্জনকে তখন জানিয়াছিলেন, চিনিয়াছিলেন। ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, অসহযোগ সম্বন্ধে বাংলাদেশ যদি অগ্রসর হইয়া আন্দোলনে অংশ গ্রহণ না করে তবে ভারতভূমিতে অসহযোগ আন্দোলনের পথ সুগম হইতে পারে না। আর বাংলাদেশ মানেই তখন চিত্তরঞ্জন। সুতরাং লজিক ও জ্যামিতিক হিসাবেও সমগ্র ভারতের অসহযোগ আন্দোলন নির্ভর করিল চিত্তরঞ্জনের উপর। সেই চিত্তরঞ্জন তখনই অসহযোগ আন্দোলন শুরু করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তবুও অধিবেশনে গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাব পাশ হইয়া গেল। অবশ্য পাশ হইবার একটা কারণ খিলাফৎ আন্দোলন তখন চলিতেছিল এবং খিলাফৎ আন্দোলনকে দৃঢ় করিবার জন্য অসহযোগ আন্দোলনেরও প্রয়োজন ছিল।

তবুও চিত্তরঞ্জনের মন ভারাক্রান্ত হইল। অমৃতসর কংগ্রেসে গান্ধীজীর সঙ্গে মতদ্বৈধ হওয়ার পর কলিকাতার এই বিশেষ অধিবেশনে আবার অসহযোগ প্রস্তাবকে কেন্দ্র করিয়া নতন করিয়া অনৈক্যের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া আসিবার কথাও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দূরে চলিয়া আসিয়া নির্বাক, নিশ্চল হইয়া থাকিতে চাহেন নাই। তিনি রাজনীতিতে যোগদান করিয়াছেন, রাজনীতিই তখন তাহার জীবন। সুতরাং নতন একটা দল গঠনের কথা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া একটা সিদ্ধান্তেও আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলার কোন কোন নেতার পরামর্শে বিশেষ করিয়া মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের উপদেশে চিত্তরঞ্জন উহা হইতে বিরত থাকেন। এই প্রসঙ্গে পৃথ্বীশচন্দ্র রায় তাহার Life and Times of C. R. Das গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "It is believed that on the acceptance of the non-co-operation resolution by the congress,

Chittaranjan and some of his Bengali friends were thinking of Seceding from that body. But The wise and patriotic intervention of Aswini Kumar Dutta prevented them from committing this political Hari-Kari."

কলিকাতায় কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার চার মাস পরে নাগপুরে ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হয়। উদ্দেশ্য অসহযোগ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে উহা পাশ করিয়া কাযে পরিণত করা। এই মাঝের চার মাস সময়ে পরিস্থিতির পরিবর্তনে মনেরও পরিবর্তন হইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব পাশ করিলেও কার্যতঃ দেখা গেল যে, ঐ চার মাসে আন্দোলন এতটুকু দানা বাঁধিয়া ওঠে নাই। স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ বিদ্যামন্দির হইতে অধিক সংখ্যায় বাহির হইয়া আসে নাই। আইনজীবিগণ আদালত পরিত্যাগ করিতে তেমন উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন না। আলিগড়ে যে বিখ্যাত কলেজটিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিবার জন্য মনস্থ করা হইয়াছিল মৌলনা মহম্মদ আলির আপ্রাণ চেষ্টায়ও তাহা বাস্তবে রূপায়িত করা গেল না। শুধু তাহাই নহে,—কাশীর হিন্দু কলেজকে অনুরূপ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিবার প্রস্তাবও কার্যতঃ সফল হইল না। উপরন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অসহযোগ মন্ত্রের উদ্গাতা মহাত্মা গান্ধীজী কলিকাতার বুকে সেই অসহযোগের দিনে যে জাতীয় বিদ্যালয়টির উদ্বোধন করিয়া অনেক আশায় বুক বাঁধিয়াছিলেন, গান্ধীজীর সে আশাও পূর্ণ হয় নাই, কারণ তেমন সংখ্যক ছাত্র ভর্তি না হওয়ার পরিণামে বিদ্যালয়ের অপমৃত্যু ঘটিল।

সজাগ দ্রষ্টা চিত্তরঞ্জন। তিনি উহা সব লক্ষ্য করিতেছিলেন। কিন্তু তাহার মনের কোন হিসাবে তিনি তখন অসহযোগ আন্দোলনকে কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনের সময় যতখানি বিরোধিতা করিয়াছিলেন ততখানি বিরোধিতা না করিয়া অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করিতে শুরু করিলেন। বলিলেন, "Non-co-operation is our only chance. A complete programme of non-co-operation with renunciation of titles and honorary offices at one end and refusal to pay taxes at the other should be at once adopted and worked out within

the shortest possible time."

নাগপুরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং গান্ধীজী ও দেশবন্ধুর মত-বিরোধের জন্য এই অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রতিনিধি সমাগমও হইয়াছিল যথেষ্ট। জানা গিয়াছে যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রায় চৌদ্দ হাজার প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

সকলের ধারণা ছিল কলিকাতার অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে নাগপুরের এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে তাহা সর্বসম্মতিরূপে গৃহীত হইবে না কারণ চিত্তরঞ্জন উহার বিরোধিতা করিবেনই। সত্য সত্যই বিরোধিতার জন্য চিত্তরঞ্জন বাংলার উভয় বিপ্লবী দল 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' হইতে প্রায় পাঁচ শত স্বেচ্ছাসেবক লইয়া নাগপুর অধিবেশনে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এই পাঁচ শত স্বেচ্ছাসেবকের যাবতীয় খরচ চিত্তরঞ্জন নিজের পকেট হইতেই করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিবার জন্য দেশবন্ধু বিপ্লবী যুগের পুলিন দাসের উপর ভার দিয়াছিলেন। পুলিন দাসও সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হইয়া নিজের দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন।

নাগপুরে দুই পক্ষই প্রস্তুত। চিত্তরঞ্জনের মন তখন অনেকটা অসহযোগের দিকে টানিতেছে তবুও তিনি গান্ধীজীকে আরও পাঁচ বৎসর পরে অসহযোগ আরম্ভ করিতে বলিয়াছিলেন কারণ তাঁহার মতে অসহযোগ করিবার মত দেশের জমি তখনও উপযুক্ত পরিমাণে প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু গান্ধীজীর মতে জমি তখনই উপযুক্ত পরিমাণে প্রস্তুত কারণ পাঞ্জাবের নির্মম হত্যাকাণ্ডে দেশের মানুষের মন ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছিল তদুপরি যুদ্ধ শেষে তুরস্কের প্রতি ইংরাজের ব্যবহারে ভারতীয় মুসলমানগণ খিলাফৎ আন্দোলন আরম্ভ করিলে উহা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সর্বভারতীয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। সুতরাং উহাই ছিল অসহযোগ আন্দোলনের সুবর্ণ-সুযোগ। ঐ পরিবেশের সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য গান্ধীজী ব্যক্তিগত-ভাবে চিত্তরঞ্জনকেও বলিয়াছিলেন যে তাঁহার মত বুদ্ধিমান ও তীক্ষ্ণধী-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে ঐ সুবর্ণ-সুযোগকে হেলায় নষ্ট করা উচিত নহে।

দুই প্রধানের দুই মত। এই দুই বিরুদ্ধবাদীকে এক মতে ও এক পথে

আনিতে মৌলনা মহম্মদ সাহেব একবার এ শিবিরে আর একবার ও-শিবিরে ছুটাছুটি করিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। মৌলনা সাহেব নিজ মুখে বলিয়াছিলেন, "I moved like a shuttle cock between Mahatma and Deshabandhu at that time."

চিত্তরঞ্জনকে স্বমতে আনিতে গান্ধীজীর নিজেরও চেষ্টার ত্রুটি ছিল না আবার বিরোধের মীমাংসা করিবেন না বলিয়া চিত্তরঞ্জনও যে জিদ করিয়া বসিয়াছিলেন তাহাও নহে। ইহার বাস্তব প্রমাণ, প্রকাশ্য অধিবেশনের আগের দিন রাত্রে উহাদের সাক্ষাৎ এবং দীর্ঘ আলোচনা। আলোচনা প্রসঙ্গে গান্ধীজী চিত্তরঞ্জনকে বলিয়াছিলেন, "Mr Das, give me some chance, at least give me one year's time to workout the idea of non-co-operation."

উত্তর দিয়াছিলেন চিত্তরঞ্জন, "Well, I am willing to support you at the open session provided you allow me to draft and move the main resolution on non-co-operation and also provided you agree to omit the clause on the boycott of councils."

দেশবন্ধু ও গান্ধীজীর মধ্যে কথাবার্তা শুধু ইহাই নহে,—আরও হইয়াছিল। অধিকন্তু গান্ধীজী নাগপুরের ঐ অধিবেশনে বাংলাদেশ হইতে যে সমস্ত বিপ্লবীগণ যোগদান করিয়াছিলেন তাহাদের উদ্দেশ্যেও বিনয় সহকারে তাঁহার অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাটি হইয়াছিল অত্যন্ত মনোহারী, বলার ভঙ্গীও ছিল স্বচ্ছ এবং সরল। তিনি বলিয়াছিলেন যে, হিংসা দ্বারা কোন মহৎ কার্য কোনদিন সম্পন্ন হয় না। যে স্বাধীনতার জন্য আপনারা, আমরা যুদ্ধ করিতেছি, হিংসার পথে তাহা কখনই আসিবে না।

ইহার পর গান্ধীজীর সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের বিরোধের মিটমাট হয়। দেশবন্ধুও গান্ধীজীর প্রতি অত্যন্ত ভক্তি সহকারে তাঁহার অহিংস নীতির সমর্থন করেন এবং গান্ধীজীর ঐ বক্তৃতার মাধ্যমে এবং বক্তৃতায় কি যাদু ছিল কে জানে,—বিপ্লবীগণও অন্ততঃ এক বৎসর কাল কোন প্রকার বৈপ্লবিক ক্রিয়া কর্মে লিপ্ত হইবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। প্রতি উত্তরে গান্ধীজীও বলিয়াছিলেন যে তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়া চলিবেন এবং দেশকে চালিত

করিবেন তাহাতে যদি এক বৎসরের মধ্যে বাঞ্ছিত স্বাধীনতা না আসে তবে তিনি বিনাদ্বিধায় চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্ব মানিয়া লইবেন। বলিয়াছিলেন "I will accept the leadership of Mr C. R. Das."

চিত্তরঞ্জন ও গান্ধীজীর মধ্যে এমন চুক্তি হওযার পর চিত্তরঞ্জনের সমর্থনকারীদের মধ্যে অনেকেই সেদিন অসন্তুষ্ট হইযা ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন প্রস্তাবের কিছু সংশোধন হইযাছিল। গান্ধাজী তাঁহার My experiments with truth গ্রন্থে এ-প্রসঙ্গে লিখিযাছেন: "Some amendments were made at the instance of the Deshabandhu, after which the non-co-operation resolution was passed unanimously." চিত্তরঞ্জন প্রকাশ্য সম্মেলনে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করিযা তাঁহার নিজস্ব বুদ্ধি ও যুক্তির জাল বিস্তার করিযা বক্তৃতা করিয়াছিলেন কিন্তু বাধা পাইযাছিলেন যাহাকে তিনি রাজনৈতিক জীবনের গুরু মনে করিতেন, সেই বিপিন পালের কাছ হইতেই। জানা যায যে, মহম্মদ আলী জিন্নাও ইহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং উহাই ভারতীয কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে তাঁহার শেষ বক্তৃতা।

যেদিন রাতে দেশবন্ধুর সঙ্গে গান্ধীজীর কথাবার্তা হইয়া গেল এবং চিত্তরঞ্জনের মনের পরিব : করাইতে গান্ধীজী সমর্থ হইলেন তাহার পরের দিন সকাল বেলাতেই বিপিন পাল দেশবন্ধুর কাছে আসিযা বেশ একটু বিরক্তির স্বরেই বলিলেন, "চিত্ত! আমাদের কারোর সঙ্গে কথা না বলে এমন কাজ করতে তোমাকে কে বলল?"

উত্তর দিযাছিলেন চিত্তরঞ্জন, "আমিই করেছি, কে আর বলবে। এ-ছাডা আর কোন ভাল পথ নেই।"

বস্তুতঃ চিত্তরঞ্জনের জীবনে তখন রাজনীতি ছাডা আর কিছুই ছিল না। দেশ, দেশের স্বাধীনতা তাঁহার জীবনের ধ্যান, তাঁহার সাধনা। গান্ধীজীর সঙ্গে যে মত বিরোধ তাহা নিয়া যদি বিরোধের মাত্রা বাডাইয়াই চলেন তবে দেশসেবা হয় কি করিযা? তিনি যে তখন দেশসেবার জন্য উন্মুখ!

অনেকে বলিয়াছেন, নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীজীর জয হইয়াছে। তাঁহার জয় কোথায়? জয় বলিলে বলিতে হয দেশবন্ধুরই। কারণ গান্ধীজী ইহা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, চিত্তরঞ্জন তাহার বিরুদ্ধে মতবাদ প্রকাশ করিলে জনগণ, বিশেষত বাংলার জনগণ, চিত্তরঞ্জনকেই সমর্থন করিবে।

আর বাংলা দেশকে বাদ দিয়া ভারতবর্ষ তখন অচল,—বাংলা দেশে কোন আন্দোলনের ঢেউ না উঠিলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কোন ঢেউ উঠিবে কি করিয়া? সুতরাং চিত্তরঞ্জনকে ছাড়া সেদিন গান্ধীজীর চলে নাই। গান্ধীজীর পরাজয় তো সেখানেই। দ্বিতীয়তঃ চিত্তরঞ্জন প্রস্তাবের কিছু সংশোধন চাহিয়াছিলেন, গান্ধীজী তাহাতে রাজী হন। তৃতীয়তঃ গান্ধীজী তাহার প্রস্তাবিত পথে চলিবার জন্য দেশবন্ধুর নিকট এক বৎসর সময় চাহিয়াছিলেন এবং অনেকটা অঙ্গীকার করিয়াও বলিয়াছিলেন যে, এক বৎসরের মধ্যে যদি স্বরাজ না আসে তবে 'I will accept the leadership of Mr. Das."

যাহা হউক, নাগপুর অধিবেশনে শেষ পর্যন্ত যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহার রচনা করেন চিত্তরঞ্জন। এই প্রস্তাবগুলি, কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনে যাহা গৃহীত হইয়াছিল তাহা হইতে অনেক দৃঢ় এবং বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন। প্রস্তাবগুলির সংক্ষিপ্তভাব এই:

(১) কলিকাতার প্রস্তাবে জালিয়ানওয়ালাবাগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, স্বরাজ লাভের কোন প্রস্তাব ছিল না। নাগপুরে প্রস্তাব করা হইল, ইংরাজ সরকার ভারতবাসীর আস্থা ও বিশ্বাস হারাইয়াছে এবং ভারতবাসী তাই স্বরাজ লাভে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

(২) কলিকাতায় অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হইলেও কোন্ পথে সে-অসহযোগের ধারা প্রবাহিত হইবে এবং উহার কি রূপ হইবে তাহার কোন নির্দিষ্ট উল্লেখ ছিল না, কোন ত্যাগের কথাও উল্লেখ ছিল না। শুধু অনুনয়ের সুরে [earnestly desires] বলা হইয়াছিল, ছাত্রগণ ও উকিলগণ যেন ক্রমে ক্রমে স্কুল-কলেজ ও আদালত পরিত্যাগ করে। নাগপুর অধিবেশনে উহা সংশোধিত হইয়া Farnestly desires এর পরিবর্তে হইল অসহযোগ এবং বয়কট যাহাতে সফল হয় তাহার জন্য 'Effective steps should be taken.'

(৩) কলিকাতায় গৃহীত প্রস্তাবে ছিল Gradual withdrawal. নাগপুরে প্রস্তাব লওয়া হইল যে, আইনজীবিগণ যেন ব্যবসা স্থগিত রাখিয়া জাতির সেবায় মন-প্রাণ উৎসর্গ করেন [by Calling upon lawyers

to make greater efforts to suspend their practice and to devote their attention to national service.]

(৪) কলিকাতার প্রস্তাবে অসহযোগের জন্য minimum risk and least sacrifice এর উল্লেখ ছিল। উহার পরিবর্তে নাগপুরে যে প্রস্তাব লওয়া হইল তাহাতে ছিল Renunciation of voluntary association with the present Government at one end and the refusal to pay Taxes at the other.

(৫) অসহযোগের ব্যাপারে কলিকাতার প্রস্তাবে ছাত্রগণকে ধীরে ধীরে স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করিবার জন্য বলা হইয়াছিল। নাগপুরে বলা হইল, ভবিষ্যতে পরিণামে কি হইবে না হইবে তাহা চিন্তা না করিয়া ১৬ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ছাত্রগণ সরকারী স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করিয়া জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে অথবা জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিবে।

কলিকাতার প্রস্তাবের পর নাগপুরে চিত্তরঞ্জনের মুসাবিদায় ঐ সংশোধিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হইল। সুতরাং পূর্ব আলোচনায় ফিরিয়া গিয়া বলিতে পারা যায়, নাগপুরে গান্ধীজীর জয় নহে, জয় চিত্তরঞ্জনের। অথবা রাজনৈতিক ভাষ্য সংকারে প্রচার না করিয়া বলা যায়, জয় দুই জনেরই। কারণ গান্ধীজী চিত্তরঞ্জনের ধী-শক্তি, যুক্তি তর্ক এবং প্রখর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখিয়া যেমন তাহার প্রতি মুগ্ধ হইয়াছিলেন, চিত্তরঞ্জনও তেমনি গান্ধীজীর ত্যাগ, হিংসাবর্জিত আন্দোলন এবং আন্দোলনের ধারায় প্রেম ও ভালোবাসার পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এ যেন ভারতীয় দুই পবিত্র নদীর মিলনেও মিলন স্থলে দুই নদীর নিজস্ব জলের রং অপরিবর্তিত রহিয়াছে। গান্ধীজী ও দেশবন্ধু মিলিত হইয়া আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন কিন্তু কেহই কাহারো নিজস্ব স্বত্বাকে এতটুকু পরিত্যাগ করিলেন না—নিজস্ব শক্তিতে উভয়েই শক্তিমান্, নিজস্ব সম্পদে উভয়েই সম্পদশালী। শুধু দেশ-প্রেমের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া দুই মহান্ নেতার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য স্বত্বা লইয়া মহামিলন!

কিন্তু নাগপুরের এই মিলন-উৎসবের মাঝে একটি বিষাদের ছায়াও নামিয়া আসে। সতীশচন্দ্র দাশ নামক একজন স্বেচ্ছাসেবক সর্দিগর্মি হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ-সংবাদে চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন

এবং তাহাকে সৎকার করিবার জন্য দেশবন্ধু নগ্নপদে চার মাইল পথ, কোথাও বালুকাময় পথ, কোথাও কাঁটাবন পার হইয়া গিয়াছিলেন। সেই শবানুগমনে চিত্তরঞ্জনের নূতন চেহারা দেখা গেল। সত্যই তাহাই। নাগপুর হইতেই নূতন এক চিত্তরঞ্জনের জন্ম! মহাত্যাগীর ত্যাগ, আদর্শ, অহিংসা ও প্রেমের বাণীতে তাঁহার অন্তর-মন তখন নূতন ভাবে পূর্ণ, নূতন একটা দিগন্তের আলো আসিয়া তাঁহার অন্তর-বাতায়নেও যেন গৈরিক-আলো মুঠা-মুঠা করিয়া ছড়াইয়া দিয়া গেল! তাঁহার এই মনের পরিচয় তাঁহার কথার মধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নাগপুর হইতে কলিকাতা ফেরার পথে তাঁহার মুখে চিন্তার রেখা! কত কি যেন ভাবিয়া চলিয়াছেন। মানুষের মনের-গহন চিরকালই অজ্ঞেয়, সে গোপন স্থানে কত কথার উত্থান হইতেছে আবার তাহার পতন হইতেছে, কত ভাবনার জন্ম হইতেছে আবার সেই ভাবনারাশি সাগরবেলায় ঢেউয়ের মত ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে। চিত্তরঞ্জনেরও তখন হয়তো তেমনই মনের অবস্থা। সহসা নিজেরই অলক্ষ্যে বলিয়া উঠিলেন, "আমার পথ উন্মুক্ত। বাসন্তীকে একবার জিজ্ঞাসা করে একেবারে কাজে লেগে যাব।"

ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নাগপুর অধিবেশন হইতে চিত্তরঞ্জন কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। পূর্বের চিত্তরঞ্জনকে যেন কোথায়, কোন অজানা, অজ্ঞাতস্থানে পরিত্যাগ করিয়া দেখা দিল সে এক নতন চিত্তরঞ্জন! তাঁহার ভিতর উদিত হইল নূতন যুগ-সূর্য। কথাবার্তায় ত্যাগীর মহান বাণী, চেহারায় ত্যাগপূতঃ দেহের আলোকরাশি বিচ্ছুরিত। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। ভারতীয় ইতিহাসের পাতায় যুক্ত হইল আবার তেমন ইতিহাস। মহামতী অশোক সসৈন্যে কলিঙ্গদেশ জয় করিতে গিয়াছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি নূতন অশোক। অশোকের এই রূপ দর্শন করিয়া কবি বলিয়াছেন,—

দূর কলিঙ্গে শোকের সাগরে লভিলে জনম নব
তাই বুঝি বীর অ-শোক নামটি তব।

তখন হইতে অহিংসা মন্ত্রের পূজারী অশোকের নূতন রূপ। নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনের পটভূমিকাতেও কি চিত্তরঞ্জনকে ঠিক তেমনিরূপে রূপান্তরিত দেখা যাইতেছে না? ভারতের আরাধ্য সর্বত্যাগী ভোলানাথের মত রাতারাতি তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিবার ব্রত গ্রহণ করিলেন। সে-ব্রতের

শুধু একটি মন্ত্র।—স্বদেশের বন্দনা। কলিঙ্গ জয় করিয়া প্রত্যাবর্তনের পথে উপগুপ্ত নামে একটি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন অশোক। —আর চিত্তরঞ্জন। কে তাঁহাকে মন্ত্র দান করিল? শৈশবের ছাত্রাবস্থাতেই তো তাঁহার মধ্যে স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।—তবুও সেই স্বদেশে সেবার মহান ব্রতেই ভারতবাসীর অমোঘ আকুল আহ্বানই যেন তিনি গান্ধীজীর কণ্ঠের মারফৎ নাগপুরে শুনিতে পাইলেন, "মিঃ দাশ। আমি আপনাকেই চাই।"

মনোভূমি প্রস্তুত হইয়াছিল পূর্ব হইতেই—শুধু যেন অপেক্ষা ছিল একটি আহ্বানের। সে আহ্বান আসিল। ঘর ছাড়ার বাঁশী,—সর্বস্ব ত্যাগের ডাক! গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিলেন চিত্তরঞ্জন,—কিন্তু ডাকের চাইতেও সাড়া দেওয়া যে এমন মনে প্রাণে, এমন গভীরতম ভাবে তাহা কি সেদিন গান্ধীজীও ভাবিতে পারিয়াছিলেন, ভাবিতে পারিয়াছিল কি কোন ভারতবাসী?

আগের দিনে যে চিত্তরঞ্জন ছিলেন ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন সেই চিত্তরঞ্জন সেদিন হইলেন বাসনা বিবর্জিত সর্বত্যাগী। তিনি বলিতেন, "সর্বস্ব ত্যাগ করো, নইলে এ খেলার দরকার নেই।" নিজের এ-কথার বাস্তব রূপায়ণ তিনি নিজেরই জীবন দিয়া আরম্ভ করিলেন। ভোগের রাজা হইলেন ফকির। দেশমাতার চরণতলে নিজের ভোগ বিলাস, কামনা-বাসনা সবই অর্ঘ্য সাজাইয়া অঞ্জলি দিয়া, প্রাসাদ হইতে নামিয়া বসিলেন পথের ধূলায়, মিশিয়া গেলেন জনগণের মাঝে। কত দিনের বিলাসপূর্ণ অভ্যস্তজীবনকে একদিনের তীব্র কশাঘাতে সন্ন্যাসের কঠিন পথে পরিচালিত করিলেন। তাঁহার বাবুয়ানা! —সেও ইতিহাসের পাতায় উল্লিখিত হইবার মত ঘটনা। কথিত আছে, দেশবন্ধুর দৈনন্দিন জীবনের পরিধানের জামা-কাপড় সুট-প্যাণ্ট সবই প্যারিস হইতে মলিন-মুক্ত হইয়া আসিত। ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'Chain Smoker' তিনি ছিলেন তাহাই। যতক্ষণ তিনি বাড়ি থাকিতেন তিনি তামাক খাইতেন আর যখন বাড়ি হইতে বাহির হইতেন সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহার মুখে উঠিত চুরুট। তামাক খাওয়াও যেমন তেমন নহে। মজফ্ফার নামে একজন চাকর ছিল। বাড়িতে সর্বক্ষণের তামাক সাজার ভার ছিল তাহার উপর। অন্যের তামাক সাজায় দেশবন্ধুর মন উঠিত না। তিনি মদও খাইতেন। কিন্তু নাগপুর সম্মেলনীতে সুরাপান নিষিদ্ধ করিয়া প্রস্তাব

গ্রহণ করায় তিনি তাঁহার পশ্চাতে ফেলা দীর্ঘদিনের লালিত নেশা একদিনে, এক মুহূর্তেই চিরতরে পরিত্যাগ করিলেন। এই ব্যাপারে দেশবন্ধুর এক ডাক্তার আত্মীয় ডি, এন, রায় তাহাকে বলিয়াছিলেন, "ভায়া, ছাড়তে হয় আস্তে আস্তে ছাড়, একেবারে বন্ধ করলে শরীর যে ভেঙ্গে যাবে।"

মনের জোর সব ওষুধের সেরা। চিত্তরঞ্জন তাহা জানিতেন। তাই বলিলেন, "মায়া করলে আর ছাড়া চলে না, ছেড়ে দিতে হ'লে নির্বিচারেই ছাড়া উচিত।"

দীর্ঘদিনের নেশা ছাড়া সহজ কথা নহে—কিন্তু তাহাই সহজতর করিলেন দেশবন্ধু। লোকে অবাক! কিন্তু এ বিস্ময়ের চাইতেও আরও বিস্ময়ের কাজ তিনি তখনই করিলেন। জীবিকা তো মানুষের জীবনের সব। বাঁচিয়া থাকিতে অর্থের প্রয়োজন না হইলে জগৎ সুধা-পারাবারে পরিণত হইত। সংসারে, আত্মীয়-স্বজন সহ বিরাট পরিবার প্রতিপালনে তাঁহারও অর্থের প্রয়োজন ছিল কিন্তু নাগপুর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই তিনি নিজের সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ করিয়া মন স্থির করিয়া ফেলিলেন। লোকে জানিতে পারে নাই, বুঝিতেও পারে নাই। অবশ্য অন্তরঙ্গ অনেকের কাছেই কথা প্রসঙ্গে তিনি আগেও বলিয়াছিলেন, আইন-ব্যবসা ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু যাহাদের কাছে বলিয়াছিলেন, তাহারা সেদিন কি সত্যই বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিলেন যে মাসিক ৬০।৭০ হাজার টাকার ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া কেহ শুধু দেশেরই সেবা করিতে পারে? তবে তাহাদের সে মন সেদিন নিশ্চিন্ত জানিল, হ্যাঁ পারে, চিত্তরঞ্জন পারে! ব্যবসা পরিত্যাগ করিলেন। ডুমরাওনের আপীল মোকদ্দমার জন্য ডুমরাওনের রাজা তাঁহাকে তখন মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে অশ্রুতপূর্ব একটি টাকার অঙ্কের প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন কিন্তু সেই মোটা টাকার অঙ্কও ত্যাগের প্রতিমূর্তির সম্মুখে আসিয়া কোথায় যেন লজ্জায় লুকাইয়া গেল।—তখন যে চিত্তরঞ্জনের :

চীর গৈরিক দিয়া আশিসিল ভারত জননী কাঁদি'
প্রতাপ শিবাজী দানিল মন্ত্র, দিল উষ্ণীষ বাঁধি'!
বুদ্ধ দিলেন ভিক্ষাভাণ্ড, নিমাই দিলেন ঝুলি,
দেবতারা দিল মন্দার-মালা, মানব মাখালো ধূলি।
নিখিল-চিত্ত-রঞ্জন তুমি উদিলে নিখিল ছানি'—

মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, কর্মী, জ্ঞানী।
হিমালয় হ'তে বিপুল বিরাট, উদার আকাশ হ'তে,
বাধা-কুঞ্জর তৃণ সম ভেসে গেল তব প্রাণ-স্রোতে!

[ইন্দ্র-পতন : নজরুল]

মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত করিতে আরও বাকী ছিল। জীবনের গতি পরিত্যাগ করিলেন, ব্যবসা পরিত্যাগ করিলেন, আমিষ-আহার পরিত্যাগ করিয়া হইলেন নিরামিষ-ভোজী।—আর ঘরের পরিবর্তে বাহির, তখন ছোট ঘর তাঁহার ঘর নয়,—রসা রোডের বাড়ীর পরিবর্তে সমগ্র ভারতভূমি তাহার ঘর। রবীন্দ্রনাথের দুই বিঘা জমির অনুকরণে 'তাই লিখে দিল বিশ্ব নিখিল দু বিঘার পরিবর্তে'র মত চিত্তরঞ্জনের অদৃষ্টেও লিখিত হইল, 'বিশ্বভারত রসারোডের বাড়ীর পরিবর্তে।' এমন ত্যাগ,—এমন মহান ত্যাগ,—এমন মহত্তর ব্রত ইতিহাসেও বিরল। চার শত বৎসর পূর্বে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেবের মহান শিক্ষা 'আপনি আচরি ধর্ম প্রভু অন্যকে শিখায়' মন্ত্রকে জীবনের প্রতিধাপে গ্রহণ করিয়া চিত্তরঞ্জন অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি সকলকে বলিতেন 'সর্বস্ব ত্যাগ করো।' নিজেই যদি নিজের জীবনে তাহা দেশবাসীকে না দেখাইতে পারিলেন তবে উপদেশ দেওয়ার অধিকার তাহার থাকে না। Bernard shaw বলিয়াছেন One who Can, Does, one who Cannot, teaches অর্থাৎ "যাহাদের শক্তি আছে তাহারাই কাজ করে। যাহাদের শক্তি নাই তাহারাই শিক্ষক হইয়া উপদেশ বিতরণ করে।" চিত্তরঞ্জনের মাঝে আমরা এই দুইয়েরই মিশ্রণ দেখিতে পাই। তিনি যেমন উপদেষ্টা, শিক্ষক, তিনি তেমন কর্মী, তিনি কর্তা। অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে তাই তিনি সকলকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সর্বস্ব ত্যাগ করিবার আহ্বান জানানোর জন্যই নিজেও সর্বত্যাগী হইয়া পথ প্রদর্শক হইলেন। কবিগুরুর গানের সুরে সুর মিলাইয়া চিত্তরঞ্জনকেও বর্ণনা করিয়া গান গাওয়া যায়, 'তব সিংহাসনের আসন থেকে এলে তুমি নেমে'। তাঁহার সিংহাসন রসা রোডের ১৪৮ নং বাড়ী—আর নামিয়া আসিলেন জনগণের চরণধূলির ধূলায় ধূসর হইতে। অসহযোগ আন্দোলনের সেনাপতি চিত্তরঞ্জন, মনে মাতৃ-বন্দনার মন্ত্র, দৃঢ়চিত্তে অমিত তেজ, দক্ষিণ হাতের বজ্রমুঠিতে ত্যাগের নিশান আর তাঁহার পূর্ব-পুরুষের চরণধূলায় পবিত্র,—নিজের শত স্মৃতি বিজড়িত গৃহের

শীর্ষে নিজের উন্নত শিরের মতই উড্ডীন জাতীয় পতাকা!

নূতন পোশাক পরিধান করিয়া চিত্তরঞ্জন অসহযোগ আন্দোলনে অবতীর্ণ হইলেন। পরিপূর্ণ অসহযোগী তিনি। যে-কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে ছিল (১) ইংরাজ বা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি পরিত্যাগ করা (২) সরকার আয়োজিত দরবারের নিমন্ত্রণ বর্জন করা (৩) সরকারী স্কুল-কলেজ হইতে ছাত্রগণকে ফিরাইয়া আনা এবং আইন ব্যবসায়ীদের আদালত বর্জন (৪) ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচনের সময় দেশবাসী কর্তৃক উহা বর্জন। ইহার মধ্যে তিনটি প্রস্তাবের উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল,—উহা হইতেছে তিনটি বর্জন,—স্কুল-কলেজ, আদালত আর কাউন্সিল। এই সমস্ত বর্জন এবং যাবতীয় অসহযোগ আন্দোলনই হিংসা বর্জিত পথে পরিচালিত করিয়া ইহার পরিধিকে ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর করিবার ব্যবস্থা হইল। গান্ধীজী ইহা চাহিয়াছিলেন এবং চিত্তরঞ্জন তাহাই মনে প্রাণে গ্রহণ করিলেন। চিত্তরঞ্জন বুঝিয়াছিলেন যে, অসহযোগ আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে বাংলার তরুণ সম্প্রদায় বা ছাত্রমণ্ডলীকে সহায়করূপে না পাইলে চলিতে পারে না। তাই তাঁহার হিসাব মত ছাত্রগণকে পাইবার জন্যই তিনি প্রথম চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ছাত্রগণ সুকুমারমতি, উহাদের মন হিংসা দ্বেষ বিবর্জিত, পাপ-শূন্য। তাহাদিগকে স্বদেশ প্রেমে তৃষ্ণাতুর করিতে হইবে, স্বাধীনতা হীনতায় বাঁচিয়া থাকা বাঁচিয়া থাকাই নহে,—সে জীবন যাপনে মায়ের অপমান, নিজের অপমান। দিনে দিনে স্তূপীকৃত হওয়া এই অপমানের পাহাড় লইয়া না বাঁচিয়া উহাদিগকে অসহযোগের মাধ্যমে স্বরাজ লাভের পথে আনিতে হইবে। তাই তিনি ছাত্রগণকে স্বদেশ প্রেমে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য ডাক দিলেন। আরম্ভ হইল তাঁহার কাজ।

সেই অসহযোগের সময়, অসহযোগের বছর ১৯২১। জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ১০ই, ১১ই এবং ১৩ই তারিখে কলিকাতার বুকে তিনি আন্দোলনের উদ্বোধন করিলেন। ১০ই তারিখে বিডন স্কোয়ারে (বর্তমানে রবীন্দ্র কানন) বক্তৃতা করিলেন। পরের দিন রবিবার ১১ই জানুয়ারী তিনি ওয়েলিংটন (বর্তমান সুবোধ মল্লিক) স্কোয়ারে সভা করিয়াছিলেন। কোথাও তাঁহার গায়ে বালাপোষ, কোথাও কালো কোট। কিন্তু পায়ে সর্বত্রই

চটিজুতা। রবিবার বলিয়া স্বাভাবিকই সেদিন জনসমাগম বেশী হইয়াছিল। বক্তৃতাও করিয়াছিলেন অনেকে। বাংলার সব বিখ্যাত শ্যামবাবু, অম্বিকা উকিল, শ্রীশবাবু ও মহবুব আলি প্রভৃতি। কিন্তু ইহাদের সকলের কণ্ঠ ছাপাইয়া অপূর্ব আবেগ আর দরদের স্বরে চিত্তরঞ্জন বলিতে লাগিলেন,—আহ্বান জানাইলেন, "বাংলার তরুণগণ! তোমারই তো দেশের একমাত্র আশা, তবে এখনও নিশ্চেষ্ট কেন? তোমরা যদি বাস্তবিকই মানুষ হও, যদি মনুষ্যের আত্মা তোমাদের হৃদয়ে থাকে, যদি মানুষের রক্ত তোমাদের ধমনীতে প্রবাহিত হয়, তবে স্বরাজ সংগ্রামে কেন তোমরা পরাঙ্মুখ? জানিও স্বরাজলাভের ব্রতে যদি তোমরা প্রতিবন্ধক হও, যদি তোমাদের ঔদাসীন্যে আমরা স্বরাজলাভে বঞ্চিত হই, তোমাদের এই কাপুরুষের কীর্তি-কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিবে। আর তর্ক করিও না, মুক্তি চাও তো আর যুক্তি চাহিও না, ছাড়িয়া এসো গোলামখানা, মুক্তির সন্ধানে অগ্রসর হও। কাজের তো অভাব নাই, কাজীরই অভাব। শীঘ্র এসো, মনে রেখো সকলেই তোমরা সরকারী চাকুরী পাইবে না।"

চিত্তরঞ্জনের এই আবেদন বৃথা হইল না। তাঁহার বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ যেমন তাহারা মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছিল, উহার অর্থও তাহারা উপলব্ধি করিয়াছিল নিশ্চয়ই। কারণ ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মিটিংয়ের দুই দিন পরে, ১৩ই জানুয়ারী কুমারটুলি পার্কে চিত্তরঞ্জন আর একটি সভা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহার পরেই ছাত্রগণ চিত্তরঞ্জনের ডাকে সাড়া দিলেন। বিডন স্কোয়ার, ওয়েলিংটন স্কোয়ার এবং কুমারটুলি পার্কের বক্তৃতায় ছাত্রগণ অনুপ্রাণিত হইয়া মনের মধ্যে যে বিদ্যুৎ পুঞ্জীভূত করিয়াছিল তাহারই প্রবল প্রেরণায় তাহারা নিজেদের কর্তব্যে অংশ গ্রহণ করিতে আগাইয়া আসিলেন। মুখে তাহাদের একই কথা,—স্বরাজ চাই, হাতে তাহাদের স্বরাজের পতাকা। পরের দিন কলিকাতার রাজপথে এক নয়ন-ভোলানো দৃশ্য। যাহা অনেকে ভাবে নাই, কল্পনাও করিতে পারে নাই বাস্তবে তাহারা তাই দেখিল।—১৪ই জানুয়ারী কলেজের ছাত্রগণ কলেজ পরিত্যাগ করিয়া রাস্তায় নামিল। প্রথমেই বাহির হইল বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্রগণ। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আসিল রিপণ (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) 'কলেজে। পার্শ্ববর্তী দুই কলেজের মিলিত ছাত্র রওনা হইল আমহার্স্ট স্ট্রীটে সিটি কলেজে। মুহূর্তে তাহারা

যুক্ত হইলে ছাত্রদল আসিল বিদ্যাসাগর কলেজে। সেইখানেই প্রথম বাধা। ভাইস প্রিন্সিপাল অন্য কলেজের ছাত্রদের ভেতরে প্রবেশ নিষেধ করিলেন। উদ্বেল ছাত্র-ধারার স্রোত আসিল তখন স্কটিশ চার্চ কলেজে। বাধা সেখানেও, হওয়ার কথাও, বিদেশী অধ্যক্ষ। ওয়াটস্ সাহেব নিষেধাজ্ঞা জারি করিলেন। সুতরাং স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রগণ ঐ সম্মিলিত ছাত্রদলের সঙ্গে মিলিত হইল না। কিন্তু প্রশ্ন—কোন্ কলেজের ছাত্র যোগদান করিল আর কোন কলেজের ছাত্র যোগদান করিল না তাহাই নহে, বিদ্যামন্দির ছাড়িয়া ছাত্রগণ বাহির হইয়া আসিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়াছে তাহাই যথেষ্ট। সেই তো পথ, পথের সূচনা, শুভ সূচনা। দলে দলে ছাত্র। অনুমান—তিন হাজার হইবে। মির্জাপুর পার্কে সভা হইবে, তাহারা আসিয়া সেখানেই সম্মিলিত হইল। সভাপতি চিত্তরঞ্জন। ছাত্রগণের ঐ সমাবেশ দেখিয়া খুশীতে তাঁহার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে—তাহার বুকে সেই খুশীর ঢেউ, চোখে নূতন আশার দিগন্তবিসারী আলো, মুখে হাসির ছটা—ভাবিলেন, স্বেচ্ছা-সেবক! সৈন্য!! এই তো অসহযোগ আন্দোলনের জন্য সৈন্য পাওয়া গিয়াছে। বক্তৃতা মঞ্চে দাড়াইয়া বলিলেন, "আজ তোমাদিগকে আমার সঙ্গে পাইয়া আমি স্বরাজ লাভে নিঃসন্দেহ হইলাম, আজ আমি অনুভব করিতেছি যে স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্য সাধনে এই জীবনটা উৎসর্গ করিতেও আমার একটুও দ্বিধা বোধ হইবে না।"

ছাত্রগণ নূতনভাবে ভাবিত। স্কুল কলেজ ছাড়িয়াছে তো ছাড়িয়াছেই, তাই তাহারা চিত্তরঞ্জনের নিকট দাবী করিল, ' আমাদের জন্য জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া দিন, আমরা সেখানেই লেখা পড়া শিখিব।"

উত্তর দিয়াছিলেন চিত্তরঞ্জন,—"হ্যা দিব। কিন্তু তোমাদের অনেক কাজ করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে স্বরাজের বার্তা বহন করিতে হইবে। পল্লী জীবন গঠনের কাযে ব্রতী হইতে হইবে। তবে যাহারা বিদ্যালয়ে পড়িতে চাও তাহাদের জন্য জাতীয় শ্রেষ্ঠ বিদ্যামন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

আন্দোলনের গতি রোগের সংক্রামিত গতির মত। অসহযোগ আন্দোলনের এই গতিও দুর্বার স্রোতে শহরের বুক হইতে বাংলা মায়ের অঞ্চল-প্রান্ত মফঃস্বলে মফঃস্বলে বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। কলিকাতা মির্জাপুর পার্কের তিন হাজার স্বেচ্ছাসেবক দেখিতে দেখিতে তিরিশ হাজারে পৌছাইল। মফঃস্বল

হইতে সংবাদ আসিতে লাগিল, টেলিগ্রাম আসিল, পত্র আসিল—সবটিতেই স্বেচ্ছাসেবক বৃদ্ধির সংবাদ। উদ্বেলিত বাংলা, জাগ্রত বাংলা। সর্বত্র নূতন জয়-ধ্বনি, 'বন্দেমাতরম্'! ছাত্রগণ প্রত্যেক দিন অপরাহ্নে মির্জাপুর পার্কে সম্মিলিত হইয়া আলাপ-আলোচনা করিত, চিত্তরঞ্জনের ইচ্ছা, আদেশ ও উপদেশ মত নিজেদের করণীয় কর্ম নির্ধারণ করিত। সে কর্তব্য পালনে তাহাদের কত আনন্দ, প্রাণের কানায় কানায় নূতন প্রাচুর্য আর মনে ধ্যান, মনে ধারণা—চিত্তরঞ্জন! কি বিরাট পুরুষকার,—মহান প্রেরণাদাতা! ছাত্র-স্বেচ্ছাসেবক-দের সম্মুখে তিনি এক নূতন মন্ত্রের উদ্‌গাতা,—তিনি নব-ভগীরথ। ছাত্র-সমাজের এই মানসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা এক সংবর্ধনায় চিত্ত-রঞ্জনকে একদা 'মহাত্মা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। ইহাতে অবস্থাটি রূপ নিল অন্যরূপে। চিত্তরঞ্জনকে তো আর সাধারণ মানুষের মত ধরিয়া হিসাব করিলে চলিবে না। যাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য ছাত্রগণ বিজয় উল্লাসের মধ্যে মহাত্মা বলিয়াছিলেন, তিনি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন। জানা যায়, সম্বোধনটি শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখখানি বিবর্ণ হইয়াছিল। উদ্যোক্তা ছাত্রবৃন্দকে ধীর স্থির ভাষায় বলিয়াছিলেন, "এই মিথ্যা সম্মানে যদি আমার মস্তক ভারাক্রান্ত হ, তবে এ ভার তো এই শির বহন করিতে পারিবে না, একেবারে বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।"

রতন-ভূষণ নহে, মহামূল্য উপাধি-ভূষণ যাহা চিত্তরঞ্জন নিজের সম্বন্ধে মিথ্যা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন তাহা কিছুতেই গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু দেশের জন্য যাহার মন আকুল, দেশের মানুষকে যিনি ভালোবাসেন এবং দেশের জন্য যাহার উৎসর্গীকৃত প্রাণ সেই দেশ, দেশের মানুষ কৃতজ্ঞতায় বাধিত হইয়া তাঁহার সেই মন আর প্রাণের মূল্য না দিয়া পারে কি? তাই দেখা গেল, ১৯২১ সালের ১৮ই জানুয়ারী সেই সময়ের বিখ্যাত ওরিয়েন্টাল লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সেক্রেটারী বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত মহাশয় দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকায় একখানি চিঠি প্রকাশিত করিয়া চিত্তরঞ্জনকে 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

নূতন প্রস্তাব। উপাধির অর্থ সত্য সত্যই চিত্তরঞ্জনের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সংবাদপত্রে ঐ পত্র এবং প্রস্তাবে দেশের মানুষের পূর্ণ সমর্থন তো নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু নিয়মের যেমন ব্যতিক্রম থাকে এখানেও তাহাই দেখা

গেল। দুই একজন এই উপাধিতে আপত্তি জানাইল না বটে তবে বলিল, 'দেশবন্ধু' শব্দের অর্থ চণ্ডাল।

চিত্তরঞ্জন ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাদের দেশ পরাধীন, আমরা পরাধীন। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ব্যক্তি চণ্ডালেরও অধম।"

এই সময় আইনের পরীক্ষা আরম্ভ হয়। স্বেচ্ছাসেবক ছাত্রগণ তাহাদিগকে পরীক্ষা দিতে বিরত করিবার জন্য চেষ্টা করিল। তাহারা পরীক্ষার্থীদের প্রবেশ করিবার পথে লাইন-বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কেহ কেহ শুইয়া পড়িল। বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ছাত্রগণ কেহ পরীক্ষায় উপস্থিত হইল না, আবার কেহ কেহ শায়িত স্বেচ্ছাসেবকদের পদদলিত করিয়াই পরীক্ষার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু আন্দোলনের তীব্রতা বুঝিতে পারা যাইবে পরীক্ষার্থীদের সংখ্যার দিকে তাকালেই। সে-বৎসরে বি. এল. পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল ৫৬০ জন ছাত্রের আর পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হইয়াছিল মাত্র ১৭৮ জন।

আন্দোলনের গতি দুর্বার গতিতে চলিয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার তখন স্যার নীলরতন সরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণও যাহাতে এই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে সে জন্যও চেষ্টা করা হইল। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিরূপ হইয়াছিলেন। তিনি এই আন্দোলন সম্বন্ধে রূঢ় মন্তব্যও করিয়াছিলেন। ওদিকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় চিত্তরঞ্জনের দেশপ্রেমের জন্য ত্যাগ সম্বন্ধে সন্দেহাতীত হইতে না পারিয়া অমৃতবাজার পত্রিকায় চিত্তরঞ্জনের নিকট কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। উহা চিত্তরঞ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং স্যার আশুতোষের রূঢ় মন্তব্যের কথাও তাঁহার কানে আসিয়াছিল। তিনি এই সব কিছুরই উত্তর দিলেন ঐ মির্জাপুর পার্কের এক সভাতেই। আশুতোষ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল যে, ঐ পুরুষ-সিংহ একদিন দেশসেবার মহান ব্রতকে তাঁহার জীবনেরও একমাত্র স্থির লক্ষ্য করিয়া ঐ ব্রতে যোগদান করিবেনই। সুতরাং তাঁহার যাহা মন্তব্য তাহা সাময়িকই। আর রামানন্দ বাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "গত দুই তিন বৎসর হইতেই পাগলের মত তিনি দেশচিন্তায় কত অনিদ্র-রজনী যাপন করিয়াছেন, ব্যবসা না ছাড়িলে একান্ত মনে যে দেশসেবা করিতে পারিবেন না তাহাও ভাবিয়াছেন। সমস্ত মামলার

সংস্রবই তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন। ডুমরাওনের আপিলটি সম্বন্ধে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন আর মিউনিসান বোর্ডের মামলা হইতে যাহাতে তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়, তজ্জন্যও Armstrong সাহেবকে তিনি লিখিয়াছেন"।

স্কটিস্ চার্চ কলেজে ছাত্র পিকেটিং লইয়া বেশ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ছাত্রগণ কলেজের প্রবেশদ্বারে শুইয়া পথরোধ করিয়াছিল। অধ্যাপক ওয়াটস্ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া ছাত্রগণকে পদাঘাত করিয়াই অগ্রসর হইয়াছিল। ছাত্রগণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আন্দোলনের মাত্রা আরও তীব্রতর করিয়াছিল এবং দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ভোলানাথ রায়ও প্রতিবাদ স্বরূপ ছাত্রগণের সহিত আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। ঘটনাটি চিত্তরঞ্জনের কানে গিয়া পৌঁছাইল। তিনি অহিংস অসহযোগের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়াছেন। ছাত্র আন্দোলনের ধারা যাহাতে বিপথগামী না হয় সেই জন্য আন্দোলনকারী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লিখিয়া পাঠাইলেন, "Your leaders as Non-co-operators are holy and not to be trampled down."

ছাত্রগণ চিত্তরঞ্জনের আদেশ মান্য করিল। কিন্তু কলেজ ছাড়াই তো বড় কথা নয়,—কলেজ ছাড়িয়াও বিদ্যাশিক্ষার জন্য যাহারা উদ্‌গ্রীব তাহাদের জন্য তো জাতীয় বিদ্যালয় চাই-ই। সেই উদ্দেশ্যেই চিত্তরঞ্জন আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া চলিলেন। তিনি একবার আসিলেন বঙ্গবাসী কলেজের আচার্য গিরিশচন্দ্র বসুর কাছে। একবার গিয়াছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিকট। কিন্তু জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট হইতে চিত্তরঞ্জন তেমন সহানুভূতিপূর্ণ কোন আশ্বাস পাইলেন না। তাঁহার পরিশ্রমই বৃথা হইল।

অসহযোগ আন্দোলনের এই পর্যায়ে গান্ধীজী মৌলানা মহম্মদ আলীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা আসেন। ২৬শে জানুয়ারী রবিবার মির্জাপুর পার্কে তাঁহারা একটি জনসভা আহ্বান করেন। সে এক বিশাল জনসমাবেশ। তদানীন্তনকালে তেমন জনসভা নাকি খুব কমই হইয়াছে—প্রায় ৩০ হাজার লোক। পার্কে আর লোক ধারণের জায়গা ছিল না। মিটিং শুনিতে মানুষ গাছে উঠিয়াছিল। নীচে জায়গা না পাইয়া ছাদে, বাড়ীর বারান্দায় জায়গা করিয়া লইয়াছিল। এই ত্রয়ী সম্মেলন সেদিন দেশের বুকে নূতন আশার

সঞ্চার করিয়া মানুষকে নূতন করিয়া স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। এই সভায় চিত্তরঞ্জন বিশেষ করিয়া ছাত্রগণের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, "সফলতা তো তোমাদেরই হাতে। আমার একমাত্র উপদেশ এই যে, সকলে তোমরা অবিচল থাকিও। তোমাদের শক্তিতেই আমার শক্তি। এ কথা কখনও ভুলিও না যে এই মহাকার্যের জন্য এক বৎসর তোমাদের শিক্ষা স্থগিত রাখিলে বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হইবে না। এই ধর্মযুদ্ধে তোমরা যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া ঐ সমস্ত কলেজগুলিতে আবার ফিরিয়া যাও তবে তোমরা জাতীয় সংগ্রামে ভীরু, কাপুরুষ, আর এই ধর্মযুদ্ধের যোদ্ধা নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য!"

উক্ত সভাতেই চিত্তরঞ্জন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা কতিপয় ছাত্র যদি না আস সে তো তোমাদেরই লজ্জা! কাজ কিছুতেই পড়িয়া থাকিবে না, কারণ জনসাধারণ আমার পশ্চাতে।"

কথার অর্থ বুঝিলেও মেডিক্যাল ছাত্রগণ দেশবন্ধুকে প্রশ্ন করিয়াছিল। তাহারা চিত্তরঞ্জনের নিকট উত্তর চাহিলেন, "আমরা এই রুগ্নব্যক্তিগণের শুশ্রূষা ছাড়িয়া কি করিয়া আসিব?"

চিত্তরঞ্জন উত্তর করিয়াছিলেন, "তোমরা কয়জন রোগীর কথাই ভাবিতেছ। আজ সমগ্র দেশের নরনারী ব্যাধি বিড়ম্বনায় জর্জরিত। কই তাহাদের কথা তো একবারও ভাবিতেছ না?"

আন্দোলন তখন এমন অবস্থাতেই চলিতেছিল যে সভা-সমিতিহীন একটি দিনও অতিবাহিত হয় নাই। ২৬শে জানুয়ারী মির্জাপুর পার্কে ছাত্রগণকে উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়া ২৭শে জানুয়ারী ছাত্রগণকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি আবার বলিলেন, "The battle of freedom has never been won in the history of the world without sacrifice. The armed organizations of powerful Bureaucracies all over the world have made armed resistance well nigh impossible. But the soul is ever free and he who is free in his mind can never be enslaved. I want you to turn your face from Europe and from organizations which are of European character. I want you to concentrate your vision on the

things which truly belong to us. Avoid the very monstar of Bureaucratic education. I repeat again—wake up, wake up. We have slept too long. Realise the sense of your bondage and stand out boldly on the road to freedom."

এই সময়েই ১১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একটি বাড়ী ভাড়া লওয়া হয়। মাসিক ভাড়া নির্ধারিত হইয়াছিল দুই হাজার টাকা। বাড়ীখানার নাম 'ফোরবেস্ ম্যানসন'। সেখানে ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে গৌড়ীয় সর্ব-বিদ্যায়তন ও জাতীয় মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবসে শারীরিক অসুস্থতার জন্য চিত্তরঞ্জন উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। মহাত্মাজী উহার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আরও যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন তাহারা হইতেছেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি। উল্লেখ-যোগ্য যে, উপস্থিত এই নেতৃবৃন্দ সকলেই দেশবন্ধুর এই স্বদেশ-প্রেমের মহান প্রচেষ্টাকে সেদিন অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহার পরে কালীঘাটে যেদিন জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় সেদিন দেশবন্ধু নিজে উপস্থিত থাকিয়া উহার শুভ উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

কিন্তু প্রধান কর্মকেন্দ্র পাঁচতলা বাড়ী ঐ 'ফোরবেস ম্যানসন।' উহা স্কুল, উহা কর্মকেন্দ্র, উহা ভবিষ্যৎ হোম যজ্ঞের প্রধান তীর্থভূমি। প্রধান হোতা চিত্তরঞ্জন আর তাঁহার এই কর্মযজ্ঞের সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য বাংলার যে সমস্ত বিপ্লবী তরুণ-প্রাণ সেদিন তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে প্রধান হইলেন সুভাষচন্দ্র।

প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ে তিন রকম শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যথা,—আদ্য, মধ্য ও উপাধি। ইহার প্রথম অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে সঙ্গে জিলায় জিলায়ও জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যে-সমস্ত পুস্তক পড়ান হইত তাহা ছিল সর্বত্রই এক। কবিরাজী সম্বন্ধেও দেশবন্ধু অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তৎকালীন সময়ের বিখ্যাত শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়কে আহ্বান করিয়া বৈদ্যশাস্ত্র পীঠ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং যে সমস্ত মেডিকেল ছাত্র অসহযোগে যোগদান করিয়াছিল তাহাদের শিক্ষার জন্য ঐ ফোরবেস ম্যানসনেই জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান পরিষদ

(National Medical Institute) স্থাপন করিয়া ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসকে উহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। তাহার এই কর্মগ্রহণের সময় দেশবন্ধুর সঙ্গে যে কথা হইয়াছিল তাহা সুন্দরীমোহন নিজেই বলিয়াছেন। দেশবন্ধু তাহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনার যোগ্য বেতন দিতে পারি এমন সাধ্য কিন্তু আমার নেই, তবে আপনাকেই এটা গড়ে তুলতে হবে।"

সুন্দরীমোহন জানাইয়াছিলেন, "আপনি এত ত্যাগ করতে পারলেন, আর আমরা কিছু পারব না! আমি আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

দেখা গেল, অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম হাতিয়ার ছাত্রগণকে অসহযোগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বুঝাইতে পারিয়া চিত্তরঞ্জন কৃতকার্য হইলেন। কিন্তু শুধু কলিকাতার ছাত্রগণই তো সব নহে, মফঃস্বলেও লক্ষ লক্ষ ছাত্র রহিয়াছে। তাহাদিগকেও চিত্তরঞ্জনের চাই। সেই মহান উদ্দেশ্যেই চিত্তরঞ্জন কলিকাতা ছাড়িয়া তখন মফঃস্বলের পথে জয়যাত্রা করিলেন।

এই অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে এখানে আর একটি বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন রহিয়াছে। নাগপুর অধিবেশনে মহাত্মাজীর বিরোধিতা করিবার জন্য চিত্তরঞ্জন অনেকটা যুদ্ধে যাইবার মত সসৈন্যে সেখানে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল ডেলিগেটরূপে যুগান্তর ও অনুশীলন দলের বিপ্লবীগণ। কিন্তু নাগপুরে যে-চিত্রটি বাস্তবে ফুটিয়া উঠিল তাহা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। যুদ্ধের পরিবর্তে হইল শান্তি। মহাত্মাজী ও চিত্তরঞ্জন মিলিত হইয়া আলাপ-আলোচনা করিলেন যাহার পরিণামে দেখা গেল দুই বিরুদ্ধ শিবিরের ব্যবধান দূরীভূত হইয়া এক হইয়া গিয়াছে। সেনাপতির সিদ্ধান্তে সৈনিকের প্রশ্ন করিবার কোন অধিকার নাই। কিন্তু মনে মনে অসন্তুষ্ট হইবার অধিকার হরণ করিতে পারে কে? তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা দিল। বাংলার বিখ্যাত বিপ্লবী পূর্ণ দাস ও পুলিন দাস তাই তাহাদের বিপ্লবী মতবাদ লইয়া অগ্রণী হইয়াছিলেন। দেশবন্ধু অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া মহাত্মাজীর হাতে হাত মিলাইয়াছেন—তবুও তাঁহারাও দেশবন্ধুকে অনুসরণ করিবেন ঠিকই কিন্তু তাহাদের অহিংসায় অবিশ্বাসী বিপ্লবী মনের দাবী উঠিল, অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিবার পুর্বে তাহারা একবার মহাত্মাজীর সঙ্গে কথা বলিতে চান। চিত্তরঞ্জনকেই তাঁহারা ইহার

ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। সেই অনুসারে ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চিত্তরঞ্জনের রসা রোডের বাড়ীতে বিপ্লবীদের সঙ্গে গান্ধীজীর এক সাক্ষাৎকার হয়। দীর্ঘ কথোপকথন, দুই পক্ষেরই যুক্তি তর্ক চলিয়াছিল। এই সাক্ষাৎকারে মহাত্মাজী যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মূল কথা এই: "তোমরা বিপ্লবীদল মুষ্টিমেয়, তোমরা জীবন পণ করিতে পার, কিন্তু এইভাবে চুরি করে অস্ত্র সংগ্রহ করে ব্রিটিশরাজের বিশাল সৈন্যের কি করতে পারবে? আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশবাহিনীর সঙ্গে অস্ত্রযুদ্ধ—অসম্ভব! কিন্তু যদি অহিংসা পন্থা গ্রহণ কর, তবে অহিংসভাবে বিপ্লবের বাণী গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে পারবে। লুকিয়ে কিছু করতে হবে না। প্রকাশ্যে গ্রামবাসীদের বোঝাও, ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগ কর, এতেই জন জাগরণ হবে। যদি অধিকাংশ ভারতবাসী চায় ইংরেজ চলে যাবে, ইংরেজ চলে যেতে বাধ্য হবে। পশুবল দিয়ে ইংরেজের সঙ্গে না লড়ে মানসিক বল, আত্মিক বল দিয়ে লড়াই কর।"

দেশবন্ধুর উভয় সঙ্কট। তিনি এক দিকে যেমন গান্ধীজীর সঙ্গে হাত মিলাইয়া অহিংস অসহযোগে মন-প্রাণ যুক্ত করিয়া দিয়াছেন আবার বিপ্লবীদেরও তিনি চিনিতেন। তাহাদের সঙ্গে ছিল তাঁহার নাড়ীর যোগ। বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য তাঁহার সর্বসত্বা সবদাই উন্মুখ। সময়ে অসময়ে অর্থদ্বারা এবং উপদেশ দ্বারা তিনি যে বিপ্লবীদের কত সাহায্য করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং তাহাদিগকেও তিনি দূরে রাখিতে পারেন না। অবশ্য চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে বিপ্লবীদের সহিংস অথবা অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে পার্থক্য থাকিলেও বাস্তবক্ষেত্রে ঐ অসহযোগ আন্দোলনে বিপ্লবীগণ চিত্তরঞ্জনকে পরিপূর্ণ সমর্থন করিয়াছিলেন। তাহাদের সমর্থন ছিল বলিয়াই চিত্তরঞ্জন ঐ আন্দোলনে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের বীজ তখন প্রোথিত হইয়াছে। উহা ডালপালাতে, শাখা-প্রশাখায় বিস্তারিত হইয়া বাংলার দিকে দিকে আরও বিস্তার লাভ করুক ইহাই চিত্তরঞ্জন চাহিয়াছিলেন। সেই মহান উদ্দেশ্যে তিনি ফেব্রুয়ারীর শেষ ভাগে পূর্ববঙ্গে যাত্রা করিলেন।

চিত্তরঞ্জন প্রথমেই নারায়ণগঞ্জ হইয়া ঢাকা গিয়াছিলেন। নারায়ণগঞ্জে তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই প্রীত হইল এবং উৎসাহবোধ করিল কিন্তু ঢাকাতে

সে উৎসাহ দেখা দিল প্রবল বন্যার আকারে। ছাত্রগণ স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করিল, আইনজীবিগণ নিজেদের জীবিকা বর্জন করিতেও দ্বিধাবোধ করিলেন না। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকার বিখ্যাত নবাব পরিবারের স্বনামখ্যাত খাজে আবদুল করিম ও খাজে সোলেমান কাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের জন্য অসহযোগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া চিত্তরঞ্জনের পার্শ্বে আসিয়া আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন।

ঢাকার কাজ সমাধা করিয়া চিত্তরঞ্জন ২রা মার্চ পূর্ববঙ্গের আর এক বিখ্যাত শহর ময়মনসিংহ অভিমুখে যাত্রা করেন। চিত্তরঞ্জন ময়মনসিংহ আসিতেছেন শুনিয়া সেখানকার স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, ছাত্র, কেরানী, উকিল, মোক্তার জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই অনির্বচনীয় উৎসাহে উদ্বেলিত। শহরের লোক ঘর ছাড়িয়া আসিল পথে পথে,—জনতার স্রোত শহর ভাঙ্গিয়া স্টেশনের দিকে একমুখী। প্ল্যাটফর্মে জনসমুদ্র। কিন্তু এত যে উৎসাহ আর উদ্দীপনা তাহা সবই কোথা হইতে একখানি ঘন কালো মেঘ আসিয়া একেবারে স্তিমিত করিয়া দিল।

চিত্তরঞ্জন তখন বাসন্তী দেবীসহ গাড়ী হইতে প্ল্যাটফর্মে নামিয়াছেন। তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই উত্থিত হইল সহস্র সহস্র কণ্ঠের সমবেত জয়ধ্বনি, 'চিত্তরঞ্জন কি জয়! 'বন্দেমাতরম্'। এই সমবেত জনমণ্ডলীর জয়োল্লাসের মধ্যে চিত্তরঞ্জন যখন প্ল্যাটফর্মের বাহিরে যাইবার জন্য পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতে-ছিলেন ঠিক সেই সময়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মধুসূদন দাস, এডিসনাল ডিস্ট্রীক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ভগেন ষ্টিফেনের একটি আদেশনামা তাঁহার হাতে তুলিয়া দিল। —তাহাতে চিত্তরঞ্জনের উদ্দেশ্যে লেখা ছিল, "As you are likely to disturb public tranquility by encouraging unauthorised pro-cessious within the town of Mymensingh and attempting to disturb those engaged in lawful business in holding examina-tion, I order yon under section 144cr. P. C. to abstain from entering the town."

আদেশটি পড়িয়া চিত্তরঞ্জন একটু ভাবিলেন। তাঁহার মন কিছুতেই ঐ আদেশ মানিতে রাজী হইল না। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "জেলেই যাইব, আর কি হইবে?" অর্থাৎ সরকারী ঐ আদেশ অমান্য করিতে চিত্তরঞ্জন

প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তাঁহার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব এবং শুভানুধ্যায়ী বিশেষতঃ মনোমোহনবাবু ও হেমন্ত সরকার বুঝাইলেন, "কংগ্রেস তো এই সমস্ত ইস্তাহারাদি অমান্য করিতে এখনও আদেশ দেয় নাই।"

চিত্তরঞ্জন কথার যৌক্তিকতা বুঝিলেন এবং ইহাও নূতন করিয়া আবার ভাবিলেন যে, অসহযোগ আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে বাংলার তরুণ প্রাণগুলিকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে না পারিলে হইবে না। কারার অন্তরালে দিন কাটাইলে আন্দোলনের স্রোত মাঝ-পথে হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং বাহিরে থাকিযাই ছাত্র সমাজের মন জয় করিয়া তাহাদের মনে অসহযোগের বাজ পুতিয়া দিতে হইবে। তাহারাই উহা বাংলার গ্রামে গ্রামে বহন করিয়া গ্রামবাসার মনে স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগাইয়া তুলিবে। সুতরাং চিত্তরঞ্জন নিজেকে সংবরণ করিলেন এবং সন্ধ্যার ট্রেনে ময়মনসিংহ ত্যাগ করিবার পূর্বে সম্মিলিত জন মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বলিলেন, "যে সত্য আমি বরাবর অনুধাবন করিয়া আসিয়াছি, তাহাই আজ আমার সম্মুখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে যে, ইচ্ছা হইলেই বুরোক্রাসা সর্বাগ্রে যে কোন আইনের বিধানই ভাঙ্গিতে পারে। রিফর্মসই বা আমাদের কি দিয়াছে? যখন একজন ম্যাজিস্ট্রেট খেয়াল হইলেই ..ত্র স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করিতে পারে, তখন এই সংস্কারগুলিতে আমাদের বিন্দুমাত্রও লাভ হয় নাই। আজ আমি অনিচ্ছায়ও এই অন্যায় আদেশ মানিলাম। কিন্তু অচিরে কংগ্রেস কর্তৃক যাহাতে এই সমস্ত বেআইনা আদেশের বিরুদ্ধে অবাধ্যতা প্রয়োগ হয়, আমি বিশেষভাবে সেদিকে যত্নবান হইব। আর কি দেখিতেছেন, স্বরাজ ভিন্ন কোন উপায়ই সম্ভব নয় আর কোন গতিই নাই 'নান্য পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়'। প্রতি মুহূর্তে ছটফট করিতেছি, মনে হয় ..দের জীবন কি হেয়! হায়, আমরা নিজবাসে ক্রীতদাস মাত্র, স্বরাজলাভ ব্যতিত জীবন ধারণই বিড়ম্বনা"।

ময়মনসিংহের এই ঘটনার জন্য সর্বত্রই একটা আলোড়ন সৃষ্টি হইল। বাংলার গভর্ণর রোনাল্ডসে তখন ঢাকাতে ছিলেন। তিনি স্বচক্ষে দেখিলেন, ঢাকায় হরতাল। আইনজীবিগণ ৭ দিন আদালত বর্জন করিবেন স্থির করিলেন, অন্যান্য স্থানের ব্যবসায়ীগণও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হরতাল পালনের জন্য দৃঢ় চিত্ত হইল। কলিকাতাতেও দুইটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয। একটি অনুষ্ঠিত হয় মির্জাপুর পার্কে। অপর সভা হয়

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। এ-সভার প্রধান হোতা ছিলেন ব্যোমকেশ চক্রবর্তী এবং মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। সেখানকার গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, 'ময়মনসিংহের এ. ডি. এম মিঃ ভগেন ষ্টিফেনের ঐ আদেশ অত্যন্ত অন্যায়, আইন-বিরোধী এবং অসঙ্গত'।

জলের স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হইলে জল স্ফীত হইয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলে। এখানেও অবস্থা দাঁড়াইল প্রায় তদ্রূপ। ষ্টিফেনের ঐ অসঙ্গত আদেশে বাংলার জনগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া নূতন রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইল। সেদিক হইতে উপকারই হইল চিত্তরঞ্জনের।

চিত্তরঞ্জন গিয়া পৌঁছাইলেন টাঙ্গাইল। ময়মনসিংহের সম্মিলিত জনতা যেন আসিয়া সেখানে জমা হইয়াছিল। লোকে লোকারণ্য। টাঙ্গাইলের বিখ্যাত কংগ্রেস কর্মী, আইনজীবী অমরেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়ীতে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। অমরবাবু তখন হইতেই আইন ব্যবসা বর্জন করিয়া দেশবন্ধুর মন্ত্রশিষ্যের মত তাঁহার অনুগামী হইলেন আর অনুগামী হইলেন চার লক্ষ টাকা আয়ের বিখ্যাত জমিদার চাঁদমিঞা সাহেব। বিরাট ঐশ্বর্যশালী চাঁদমিঞা সাহেব অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পরবর্তীকালে কারাবরণও করিয়াছিলেন। আমীর হইলেন ফকির।

টাঙ্গাইল হইতে চিত্তরঞ্জন গিয়া পৌঁছান মৌলভীবাজার। এখানে খিলাফৎ কমিটির সভাপতিরূপে চিত্তরঞ্জন সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেইদিনকার সেই বক্তৃতা নরনারীকে নূতনভাবে, নূতন চিন্তাধারায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিল। ঐ সময় সেখানে একটি নূতন দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। বক্তৃতা শেষে চিত্তরঞ্জন নিজের আসনে বসিবার সময়ে পশ্চাতের দিকে চোখ পড়িলে একটি সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহার চোখের মিলন হয়। দীর্ঘ জটাজুটধারী সন্ন্যাসী,—হাতে একটি ফুলের মালা। চোখের মিলনে দেশবন্ধুকে মালা পরাইয়া দিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন। চিত্তরঞ্জনও হাসিমুখে তাহা গ্রহণ করিলেন।

এই মালা পরাইবার মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই এবং উহা সংবাদ হইবার উপযুক্তও নহে। কিন্তু যে কারণে ইহা সংবাদ এবং ইহার বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে তাহা হইতেছে, চিত্তরঞ্জনের গলায় মালা পরান পর্ব শেষ হইলে ঐ সন্ন্যাসীকে আর কোথাও দেখা যায় নাই এবং ইহাও জানা গিয়াছে যে, ঐ অঞ্চলে পূর্বেও

ঐ সন্ন্যাসীকে কেহ কোনদিন দেখে নাই।

মৌলভীবাজারে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার মধ্যে আর একটি ঘটনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঘটনাটি বিশেষ ছোট কিন্তু উহার মধ্যেও যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। চিত্তরঞ্জন আইন-ব্যবসা ছাড়িবার জন্য কামিনীকুমার চন্দ মহাশয়কে বলিতেছিলেন, "আপনি তো পাকা আম, গাছে লাগিয়া আছেন মাত্র, নাড়া পাইলেই মাটিতে পড়িয়া যাইবেন।"

চিত্তরঞ্জন তখনও ধূমপান অভ্যাস পরিত্যাগ করেন নাই। কামিনী চন্দ মহাশয়কে যখন তিনি আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করিবার কথা বলিতেছিলেন তখনও তাঁহার মুখে চুরুট। কামিনীবাবু তখন বলিলেন, সবই তো ছেড়েছেন, আর এই চুরুটের মায়া কেন?

বলিলেন দেশবন্ধু: আপনি প্রাক্‌টিস্ ছাড়ুন, আমিও চুরুট ছেড়ে দেব।

মৌলভীবাজার হইতে চিত্তরঞ্জন শ্রীহট্ট ও হবিগঞ্জ হইয়া কুমিল্লা আসেন। যেখানেই যান সেখানেই তাঁহার বিপুল সংবর্ধনা। কুমিল্লাতে তিনি চারুচন্দ্র দত্তের বাড়িতে অতিথি হইয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের অনুপ্রেরণায় চারু দত্ত এবং স্থানীয় আরও দুই এক জন আইন-ব্যবসায়ী ব্যবসা পরিত্যাগ করেন। ইহা ছাড়াও বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত অখিল দত্ত মহাশয়, প্রকাশ দাস মহাশয় অসহযোগের সর্মথনে আদালত বর্জন করেন। কুমিল্লায় মহেশ ভট্টাচার্যের বাড়ির প্রাঙ্গণে সভা হইয়াছিল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, অখিল দত্ত প্রভৃতি কুমিল্লা হইতে অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন এবং কুমিল্লায় মেয়েদের সভা হইতে প্রায় দুই হাজার টাকা মূল্যের সোনার গহনা পাওয়া গিয়াছিল।

ঝড়ের গতিতে চিত্তরঞ্জন পূববঙ্গে ছুটিয়া চলিতেছেন। কুমিল্লা হইতে তিনি সোজা চলিয়া আসিলেন চট্টগ্রাম সেখানে তিনি অতিথি হইলেন জে, এম, সেনগুপ্তের বাড়িতে। চিত্তরঞ্জনের আগমনে এখানে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইল। সেনগুপ্ত তিন মাসের জন্য ব্যবসা ছাড়িয়া স্বরাজ লাভের জন্য ঐ অঞ্চলে কার্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং তাহার এই কার্যে সহায়তা করিবার জন্য অনেক দেশপ্রেমিক মহিম দাস, ত্রিপুরা চৌধুরী, প্রসন্ন সেন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ অগ্রসর হইয়া আসেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, চট্টগ্রামের সরকারী কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপাল ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসের শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সরকারী চাকুরী

পরিত্যাগ করিলেন।

চিত্তরঞ্জনের গতির শেষ নাই। বিরাট পুরুষের বিরাটতর অভিযান। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিক হইতে আরম্ভ করিযা জুলাই মাস পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও তিনি ক্লান্ত নন। ভারতবিখ্যাত আইনজীবী চিত্তরঞ্জন। ৬০।৭০ হাজার টাকা যাঁহার মাসিক আয়, যাঁহার বাবুয়ানা কিংবদন্তীতে তখন দাঁড়াইয়াছিল, যাঁহার ভোগ-বিলাস, সুখ-ঐশ্বর্য কুবেরের ন্যায়, যাঁহার চাল-চলন রাজার ন্যায় সেই চিত্তরঞ্জন সব ত্যাগ করিয়া, ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া নামিয়া আসিয়াছেন জনগণের মাঝে,—জনগণই তখন তাঁহার সাম্রাজ্য। তিনি জন-সাম্রাজ্যের দীন রাজা! এই জনগণের সান্নিধ্য লাভ করিতে করিতে তিনি আসিয়া পৌছিলেন নোয়াখালি। নোয়াখালিতে তিনি বেশী সময় থাকিতে পারেন নাই। মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় তিনি সেখানে ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নোয়াখালি বারের সভাপতি রজনীবাবুকে ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের কাজে ব্রতী করাইয়া আসেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় চিত্তরঞ্জন ছিলেন দূরে, তখনও যে তাঁহার রাজনৈতিক চেতনা ছিল না তাহা নহে কিন্তু তিনি তখন একাধারে কাব্যের সাধনা ও অন্য দিকে আইন ব্যবসা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এই অসহযোগ আন্দোলনের সময় দূরে নহে,—একেবারে পুরোভাগে। পুরোভাগে থাকিয়া প্রধান পুরোহিতের কর্ম সমাপন করিয়া তিনি পূর্ববঙ্গ ও আসামের মানুষের মনে মনে নূতন মন্ত্র দিয়া আসিলেন। সে মন্ত্র এক, সে সাধনার পথ এক, সকলের মনে মনে তখন জাগ্রত একটি তৃষ্ণা, স্বরাজ চাই! এই অমৃত তৃষ্ণায় জনগণকে তৃষ্ণার্ত করিয়া চিত্তরঞ্জন নোয়াখালি হইতে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন কারণ শীঘ্রই প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে।

অসহযোগ আন্দোলনের ধারাকে কলিকাতার কেন্দ্রভূমি হইতে ভগীরথের মত মাথায় করিয়া পূর্ববঙ্গে ও আসামে বহন করিয়া, জিলায় জিলায় ঘুরিবার পথে মৌলভীবাজারে সন্ন্যাসী কর্তৃক চিত্তরঞ্জনকে মালা দেওয়ার মধ্যে যেমন একটা অলৌকিক ভাব মিশ্রিত রহিয়াছে, ঠিক তেমনি চিত্তরঞ্জনকে দেখিবার জন্য জনচিত্তে যে আকুল পিপাসা জাগিয়াছিল তাহার একটি নিদর্শনও কম

প্রণিধানযোগ্য নহে। ঘটনাটি অনুষ্ঠিত হয় চিত্তরঞ্জন যখন সদলবলে চাঁদপুর হইতে আসাম যাইতে ছিলেন সেই সময়ে। প্রতিটি স্টেশনে স্টেশনে চিত্তরঞ্জনকে দেখিবার জন্য কাতারে কাতারে মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা সতৃষ্ণ নয়নে দাঁড়ান। একটি স্টেশনে ট্রেন আসিয়া থামিল। রাত তখন শেষ প্রান্তে, —৪টা বাজে। চিত্তরঞ্জন যে কামরায় ছিলেন, স্টেশনের অপেক্ষমান জনতা হইতে এক দীর্ঘকায় স্বাস্থ্যবান পাঞ্জাবী শিখ, সেই কামবায আসিযা উপস্থিত হইল। চারিদিকে তাহার চোখ জোড়া একবার ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'দেশবন্ধু কোথায়?' চিত্তরঞ্জনের অনুগামীগণ সহ বাসন্তী দেবীও লোকটির অমন জিজ্ঞাসা এবং ঐ বিশাল চেহারা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। চিত্তবঞ্জন তখন উপরের গদিতে নিদ্রা যাইতেছিলেন। লোকটি দমিবার পাত্র নহে। সে তাহার মনের আকাঙ্ক্ষা সাহসভরে বলিতে লাগিল, "আমরা সাত দিনের পথ আসিয়াছি, দেশবন্ধুকে দেখিব বলিযা আজ দুই-দিন চিড়া খাইযা স্টেশনে বসিযা আছি—আমবা দেশবন্ধুকে দেখিতে চাই।"

চিত্তরঞ্জনের দলের সঙ্গে হেমন্ত সরকারও ছিলেন, ছিলেন ঐ কামরাতেই। অনেক পরিশ্রমের পর দেশবন্ধু একটু ঘুমাইতেছেন এই কথা বলিয়া তিনি পাঞ্জাবীটির সহিত তর্কও করিলেন কিন্তু বৃথাই হেমন্ত সরকারের তর্ক। পাঞ্জাবীটি তাহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া দেশবন্ধুকে উপর হইতে তুলিয়া নিজের হাতে করিয়া প্ল্যাটফর্মে দণ্ডায়মান জনতাকে বাববার দেখাইতে লাগিল।

১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে বরিশালে বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয। পূর্বেও এখানে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মনোমালিন্যও হইয়াছে। কিন্তু এবারে যাহা হইল তাহা চরম। গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে মনোমালিন্যের স্তর দুস্তব হইয়া দাঁড়াইল।

এই সম্মিলনীতে বিখ্যাত বাগ্মী বিপিন পাল সভাপতি হইলেন এবং মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত হইযাছিলেন ঐ সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান। রাজনীতির গতি বড়ই চঞ্চল। অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন নাগপুরে হঠাৎ তাহার মনের পরিবর্তন করিযাছিলেন ইহাতে বিপিন পাল তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন না করিয়া বরং চিত্তরঞ্জনের উপর অসন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন কংগ্রেসের প্রকাশ্য সম্মেলনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় তখন তিনি উহা সমর্থন করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি

মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করিয়া উহার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। অসহযোগের জন্য তাহার সেই পরিশ্রম এবং কিছু উৎসাহ দেখিয়া চিত্তরঞ্জন ভাবিয়াছিলেন যে বরিশাল সম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণে ঐ অসহযোগ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু নূতন কথা শুনিবেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল অন্য চিত্র! সভাপতির ভাষণে বিপিন পাল যাহা বলিয়াছিলেন তার সারমর্ম হইল এই যে, কংগ্রেসের এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে কখনই স্বরাজলাভ হইতে পারে না, এই অসহযোগ এই পর্যায়ে চলিতে থাকিলে ইহার ভবিষ্যৎ পরিণতি ইংরাজের সঙ্গে সহযোগিতা। তাহা ছাড়া আমরা স্বরাজ, স্বরাজ করি বটে কিন্তু স্বরাজের একটি নির্দিষ্টরূপ বা কাঠামো থাকা একান্তই দরকার।

চিত্তরঞ্জন সভাপতির আসন হইতে তাঁহার রাজনৈতিক গুরু বিপিন পালের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "Swaraj is Swaraj—I am not a scheming man".

তেজস্বী বিপিন পাল। তিনিও কাহারও কাছে সহজে মাথা নত করেন নাই। চিত্তরঞ্জনের উত্তরে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "I have never bowed to pontifical authority in religion, and I am not going to do so in politics. The nation wants majic, but I can only give you logic."

ঠিক এই সময় হইতে উহাদের দুইজনের মধ্যে মতদ্বৈধের ভাব চরমে ওঠে এবং বিপিন পাল মহাশয় কংগ্রেসের মধ্যে আর তেমন স্থান লাভ করিতে পারেন নাই। বলা যায়, বরিশাল সম্মিলনীতেই তাঁহার কংগ্রেসী জীবনের যবনিকাপাত ঘটে।

বরিশালের ঐ সম্মিলনীতে চিত্তরঞ্জন যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হইতেছে: "স্বরাজের কোন বিশিষ্ট নাম নাই, স্বরাজের কোন রূপ কল্পনাও সম্ভব নয়, স্বরাজ গণতন্ত্র বা প্রভুতন্ত্র শাসনের সগোত্র নহে। স্বরাজ স্বরাজই, উহা স্বতন্ত্র। যখন স্বরাজ লাভ হইবে, তখন উহার নাম দিব। নাম দিলেই স্বরাজের আদর্শ কল্পনার শেষ হইয়া যায়। আমি ইহার কোন ধারা বা প্রকৃতি বা নাম রূপাদি নির্দেশ করিতে চাহি না। হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃগণ লইয়া একটি নূতন জাতি গঠিত হইতেছে,

যখন একটি বিশিষ্ট সমুন্নত জাতিতে পরিণত হইবে, কেবল সেই সময়েই স্বরাজের মর্মার্থ নির্দেশ সম্ভব। স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার। এই অধিকারকে সম্পূর্ণ অধিগত করিতে হইলে বা উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইলে তদুপযোগী তপঃ সাধনা চাই।

অসহযোগ আত্মপ্রতিষ্ঠামূলক মন্ত্র, ইহার সহিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কোনও সংস্রব নাই, ইহাতে আত্মসত্তা অনুভব করিতে পারিব, ইহাতে মোহ-জাল ছিন্ন হইবে, আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি, আমরা নিজেকে চিনিতে পারিব। সরকারী স্কুলই বল, আদালতই বল, বিলাতী বস্ত্রই বল, সব অলীক মোহরূপে আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। তাই শাসন সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক বস্তু হইতেই আমাদের সহযোগিতা বিচ্ছিন্ন করিব। এই দেশের কেহই যদি ঐ শাসনযন্ত্রের চালনায় সাহায্য না করে তবেই আমরা আত্মনির্ভরতা শিখিব, আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিব।

অহিংসা আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয় পথ। বিদ্বেষ সৃষ্টি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ইংরাজের ন্যায্য অধিকাব হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে চাই না। কোন জাতিই যেন অপর জাতির ন্যায্য অধিকারে বাধা প্রদান না করে, ইহাই আমাদের অভিপ্রায়। ইংরাজের সঙ্গে আমাদের কি বিবাদ? কিন্তু তাহারা আমাদের জা ীয় সমুন্নতি ও স্বাধিকার লাভে বাধা প্রদান করিবে, তাহা তো কখনও হইতে দিব না। স্বরাজ অর্থে স্বার্থ বিসর্জন, আত্মোৎসর্গ। আমি কি এই মহাজা তর প্রতিষ্ঠাকল্পে আপনাদের নিকট হইতে এই ত্যাগধর্ম প্রত্যাশা করিতে পারি না?

এই যে ছাত্রগণের 'ক্ষতি' 'ক্ষতি' বলিয়া অনেকে চীৎকার করিতেছে। গত যুদ্ধের সময় সৈন্য সংগ্রহ ব্যাপারে তো কেহ কোন আপত্তি করে নাই? আজও এই সংগ্রামে কেন সেই আপত্তি, তর্ক বা প্রতিবাদ শুনিতে পাই? এই যুদ্ধ ন্যায্য যুদ্ধ, আমাদের খাঁটি জীবনযুদ্ধ। যদি ইহাতে পরাজয় স্বীকার করি বা অগ্রসর না হই, তবে এ জাতির আর পুনরাভ্যুদয় নাই। আর এই যুদ্ধে অহিংসাই একমাত্র অমোঘ অস্ত্র। অনেকে আপত্তি করিয়া বলেন, "এরূপ অস্ত্রে কোন দেশেই স্বাধীনতা অর্জিত হয় নাই"। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি কোন্ দেশে বহুবর্ষ যাবৎ ত্রিশ কোটি নরনারী মুষ্টিমেয় বিদেশীর পদানত থাকিয়াছে? নিশ্চয়ই এই মন্ত্রে আপনার অভীষ্ট লাভ করিবেন।

যদি সমর্থ হন অনন্তকাল পর্যন্ত এই গৌরবময় ভারতের যশ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। একি দারুণ লজ্জার কথা নয় যে ম্যানচেস্টার আপনার মাতা, ভগ্নী ও স্ত্রীর বস্ত্র সরবরাহ করে? আপনার অতীত ঐশ্বর্য লাভ করিবার এই কি প্রকৃষ্ট অবসর নয়? কি, পারিবেন না আপনারা? যদি না পারেন আপনার ঈশ্বরের নিকটে আপনার ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন পুরুষের কাছে, আপনার দেশের নিকটে আপনি যে অপরাধী সাব্যস্ত হইবেন। কংগ্রেস তো আপনার কাছে বিশেষ কিছুই চাহে নাই। আপনাদের কৃষিকাজ আপনারা করিবেন, সূতা কাটিয়া আপনাদের বস্ত্র নিজেই বয়ন করিবেন। স্বাবলম্বী হইয়া স্ত্রীপুত্রের লজ্জা আপনি নিবারণ করিবেন, সন্তানগণের শিক্ষার ভার আপনারাই লইবেন। বাদ-বিসম্বাদ নিজেরাই নিষ্পত্তি করিবেন, এ আর বেশী কি? নিশ্চয়ই পারিবেন, কাজ করুন, শ্রমের মূল্য দিয়া স্বরাজলাভ করুন। অগ্রসর হউন, স্বয়ং নারায়ণ আপনাকে সাফল্য প্রদান করিবেন।"

অসহযোগ আন্দোলন তখনও চলিতেছিল কিন্তু উহার গতিবেগ সর্বত্র ত্বরান্বিত ছিল না। অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত বেজওয়েদায় তখন এপ্রিল মাসের শেষভাগে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান উদ্দেশ্য হইল অসহযোগ আন্দোলনকে তীব্রতর কিভাবে করা যায় তাহা নির্ধারণ করা। গান্ধীজী চাহিলেন, "Men, Money and Munitions." আন্দোলনকে সুষ্ঠুভাবে এবং নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিতে হইলে জনবল এবং অর্থবল দুইয়েরই প্রয়োজন রহিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে মহারাষ্ট্র নায়ক লোকমান্য তিলকের পবিত্র স্মৃতির 'উদ্দেশ্যে তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ড' নামে একটি ফাণ্ড গঠিত হইল এবং জুন মাসের তিরিশ তারিখের মধ্যেই এক কোটি টাকা সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল। এই সংগৃহীত অর্থ ব্যয় করা হইবে স্বরাজের কার্যে এবং কংগ্রেস কমিটিতে এই সিদ্ধান্তও নেওয়া হইয়াছিল যে আন্দোলনকে তীব্রতর করিবার জন্য কংগ্রেসে এক কোটি প্রাথমিক সদস্য নেওয়া হইবে।

'তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডে' অর্থ সংগ্রহ করিবার শেষ তারিখ নির্দিষ্ট হইল ৩০শে জুন। বাংলা দেশের ভাগে যে অঙ্কটি নির্দিষ্ট হইল উহা সাড়ে দশ লক্ষ টাকা। এই অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চিত্তরঞ্জন বাংলা জিলা কংগ্রেস কমিটিগুলির দিকে নজর রাখিয়া উহা পুনরায় গঠন করিলেন এবং তিনি

নিজেও দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি হইলেন। চিত্তরঞ্জনের তখন চোখে ঘুম নাই। দিন রাতের চিন্তা, কি করিয়া নির্দিষ্ট টাকা সংগ্রহ করিয়া দিবেন। দলের সকলকে ডাকিলেন, বলিলেন এবং বুঝাইলেন, 'দেখ যেন বাংলার মুখ রক্ষা হয়।' নিজেও কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবকে কার্যে রূপায়িত করিবার জন্য মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আবার বাংলার মফঃস্বলে বাহির হইলেন। এবার তাঁহার লক্ষ্য হইল উত্তরবঙ্গ। এবারকার এই সফরে দেশবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন মৌঃ আক্রাম খান, হরেন্দ্র ঘোষ, হেমন্ত সরকার, সুপ্রভা দেবী এবং বাসন্তী দেবী প্রভৃতি।

উত্তরবঙ্গ সফরে বাহির হইয়া চিত্তরঞ্জন প্রথমেই গেলেন বগুরা। এক অপূর্ব জন জাগরণ দেখা গেল সেখানে। সকল সম্প্রদায়ের প্রধানদের লইয়া তিনি 'ছত্রিশী বিচার' সমিতি গঠিত করিলেন। তাহারাই সব বাদ-বিসম্বাদ নিজেরাই সালিসী করিয়া মিটমাট করিয়া দিত। ঐ 'ছত্রিশী বিচার'ই স্বরাজের ভিত্তি মনে করিয়া চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং সেখানকার প্রায় সমস্ত আইনজীবিগণই আইন ব্যবসা স্থগিত রাখিয়াছে জানিয়া তিনি আরও খুশী হইয়াছিলেন।

পরে চিত্তরঞ্জন গিয়াছিলেন মালদহে। মালদহে চিত্তরঞ্জনকে একটি সন্ন্যাসীর বাড়ীতে থাকিবার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সেই বাড়ীটির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সেখানে স্ত্রীলোকের রাত্রিবাস করা নিষেধ। তাহা ছাড়া চিত্তরঞ্জন দোতলায় যেখানে ছিলেন সেখানে কোন ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা ছিল না। হেমন্তবাবু উপরে কমোড আনিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, বিপিনবাবু প্রভৃতি উহাতে বাধা দিলেন কারণ কমোড যে ঘরে রাখিবার কথা হইয়াছিল সে-ঘরে যাইতে হইলে শিবের ঘরের মধ্য দিয়া যাইতে হইত। সুতরাং উপরে কমোড আনা হইল না এবং চিত্তরঞ্জনকে রাত্রিতে বার বার নীচেই নামিতে হইয়াছিল। ইহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন প্রকৃত ঘটনা শুনিলেন যে শিবের ঘর রহিয়াছে তখন তিনি চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। হাত জোড় করিয়া প্রণাম জানাইয়া, যাহারা উপরে কমোডের ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাদের নিন্দাই করিলেন।

ইহার পর চিত্তরঞ্জন গিয়াছিলেন রাজশাহী এবং সেখান হইতে ২৯শে মে তিনি জলপাইগুড়ি পৌছিলেন। জলপাইগুড়িতে দেখা গেল বিরাট এক

প্রাণচাঞ্চল্য। তিনি যখন স্টেশনে গিয়া পৌছাইলেন, মানুষ ছুটিয়া আসিল মালা চন্দন লইয়া। অসংখ্য জয়ধ্বনি আর শঙ্খনিনাদে চতুর্দিক মুখরিত। প্রায় আধ মাইল এক শোভাযাত্রা করিয়া, কীর্তন গাহিয়া, দেশবন্ধুকে লইয়া যাওয়া হইল জলপাইগুড়ির বিখ্যাত প্রসন্নদেব রায়কতের বাড়ী। বৈকালে সেখানে এক বিরাট জনসভাও অনুষ্ঠিত হয়। অর্থও সংগৃহীত হইয়াছিল অনেক। মহিলা সমিতিতে উর্মিলা দেবী, বাসন্তী দেবী স্বরাজ সম্বন্ধে মহিলাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন এবং বাসন্তী দেবীর আহ্বানে মহিলাগণ প্রায় দুই হাজার টাকার মত অর্থ ও অলঙ্কার তুলিয়া দেন।

এই আন্দোলনে জলপাইগুড়ির বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। ওখানকার বারাঙ্গণাগণ দেশবন্ধুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নূতন শপথ গ্রহণ করে। তাহারা প্রতিজ্ঞা করে, জীবনে কখনও মদ খাইবে না, বিলাতী বস্ত্র পরিধান করিবে না এবং সিগারেটও খাইবে না। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল দুইজন অন্ধ ভিখারীর দান। তিলক স্বরাজ্য তহবিলের জন্য সভার অগণিত জনমণ্ডলীর মধ্যেই দুইটি অন্ধ ভিক্ষুক দেশবন্ধুর হাতে তাহাদের যথাসর্বস্ব চারি আনা করিয়া পয়সা দান করে। এই পরম দানে চিত্তরঞ্জন খুশীতে এমন অভিভূত হইয়াছিলেন যে তিনি ঐ সভার মধ্যেই অন্ধ ভিক্ষুক দুইটিকে নিজের বুকে জড়াইয়া ধরেন। জানা গিয়াছে যে, জলপাইগুড়িতে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল।

অন্ধ ভিখারীর এই দানের মত আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল মাদারীপুরেও। সেখানে তিলক স্বরাজ্য তহবিলে একটি মেথর একটি টাকা দান করিয়াছিল। ইহাতেও চিত্তরঞ্জন এমন মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার নিজের গলার মালা তুলিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ মেথরটির গলায় পরাইয়া দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন।

ইহার পর চিত্তরঞ্জন সিরাজগঞ্জ, পাবনা প্রভৃতি স্থানে যাইবার জন্য মন স্থির করিলেন কিন্তু সেখানে রওনা হইবার পূর্বেই কুমিল্লার বিখ্যাত নেতা অখিলচন্দ্র দত্তের নিকট হইতে একটি টেলিগ্রাম পান। তাহাতে লেখা ছিল, "চাঁদপুরে চা-বাগানের কুলীরা ধর্মঘট করিয়াছে, আপনার উপস্থিতি প্রয়োজন।"

টেলিগ্রাম শুধু ঐ একটিই নহে, সঙ্গে সঙ্গে আসিল যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের

টেলিগ্রাম। টেলিগ্রাম দুইখানি পাইয়া চিত্তরঞ্জন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অসহযোগ আন্দোলন আর 'তিলক স্বরাজ্য তহবিলের' জন্য অর্থ সংগ্রহকারী মনটি এক টানে ছুটিয়া গেল চাঁদপুরে সেই নির্যাতিত শ্রমিকদের পার্শ্বে। তিনি যেন দূরে থাকিয়াও শ্রমিকদের বিষাদক্লিষ্ট, কালিমালিপ্ত ম্লানমুখগুলি দেখিয়া নিজেও বেদনায় ছলছল করিয়া উঠিলেন। আর সত্যই শ্রমিকদের জন্য দুঃখ হইবারই কথা। শ্রমিকগণ চা-বাগিচার সাহেবদের অত্যাচারে জর্জরিত। দীর্ঘদিন মুখ বুজিয়া তাহারা ঐ অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তখন ভারতের দিকে দিকে জনজাগরণের দিন,—অসহযোগ আন্দোলনের বন্যা দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ছুটিয়া চলিয়াছে। ঐ জর্জরিত, ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের কানেও বর্ষিত হইল সেই অসহযোগের পবিত্র মন্ত্র। নূতন চেতনাপ্রাপ্ত শ্রমিকদের মন তখন নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত,—তাহারা আর এমন হেয়, ঘৃণ্য জীবন যাপন করিবে না। দেশে চলিয়া যাইবে, দেশে গিয়া যাহা হয় করিবে, না খাইয়া মরিবে তাহাও শ্রেয়,—এই প্রতিজ্ঞায় একদিন শুভ মুহূর্তে হাজার হাজার কুলি নিজেদের জিনিস-পত্র গুছাইয়া রওনা হইল চাঁদপুর। কিন্তু দুর্ভাগ্য শ্রমিকদের। তাহাদের জন্য রেলওয়ের টিকিট ঘরও বন্ধ। ঘরে যাইবার টিকিট তাহারা পাইল না। বাধ্য হইয়া কেহ ছিল চাঁদপুর রেলওয়ে ইয়ার্ডে, কেহ ছিল ঘাটে, মাঠে পথের ধূলায়, অনেকের সঙ্গে তাহাদের পরিবার, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা। এখানেও অবস্থাটি দাঁড়াইল ঠিক সেই পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম, নিষ্ঠুর অত্যাচারের মতই। সেখানে বাহির হইবার পথ ছিল না আর এখানে ছিল রাত্রির ঘন অন্ধকারের প্রাচীর। পথের ক্লান্তির পর অবসন্নদেহে কেহ একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছে, কেহ জাগিয়া রহিয়াছে, ক্ষুধার জ্বালায় কাহারো চোখে ঘুম আসিতেছিল না। এই নির্জীব, বলশূন্য, অসহায় শ্রমিকগণই হইল গুর্খা পুলিশের শিকার। পাঞ্জাবের বিদেশী মাইকেল ওডায়ার আর জেনারেল ডায়ার নহে, সেখানে ছিল দুইজনই বাঙালী। ম্যাজিস্ট্রেট, অনারেবল সিংহ আর কমিশনার মিঃ কে. সি. দে। মিঃ দের আদেশে রাত্রির অন্ধকারে গুর্খা পুলিশের অকথ্য এবং অভিনব কায়দার অত্যাচারে চাঁদপুরের পথের ধূলি সেদিন রক্তে রাঙা; সে ইতিহাস আজও ইতিহাসের পাতায় রক্তাক্ষরে লেখা।

চিত্তরঞ্জন যখন গোয়ালন্দ আসিয়া পৌছাইলেন তখন সেখান হইতে

চাঁদপুরে যাওয়ার ষ্টীমার বন্ধ। কুলীদের প্রতি ঐ অমানুষিক নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিবাদে ষ্টীমারের সারেং, কুলী সকলেই কাজ বন্ধ করিয়াছে। সুতরাং নৌকা ভিন্ন চাঁদপুরে যাইবার আর কোন পথই দেশবন্ধুর নিকট উন্মুক্ত ছিল না। কিন্তু পথ কম নহে। দুইটি নদীও ভীষণতর,—পদ্মা ও মেঘনা।

চাঁদপুরে জড় হওয়া সেই হাজার হাজার শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিতেছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। তিনি শ্রমিকদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তাহাদের দুঃখ কষ্ট লাঘব করিবার জন্য পরিশ্রম করিয়া চলিয়াছেন। আর অপরপ্রান্তে দণ্ডায়মান ছিলেন এই মর্মন্তুদ দৃশ্যের রচয়িতা কমিশনার মিঃ কে. সি. দে।

দেশবন্ধুও চাঁদপুরে যাইবেন। বর্ষাকাল। পদ্মা মেঘনার বুক কানায় কানায় ভরা। মত্তহস্তীর উত্তুঙ্গ শুঁড়ের মত উত্তাল তরঙ্গমালা লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে যেন সম্মুখের সব কিছু গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। উহাদের মধ্যে পথ করিয়া সময় সময় ষ্টীমার পর্যন্ত চলিতে সাহস করে না, সে-অবস্থায় নৌকা! তদুপরি ঝড়! সকলে নিষেধ করিল। কিন্তু দেশবন্ধুর বেদনাভরা মন শ্রমিকদের জন্য গভীর ব্যথায় টন্‌টন্ করিয়া চলিয়াছে। সে-বেদনায় শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁহার নাড়ীর যোগ। তিনি কি তাহাদের ঐ বিপদের সময় তাহাদের পাশে না গিয়া দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন? কাহারো বাধা তিনি শুনিবেন কেন? সকলে প্রাণের ভয় দেখাইল। কিন্তু দেশবন্ধুর কাছে ভয়-ই যে ভয় পাইয়া গেল। তিনি ভীত না হইয়া বরং যাহারা তাঁহাকে ঝড়টা থামা পর্যন্ত দুই একদিন অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন তাহাদিগকে বুঝাইলেন, "তোমরা কোন চিন্তা করিও না, আমার কিছু হইবে না, নারায়ণ আছেন তিনি পার করিয়া দিবেন।"

৫ই জুন দেশবন্ধু অনুগামীসহ গোয়ালন্দ হইতে চাঁদপুর রওনা হইলেন। রওনা হওয়া কথাটি অতি মৃদু বলা হয়, বলিতে হয় তরঙ্গায়িত পদ্মাবক্ষে দেশবন্ধু ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সুবিস্তৃত পদ্মাবক্ষ, ছোট তাঁহার তরীখানি তরতর করিয়া জল কাটিয়া আগাইয়া চলিল,—আগাইয়া চলিল পদ্মার যে বক্ষের উপর আকাশ নামিয়া দিকচক্রবালের সৃষ্টি করিয়াছে সেদিকে।

দুইখানি নৌকা পদ্মাবক্ষে ভাসিয়া চলিয়াছে। একখানাতে রান্না-খাওয়ার সব জিনিসপত্র এবং অন্যখানিতে দেশবন্ধু, বাসন্তী দেবী, সুপ্রভা, সত্যেন্দ্রচন্দ্র।

তীরে দাঁড়াইয়াছিলেন অনেকে। তাহারা শঙ্কিত বুকে, যিনি শঙ্কা মানেন না তাঁহার নৌকার দিকে তাকাইয়া রহিল অপলক দৃষ্টিতে।—জল, ঝড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ তদুপরি মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া একমাত্র লক্ষ্যস্থল চাঁদপুরের দিকে ছুটিয়া চলিলেন অকুতোভয় চিত্তরঞ্জন। তখন তাঁহার মনের গতি নৌকার গতিবেগ হইতে কত লক্ষ গুণ তীব্রতর সে হিসাব কে জানে!—তা জানে চিত্তরঞ্জনের মন!

চাঁদপুরে পৌঁছিয়া চিত্তরঞ্জন অত্যাচারিত শ্রমিকদের সঙ্গে মিশিয়া একেবারে একাত্ম হইয়া গেলেন। তাহাদের মুখ হইতে সব শুনিয়া তিনি প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে পারিলেন এবং কমিশনার মিঃ কে. সি. দে-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "নিরস্ত্র খেটে-খাওয়া শ্রমিকদের উপর এমন নির্মম অত্যাচার করার কি সঙ্গত কারণ থাকতে পারে?"

কমিশনার মিঃ দে চিত্তরঞ্জনের ঐ জিজ্ঞাসার কোন উত্তর দিতে পারে নাই। উত্তর দেওয়ার যে তাহার কিছু ছিল না চিত্তরঞ্জন তাহা জানিতেন কারণ তিনি ঠিকই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ঐ কুলী ধর্মঘট শুধু সাধারণ ধর্মঘট নহে,— শুধু শ্রমিক ধর্মঘটরূপে উহাকে মনে করিলে চলিবে না,—উহা প্রকৃতপক্ষে স্বরাজের পথে জনজাগরণ। উহা চাঁদপুরের ঘটনা হইলেও উহা সর্বভারতীয় সমস্যা।

উহা বুঝিয়াই চিত্তরঞ্জন তাঁহার অভিমত প্রকাশ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন: With all the emphasis I can command I must say that these strikes art not the labour strikes. They are not political either, they are national. They have sprung from the same spirit with which the battle of swaraj was being fought all over the country and is part of the General Non-co-operation Movement.

সুতরাং শ্রমিকদের জন্য তাঁহার মন যে কতখানি কাঁদিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার এই আন্তরিক কান্নার প্রকাশ দেখা যায় তাঁহার কার্যের মধ্যে। কুলীদের বলিলেন, কর্তৃপক্ষের সহিত সম্মানজনক সর্তে মিটমাট না হওয়া পর্যন্ত তাহারা যেন ধর্মঘট চালাইয়া যায়। ইহাতে টাকা সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে যদি মোট বহন করিতেও হয় তবে তিনি তাহা করিতেও

প্রস্তুত আছেন। তাছাড়া 'তিলক স্বরাজ্য তহবিল' হইতে তিনি ঐ ধর্মঘটি শ্রমিকদের জন্য দেড় লক্ষ টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। আর বলিয়াছিলেন, 'শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য যতীন [যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত] অনেক টাকা ধার করিয়াছে, সে টাকাটা যতীনকে দিতেই হবে।'

এই সাহায্যের ব্যাপারে অর্থাৎ তিলক স্বরাজ্য তহবিল হইতে দেড় লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা লইয়া চিত্তরঞ্জনকে অনেক কথা শুনিতে হইয়াছিল, অনেক বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি দেশের বন্ধু, দশের স্বজন, দুই পাঁচজনের বিদ্রূপ সহ্য করিয়াও দেশেরই হাজার হাজার ভাইবোনেদের জন্য ঐ দেড় লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

চাঁদপুর হইতে দেশবন্ধু চট্টগ্রাম ও মাদারীপুর যান। মাদারীপুরে দেশবন্ধুরই উৎসাহ ও প্রেরণায় স্থানীয় বারের তদানীন্তন প্রধান আইনজীবী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় তাঁহার রায়সাহেব উপাধি পরিত্যাগ করেন এবং ব্যবসা ছাড়িয়া অসহযোগ আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন। এ-কাজে আর একজনের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য—তিনি হইলেন প্রতাপ চন্দ্র গুহ রায়। দেশবন্ধু ইহাদের দুইজনের ত্যাগ ও কার্যে অত্যন্ত খুশী হইয়াছিলেন।

মাদারীপুর হইতে চিত্তরঞ্জন চলিয়া আসেন কলিকাতা। ৩০শে জুনের মধ্যে তিলক স্বরাজ্য তহবিলে বাংলার অংশের টাকা তুলিয়া দিতে হইবে। ইহার সমস্ত ভারই ছিল চিত্তরঞ্জনের উপর। অবশ্য ইতিমধ্যে তিনি সে টাকা প্রায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তবুও ৩০শে জুন কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারে এক বিরাট জনসভা হয়। অগণিত লোকের সমাবেশ। সভায় সবাই যেন দানের জন্য উন্মুখ। বৃষ্টি যেমন পড়ে, টাকা পড়িয়াছিল তেমনি। এই টাকা বৃষ্টির মধ্যে আজও, কালের দূরত্ব অতিক্রম করিয়া কয়েকটি টাকা বৃষ্টির শব্দ শোনা যায়। বাসন মাজিয়া জীবিকা নির্বাহ করে একটি ঝি, সামান্যই তাহার মাসিক মাহিনা। সেই চাকরাণী তাহার এক মাসের মাহিয়ানার সমগ্র সামান্য টাকা দেশবন্ধুর হাতে দান করে। ঘটনাটি সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন সেদিনই বলিয়াছিলেন, "আজ একটি ঘটনায় আমার প্রাণ বিগলিত হইয়াছে যে সেই আনন্দ আমি কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। একটি চাকরাণী সামান্য মায়না পায়। সে যে এক মাসের সমস্ত বেতনটা

এই কার্যে দিয়া গেল, তাহা কল্পনারও অগোচর। আমার খুব বিশ্বাস হয়েছে দেশের কল্যাণ সুনিশ্চিত। আমরা যতই তর্ক করি না কেন, স্বার্থত্যাগীর সংখ্যাও নিতান্ত কম নাই।"

চাঁদপুরের ব্যাপারে চিত্তরঞ্জনের যিনি দক্ষিণ হস্ত ছিলেন তিনি যতীন্দ্রমোহন। শ্রমিকদিগের প্রকৃত দরদী হইয়া চাঁদপুরে চা-বাগানের ঐ নির্যাতিত শ্রমিকদের জন্য তিনি দিন-রাত পরিশ্রম করিয়া তাহাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ইহার পর যতীন্দ্রমোহন আরও কয়েকটি ধর্মঘট করান,—ইহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য আসাম বেঙ্গল রেল ধর্মঘটের সুষ্ঠু পরিচালনা। যতীন্দ্রমোহনের এই অদম্য উৎসাহ এবং উদ্দীপনা দেখিয়া ইংরাজ সরকার চিন্তিত হইয়া পড়েন। এদিকে নাগপুরে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পর ছয় মাস কাল মধ্যে দেশবন্ধু বাংলাদেশে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার এই কর্মযজ্ঞে আসিয়া আবার যুক্ত হইলেন এই অসীম সাহসী বীর যুবক। সরকারের চিন্তা হইবারই কথা। কিন্তু সমাধানের সহজ পথ তাহাদের হাতেই। সরকার তখন যতীন্দ্রমোহনকে এবং দেশবন্ধুর আরও কয়েকজন বিশ্বাসী সহকর্মীকে গ্রেপ্তার করিলেন।

কিন্তু রাজার সিংহাসন শূন্য থাকে না। যতীন্দ্রমোহন কারার অন্তরালে গেলেন আর একজন কারাগার ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিলেন দেশবন্ধুর পার্শ্বে দাড়াইবার জন্য। তিনি সুভাষচন্দ্র। তেজস্বী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী যুবক। আই. সি. এস্. পাশ করিয়াই তাঁহার মনের ভাব পরিবর্তন হইল। মনে করিলেন, আই. সি. এস্ পাশ ব্রিটিশের গোলাম না হইয়া দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন দেশপ্রেমিক যুবক। বিলাতে বসিয়াই দেশবন্ধুর প্রতি তাঁহার মন শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। দেশবন্ধুর ত্যাগ, তাঁহার কর্ম-সাধনা, স্বরাজের জন্য দেশকে, জাতিকে জাগ্রত করিতে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা জানিয়া দেশবন্ধুকেই তাঁহার নেতা বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলেন। এই ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশরূপে তিনি ১৯২১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দেশবন্ধুকে একখানি দীর্ঘ চিঠি লিখিয়া ভারতের মুক্তিযুদ্ধে, স্বাধীনতা-যজ্ঞে নিজেকে নিবেদিত করিবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহের কথা জানাইয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্রের সেই সম্পূর্ণ

চিঠিখানি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

The Union Society
Cambridge
১৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯২১)

প্রণাম পুরঃসর নিবেদন

আপনি আমাকে বোধহয় চিনেন না—কিন্তু আমার পরিচয় দিলে বোধহয় চিনিতে পারিবেন। আপনাকে আমি খুব প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ে এই পত্র লিখিতেছি—কিন্তু কাজের কথা আরম্ভ করিবার পূর্বে আমাকে নিজের Sincerity আগে প্রমাণ করিতে হইবে। সেই জন্য নিজের পরিচয় দিতেছি।

আমার পিতা শ্রীজানকীনাথ বসু কটকে ওকালতি করেন এবং কয়েক বৎসর পূর্বে সেখানকার গভর্ণমেণ্ট প্লিডার ছিলেন। আমার একজন দাদা শ্রীশরৎচন্দ্র বসু কলিকাতা হাইকোর্টের Barrister. আপনি আমার পিতাকে চিনিলেও চিনিতে পারেন এবং আমার দাদাকে নিশ্চয়ই চেনেন।

পাঁচ বৎসর পূর্বে আমি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতাম। ১৯১৬ সালের গোলমালের সময় আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে expelled হই। দুই বৎসর নষ্ট হইবার পর আমি কলেজে পড়িবার অনুমতি পাই। তারপর ১৯১৯ সালে আমি বি-এ পাশ করি এবং Honours এর প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাই।

১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে আমি এখানে আসিয়াছি। ১৯২০ সালের আগষ্ট মাসে আমি Civil Service পরীক্ষা পাশ করি এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করি। এই বৎসর জুন মাসে আমি Moral Science Tripos পরীক্ষা দিব। সেই মাসে আমি এখানকার B. A. Degree পাইব।

এখন কাজের কথা বলি। সরকারী চাকুরী করিবার আমার মোটেই ইচ্ছা নাই। আমি বাড়িতে লিখিয়াছি বাবাকে এবং দাদাকে যে, আমি চাকুরী ছাড়িয়া দিতে চাই। আমি এখনও উত্তর পাই নাই। তাঁদের অনুমতি পাইতে হইলে, আমাকে দেখাইতে হইবে আমি চাকুরী ছাড়িবার পর কি Tangible কাজ করিতে চাই। আমি অবশ্য জানি যে, চাকুরী ছাড়িয়া আমি যদি কোমর বাঁধিয়া দেশের কাজে অবতীর্ণ হই তাহা হইলে করিবার আমার অনেক আছে—যথা, জাতীয় কলেজে শিক্ষকতা, পুস্তক ও

খবরের কাগজ প্রণয়ন ও প্রকাশ, গ্রাম্য সমিতি স্থাপন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, ইত্যাদি। কিন্তু আমি যদি এখন বাড়ীতে দেখাইতে পারি আমি কি Tangible কাজ করিতে ইচ্ছা করি—তাহা হইলে বোধহয় চাকুরী ছাড়া সম্বন্ধে অনুমতি সহজে পাইব। আমি যদি তাঁহাদের অনুমতি লইয়া চাকুরী ছাড়িতে পারি তাহা হইলে বিনা অনুমতিতে কোন কাজ করিবার আবশ্যকতা নাই।

দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আপনি সব চেয়ে ভাল জানেন। শুনিলাম আপনারা কলিকাতায় এবং ঢাকায় জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং ইংরাজী ও বাংলায় "স্বরাজ" পত্রিকা বাহির করিতে চান। আমি আরও শুনিলাম বাঙলা দেশের নানা স্থানে গ্রাম্য সমিতি প্রভৃতিও স্থাপন করা হইয়াছে।

আমি জানিতে ইচ্ছা করি আপনারা আমাকে এই স্বদেশ সেবার যজ্ঞে কি কাজ দিতে পারেন। আমার বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নাই—কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, যৌবনোচিত উৎসাহ আমার আছে। আমি অবিবাহিত। লেখাপড়ার মধ্যে আমি Philosophy টা একটু পড়েছি কারণ কলিকাতায় আমার ঐ বিষয়ে Honours ছিল এবং এখানেও আমি ঐ বিষয়ে Tripos পড়িতেছি। Civil Service পরীক্ষার কৃপায় সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা খানিকটা হইয়াছে—যেমন Economi . Political Science, English and European History, English law, Sanskrit, Geography ইত্যাদি।

আমি বিশ্বাস করি যে, আমি যদি নিজে এই কাজে নামিতে পারি তাহা হইলে আমি এখানকার ২।১ জন বাঙালী বন্ধুকে এই কাজে টানিতে পারিব। কিন্তু আমি নিজে যতক্ষণ এই কাজে না নামিতেছি, কাহাকেও টানিতে পারিতেছি না।

এখন আমাদের দেশে কোন্ কোন্ বিষয় কাজ আরম্ভ করিবার সুবিধা আছে তাহা এখান থেকে বুঝিতে পারিতেছি না। তবে আমার মনে হইতেছে যে, দেশে ফিরিলে আমি কলেজে অধ্যাপনা এবং পত্রিকায় লেখা —এই দুই কাজে হাত দিতে পারিব।

আপনি আজ বাঙলা দেশে স্বদেশ সেবা যজ্ঞে প্রধান ঋত্বিক—তাই আপনার নিকট এই পত্র লিখিতেছি। আপনারা ভারতবর্ষে যে আন্দোলনের বন্যা তুলিয়াছেন তার তরঙ্গ চিঠি ও খবর কাগজের ভিতর দিয়া এখানে আসিয়া

পঁহুছিয়াছে। এখানেও তাই মাতৃভূমির আহ্বান শোনা গিয়াছে। Oxford থেকে একজন মাদ্রাজী ছাত্র তাঁর লেখাপড়া আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছে—সেখানে গিয়া কাজ আরম্ভ করিবার জন্য। Cambridge-এ এ-পর্যন্ত কাজ কিছু হয় নাই যদিও "অসহযোগিতা" সম্বন্ধে আলোচনা খুব বেশী রকম চলিতেছে। আমার বিশ্বাস যদি কেহ পথ দেখাইতে পারে তাহা হইলে সেই পথ অনুসরণ করিবার লোক এখানে আছে।

আপনি বাঙলা দেশে আমাদের সেবা যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক--তাই আপনার নিকট আমি আজ উপস্থিত হইয়াছি—আমার যৎ সামান্য বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও উৎসাহ লইয়া। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার আমার বিশেষ কিছুই নাই—আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীর।

আপনাকে এই পত্র লেখার উদ্দেশ্য—শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করা আপনি আমাকে এই বিপুল সেবা যজ্ঞে কি কাজ দিতে পারেন। আমি তাহা জানিতে পারিলে বাড়িতে—বাবাকে এবং দাদাকে সেইরূপ লিখিতে পারিব এবং নিজের মনকেও সেইভাবে প্রস্তুত করিতে পারিব।

আমি এখন এক রকম সরকারী চাকর। কারণ আমি এখন I. C. S. Probationer। আপনাকে চিঠি লিখিতে সাহস করিলাম না পাছে চিঠি Censored হয়। আমার জনৈক বিশ্বাসী বন্ধু শ্রীপ্রমথনাথ সরকারকে আমি এই চিঠি পাঠাইতেছি তিনি আপনার হাতে এই চিঠি দিয়া আসিবেন। আমি যখনই আপনাকে পত্র দিব তখন এইভাবেই দিব। আপনি অবশ্য আমাকে চিঠি লিখিতে পারেন কারণ এখানে চিঠি Censored হইবার ভয় নাই।

আমার এখানকার মতলব সম্বন্ধে আমি কাহাকেও জানাই নাই—শুধু বাড়ীতে বাবাকে এবং দাদাকে লিখিয়াছি। আমি এখন সরকারী চাকর —সুতরাং আশা করি যে আমি যে পর্যন্ত চাকুরী না ছাড়িতেছি সে-পর্যন্ত আপনি কাহাকেও এ বিষয়ে কিছু বলিবেন না। আমার আর কিছু বলিবার নাই। আমি আজ প্রস্তুত—আপনি শুধু কর্মের আদেশ দিন।

আমার নিজের মনে হয় যে, আপনি যদি "স্বরাজ" পত্রিকা ইংরাজীতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে আমি সেই পত্রিকার Sub-editorial Staff-এ কাজ করিতে পারি। তা ছাড়া 'জাতীয় কলেজের' নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতে পারি।

কংগ্রেসের বিষয়ে আমার মনে অনেক প্রস্তাব আছে। আমার মনে হয় যে, কংগ্রেসের একটা স্থায়ী আড্ডা চাই। তার জন্য একটা বাড়ী করা চাই। সেখানে একদল research student থাকিবেন—যাঁহারা আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা লইয়া গবেষণা করিবেন। আমি, যত দূর জানি Indian Currency and Exchange সম্বন্ধে আমাদের কংগ্রেসের কোনও definite policy নাই। তারপর Native statesদের প্রতি কংগ্রেসের কিরূপ attitude হওয়া উচিত তাহা বোধহয় স্থির করা হয় নাই। Franchise (for men and women) সম্বন্ধে কংগ্রেসের কি রকম মত তাহাও বোধহয় জানা নাই। তাবপর Depressed Classes দের লইয়া আমাদের কি করা উচিত তাহাও বোধহয় কংগ্রেস ঠিক করে নাই। এ বিষয়ে (অর্থাৎ Depressed Classes সম্বন্ধে) কোন কাজ না করার দরুণ মাদ্রাজে আজ সব Non-Brahmin এবা Pro-Government এবং anti-nationalist হইয়াছে।

আমার নিজের মনে হয় যে Congress এর একটা Permanent staff রাখা দরকার। ইহারা এক একটা সমস্যা (Problem) লইয়া গবেষণা করিবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয়ে Up to-date facts and figures সংগ্রহ করিবে। এই সব fact and figures সংগৃহীত হইলে Congress Committee প্রত্যেক বিষয়ে (Problem এ) একটা policy formulate করিবে। আজ অনেক জাতীয় Problem সম্বন্ধে কংগ্রেসের কোন definite policy নাই। আমার সেই জন্য মনে হয় যে, কংগ্রেসের একটা স্থায়ী বাড়ী চাই এবং স্থায়ী staff of research student চাই।

তা ছাড়া Congress এর একটা Intelligence Department খোলা দরকার। Intelligence Department এ দেশের সম্বন্ধে up-to date সব খবর facts and figures যাহাতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। Propaganda Department থেকে প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় ছোট ছোট পুস্তক প্রকাশিত হইবে এবং জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইবে। এতদ্ব্যতীত জাতীয় জীবনের এক একটা সমস্যা লইয়া Propaganda Department থেকে এক একটি বই প্রকাশিত হইবে। সেই পুস্তকে কংগ্রেসের Policy বুঝান হইবে এবং কি কি কারণের

নিমিত্ত কংগ্রেসের এইরূপ Policy হইয়াছে তাহাও লেখা থাকিবে। আমি অনেক লিখিয়া ফেলিলাম। আপনার কাছে এই সব কথা পুরাতন। আমার কাছে খুব নূতন বলিয়া মনে হইতেছে বলিয়া আমি না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার মনে হইতেছে যে কংগ্রেস সংক্রান্ত বিপুল কাজ আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে। আপনারা ইচ্ছা করিলে আমি এ বিষয়েও বোধহয় কিছু করিতে পারিব।

আপনার মতের জন্য আমি অপেক্ষা করিতেছি। আপনি কি কি কাজে আমাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, তাহা জানিবার জন্য আমি ব্যগ্র আছি। যদি আপনাদের অভিপ্রায় থাকে কাহাকেও বিলাতে পাঠাইতে Journalism শিখিতে তাহা হইলে আমি সে কাজের ভার লইতে পারি। আমাকে যদি সে ভার দেন তাহা হইলে passage এবং Outfit-এর খরচ বাঁচিয়া যাইবে। অবশ্য এ কাজের ভার লইবার পূর্বে আমি চাকুরী ত্যাগ করিব, অবশ্য আমার থাকা ও খাওয়ার খরচ দিবেন—কারণ চাকুরী ছাড়ার পর বাড়ী থেকে টাকা লওয়া বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

আমার নিজের ইচ্ছা যে যদি চাকুরী ছাড়ি তাহা হইলে জুন মাসেই রওনা হইব। তবে প্রয়োজন হইলে আমি নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।

আমার বহুভাষিতা ক্ষমা করিবেন। আশা করি যথাশীঘ্র উত্তর দিবেন। আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি—

আমার ঠিকানা— প্রণত

Fitz William Hall, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

Cambridge.

সদ্য পাশ-করা আই. সি. এস.—ভারতবর্ষের চাকরী জীবনে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, হাতে থাকে প্রতাপের দণ্ড, আবার আছে আরামের শীতলতা, জীবনের চলার পথে কুসুম ছড়ান, দৈনিক জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখের কোমল কার্পেট বিছান। সেই আরাম, বিলাস, জীবনের ধ্রুব নিশ্চিত ভোগ-সুখ

ছাড়িয়া সুভাষচন্দ্র ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে চাইছেন,—বার বার ভাবিতে লাগিলেন দেশবন্ধু।—এ কি মহান ত্যাগ! কত বড় দেশপ্রেমিক যুবক! শুধু মনে মনে বার বার সুভাষচন্দ্রের কথা ভাবাই নহে, চিঠিখানিও তিনি কয়েকবার পড়িলেন।

সুভাষচন্দ্র প্রত্যেক দিনই প্রতীক্ষায় ছিলেন একখানি চিঠির আশায়—দেশবন্ধু তাঁহাকে লিখিবেন আর তিনিও ছুটিয়া যাইবেন। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেও কোন উত্তর না পাইয়া তিনি চিন্তিত হইলেন কিন্তু চুপ করিয়া থাকিলেন না। নিজেকে দেশের কাজে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিবার জন্য সুভাষচন্দ্র ২রা মার্চ আবার আর একখানি চিঠি দেশবন্ধুকে লিখিয়াছিলেন। সে চিঠিখানিও নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :—

The Union Society
Cambridge
২রা মার্চ, ১৯২১

প্রণাম পুরঃসর নিবেদন,

কয়েক দিন পূবে আপনাকে একখানি পত্র দিয়াছি—আশা করি যথাসময়ে তাহা পাইযাছেন।

আপনি বোধহয় শুনিয়া সুখী হইবেন যে আমি চাকুরী ছাড়া সম্বন্ধে এক রকম কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছি। আমি কি কি কাজের জন্য উপযুক্ত হইতে পারি তাহা আপনাকে পূর্বপত্রে জানাইয়াছি। দেশে এখন কি রকম কাজের সুবিধা আছে তাহা এখান হইতে ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। আপনারা এখন কর্মক্ষেত্রের মধ্যে আছেন—সুতরাং আপনারা খুব ভাল রকম জানেন কি রকম কাজের সুবিধা এখন আছে এবং এখন কি রকম কর্মী-লোকের দরকার।

আমার এই অনুরোধ যে, যে পযন্ত আমার চাকুরী ছাড়ার খবর না পাইতেছেন, সে পর্যন্ত যেন এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু না বলেন। চাকুরী ছাড়িলে আমি জুন মাসের শেষে দেশে ফিরিতে ইচ্ছা করি অবশ্য যদি সময় মত Passage পাই। দেশে ফিরিলে কি রকম কাজে হাত দিতে পারিব তাহা জানিবার জন্য উৎসুক আছি—কারণ মনটাকে সেই ভাবে প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করি। তা ছাড়া দেশে গিয়ে যে রকম কাজ আরম্ভ করিব, তদুপযোগী লেখাপড়া

এখানে থাকিতে করাও সম্ভব। আশা করি, আপনি যত শীঘ্র পারেন এ বিষয় একটা উত্তর দিবেন।

আমার নিজের কতকগুলি মতলব মনে আসিতেছে—আপনাকে তাহা জানাইতেছি।

(১) "জাতীয় কলেজে" আমি শিক্ষকতা করিতে পারি। পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র আমার যৎ কিঞ্চিৎ পড়া আছে।

(২) আপনারা যদি কোন দৈনিক খবরের কাগজ ইংরাজীতে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমি Sub-editorial Staff-এ কাজ করিতে পারি।

(৩) আপনারা যদি 'কংগ্রেসের' সংক্রান্ত একটা research department খোলেন, তাহা হইলে আমি তাহাতেও কাজ করিতে পারি। আমার গতপত্রে আমি এ সম্বন্ধে খানিকটা লিখিয়াছি। আমার মনে হয়, একদল research-students আমাদের চাই। তাহারা জাতীয় জীবনের এক একটা সমস্যা লইয়া সেই সম্বন্ধে facts সংগ্রহ করিবে। কংগ্রেস তারপর একটা committee নিযুক্ত করিবে—এই committee সেই সব facts বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে কংগ্রেসের একটা Policy ঠিক করিবে।

Currency and Exchange সম্বন্ধে আমাদের Congress-এর কোন বিশিষ্ট Policy নাই, তারপর Labour and factory legislation সম্বন্ধেও কংগ্রেসের কোন বিশিষ্ট Policy নাই। তারপর Vagrancy and poor Relief সম্বন্ধে আমাদের কংগ্রেসের কোন বিশিষ্ট Policy নাই, তারপর 'স্বরাজ' পাইলে আমাদের constitution কি রকম হইবে, সে সম্বন্ধে বোধহয় কংগ্রেসের কোন বিশিষ্ট Policy নাই। আমার নিজের মনে হয় যে, Congress-League scheme একেবারে পুরানো হয়ে গেছে। স্বরাজের ভিত্তির উপর আমাদের এখন ভারতের constitution তৈয়ারী করিতে হইবে।

আপনি অবশ্য বলিতে পারেন যে Congress এখন existing order ভাঙ্গিতে ব্যস্ত সুতরাং ভাঙ্গার কার্য সম্পূর্ণ না হইলে Constructive কাজ আরম্ভ করা অসম্ভব। কিন্তু আমার মনে হয় যে, এখন থেকেই ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে নূতন করিয়া সৃষ্টি আরম্ভ করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের যে-কোন সমস্যা সম্বন্ধে একটা Policy ঠিক করিতে গেলে অনেক দিনের চিন্তা

এবং গবেষণা চাই। সুতরাং এখন থেকেই গবেষণা আরম্ভ করা দরকার। কংগ্রেস যদি Complete Programme প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা হইলে যেদিন আমরা 'স্বরাজ' পাইব সেই দিন কোন বিষয়ে কোন Policyর জন্য আমাদের ভাবিতে হইবে না।

তারপর কংগ্রেসের একটা Intelligence Department চাই—যেখানে দেশের সব খবর পাওয়া যেতে পারে। এই Department থেকে ছোট ছোট বই প্রকাশ করা দরকার। এক একটা বইতে এক একটা বিষয় থাকিবে যথা গত দশ বৎসরের মধ্যে কত জন্ম এবং কত মৃত্যু হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ রোগে কত মৃত্যু হইযাছে।

তারপর, গত দশ বৎসরে ভারতবর্ষের অবস্থা আয ও ব্যয় (Revenue and Expenditure) কত হইয়াছে—কোন্ কোন্ দিক থেকে আয় হইয়াছে এবং কোন কোন্ বিষযে ব্যয হইযাছে তাহা আর একটা বইতে প্রকাশিত হইবে। এইরূপে আমাদের জাতীয জীবনের সব দিককার খবর ক্ষুদ্র পুস্তকের ভিতর দিযা দেশময প্রচার করিতে হইবে।

(৪) জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের দিক দিয়া কাজ করিবার অনেক সুবিধা আছে। এই কাজের সঙ্গে Co-operative Banks প্রতিষ্ঠা করাও আবশ্যক।

(৫) Social Service.

আমার নিজের মনে হচ্ছে যে, এই কয বিষয়ে কাজ করিবার সুবিধা আছে। কিন্তু আপনাকে বিবেচনা করিতে হইবে, আপনি আমাকে কোন্ বিভাগে চান। তবে শিক্ষকতা এবং journalism বোধ হয় আমার মনের মত কাজ হইবে। এই নিয়ে আমি এখন আরম্ভ করিতে পারি তারপর সুবিধা মত অন্য কাজেও হাত দিতে পারি। আমার পক্ষে চাকুরী ছাড়া মানে দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করা সুতরাং বেতন সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না, খাওয়া পরা চলিলেই আমার যথেষ্ট হইবে।

আমি যদি বদ্ধপরিকর হইয়া কাজে নামিতে পারি তাহা হইলে আমার বিশ্বাস আমি আমার সঙ্গে এখানকার ২।১ জন বাঙ্গালী বন্ধুকেও এই কাজে টানিতে পারিব।

স্বদেশ সেবার যে মহাযজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে আপনি তাহাতে বঙ্গদেশের

প্রধান পুরোহিত। আমার যাহা বক্তব্য আমি তাহা শেষ করিয়াছি—এখন আপনি আমাকে আপনার বিপুল কাজের মধ্যে স্থান দিন।

আমি চাকুরী ছাড়িলেই এখানে পাঁচজনে জিজ্ঞাসা করিবে আমি দেশে ফিরিয়া কি কাজ করিব। সুতরাং নিজের সন্তোষের জন্য এবং পাঁচজনের কাছে Self justification এর জন্য আমি জানিতে উৎসুক আপনি আমাকে কি কাজ দিতে পারেন।

আশা করি আপনি এ সব কথা আপাততঃ গোপন রাখিবেন।

আপনি আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি –

বিনীত

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

সুতরাং দেশবন্ধু সুভাষকে দূরে না রাখিয়া নিজের কাছেই টানিয়া লইলেন, যুক্ত হইল বিদ্যুতের সঙ্গে বহ্নি। এ-প্রসঙ্গে দেশবন্ধু তাঁহার পরবর্তী জীবনে অনেক জায়গায় প্রকাশ্য আলোচনায় বলিয়াছেন "দেশের কাজে আমি কি দিয়েছি জানি না কিন্তু দেশের কাজে আমি দিয়েছি সুভাষকে"। সুভাষচন্দ্রও তাঁহার 'The Indian straggle' পুস্তকে বলিয়াছেন, "I felt that I had found a leader and I meant to follow him."

এদিকে বোম্বাইতে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসিল ২৮শে জুলাই হইতে ৩রা আগস্ট পর্যন্ত। আলোচনার বিষয়বস্তু অসহযোগ আন্দোলনের ধারা প্রকৃতি লইয়া। দেশবন্ধু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সভায় স্থির হইল, নূতন কর্ম পদ্ধতি লওয়া হইবে।—তাহা হইল, বিলাতী বর্জন। উদ্দেশ্য মহৎ। বিলাতী বস্ত্র বর্জন করিলে স্বদেশবাসীগণ বস্ত্রের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য কর্মতৎপর হইয়া স্বাবলম্বী হইবে। দ্বিতীয় আর একটি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়াছিলেন স্বয়ং দেশবন্ধু। প্রস্তাবের আকারে দেশবন্ধু তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, শীতকালে যখন ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারতবর্ষে আসিবেন তাহাকে অভ্যর্থনার জন্য যে সমস্ত উৎসবাদির আয়োজন হইবে তাহা ভারতবাসী সঙ্ঘবদ্ধভাবে বর্জন করিবে। কংগ্রেসের সভ্য সংখ্যা তখন বৃদ্ধি পাইতেছিল তথাপি আরও অধিক সংখ্যায় সভ্য সংগ্রহের জন্যও একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়।

চিত্তরঞ্জন পূর্ণ উদ্যমে কর্মযজ্ঞে আত্ম নিবেদন করিয়াছেন। কংগ্রেসের সংগঠনী শক্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য এই সময়ে তাঁহার বিশেষ সহায়কারী ছিলেন কিরণশঙ্কর রায়, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকার প্রভৃতি। সুভাষচন্দ্র তো ছিলেনই। এক একজনের হাতে চিত্তরঞ্জন এক একটি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান আর বিচক্ষণ সুভাষচন্দ্রের উপর তিনি গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনের সম্পূর্ণ ভার দিলেন অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রকে তিনি উহার অধ্যক্ষ করিয়া দিলেন এবং এই দায়িত্বের সংগে তাঁহার উপর আবও একটি গুরু দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল। দেশবন্ধু সুভাষকে বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রচার সচিবের পদে অধিষ্ঠিত করিলেন এবং সেই সঙ্গে তাহার প্রাইভেট সেক্রেটারী রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন কৃষ্ণনগরের অধ্যাপক হেমন্ত সরকারকে। ইহাদের মত একনিষ্ঠ সহায়কারী পাইয়া চিত্তরঞ্জন দ্বিগুণ উৎসাহে উদ্দীবিত হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন আন্দোলন এবং কংগ্রেসেব কর্মসূচীর সুষ্ঠু রূপায়ণেব জন্য নিজস্ব দলীয় একখানি কাগজের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলেন। ঐ কাগজের মাধ্যমে তিনি আন্দোলনকে গভীরভাবে সুদূব প্রসারী কবিতে চাহিলেন। কাগজটি হইবে সাপ্তাহিক কারণ দৈনিক কাগজ বাহির করিবার মত আর্থিক স্বচ্ছলতা তখন তাঁহার ছিল না। যাহা হউক, সমস্যা হইল কাগজটির নামকরণ লইয়া। অনেকে অনেক নাম বলিলেন কিন্তু কোনটিই পছন্দ হইল না। এদিকে দেশবন্ধুর ইচ্ছা, মহাত্মাজীর ৫২তম জন্ম-বার্ষিকীতে কাগজটি বাহির করেন। অবশ্য কাগজটির নাম শেষ পর্যন্ত তিনিই স্থির করিলেন। অনুগামীদের নিকট তিনি বলিলেন, "কাগজটির নাম কি হইবে তাহা লইয়া অনেক ভাবিয়াছি। নানা চিন্তার মধ্যে কাল রাতে হঠাৎ নামটি মনে হইল 'বাংলার কথা'। কয়েক বছর আগে ভবানীপুরে প্রাদেশিক সম্মেলনীতে আমার সভাপতির ভাষণ ঐ নামেই ছিল।" 'বাংলার কথা' দেশবাসীর নিকট অতি আদরের, অতি আগ্রহের। দেশবাসীগণ অদম্য উৎসাহ লইয়া উহার আত্মপ্রকাশের আশায় দিন গুনিয়াছিল। বাহির হইল সে কাগজ। প্রথম সংখ্যাটিতে চিত্তরঞ্জনের নিজের লেখা ছিল তিনটি প্রবন্ধ আর উল্লেখযোগ্য ছিল একটি কবিতা। চিত্তরঞ্জনের 'স্বরাজ সাধনা' দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় আর তৃতীয় সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য ছিল 'বস্ত্রযজ্ঞ'।

এই পরিবেশে গান্ধীজীর সংগে দেশবন্ধুর আবার একটু মতদ্বৈধ হয়। লর্ড রীডিং তখন গভর্ণর জেনারেল। তাহার সংগে গান্ধীজীর এক সাক্ষাৎ হইলে বড়লাট তাহাকে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের বক্তৃতার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইলেন যে, উহা প্রকাশ্যভাবেই হিংসাত্মক। বিশেষতঃ করাচীতে খিলাফৎ কনফারেন্সের সভাপতিরূপে মৌলানা মহম্মদ আলি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা জনগণকে হিংসায় প্রবৃত্ত করা ছাড়া আর কিছুই নহে। গান্ধীজীও লর্ড রীডিং-এর নিকট উহা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং গান্ধীজী আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে ঐ বক্তৃতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া গভর্ণর জেনারেলের নিকট চিঠি লিখিতে বলিয়াছিলেন। ঐ চিঠি লেখা উচিত কি-না ইহা লইয়াই কংগ্রেসের মধ্যে তখন দুই দল হইয়া গেল। একদল গান্ধীজীকে সমর্থন করিলেন, একদল সমর্থন জানাইতে পারিলেন না। দেশবন্ধু ছিলেন বিরুদ্ধ দলে।

তখন ১৯২১ সাল তাহার শেষের দিকে চলিয়াছে। নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে যুবরাজ ভারতবর্ষে আসিবেন এবং দুই মাস ভারতবর্ষে থাকিয়া সর্বত্র প্রজাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের কোন বিচার তখনও হয় নাই বা ভারতব্যাপী খিলাফৎ আন্দোলনের ব্যাপারে তখনও ইংরাজ-সরকার বিরূপ মনোভাব লইয়াই রহিয়াছে। সুতরাং বোম্বাইয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে সেই মতে গান্ধীজী নির্দেশ দিলেন, যুবরাজের আগমনে ভারতবাসী সমস্ত উৎসব বর্জন করিবে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া যুবরাজ যেদিন যে-প্রদেশে যাইবেন সেদিন সেখানে হরতাল প্রতিপালিত হইবে।

এই প্রস্তাবের প্রস্তাবক ছিলেন দেশবন্ধু। কলিকাতায় যেদিন যুবরাজ আসিবেন সেদিন যাহাতে পরিপুর্ণ হরতাল বাংলাদেশে প্রতিপালিত হয় সে-জন্য চিত্তরঞ্জন কঠোর পরিশ্রম করিয়া চলিলেন। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় যে এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে সভাপতির ভাষণে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষের একমাত্র লোক প্রতিনিধি সভা অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি এবং এই সমিতির আদেশ অনুসারে আমরা যুবরাজের অভ্যর্থনানুষ্ঠান পরিবর্জন করিতে বাধ্য। ইংরাজের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই, আমাদের অভিযোগ, যে শাসন-প্রণালী আমাদের নিষ্পেষিত করে, সেই বুরোক্রাসী বা অমাত্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে। আমাদের শত্রু এই বুরোক্রাসী,

আমাদের জাতীয় জীবন নষ্ট করিতেছে এই বুরোক্রাসী এবং আমাদের মানুষ বলে স্বীকার করতে চায় না এই বুরোক্রাসী। ইহারই বিরুদ্ধে আমরা অহিংস যুদ্ধ ঘোষণা করিযাছি এবং এই শত্রু বুরোক্রাসীর অতিথিরূপেই তাব আহ্বানে তাকে পরিপুষ্ট কবিবার জন্যই আজ যুবরাজ পদার্পণ করিবেন। সম্রাটই হউন বা তাঁহার যোগ্যপুত্র যুবরাজই হউন, যিনি এই বুরোক্রাসীর শক্তিবৃদ্ধি অভিপ্রায়ে এখানে আসিবেন আমরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে পারি না। কংগ্রেসের আদেশ আমরা মানিব, তাহাতে আমাদের যত ক্ষতিই স্বীকার কবিতে হোক। কেহ কেহ বলেন, যুবরাজ আমাদের অতিথিরূপে আসিতেছেন, অভ্যাগতের প্রতি আমাদের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন আমাদের ধর্মানুমোদিত। বটেই তো? কে আহ্বান করিতেছে যুবরাজকে? আমরা, না আমাদেব শত্রু বুরোক্রাসী? যদি আজ স্পষ্ট ও সত্য কথা বলিবার আমাদের অধিকাব থাকিত, আমরা বলিতাম, 'আমবা দুঃখ দৈন্যে জর্জরিত, মৃত্যুমুখে পতিত, লাঞ্ছিত জাতি, এখন আপনি আমাদেব শত্রুর পক্ষ থেকে আসিবেন না।" রাজার প্রতি, বাজসিংহাসনেব প্রতি, রাজবংশের প্রতি ভক্তি আমাদেব খুব আছে কিন্তু যে শাসনদণ্ড আমাদেব দেহের জীবনীশক্তি খর্ব করিতেছে, আমাদিগকে হৃতসর্বস্ব করিতেছে, আমরা সত্যই বলিতেছি, তৎপ্রতি আমাদের বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা নাই। অনেকে বলেন, অর্থ তো আমাদেরই, কোথায় আছে সে অর্থ ব্যয় করিবার আমাদের ক্ষমতা? আমরা নিজবাসভূমে পরবাসী, দাস, দাসেরও অধম ঘৃণিত হেয় লাঞ্ছিত জাতি। পারি না আমরা কিছুতেই যুবরাজ-অভ্যর্থনার কোন অংশে যোগদান করিতে।"

হরতাল পালন করা এবং উহাকে সর্বাত্মক করিযা তুলিবার জন্য স্বেচ্ছা-সেবক প্রযোজন। কিন্তু তখন পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ হইয়াছিল মাত্র পাঁচ হাজার। ইহাতে চিত্তরঞ্জন মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন "কলি-কাতার মত মহানগরীতে মাত্র পাঁচ হাজার। এখানে এতগুলি স্কুল-কলেজ তবু মাত্র পাঁচ হাজারের বেশী পাওযা গেল না। আমি আশা করি ঠিক যেভাবে মানুষের বাঁচা উচিত, কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ সেইভাবেই জীবন ধারণ করে। শুধু অস্তিত্বের ভার বহন করা মানে বেঁচে থাকা নয়।"

দেশবন্ধুর ইহা শুধু বলা নয়,—আবেদন। দেখা গেল তাঁহার আবেদন নিষ্ফল হইল না। ইহার পর কয়েক দিন মাত্র অতিবাহিত হইল। সেই

অল্প সময়ের মধ্যেই স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা পাঁচ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া আশানুরূপ হইয়াছিল।

১৭ই নভেম্বর যুবরাজ ভারতের মাটি বোম্বাইতে আসিয়া পদার্পণ করেন। কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেদিন সর্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হয় এবং এই হরতালকে কেন্দ্র করিয়া নানা স্থানে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে Hutchinson তাহার The Empire of the Nabobs গ্রন্থে বলিয়াছিলেন, "The Prince's arrival was the signal for serious riots in Bombay and elsewhere, and his tour was everywhere marked by scenes of disorder."

কলিকাতায় হইল সর্বাত্মক হরতাল। অনেকে কলিকাতার সেদিনের দৃশ্যকে বলিয়াছেন মরুভূমি! কলিকাতার যান-বাহন, ট্রাম-বাস সব বন্ধ, বন্ধ সমস্ত অফিস-আদালত, কল-কারখানা। সব খাঁ খাঁ করিয়াছে। কিন্তু যান-বাহন আবার চলিয়াছে মহত্তর উদ্দেশ্যে। যাহারা দূর দূরান্ত হইতে ট্রেনে আসিয়া হাওড়া ও শিয়ালদা পৌছিয়াছিল তাহাদের মধ্যে রুগ্ন, শিশু ও স্ত্রীলোকদের যাহাতে অসুবিধা না হয় সে-উদ্দেশ্যে গাড়ী বাহির হইয়াছিল তাহাদিগকে তাহাদের গন্তব্যস্থানে পৌছাইয়া দিবার জন্য। গাড়ীর কপালে ছিল বিজয়-তিলক; বড় বড় অক্ষরে প্লাকার্ড আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল, "অন ন্যাশানাল সার্ভিস"। এই সার্থক হরতাল, কলিকাতার মত শহরের বুকে এই মরুভূমির খাঁ খাঁ দৃশ্যের নিপুণ স্রষ্টা ছিলেন সুভাষচন্দ্র।

কলিকাতার অবস্থা উত্তপ্ত। ১৮ই গভর্ণমেণ্ট হাউসে [রাজভবন] ইহা লইয়া কর্তৃপক্ষের গভীর আলোচনা হয়। ইংরাজের বণিক সভা 'Bengal chamber of Commerce' বিকালের দিকে এক অভিযোগপত্র পেশ করে যে, হরতালের দিন স্বেচ্ছাসেবকগণ অনেক দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিয়াছে। সুতরাং এই স্বেচ্ছাসেবকগণকে দমন করিবার জন্য সরকারও বদ্ধ পরিকর হয়। পরের দিন স্টেটস্‌ম্যান ও ইংলিশম্যান কাগজে দেখা গেল ইহার চরম পরিণতি, All Volunteers associations illegal। সরকারের দৃষ্টিতে সন্দেহজনক ১১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ফোরবেস ম্যানসন খানা-তল্লাসী করিয়া তছনছ্ করা হইল আর সে সঙ্গে কংগ্রেস অফিস ও খিলাফৎ অফিসও সরকারের দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। সর্বত্রই জিনিসপত্র ভাঙ্গচুর, খাতাপত্র ছিন্নভিন্ন।

স্বেচ্ছাসেবকদল বে-আইনী, কংগ্রেস অফিস তছ্নছ্। ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, "I feel the handcuff on my wrists and the weight of iron-chains on my body. It is the agony of bondage. The whole of India is a vast prison. The work of the Congress must be carried on what matters is whether I am taken or left, what matters is whether I am dead or alive ?

চিত্তরঞ্জন সেদিন বিনিদ্ররজনী যাপন করেন, শুধু একা নন, সপরিবারে। ওদিকে বোম্বাইতে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হয় উহা গান্ধীজীকে বিশেষভাবে আলোড়িত করিয়াছিল। তাঁহার হাতের অস্ত্র অনশন। তিনি তাহা করিয়াই উহার প্রতিকার করিতে চাহিলেন এবং ইংরাজ সরকার যে ভাবে দমননীতির চাকা ঘুরাইয়া দেশবাসীকে নিষ্পেষিত করিতে চাহিতেছিল উহার সম্মুখে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইবার জন্য মন স্থির করিলেন। তখন তিনি ঘোষণা করেন তাঁহার সংগ্রামের নূতন নীতি।

চিত্তরঞ্জনের তখন ডাক পড়িল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভায় যোগদান করিবার জন্য। তিনি তখন বোম্বাই মেলে আমেদাবাদের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন কলিকাতার জন সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গমালা। যাত্রার পূর্বে তিনি বলিলেন, "হরতালের সাফল্যের জন্যই চারিদিকে ধরপাকড়ের ধূম পড়িবে। শুনিয়াছি আপাততঃ শাসমল, সুভাষ ও মুজিবর রহমানকে ধরিবে।" উহাদের ধরিবার কারণ সুভাষচন্দ্র ছিলেন প্রচার বিভাগের সম্পাদক এবং তাঁহার নামে অনেক প্যাম্পলেট প্রচারিত হইয়াছে। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ছিলেন কংগ্রেসের সেক্রেটারী এবং মুজিবর রহমান ছিলেন খিলাফতের সম্পাদক। সুতরাং ঐ গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকায় যে কোন মুহূর্তেই তাঁহাদের গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই তিনি বলিয়া গেলেন, "আমি এ সম্বন্ধে মহাত্মার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিব, সাত দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব, আপনারা আমি না আসা পর্যন্ত কিছু করিবেন না।"

বোম্বাইতে দেশবন্ধু কংগ্রেসের সভা করিলেন ২৩ এবং ২৪শে নভেম্বর। তিনি ২৬শে নভেম্বর কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। পুলিশ কমিশনার তখন কলিকাতায় তিন মাসের জন্য সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ

জারী করিয়াছেন। কিন্তু অদম্য দেশবন্ধু। মহাত্মার নূতন নীতির তখন রূপ পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কলিকাতা আসিয়া তাই তিনি হিন্দু মুসলমান তাঁহার অনুচর কর্মীদিগকে ডাকিয়া অসীম বল এবং প্রগাঢ় আত্ম-বিশ্বাস লইয়া কর্মযজ্ঞে জীবন আহুতি দিবার প্রতিজ্ঞা করাইলেন। গান্ধীজীর এই নূতন নীতির নাম হইল আইন অমান্য আন্দোলন। Hutchinson বলিয়াছেন, "This new policy was given the name Civil Disobedience, and was calculated to paralyse the machinery of Government. It was enthusiastically acclaimed and Gandhi was appointed dictator". আর বাংলার ডিক্টেটর হইলেন দেশবন্ধু। —কংগ্রেসের তো ছিলেনই, খিলাফত কমিটিও তাহাদের ভালোমন্দ সব কিছুর ভারই দেশবন্ধুর উপর ছাড়িয়া দিলেন।

স্বেচ্ছাসেবকগণ তখন যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত। শুধু আদেশের প্রতীক্ষা। স্থির হইল ৩রা ডিসেম্বর হইতে স্বেচ্ছাসেবকগণ খদ্দর বিক্রির জন্য বাহির হইবে, পুলিশ তাহাদের সে জন্য গ্রেপ্তার করিতে আসিলে তাহারা বিনা আপত্তিতে গ্রেপ্তার বরণ করিবে। সুভাষচন্দ্র বলিলেন, সরকারের বে-আইনী আইন মানিব না। যে পাঁচজন খদ্দর বিক্রয় করিবে তিনি যাইবেন সেই অগ্রগামী দলেই। নিজের গায়ের বিলাতি পোশাক তাহার আগেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। দেশবন্ধুর বাড়ীতেও বিলাতি বস্ত্রের বহ্নি-উৎসব হইয়া গিয়াছে। বাড়ীতে যত বিলাতি পোশাক ছিল তাহা সবই একদিন দেশবন্ধুর বাড়ীর লনে স্তূপীকৃত করিয়া আগুন দিয়া শেষকৃত্য করা হইয়াছিল।

দেশবন্ধুর চিন্তার শেষ নাই। তিনি ডিক্টেটর বটেন তবুও তখন কোন কাজ সকলের সঙ্গে পরামর্শ করা ছাড়া করেন নাই। তাঁহার সৈন্য সংখ্যা তিন শ্রেণীর, বাঙালী, হিন্দুস্থানী এবং খিলাফত। এক এক শ্রেণীর জন্য এক এক জন প্রধান। এই তিন শ্রেণীর উপরে যিনি ছিলেন প্রধান তিনি হইলেন সুভাষচন্দ্র। দেশবন্ধু নিজেও স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকায় নিজের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে দেশবাসীগণের নিকট আরও অধিক সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক চাহিয়া 'my message to my Countrymen" নামক একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন : "বুরোক্রাসী এবার অসহযোগ ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। আমি জানিতাম সর্বাগ্রে ইহারাই আইনের বিধান ভঙ্গ করিবে।

পূর্ব হইতেই ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করিয়া আমাদিগের ন্যায়সঙ্গত অনেক কার্যে ইহারা বাধা প্রদান করিয়াছে। এখন আবার আমাদের সাফল্যে অসহিষ্ণু হইয়া ইহারা বিস্মৃতির গর্ভ হইতে অব্যবহৃত আইন-অস্ত্রের উদ্ধার সাধন করিয়া আমাদের উপরে প্রয়োগ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। আমি আপনাদিগকে সাহস দিতেছি এই সঙ্কট সময়ে আপনারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবেন না। ধৈর্যের সহিত আপনারা সর্বপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিবেন। হিংসা নীতির কখনও আশ্রয় লইবেন না, কংগ্রেসের নির্দিষ্ট কার্য করিতে কখনও বিতৃষ্ণ হইবেন না। মনে রাখিবেন স্বরাজ লাভই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ইহারা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বে-আইনী জনতা আখ্যা দিয়া প্রকারান্তরে কংগ্রেসের কার্যে বাধা প্রদান করিতেছে। আজ হইতে সমস্ত নরনারী যেন ভলাণ্টিয়ার হইয়া এই অসঙ্গত আইন অমান্য করিতে সঙ্কুচিত হয় না। আজ হইতে কংগ্রেসের কার্যে আমি নিজে ভলাণ্টিয়ার শ্রেণীভুক্ত হইলাম। আমি আশা করিতেছি বাংলাদেশে অচিরেই লক্ষাধিক ভলাণ্টিয়ার কাজ করিতে ছুটিয়া আসিবে। আমাদিগের লক্ষ্য পবিত্র। কার্য প্রণালীবিধি সঙ্গত এবং অপ্রমত্ত। আপনারা মনে রাখিবেন যে দেশমাতৃকার কার্যে আত্মনিয়োগ করা ভগবানেরই অভিপ্রেত কার্য। পার্থিব কোন ক্ষমতাই আমাদের এই ভাগবত ব্রতে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না ও পারিবে না।"

আরম্ভ হইল খদ্দরের অভিযান। ৩রা ডিসেম্বর। খদ্দর পরিহিত স্বেচ্ছাসেবকগণ খদ্দর বিক্রি করিবার জন্য পাঁচ পাঁচ জনের এক একটি দলে বিভক্ত হইয়া বহির্গত হইল। স্থির হইয়াছিল একজন দূরে দাঁড়াইয়া থাকিবে। প্রয়োজন মত সংবাদাদি আদান-প্রদান করিবে সে। সেদিন খদ্দর বিক্রয় করিবার জন্য পাঁচটি দল বাহির হইয়াছিল। সেদিন পুলিশ একটি দলকেও গ্রেপ্তার করিতে আসে নাই বা খদ্দর বিক্রয় করিবার কার্যে বাধা প্রদান করে নাই।

পরের দিন ৪ঠা ডিসেম্বর দলের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়া দশটি দল খদ্দরের অভিযানে বহির্গত হইল। কিন্তু আনন্দের বিষয় যে, সেদিনও পুলিশ তাহাদের অত্যাচারী সংহার মূর্তি ধারণ করিয়া অগ্রসর হয় নাই।

এই সময়ের একদিনের একটি ঘটনা সকলের হাসি ও বিষাদের কারণ হইয়াছিল। রাত্রে চিত্তরঞ্জন আহারে বসিয়াছেন। যথারীতি আরও অনেকে

তাঁহার সঙ্গে খাইতে বসিয়াছেন। বসিয়াছিলেন সুভাষচন্দ্রও। ঠাকুর খাদ্য পরিবেশন করিতেছে। খাইতে খাইতে চিত্তরঞ্জন একবার বলিয়া উঠিলেন, ঠাকুর! আমার ভাতে কঙ্কর মিশিয়ে দিতে পার না?

ঠাকুর বিস্মিত! কর্তা বলেন কি!! সলজ্জভাবে বলিল, কেন কর্তা?

চিত্তরঞ্জন বলিলেন, জেলের ভাতে কঙ্কর মেশান। জেলের ভাত খাবার অভ্যাস এইখান থেকে করাই ভাল।

আপত্তি তুলিলেন সুভাষ। তা কেন,—বলিয়াই তিনি তাকাইলেন বাসন্তী দেবীর দিকে, যে দুর্ভোগ এখনও কপালে আসেনি, এখনই তা সাধ করে ভোগ করা কেন?

খাইতে খাইতেই হাসিলেন দেশবন্ধু, "শরীরটাকে একটু কষ্টসহিষ্ণু করে নিলে মন্দ কি। জেলে গিয়ে ঘানি টানিতে তখন কষ্ট হবে না।"

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া দেশবন্ধু সুভাষকে একা একা ডাকিয়া বলিলেন, আমার একটা কাজ তোমার করে দিতে হবে।

বলুন,—জানিতে চাহিলেন সুভাষচন্দ্র।

আমার এক লাখ টাকার প্রয়োজন, সংগ্রহ করে দিতে পারবে?

নিশ্চয়ই পারব। কিন্তু কত দিনের মধ্যে?

এখনই চাই। এই মুহূর্তে।

এখনই চাই, চিন্তায় পড়িলেন সুভাষ।

তোমার চিন্তার কিছু নাই। তুমি শুধু হ্যাঁ বলিলেই হয়।

আমি! বিস্মিত হলেন সুভাষ!—হ্যাঁ বলিলেই লাখ টাকা!

তুমি বিয়ে করবে বললে এখুনিই লাখ টাকা আমার হাতে আসে—পাত্রী প্রস্তুত।

নিস্তব্ধ সুভাষ—আপনি আমাকে পরীক্ষা করছেন? কিন্তু আমি যে দেশের জন্য বলি? মায়ের চরণে আমার মন প্রাণ সব সমর্পণ করে বসে আছি—সংসার করার মত আমার যে কিছুই নেই।

দেশবন্ধু যে গ্রেপ্তার হইতে পারেন ইহা ভাবিবার তাঁহার সঙ্গত কারণ ছিল। কারণ বাংলা দেশ তখন তাঁহার আদেশে চলিতেছে। অসহযোগ, আইন অমান্য আন্দোলন, খদ্দরের অভিযান সমান ভাবেই চলিতেছে। সেই সঙ্গে ২৪শে ডিসেম্বর যুবরাজ কলিকাতা আসিলে যাহাতে দেশময়

সর্বাত্মক হরতাল প্রতিপালিত হয় তাহার জন্য দেশ ও জনগণকে সুগঠিত, সংহত করিবার জন্য তিনিই মস্তিষ্ক চালনা করিতেছেন। তাহা ছাড়া সরকার কর্তৃক তখন ধরপাকড আরম্ভ হইয়াছে। বাংলার এক বিখ্যাত বাগ্মী জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যাযকে তাহার নিজের জেলা বীরভূমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল ৩০শে নভেম্বর। তাহার পূর্বে দণ্ড আইনের ধারা অনুযায়ী বাংলার আরও কয়েকজন বিখ্যাত বীর সন্তানগণকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাহারা হইলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, নৃপেন্দ্রচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র এবং পীর বাদশা মিঞা প্রভৃতি। ইহা ছাডা বাংলার বাইরে আর এক মহান নেতাকেও গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করা হয। তিনি হইলেন পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়। কারার অন্তরালের এই মহান নেতৃবৃন্দের কথা স্মরণ করিয়া সেদিন চিত্তরঞ্জন বীরদর্পে ঘোষণা করিযাছিলেন, 'The Pillar of the Congress Lajpath Rai has been arrested and I like the direct attack."

৫ই ডিসেম্বর যাহারা খদ্দর বিক্রয় করিতে গিয়াছিলেন তাহারা সেদিন গ্রেপ্তার হইলেন। চিত্তরঞ্জন ইহা পূর্ব হইতেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু বাস্তবে যখন তাহাদেব গ্রেপ্তার করা হইল তখন এতই মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন যে, কাগজে প্রকাশিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত লেখাটুকু লিখিয়া তিনি একেবারে কাঁদিয়া ফেলিলেন: 'হারিযা যাই, আমায় জেলে নিক, কি গুলি করিয়া প্রাণ বধ করুক কিছু যায় আসে না, কিন্তু বাংলার যুবক কি মৃত, জন্মভূমিব এই মহাসঙ্কটেও কি তাহারা পশ্চাদ্‌পদ থাকিবে? বাঙালীর কি বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব নাই? আমি যে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি।"

দেশবন্ধুর বাডীতেও তখন প্রবল উত্তেজনা। চিত্তরঞ্জনের একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন তখন স্বেচ্ছাসেবকরূপে খদ্দর বিক্রয় করিবার জন্য মনস্থ করিলেন। ইহা লইয়া পরের দিন ৬ই ডিসেম্বর সকালের দিকে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে কথা কাটাকাটি। তখন খদ্দর বিক্রয় করিতে যাওয়ার অর্থই গ্রেপ্তার বরণ করা। অনেকে চিররঞ্জনকে নিষেধ করিল। কিন্তু সে না গেলে অন্য স্বেচ্ছা-সেবক যাইবে কেন—ইহাই হইল চিররঞ্জনের যুক্তি। চিররঞ্জন খদ্দর বিক্রয় করিতে যাইবে শুনিয়া চিত্তরঞ্জনও খুব খুশী হইয়াছিলেন।

কেহ কেহ চিত্তরঞ্জনকে বলিল, আমাদের আশঙ্কা, শীঘ্রই আপনাকে গ্রেপ্তার

করিবে, ভোম্বল বাড়ীতে থাক।

চিত্তরঞ্জন উত্তর করিয়াছিলেন, "এটা আমার আদেশ, পালন করিতেই হইবে।" অত্যন্ত দৃঢ়স্বর তাঁহার। একমাত্র পুত্রের উপর পুলিশের অত্যাচার হইবে, জেলে কখন কি অবস্থায় থাকিবে তাহা ভাবিয়াও তাঁহার এতটুকু দুশ্চিন্তা হইল না। বরং দেখা গেল, ঠিক সেই সময় খেলিতে খেলিতে তাহার নাত্‌নী সেখানে আসিলে তাহাকেও হাসি ঠাট্টার স্বরে বলিলেন, "কি রে মীনু। তুইও যাবি নাকি ?"

যাহা আশঙ্কা করা গিযাছিল হইলও তাহাই। ৬ই ডিসেম্বর ভোম্বল গ্রেপ্তার হইল। অনেকে সহানুভূতি জানাইতে চিত্তরঞ্জনের নিকট গিয়াছিল কিন্তু তখন পুত্রের গ্রেপ্তারের কথা চিন্তা না করিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের স্রোতকে অব্যাহত রাখিবার জন্য চিন্তা করিয়া চলিয়াছেন। পরে জানা গেল, চিররঞ্জন প্রভৃতি ২১ জনকে সেদিন যখন গ্রেপ্তার করিয়া গাড়ীতে তুলিতেছিল তখন হইতেই লাথি, ঘুষি মারিবার সঙ্গে পুলিশ মুখেও বলিযা চলিযাছিল Swine, Gandiwalas, Salas...

এই অত্যাচারের কথা শুনিয়াও চিত্তরঞ্জন নীরব। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি যখন চিররঞ্জনের জন্য কম্বল ও খাবার দিতে যাইতেছিলেন তখন হেমেন্দ্রবাবুকে বারবার বলিয়া দিলেন, "যে কয়েকজন ছেলে গ্রেপ্তার হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের জন্য কম্বল ও খাবার দিবে।" এই উদ্দেশ্যে তাহারা যখন লালবাজারে গিয়া একজন সার্জেন্টের নিকট উহাদের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তখন সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, "Get away you non-co-operating people. You have nothing to do here, I shall arrest you at once."

৭ই ডিসেম্বরের ভোর হইল। দেশবন্ধুর বাড়ী তেমনি ক্ষুব্ধ, উদ্বেলিত। সেদিন খদ্দর বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন বাসন্তী দেবী, ঊর্মিলা দেবী ও সুনীতি দেবী। নির্দিষ্ট সময়ে এই তিন বীরাঙ্গনা বডবাজারের এক রাস্তায় দাঁড়াইয়া খদ্দর বিক্রয় করিতেছিলেন। এমন সময় একজন সার্জেন্ট অতর্কিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, Madam, what are you doing ?

বাসন্তী দেবী জবাব দিয়াছিলেন, Nothing but Selling khaddar and declaring Hartal on the 24th December.

সার্জেন্ট, will you mind stepping into the thana.

এতটুকু আপত্তি করেন নাই বাসন্তী দেবী,—হাসিমুখে তাঁহারা চলিলেন। বাসন্তী দেবীর পিতা ও ভ্রাতা উভয়েই ইহাদের জামিনের জন্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু যাহাদের জন্য জামিন তাহারাই সম্মত হইলেন না। অবশেষে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের অনেক চেষ্টায় রাত ১২টার সময় বাসন্তী দেবী প্রভৃতিকে মুক্তি দেওয়া হয়। চট্টোপাধ্যায়ের এই চেষ্টায় চিত্তরঞ্জন অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বিরক্ত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, বিজয় তুমি এ সব কি কচ্ছ?

বিজয় জবাব দিয়াছিলেন, আমি আমার cousin এর জন্য করব না?

দেশবন্ধু: যদি অন্য স্ত্রীলোক হতো তাহলে করতে?

শুধু ইহাই নহে, বাসন্তী দেবী প্রভৃতিকে সেদিনই রাত ১২টার মধ্যে মুক্ত করিয়া আনিবার জন্য বিজয় চট্টোপাধ্যায়ের উপব তিনি এত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি বলিয়াছিলেন, "I regret Bijoy happens to be a relation of mine."

রাত গিয়া পৌঁছাইল প্রভাতের সিংহদ্বারে। ৮ই ডিসেম্বর। ইতিহাসের পাতায় ইহাও একটি স্মরণীয় দিন। সেদিন বাংলার গভর্ণর রোনাল্ডসের সঙ্গে দেশবন্ধুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রোনাল্ডসের সঙ্গে দেশবন্ধুর এই সাক্ষাৎই প্রথম নহে। সুতরাং দেশবন্ধু সম্বন্ধে রোনাল্ডসের ধারণা ছিল। এই ৮ই ডিসেম্বরের সাক্ষাতের পূর্বে তিনি এক সভায় দেশবন্ধু সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "A great personality of Bengal will preside over the destiny of India and we wait with great anxiety to hear him as president of the next Indian National Congress."

রোনাল্ডসে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আন্দোলন এবং হরতাল সম্বন্ধে আলোচনার জন্য প্রয়োজন বোধ করিলেন। তিনি প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ গোরলের একখানি চিঠি সহ স্যার আশুতোষ চৌধুরীকে দেশবন্ধুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। চিঠিখানিতে লেখা ছিল, If you have time, His Excellency will be pleased to see you at 2-30 P. M. To-day.

চিত্তরঞ্জন দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানে ছিল পা হইতে মাথা পর্যন্ত শুভ্র খদ্দর। রোনাল্ডসের সঙ্গে তাঁহার কথাবার্তাও হইল এক ঘণ্টা কিন্তু যে উদ্দেশ্যে ঐ সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহার কোন

সমাধান হইল না। অবস্থা যেখানে ছিল সেখানেই রহিয়া গেল।

রোনাল্ডসে দেশবন্ধুকে অনুরোধ করিলেন, "হরতাল বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করুন।"

চিত্তরঞ্জন ইহার জবাবে বলিয়াছিলেন, "ইহা অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির আদেশ—আমাদের কোন সাধ্য নাই।"

রোনাল্ডসে, "আমাদিগকে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেই হইবে।"

চিত্তরঞ্জন, "যদি দুই একটি স্থানে সামান্য গোলমালই হইযা থাকে, সমস্ত বাংলার ভলাণ্টিয়ার সম্প্রদাযকে বিদ্রোহী মনে করা কি ন্যায়সঙ্গত ?"

লর্ড রো, "আপনাদের প্রতিনিধিগণই সেইভাবে আমাদিগকে পরামর্শ দিয়াছে।"

চিত্তরঞ্জন, "তারা তো আমাদের প্রতিনিধি ন'ন।"

লর্ড রো, "আপনারা কাউন্সিলে আসুন।"

ইহার পর পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলার কথা উঠিলে চিত্তরঞ্জন জানাইলেন, "ভলাণ্টিযারগণ বহুস্থানে মার খাইয়াছে, তাহাদের ব্যাজ কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে পুলিশ যেমন ইচ্ছা রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করিতেছে। এ সব সম্বন্ধে কি আপনি কোন খবর রাখেন ?"

রোনাল্ডসে, "না, সেই সব সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।"

কথাবার্তা চলার মাঝে রোনাল্ডসে আবার তাহার মূল শান্তি শৃঙ্খলার কথায় ফিরিয়া গেলে চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "এঁরা ধর্মকার্যে নিযুক্ত, আমি কি করে এদের বাধা দিই ? আমি যদি আপনাকে নিষেধ করি আপনি কি গির্জায় যাওয়া বন্ধ করবেন ?"

রোনাল্ডসে, "না, তা নয়। তবে কি ভলাণ্টিয়ার বাহিনী চালাবেন ? তবে তো আমাকেও শান্তি রক্ষা করতে হবে।"

চিত্তরঞ্জন, "কি আর করবো ? আমি বৃদ্ধ হয়েছি, কিন্তু এই ধর্মযুদ্ধে যদি আমার দেহপাতও হয়, তথাপি আমি সমস্ত প্রাণ দিয়ে এই বে-আইনী বিধানের বিরুদ্ধে অহিংস যুদ্ধে কখনও বিরত হবো না।"

এই দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার পশ্চাতে একটু ইতিহাস রহিয়াছে। সে-ইতিহাস, ব্যক্তিগত মান-মর্যাদা সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন যে কতখানি সচেতন ছিলেন,—তাহাই। অনেক কথাবার্তা এবং চিঠিপত্র লেখালেখির পর এই

সাক্ষাৎকার সংঘটিত হয়। কথাটি প্রথম মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর চিত্তরঞ্জনকে বলেন। তিনি জানিতে চাহেন গভর্ণর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন তাহাতে তাঁহার কোন আপত্তি আছে কি না?

চিত্তরঞ্জন জানাইয়াছিলেন, "তিনি যদি ডাকিয়াই পাঠান, আমি কেন দেখা করিব না।"

এ প্রসঙ্গে একান্ত সচিব গোরলের সঙ্গেও চিত্তরঞ্জনের টেলিফোনে কথা-বার্তা হইয়াছিল। গোরলে তাহার কথাই বলিয়া চলিলেন, আপনি যদি আসেন গভর্ণর দেখা করিবেন।

চিত্তরঞ্জনও ততবার জানাইয়াছিলেন, "It is for His Excellency to command and it is for me to obey."

এই মান-মর্যাদার লড়াইয়ে মিঃ গোরলে দেশবন্ধুকে যে চিঠি দিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :

My dear C. R. Das.

His Excellency has been out all day and I have not had a chance to see him yet. The Indian gentleman did not convey quite the right idea. The idea he conveyed was that you had expressed a desire to have a talk with the Governor with a view to discussing the present situation and so I rang you up to tell you that if that were so I know that His Excellency was always willing to see any one who wished to discuss any matter of importance with him and I was going to suggest to His Excellency that I should ask you to come along. I had thought of after-dinner to-night, if I could fix it up. He is after on his study on sunday night, but that might be too late now.

Ring me up (No 428 Regent and my house), when you get this and let me know if you think such a discussion would be helpful at the present time.

Your's very sincerely

W. R. Gourley.

প্রিয় মি. সি. আর. দাশ,

গভর্ণর বাহাদুর সারাদিন বাহিরে ছিলেন সেই জন্য আমি এখনও তাহার সহিত দেখা করিবার সুযোগ পাই নাই। ভারতীয় ভদ্রলোকটি মূল কথাটি ধরিতে পারেন নাই। বর্তমান পরিস্থিতি লইয়া আপনি নাকি গভর্ণর বাহাদুরের সঙ্গে আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তিনি বলিয়াছিলেন। তাই আমি আপনাকে টেলিফোনে জানাইয়াছিলাম যে, যদি তাহাই হয় তবে কোন প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনার জন্য কোন লোক ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, আমি জানি, গভর্ণর বাহাদুর সর্বদা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত। আপনার বিষয়ও গভর্ণর বাহাদুরকে আমি জানাইতে যাইতেছিলাম। যদি দেখা করিয়া ঠিক করিতে পারি তবে আমার মনে হয় যে তাহার ভোজনের পর আজ রাত্রে সাক্ষাৎ হইলে ভাল হয়। রবিবার রাত্রে তিনি প্রায়ই পড়াশুনা করেন কিন্তু তাহাতে অনেক বিলম্ব হয়।

আমার এই চিঠি পাইয়া (রিজেণ্ট ৪২৮ এবং আমার বাড়ী) আমাকে টেলিফোন করিবেন এবং জানাইবেন যে বর্তমান সময়ে এইরূপ আলোচনা ফলপ্রদ বলিয়া আপনি মনে করেন কি না।

ভবদীয়
গোর‍্লে।

গোরলে সাহেবের চিঠি পাইয়া চিত্তরঞ্জন উত্তর দিলেন,

148, Russa Road South,
Bhowanipur, 4. 12. 21.

Dear Mr. Gourly,

I have just received your letter. As you say, there must have some misunderstanding. Maharaja Sri P. K. Tagore asked me whether I had any objection to see His Excellency. He was under the impression that I could not do so on account of the principle of Non-co-operation. I explained to him that it was my duty to see His Excellency if H.E. wished to see me. He was particularly anxious that H.E. and I should meet to discuss the question of the Hartal. I told

him should H.E. send for me I certainly would consider it my duty to see him and discuss any matter which His Excellency might consider necessary.

I have now told you everything. If H.E. wishes to see me, kindly drop me a line.

Your's sincerely
C. R. Das

প্রিয় মিঃ গোবুলে,

এইমাত্র আপনার চিঠি পাইলাম। যাহা বলিলেন তাহাতে মনে হয় নিশ্চয়ই কোথাও ভুল বোঝাবুঝি হইয়াছে। গভর্ণর বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আমার আপত্তি আছে কি না মহারাজ পি কে ঠাকুর তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। তাহার ধারণা ছিল যে অসহযোগ আন্দোলনের নীতির জন্য উহা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলাম যে গভর্ণর বাহাদুব যদি আমাকে ডাকেন তবে গভর্ণর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করা আমার কর্তব্য। গভর্ণব বাহাদুর এবং আমি মিলিত হইযা হরতাল সম্বন্ধে আলোচনা করি ইহা তিনি আবশ্যক বলিয়া মনে কবিয়াছিলেন। আমি তাহাকে বলিযাছিলাম, যদি গভর্ণর বাহাদুর আমাকে ডাকিয়া পাঠান তবে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে এবং তিনি যাহা প্রযোজনীয় মনে করেন সেই বিষয় আলোচনা করিতে আমি নিশ্চয়ই প্রস্তুত আছি।

আপনাকে সব জানাইলাম। যদি গভর্ণর বাহাদুর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন তবে অনুগ্রহ করিয়া একটি লাইন লিখিয়া পাঠাইবেন।

ভবদীয়
সি. আর. দাশ

ইহার দুই দিন পরে অর্থাৎ ৬ই ডিসেম্বর গোবুলে সাহেব আবার চিত্তরঞ্জনকে জানাইলেন,—

H. E. has learned from an Indian gentleman that in reply to a question which that gentleman put to you in the Course of a Conversation upon matters which are at present the

subject of considerable public interest, you stated that you would be glad to act upon a suggestion which he had put forward.

Lord Ronaldshy understands that the matter under discussion at the time when you made this reply was the visit of His Royal Highness—the Prince of Wales. Lord Ronaldshy asks me to inform you therefore that if you are of opinion that an interview would be of advantage at the present time, he will gladly see you and he requests me to ask if 5 P. M. to-morrow (Wednesday) the 7th would be an hour Convenient to yourself.

গভর্ণর বাহাদুর একজন ভারতীয় ভদ্রলোকের নিকট হইতে জানিয়াছেন যে, বর্তমানে জনসাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কথা প্রসঙ্গে সেই ভদ্রলোকটি যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে আপনি জানাইয়াছিলেন যে আপনি তাহার পরামর্শ মত কার্য করিতে সম্মত আছেন।

যখন আপনি উত্তর দিয়াছেন এই সময়ের আলোচ্য বিষয় মহামান্য যুবরাজের আগমন সম্বন্ধে উহা লর্ড রোনাল্ডসে বুঝিয়াছেন। সুতরাং লর্ড রোনাল্ডসে আপনাকে জানাইতে অনুরোধ করিয়াছেন যে, বর্তমান সময়ে একটি সাক্ষাৎকার ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া যদি আপনি মনে করেন তবে তিনি আনন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং আপনাকে জানাইতে বলিয়াছেন যে আগামীকাল বুধবার ৭ই অপরাহ্ণ ৫টা আপনার পক্ষে সুবিধাজনক সময় হইবে কি না।

উক্ত চিঠিতেও পরিষ্কার কোন কথা না পাইয়া চিত্তরঞ্জন আবার চিঠি লিখিলেন,—

My Dear Gourly, 7. 12. 21.

I do not understand from your letter that H. E. wishes me to see me. I explained the whole situation in my last letter. The rules by which the Non-co-operation leaders are bound, are rigid. If H. E. thinks that a discussion with

me on the present situation will be helpful, it is for His Excellency to command and for me to obey. It is impossible for me to guess whether an interview would be of advantage or not at the present time. Judging from the present temper of the Government, I doubt if it would help matters, but that is for His Excellency to judge,

Yours' sincerely
C. R. Das.

প্রিয় গোর্‌লে,

আপনার চিঠি পড়িয়া আমি বুঝি না যে গভর্ণর বাহাদুর সত্যই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। আমার গত পত্রে সমস্ত বিষয়টি বুঝাইয়া বলিয়াছি। যে নিয়মে অসহযোগীনেতৃবৃন্দ আবদ্ধ তাহা দৃঢ়। বর্তমান পরিস্থিতি লইয়া আমার সঙ্গে আলোচনার সুফল হইবে বলিয়া যদি গভর্ণর বাহাদুর মনে করেন তবে তিনি আমাকে আদেশ করিতে পারেন এবং আমিও উহা মান্য করিব। বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি সাক্ষাৎকার ফলপ্রসূ হইবে কি হইবে-না তাহ অনুমান করা আমার পক্ষে অসম্ভব। সরকারের বর্তমান মনোভাব বিচার করিয়া আমার মনে হয় না যে আলোচনায় কোন ফল পাওয়া যাইবে। তবে সে-বিষয়ে গভর্ণর বাহাদুরই ভাল বুঝিতে পারিবেন।,

ভবদীয়
সি. আর. দাশ.

ইহার উত্তরে গোরলে দেশবন্ধুকে লিখিত মাত্র দুইটি লাইনে আহ্বান জানান: •

My bear C. R. Das

If you are free at 2·45 P. M. or 6 P. M. in the evening H. E. would like to see you.

Yours' sincerely
Gourley.

মর্যাদার লড়াই কেন বলা হইয়াছিল উপরোক্ত চিঠিগুলি হইতেই তাহা পরিষ্কার হইতেছে। সে যাহা হউক, সাক্ষাৎকার হইয়াও কোন সুফল পাওয়া গেল না। হরতাল হইবেই। রোনাল্ডসে মহা দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। যুবরাজ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া ভারতবাসীগণ কর্তৃক কোথাও আদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হ'ন নাই। কলিকাতাতেও যদি তাহার অভ্যর্থনা না হইয়া হরতালের মাধ্যমে অদেখা অক্ষর 'ফিরিয়া যাও' দেখান হয় তবে ভারত সরকারের তথা বাংলার গভর্ণর হিসাবে রোনাল্ডসের মুখ থাকে কি করিয়া! সুতরাং শেষ চেষ্টা হিসাবেই রোনাল্ডসের সঙ্গে দেশবন্ধুর ঐ ৮ই ডিসেম্বরের সাক্ষাৎ।

সাক্ষাৎকার নিষ্ফল। কিন্তু নিষ্ফল হওয়ার যে ফল চিত্তরঞ্জন তাহা বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি সব দিক হইতেই প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনিই তখন বাংলার ডিক্‌টেটার। ৯ই ডিসেম্বর কিরণশঙ্কর রায়ের বাড়ীতে সকলে মিলিত হইলেন। উপস্থিত ছিলেন বাসন্তী দেবীসহ দেশবন্ধু, আজাদ সাহেব, শ্যামবাবু, সত্যেনবাবু, সাতকড়িপতিবাবু, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও পদ্মরাজ জৈন প্রভৃতি। স্থির হইল, দেশবন্ধুকে গ্রেপ্তার করিলে শ্যামবাবু তাঁহার স্থলে ডিক্‌টেটার হইবেন আর সম্পাদক বীরেন শাসমলকে গ্রেপ্তার করিলে তাঁহার স্থলে সম্পাদকের কার্য পরিচালনা করিবেন সাতকড়িপতিবাবু। চিত্তরঞ্জন এতটুকু বিচলিত হইলেন না বরং তিনি মাঝে মাঝে যেমন হাসি-ঠাট্টা করিতেন ঠিক তেমনই হাসি-ঠাট্টা করিয়া যাইতে লাগিলেন। বীরেন শাসমল তখন সবে মাত্র জ্বর হইতে উঠিয়াছিলেন। দেশবন্ধু তাহাকে বলিলেন, "বীরেন, প্রস্তুত হ'য়ে থাক, কালই বোধহয় বেড়াতে নিয়ে যাবে।"

প্রত্যাশা বাস্তবে পরিণত হইল। ১০ই ডিসেম্বর অসহযোগের কার্যক্রম এবং হরতালকে সার্থক করিবার জন্য তখন আর স্বেচ্ছাসেবকের অভাব নাই।

দুপুরের খাওয়া শেষ করিয়া চিত্তরঞ্জন বাড়ীতেই ছিলেন। তিনি তখন বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার নিকট সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল তিনি সেদিনই গ্রেপ্তার হইবেন।

দুপুরের সূর্য গড়াইয়া পশ্চিমের আকাশে অনেকখানি নামিয়া পড়িয়াছে। তখন বৈকাল সাড়ে-চারটা বাজে। দেশবন্ধু উপরে বসিয়া চা খাইতেছেন।

চায়ের চুমুকে চুমুকে তৃপ্তির সঙ্গে কত চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিতেছে তাঁহার কপালের ভাঁজে ভাঁজে। তথাপি সে-চিন্তা যেন তাঁহার নয়,—অপরের! তিনি চা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর অন্যান্য যাহারা উপস্থিত ছিলেন তাহাদের সঙ্গে কথা বলিয়া চলিয়াছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে কন্যা কল্যাণী আসিয়া সংবাদ দিল, "বাবা সার্জেণ্ট এসেছে।"

শুধু সার্জেণ্টই নহে। পুলিশ,—এক গাড়ী ভর্তি পুলিশ।

চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "এসেছে?"

নীচের ঘরে বসিয়াছিলেন সুরেন্দ্রনাথ হালদার এবং বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। দুইজন ডেপুটি কমিশনার মিঃ কিড্ ও মিঃ ম্যাকেঞ্জি উহাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলিয়া উপরে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে শাসমল বলিলেন, আমাকেও কি আপনাদের দরকার আছে?

কি নাম আপনার " পুলিশ জিজ্ঞাসা করিল।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল।

হ্যাঁ-হ্যাঁ আপনাকেও দরকার আছে, আপনি বসুন।

তাহারা উপরে উঠিয়া গেল।

দেশবন্ধু প্রস্তুত। ডেপুটি কমিশনারদ্বয়ের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "I am C. R. Das. Are you for arresting me?"

ডেপুটি কমিশনার: Yes.

দেশবন্ধু: I am ready, but where is the warrant?

পুলিশ: সেখানা তো আনা হয় নাই। But you are arrested under the Criminal Law Amendment Act.

দেশবন্ধু: Oh, the same stale Act under which my boys are arrested? Very good, let us go, বলিয়াই দেশবন্ধু তাঁহার সঙ্গী চাদরখানি গায়ে জড়াইয়া পা বাড়াইলেন।—আর বলিলেন, আমার জন্য কিছুতেই জেলে খাবার পাঠাবে না।

মেয়েদের মধ্যে কে যেন বলিয়া উঠিলেন, আপনি তবে কি খাইবেন?

দেশবন্ধু: সাধারণ একজন কয়েদী যা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে আমারও তাতেই হবে।

বাসন্তী দেবীর অবস্থা সহজেই অনুমেয়, পুত্র যুদ্ধে গিয়াছে, বীর স্বামীও

যুদ্ধে চলিলেন। স্বামীপুত্রের এই বীরত্বপূর্ণ গৌরবে গৌরবান্বিতা বাসন্তী দেবী তখন আনন্দে ও বিষাদে স্তব্ধ। শুধু অপলক চোখে দেখিতে লাগিলেন চিত্তরঞ্জনের সমর-যাত্রা আর শুনিতে লাগিলেন মেয়েদের পবিত্র উলুধ্বনি, অসংখ্য শঙ্খের বিজয় নিনাদ।

গাড়ীতে উঠিবার পূর্বে দেশবন্ধু দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তাহারা যাহাতে স্মরণ রাখে তাই আবার বলিলেন, আমাদের উদ্দেশ্য যদি সাধু হয় তবে আর কোন ভাবনা নাই। যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে তার আর নিভিবার সম্ভাবনা নাই। একমাত্র ভগবানের হস্তেই এই কার্যের ভার নিযোজিত আছে। তোমরা শান্তভাবে স্বদেশেব কাজ করিয়া যাও, উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে। তিনি বলিলেন: "ভারতের নরনারী! এই আমার শেষ বাণী। যদি দুঃখ ক্লেশ, নির্যাতনে স্বরাজলাভ কবিতে চান তো এই সুবর্ণ সুযোগ,—জয় আমাদের সুনিশ্চিত"।

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে সুভাষচন্দ্রও তখন তাঁহাদের বাড়ীতে নীচের বারান্দায় বসিয়া চা খাইতেছিলেন। পুলিশ একই সময়ে এই দুই জায়গায় অভিযান চালায়। চা খাইতে খাইতে সুভাষচন্দ্র খবর পাইলেন, পুলিশ আসিয়াছে।

চায়ের কাপ রাখিয়া সুভাষচন্দ্র পুলিশকে অভ্যর্থনা জানাইলেন, আসুন। আমাকে য়্যারেস্ট করবেন তো?

সার্জেণ্ট জানাইল,—ওয়ারেণ্টে অবশ্য তাহাই লেখা আছে।

দেশবন্ধুর কোন জিজ্ঞসা করিলেন সুভাষচন্দ্র।

তাকেও য়্যারেস্ট করতে গেছে।

বেদনা নয়,—আলোকিত হইয়া উঠিল সুভাষচন্দ্রের মুখমণ্ডল। ভাবিতে লাগিলেন, জেলে একসঙ্গে থাকিতে পারিবেন গুরু আর শিষ্য, মন প্রাণ ঢালিয়া সেবা করিতে পারিবেন দেশবন্ধুকে।—ভাবিতে ভাবিতে সার্জেণ্টকে বলিলেন, চলুন, নিয়ে চলুন। গোটা দেশটাই তো একটা জেলখানা। কিন্তু না,—এ জেলখানার বাইরে যেতেই হবে। সেখান থেকেই হানতে হবে আঘাত, আনতে হবে অস্ত্রসম্ভার।

১০ই ডিসেম্বর য়্যারেস্ট করিয়া দেশবন্ধুকে প্রেসিডেন্সী জেলে রাখা হইয়াছিল। ইহার দুই দিন পরে ডেপুটি কমিশনার মিঃ কিড্ তাঁহার নিকট

উপস্থিত হইলে দেশবন্ধু ওয়ারেণ্টখানা দেখিতে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহাকে ওয়ারেণ্টের মূলে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। মিঃ কিড তাই বলিল, ফৌঃ ৫৪ ধারায় সন্দেহমূলকভাবে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শুনিয়া চিত্তরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "cognizabble case" হলে ৫৪ ধারা প্রযুক্ত হয়। ভলাণ্টিয়ার আইনের জন্য তো নয়? আচ্ছা আমি প্রাক্‌টিস্ ছেড়েছি পর কি আইনের পরিবর্তন হয়েছে?

ইহার কোন সন্তোষজনক জবাব না দিতে পারিয়া মিঃ কিড চলিয়া আসিল এবং ঐ দিনই ১২ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৫টার সময় দেশবন্ধুকে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করান হয়।

দেশবন্ধুর গ্রেপ্তারের সংবাদে সারা বাংলায় প্রবল উত্তেজনা। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম অবস্থা হইতে সারা ভারতের তুলনায় বাংলার আন্দোলনই সব প্রদেশকে ছাপাইয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। উল্লেখ করিলে ইহা অপ্রাসঙ্গিক না হইয়া বরং গর্বের বিষয়ই হইবে যে, বাংলাদেশে তখন ১৬ হাজারের মত স্বেচ্ছাসেবক কারাবরণ করিয়াছিলেন। সেদিন তাহারা উহাকে তীর্থযাত্রা মনে করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনের মধ্যমণি দেশবন্ধু! তিনিই হইলেন য়্যারেস্টেড্। সুতরাং আন্দোলনের তীব্রতা আর উত্তেজনার গভীরতাও গভীরতর হইতে লাগিল।

ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল তখন লর্ড রিডিং। কলিকাতার এই উত্তপ্ত অবস্থায় তিনি কলিকাতা আসেন কারণ যুবরাজের কলিকাতা আগমন উপলক্ষ্যে যাহাতে এখানে হরতাল না হয় সেই উদ্দেশ্যে তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গে কথা বলিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু তখন কারা-প্রাচীরের অন্তরালে। বাংলার কারাপ্রাচীরের অন্তরালে ছিল তখন আরো হাজার হাজার তরুণ, হাজার হাজার ছাত্র, স্বেচ্ছাসেবক আর ছিলেন নেতৃবৃন্দ।

আলিপুর জেলে দেশবন্ধুর সঙ্গে গভর্ণর জেনারেল লর্ড রিডিংয়ের সাক্ষাৎ-কার হয়। এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। বলা যায়, জেলের মধ্যে একটি আলোচনাসভা। অন্যান্য নেতৃবৃন্দও উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ছিলেন মৌলানা আক্রাম খাঁ, মৌলানা আজাদ প্রভৃতি। আলোচনা শেষে সুফলই পাওয়া গেল। দেশবন্ধু যাহা বলিয়াছিলেন লর্ড রিডিং তাহা মানিয়া লইয়াছিলেন কিন্তু অসুবিধার সৃষ্টি

হইল একটি বিষয়ে। তিনি গান্ধীজীকে অমান্য করিয়া, তাঁহার প্রাধান্যকে ক্ষুণ্ণ করিতে চাহিলেন না। উহাতে অবশ্য চিত্তরঞ্জনের একনিষ্ঠতা ও আনুগত্যেরই প্রমাণ পাওয়া গেল, প্রমাণ পাওয়া গেল, সময় ও সুযোগ হাতে পাইয়াও তিনি নিজের ক্ষমতা প্রকাশ না করিয়া কংগ্রেসের যিনি তখনকার কর্ণধার, একান্ত অনুগতের মত তাঁহার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন। যখন সন্ধি করিবার কথা উঠিল তখন দেশবন্ধু গভর্ণর জেনারেল-কে বলিলেন যে, তিনি তো সন্ধি করিতে পারেন না। সর্বভারতীয় আন্দোলনের যিনি নেতা, যিনি উহার কর্ণধার সেই মহাত্মা গান্ধীজীই একমাত্র সন্ধি করিতে পারেন।—তিনি পারেন না।

গান্ধীজী তখন আমেদাবাদ সবরমতী আশ্রমে ছিলেন। তাঁহার নিকট প্রকৃত ঘটনা জানাইয়া টেলিগ্রাম করা হইল। গান্ধীজী তাহার বিচার বিবেচনা শেষ করিয়া উত্তর দিলেন, "Compromise possible and withdrawal of movement agreed if the Ali brothers are released and date and composition of the Round Table Conference announced now."

লর্ড রিডিং আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে জেল হইতে মুক্তি দিতে পারিতেন, সে ক্ষমতা তাহার ছিল কিন্তু Round Table Confernce-এর দিন-তারিখ, স্থান-কাল সম্বন্ধে তিনি তখন কিছু বলিতে পারিলেন না। সুতরাং আলোচনা যতটুকু অগ্রসর হইয়া সমাধানের মুখে আসিয়াছিল তাহা আবার চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যথাস্থানে গিয়া রহিল।

সুতরাং হরতাল বন্ধ করিবার জন্য গভর্ণর জেনারেল লর্ড রিডিংয়ের এই চেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল।

ওদিকে দিন চলিয়া যাইতেছে। দেশবন্ধুকে একদিন আদালতে হাজির না করাইয়া ব্যাঙ্কসাল স্ট্রীটের কোর্টের একটি ভিন্নঘরে নিয়া বসাইয়া রাখা হইল। জনসাধারণ ইহা জানিতে পারিয়াছিল এবং তাহারা দেশবন্ধুকে দেখিবার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব। দল বাঁধিয়া সকলেই গিয়া সেখানে উপস্থিত হইলে পুলিশ জনতা সরাইয়া দিবার সময় অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটিয়াছিল। এই ঘটনার জন্যই ২০শে ডিসেম্বর সিভিল জেলে দেশবন্ধুর বিচার আরম্ভ হয়। এখানে জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ এমন কি খবরের কাগজের প্রতিনিধি

গণকেও প্রবেশ করিবার অনুমতি দেওয়া হয় না। দেশবন্ধু তাই প্রথমেই ম্যাজিস্ট্রেটকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "Is this a public Trial or Trial in camera ?

Magistrate : It is a public Trial.

Deshbandhu : How is it that you do not allow members of the Bar to attend.

দেশবন্ধুর এই কথার কোন উত্তর ম্যাজিস্ট্রেট দিতে পারে নাই। কিন্তু ২১ তারিখের পর হইতে প্রকাশ্য আদালতে দেশবন্ধুর বিচার হইবার আদেশ হয়।

দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য তখন ভালো চলিতেছিল না। জ্বর হইয়াছিল। তাহা কমিলে দেখা গেল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৈকালের দিকে আবার জ্বর আসিতে শুরু করিল। সেই সঙ্গে হাতে-পায়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা।

৬ই ফেব্রুয়ারী ব্যাঙ্কসাল স্ট্রীটে চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে চিত্তরঞ্জনের বিচার আরম্ভ হয় ভারতের বিখ্যাত আইনজীবী দেশবন্ধু,—তাঁহার বিচার। আদালতের প্রাঙ্গণে কলিকাতা মহানগরী ভাঙ্গিয়া পড়িল; মানুষের ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিল মফঃস্বল হইতেও। ইহাকেই বলে জীবনের পরিহাস। যে-দেশপ্রেমিক দেশবন্ধু জীবনের বহু বৎসর বীর-বিপ্লবীদের ফাঁসির মঞ্চ আর কারাগারের যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আদালতে দাঁড়াইয়া অপূর্ব যুক্তি তর্ক আর নজির উদ্ধৃত করিয়া সওয়াল জবাবে সকলকে অবাক্ বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছেন তিনি সেদিন নীরব। কবির বীণা স্তব্ধ। ব্যারিস্টারের আইনের ধারে মার্জিত সওয়াল-জবাবের তীক্ষ্ণ বাণ তূণে আবদ্ধ রাখিয়া তিনি তখন আসামীর কাঠগড়ায়। কিন্তু এ-আসামী কি আদালতের আসামী? চিত্তরঞ্জন যখন আদালতে প্রবেশ করিয়া কাঠ-গড়ার দিকে যাইতেছিলেন তখন উপস্থিত জনমণ্ডলী তাঁহাকে সম্মান দেখাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। সরকারের পক্ষে যাহারা আইনজীবী দাঁড়াইয়াছিল তাহারা হইল ডি, সিলভা এবং তারকনাথ সাধুখাঁ। দেশবন্ধুর কিছু বলিবার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাইলেন, "I do not desire to participate in the proceedings of the Court nor do I want to make any statement because I have got nothing to state

before your Lordship."

১৪ই ফেব্রুয়ারী। দেশবন্ধুর বিচারের 'রায়' প্রকাশের দিন। সেদিনও আদালতের কক্ষ লোকে লোকারণ্য। এই জনতার মধ্যে ছিলেন যতীন্দ্র-মোহন সেনগুপ্ত, অসুস্থ শরীরে হরদয়াল নাগ, সুরেন্দ্রনাথ হালদার, নিশীথ সেন প্রভৃতি। যথাসময়ে তুষারশুভ্র খদ্দরের পোশাক পরিহিত দেশবন্ধু আসিয়া নিজের স্থানে দাঁড়াইলেন। কিছুদিন যাবৎ-ই তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল। তথাপি এক স্নিগ্ধতায় তাঁহার মুখখানি উদ্ভাসিত, উজ্জ্বল আয়ত চক্ষু দুইটিতে হাসি-মাখা।

সুইনহো জিজ্ঞাসা করিলেন, Do you wish to say anything, Mr. Das ?

দেশবন্ধুর সেই উত্তর, No, thanks.

সুইনহো কি যেন লিখিলেন। লেখা শেষে তাহার ইণ্টার প্রেটারকে ডাকিয়া দুই একটি কথা ! তারপরেই তাহার 'রায়'—দেশবন্ধুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আপনার বিনাশ্রমে ছয় মাসের কারাদণ্ড।

দেশবন্ধু দণ্ডভোগ করিলেন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। সুভাষচন্দ্রেরও ছয়মাস জেল হইয়াছিল। তাঁহাকেও আনা হইয়াছিল আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলেই। সুভাষচন্দ্র চাহিয়াছিলেন গুরু শিষ্য একই জায়গায় থাকিবেন। হইলও তাহাই। দেশবন্ধু যাইবার পূর্বেই সুভাষচন্দ্র সেখানে গিয়া পৌঁছিয়া-ছিলেন।

জেলে যে ঘরখানিতে দেশবন্ধু ছিলেন, স্বাস্থ্যের পক্ষে তাহা মোটেই উপযুক্ত ছিল না।—আর আশা করাও তো অন্যায়—জেলখানা যে! বায়ু চলাচল করিত না, আলোও তেমন আসিত না। অসুস্থ শরীর দেশবন্ধুর, সেখানে গিয়া উহা আরও বৃদ্ধি পাইল। শরীরে বেদনা, সামান্য সামান্য জ্বর। অবশেষে সরকারী ইস্তাহারে দেখা গেল, দেশবন্ধুর ভগ্নিপতি 'হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ ডি. এন. রায়ের উপর দেশবন্ধুর চিকিৎসার ভার অর্পিত হইয়াছে এবং তাহার খাওয়ার সব ব্যবস্থা তাঁহার বাড়ী হইতেই করা হইবে। জানা গিয়াছে যে, এই চিকিৎসা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন স্যর আবদুর রহিম।

দেশবন্ধুর কারাজীবনে সমগ্র দেশ শোকে মুহ্যমান। বহুলোক, বহুনেতা

ইহাতে সমবেদনা জানাইয়াছেন। কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের লেখা বাসন্তী দেবীর নিকট চিঠিখানি। তিনি লিখিযাছিলেন :

প্রিয় ভগ্নি, আমার যে প্রবল ভাবাবেগ হইযাছে, তাহা আমি প্রকাশ করিতে অক্ষম।

আপনার স্বামী যখন সেই ইতিহাস স্মরণীয মোকদ্দমায় শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেন, সেই দিন হইতেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অশেষ বদান্যতা, স্বদেশপ্রেম, মহান আদর্শবাদ, দীন দরিদ্রের পক্ষ সমর্থনের জন্য তাঁহার অসীম আগ্রহ, সর্বদাই লোকের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। যদিও কোন কোন বিষযে তাঁহার সঙ্গে আমার মতের পার্থক্য আছে, তবুও চিরদিনই তাঁহার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিযাছি। তিনি বাংলা দেশ বা তরুণ ভারতের চিত্ত অধিকার করিবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। রাজনীতিতে তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের মতভেদ আছে, তাঁহারাও তাঁহার (চিত্ত-রঞ্জনের) অপূর্ব স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের প্রশংসা না করিযা থাকিতে পারেন না। শ্রীযুক্ত দাশের এই অগ্নিপরীক্ষার দিনে তাঁহার প্রতি স্বতঃই আমাদের চিত্ত ধাবিত হইতেছে। আমি জানি, আমার মত বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত দাশের জীবনের ব্রত সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারিবে না, কেন না লোক সমাজে ও ঘটনার স্রোত হইতে সর্বদাই আমি দূরে বাস করি। চিরজীবন একান্তভাবে বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলে আমার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, মনের প্রসার বোধহয় সঙ্কুচিত হইয়াছে। কিন্তু প্রিয ভগ্নি, আমি আপনাকে নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে যখন আমি বিজ্ঞান-চর্চা করি, তখন বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া দেশকেই সেবা করি। আমাদের লক্ষ্য একই, ভগবান জানেন। আমার জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

আপনি আপনার দুঃখ, অপূর্ব সাহস আনন্দের সঙ্গে বহন করিতেছেন। বাংলার সম্মুখে নারীত্বের যে উচ্চ আদর্শ আপনি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সেই অতীত রাজপুত গৌরবের যুগকেই স্মরণ করাইযা দেয। আমি মনে প্রাণে আশা করি যে কৃষ্ণমেঘ আমাদের মাতৃভূমির ললাট আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা শীঘ্রই অপসারিত হইবে এবং আপনার স্বামীকে আমরা ফিরিয়া পাইব।

ভবদীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

জেলে দেশবন্ধুকে প্রথমে যে ঘরে রাখা হইয়াছিল সেখানে তেমন আলো বাতাস ছিল না। কিন্তু পরে তাঁহাকে ১নং হাজতের উপর তলার ঘরে স্থানান্তরিত করা হয়। সে ঘরখানি বৃহদাকার এবং পূর্বঘর অপেক্ষা আলো-বাতাস যুক্ত। এ-ঘরে আসিয়া তাঁহার শরীরও পূর্বাপেক্ষা ভালো হইতে থাকে তবে রোগ মুক্ত হইলেন না। মাঝে মাঝেই জ্বর হইত।

কিন্তু ভালো ঘর কি মন্দ ঘর সে-বিষয়ে দেশবন্ধুর কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। কারণ, প্রথম যখন তাঁহাকে সেণ্ট্রাল জেলে আনা হইয়াছিল জেলার সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, How do you like to be classed Mr. Das ?

Deshbandhu : I can't follow you.

Jailor : Do you like to be classed as an European class prisoner ?

Deshbandhu : No, thanks, as an Indian here and simple.

জেলের মধ্যে দেশবন্ধুর সেবা ও শুশ্রূষার জন্য ছিলেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র আর ছিলেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। দেশবন্ধুর সে সময়টা কাটিয়াছিল কখনও হাসি-গল্পে কখনও নিজের লেখায়। একদিন জেলে সকলের বিচার সম্বন্ধে কথা উঠিল। সুভাষচন্দ্র ছয় মাসের জেল শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া বলিয়াছিলেন, "only six months" ? দেশবন্ধু সরকারের বিচার বিভাগের যে কি প্রহসন তাহা সকলকে আবার নূতন করিয়া বলিলেন। তিনটি Message দেশবন্ধুর হাতের লেখা বলিয়া আদালতে হস্তাক্ষর বিশারদ দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ঐ Message তিনটি যদিও দেশবন্ধুরই কিন্তু একটি বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের হাতের লেখা, একটি হেমেন্দ্রের এবং অপরটি অন্য একজনের।

আবার লেখায় যখন মন দিতেন তখন দুনিয়ার সব কিছু তাঁহার চোখ হইতে মুছিয়া যাইত। এক মনে লিখিতেন। শরীর সুস্থ থাকিলে সকাল প্রায় ১২টা পর্যন্ত। তিনি একটি বৃহৎ কাজে হাত দেন। "জাতীয়তার ইতিহাস" রচনায় তিনি মনোনিবেশ করিয়াছিলেন কিন্তু সে মহা ইতিহাস লেখা শেষ করিতে পারেন নাই। কারণ জেল হইতে বাহির হইয়াই রাজনীতির আবর্তে জড়িত থাকায় সময় পাইতেন না। তাই তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন, "আবার জেলে না গেলে সে বই হবে না।" জেলে থাকিতে শুধু লেখা নয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং দার্শনিক বহু বই আনিয়া তিনি উহা গভীর

মনযোগ সহকারে পড়িতেন।

দেশবন্ধু যখন কারাবাসে তখনই তিনি আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। সশরীরে সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সভাপতিত্ব করা অসম্ভব। বাসন্তী দেবীও তখন রাজনীতিতে পরিপূর্ণভাবে অবতীর্ণ হইয়া বাংলাদেশের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং দেশবন্ধু তাঁহার সভাপতির ভাষণটি উর্মিলা দেবীর হাতে পাঠাইয়া দিলেন।

অধিবেশনে নির্ধারিত সভাপতি দেশবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন হাকিম আজমল খাঁ। আর দেশবন্ধুর লিখিত অভিভাষণটি পাঠ করিয়াছিলেন সরোজিনী নাইডু।

অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে বিষয়বস্তু ও সুরে নূতনত্ব ছিল। গান্ধীজী এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আনিবেন কথা দিয়াছিলেন কিন্তু সে নির্ধারিত সময় শেষ হইতে তখন চলিয়াছে তাই স্বরাজ লাভের কোন লক্ষণ না দেখার সুর তাঁহার বক্তৃতায় ছিল।

তবুও আমেদাবাদ কংগ্রেসের যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাহা হইতেছে, আইন অমান্য আন্দোলন। এই আন্দোলন পরিচালনা করিবার সর্বক্ষমতা দেওয়া হয় মহাত্মা গান্ধীজীকে। স্থির হয় যে, বারদৌলিতে প্রথম সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবে। ইহারই সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য গান্ধীজী ফেব্রুয়ারী মাসে বারদৌলিতে একটি জনসভায় সেখানে সমস্ত অধিবাসীগণকে সত্য এবং অহিংস সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া এবং ঐ মহান পথে চলিলে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পথ ত্বরান্বিত হইবে ইহাই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

গান্ধীজী তাঁহার এই আন্দোলনের কথা গভর্ণর জেনারেল লর্ড রিডিং-কে এক পত্রযোগে জানাইয়া দিলেন। এই সংবাদ কারাবাসী দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির কাছে আসিয়া পৌছিলে তাঁহারা নূতন আশায় বুক বাঁধিলেন,—এইবার তাহা হইলে সত্য সত্যই গান্ধীজী যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন,—দেশ প্রবল আন্দোলনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, স্বরাজ আগত ঐ।

কিন্তু ভবিষ্যৎ অন্ধকারের গর্ভে। আন্দোলন আরম্ভ হইবার পুর্বে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যে মূল আন্দোলনের ধারা পরিবর্তিত হইয়া গেল। ভারতের সর্বত্রই তখন কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক দল ছিল। তাহাদের পরি-

চালনায় গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরাতে কিছু সংখ্যক উত্তেজিত কৃষক থানা আক্রমণ করিয়া কয়েকজন পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করে।

গান্ধীজী তখন বারদৌলিতে ছিলেন। তিনি সেখানে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটি জরুরী বৈঠক আহ্বান করিলেন। গান্ধীজী এই হিংসা নীতিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং বুঝিলেন যে, কোন প্রকার আন্দোলন তখন দেশে চলিতে পারে না। তাঁহার এই ব্যক্তিগত অভিমত অনুসারেই বারদৌলিতে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ঐ সিদ্ধান্তই ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে "বারদৌলি প্রস্তাব" নামে অভিহিত। এই প্রস্তাব অনুসারেই গান্ধীজী, অসহযোগ, আইন-অমান্য, সত্যাগ্রহ সমস্ত আন্দোলন অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করিয়া রাখেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী বারদৌলিতে এই ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব পরে যথানিয়মে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে পাশ করাইয়া লওয়া হয়। কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল প্রচণ্ডভাবে। সর্বভারতীয় নেতাদের মুখেও ইহার বিরূপ সমালোচনা শোনা গেল। বাংলাদেশের তো কথাই নাই। যাহারা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে ছিলেন তাঁহারা যেমন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন তেমনি যাহারা বাহিরে ছিলেন তাহারাও বিরূপ হইয়া উঠিলেন কারণ বাংলার স্বেচ্ছাসেবকগণ তখন মনে-প্রাণে তৈয়ার হইয়া কার্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। কি অনুশীলন কি যুগান্তর উভয় দলের বিপ্লবী তরুণগণ আন্দোলনের ঐ পর্যায়ে পৌছিয়া হঠাৎ তাহা সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় গান্ধীজীর যে যুক্তি ও মতবাদ তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কারণ বাংলা দেশের স্বেচ্ছাসেবকগণের কার্য-কলাপে সরকার এমন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সরকারের তখন একরূপ অচল অবস্থা বলা যায়।

কারাপ্রাচীরের অন্তরালে দেশবন্ধু বিচলিত হইলেন সব চাইতে বেশী। এই আন্দোলন প্রত্যাহার করা লইয়া জেলের মধ্যে একদিন একটি আলোচনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই আন্দোলন প্রত্যাহার করা বাংলা দেশের পক্ষে ভালো কি মন্দ হইল এ প্রশ্ন সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুকে সেদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু যে কতখানি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার উত্তরের মধ্যেই বুঝিতে পারা গেল এবং বাংলা দেশের পক্ষে উহা হিতকর কি অহিতকর তাহাও পরিষ্কার বুঝিতে পারা গেল। তিনি বলিয়াছিলেন

যে, "বাংলাদেশের কর্মীদের প্রাণে যতখানি কর্মস্পৃহা জন্মিয়াছিল এই আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে তাহা ততোধিক পশ্চাদপদ হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া আন্দোলন বা স্বরাজ লাভ করিবার জন্য এই সমস্ত কাজে চৌরীচৌরার মত দুই একটি ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু বাংলার কথা আলাদা, সেখানে আন্দোলন বন্ধ হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? বাংলা দেশে তো কোন ঘটনা ঘটে নাই।"

সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর উত্তর শুনিয়াছিলেন। যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শুনিয়াছিলেন আর তাঁহার মুখের রেখায় যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা তিনি শুনিতে না পারিলেও পাঠ করিতে পারিয়াছিলেন। পরে সুভাষচন্দ্র ঠিক ঐ মুহূর্তের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন: "Deshabandhu was beside himself with sorrow and anger at the way Mahatma was repeatedly bungling. The Bardoli retreat came as a staggering blow".

পণ্ডিত জহরলাল তাঁহার আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন: "We were angry when we learnt of this stoppage of our struggle at a time when we seemed to be consolidating our position and advancing on all fronts."

দেশবন্ধু আরও বলিয়াছিলেন, "গান্ধীজী ইংরাজের সঙ্গে হাত মেলাতেও দিলেন না আবার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতেও দেবেন না।"

কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস আর কাহাকে বলে! ইচ্ছা করিয়াই হউক বা ভুলবশতঃই হউক গান্ধীজীর এমন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে ইংরাজের উপকারই সাধিত হইয়াছে। তথাপি উপকারীকেও কৃতজ্ঞতাবশতঃ ইংরাজ সরকার বাহিরে রাখিল না। সরকার ১৯২২ খ্রীঃ অঃ ১০ই মার্চ গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনকে স্তব্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিল। বিচারে গান্ধীজীর শাস্তি হয় দীর্ঘ দিনের কারাবাস, ছয় বৎসর! অর্ধযুগ!!

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে দেশবন্ধুর যে-জীবন ইংরাজ কর্তৃক আলিপুর জেলে বন্দীজীবনে পরিণত হইয়াছে, দেশবন্ধু আবার উহাকে অগ্রাহ্য করিয়া সে-জীবনকে সাহিত্য-জীবনে পরিণত করিয়াছেন। ভারতীয় জীবনের

ক্রমবিকাশের যে তুলনামূলক ইতিহাস লিখিতেছিলেন তাহা সমাপ্ত হইলে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হইত সন্দেহ নাই। এ-প্রসঙ্গে তাঁহার অন্যতম প্রধান জীবনীকার এবং রাজনৈতিক জীবনের দীর্ঘ দিনের সঙ্গী ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলিয়াছেন, "যাহা লিখিতেন, আমাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন। যাহা শুনিয়াছি, ইংরাজীতে এমন উপাদেয় জিনিস কখনও শুনি নাই।"

এ-প্রসঙ্গে আবার ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের নিকট জেল হইতে সুভাষচন্দ্রের censored and passed 3. 3 26. তারিখের লিখিত একখানি বৃহদাকার পত্রের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হইল: "কারাগারে দেশবন্ধু অধিকাংশ সময়ে অধ্যয়নে নিরত থাকিতেন। ভারতের জাতীয়তা সম্বন্ধে পুস্তক লিখিবার অভিপ্রায়ে তিনি রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক অনেক নূতন নূতন পুস্তক আনাইয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়া তিনি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু সময়ের সঙ্কীর্ণতার দরুন তিনি জেলখানায় থাকিতে পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে পুনর্বার কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইল বলিয়া তিনি জীবদ্দশায় তাঁহার আরব্ধ কাজ শেষ করিতে পারেন নাই। সে-সময়ে রাজনীতি ও জাতীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার অনেক আলোচনা হইয়াছিল। তিনি কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি ধর্মনীতি—জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই মতের অনুকরণ বা অনুসরণ পছন্দ করিতেন না।"

আবার জেলজীবনে তিনি যে শুধু সাহিত্য চর্চা করিয়াই দিন কাটাইয়াছেন তাহাও নহে। তাঁহার মনের কর্মশালায় কত রকম ভাবনা যে আসিয়া ভিড় জমাইয়াছে তাহারও ইয়ত্তা নাই। গান্ধীজীকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে অথচ ইহার প্রতিবাদে দেশের বুকে উদ্বেলিত ঢেউ না উঠিয়া সর্বত্রই যেন কেমন একটা নিস্তেজ ভাব পরিলক্ষিত হইল। কোথাও কোন উত্তেজনা বা প্রজ্বলিত বহ্নিকণা দৃষ্ট হইল না। কিন্তু উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন দেশবন্ধু। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইহার পরে কংগ্রেসের কি করণীয় সে-কর্তব্য সম্বন্ধে। কখন চিন্তামগ্ন হইয়া থাকিতেন। আবার কখনও সজোরে বলিয়া উঠিতেন, "স্বাধীনতার জলন্ত আগুন জ্বললে আসতেই হবে। পতঙ্গ যখন আগুনে পুড়তে যায়, সে কি মনে করে, আগুন তাহাকে পুড়িয়া মারে? সে সাধনায় স্বরাজলাভ সম্ভব। তারই সাধনা করতে হবে। এই আমার

কাজ, এই আমার সাধনা।"

এমনই ভাবনা-চিন্তা, স্বরাজ লাভের পবিত্র সাধনা আর সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়া দেশবন্ধুর জেল-জীবনের ছয় মাস কাল, দিনের পর দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মুক্তির দুয়ারের দিকে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। দিন আসিয়া পৌঁছিল [১৯২২ খ্রীঃ] ৯ই আগস্ট তারিখে। দিনের আলো নিভিয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ। সন্ধ্যার দুয়ার পার হইয়া রাত হইয়াছে সাড়ে আটটা। এমন সময় মেজর সেলীসবারী আসিয়া দেশবন্ধুর সম্মুখে উপস্থিত। একটু স্মিত হাসি মুখে লইয়া সে বলিল, "Mr. Das, your son is ready with Car, please get yourself ready ; you are released."

শুভ সংবাদ! বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে জেলময় ছড়াইয়া পড়িল। আনন্দের কথা কিন্তু দেশবন্ধু সপারিষদ জেল-জীবনকে এমন সহজ ও মধুর আলোচনাসভা এবং রসঘন-বৈঠকখানায় পরিণত করিয়াছিলেন যে তাঁহার মুক্তিতে শাসমল, জিতেনবাবু, মৌলনা আজাদ, মৌলবী মুজিবর রহমান, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি সকলেই মনে করিলেন, মুক্ত না করিয়া সেলীসবারী যেন দেশবন্ধুকে তখন গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। মুখে তাহাদের হাসি সন্দেহ নাই কিন্তু দেশবন্ধুর সান্নিধ্যলাভে বঞ্চিত হওয়ায় তাহাদের মনের চোখ বিয়োগ ব্যথায় ছলছল্ করিয়া উঠিল।

বাংলাদেশ তখন দেশবন্ধুর একান্ত ভক্ত। সূর্যের আলোয় প্রস্ফুটিত হইয়া সূর্যমুখী যেমন কৃতজ্ঞতায় সূর্যের দিকে তাহার বুকের শত পাপড়ি মেলিয়া এক পবিত্র, অকম্পিত অঞ্জলি ধরিয়া থাকে বাংলার জনগণ, দেশবন্ধুভক্ত অনুরক্তগণ তেমনি এক সংবর্ধনার অঞ্জলি ধরিতে চাহিলেন। ইহার প্রধান উদ্যোক্তা হইলেন নির্মলচন্দ্র চন্দ। কথা উঠিল, রবীন্দ্রনাথ সভাপতি হউন। কিন্তু যথাসময়ে তাঁহার নিকট প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তিনি রাজনীতি ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া দেশবন্ধুর ঐ সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করিতে সম্মত হইলেন না। তখন বলা হইল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে। তিনিও রবীন্দ্রনাথের কথাই বলিলেন এবং নিজে গিয়াও রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু কবি তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার কথা বলিলে প্রফুল্লচন্দ্রের আর কিছু বলিবার রহিল না। তখন প্রফুল্লচন্দ্রই সভাপতি হইলেন।

সংবর্ধনা সভার উদ্যোক্তাগণ তখন নূতন উৎসাহে আবার কার্য আরম্ভ করিলেন। অভিনন্দন পত্র লেখার জন্য বলা হইয়াছিল পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। ভালো হইল অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের লেখাখানা।

প্রথম সংবর্ধনাসভা হয় ১৩২৯ সালের ২৬শে শ্রাবণ, শুক্রবার দক্ষিণ কলিকাতায় ভবানীপুর হরিশ পার্কে। সভাপতিত্ব করিলেন বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। দেশবন্ধু যখন সভায় আসিলেন—অপূর্ব শান্ত সৌম্য মূর্তি তাঁহার। তুষারশুভ্র খদ্দরের ধুতি আর চাদর। পায়ে চটিজুতা।—চারিদিক হইতে সহস্র সহস্র কণ্ঠে জয়ধ্বনি, 'দেশবন্ধু কি জয়'! এই জয়ধ্বনির পর সকলের না-বলা কথার বাণীরূপ যাহা শরৎচন্দ্রের কলমে ছন্দ-বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা ভাব-গম্ভীর পরিবেশে পঠিত হইল :

শ্রদ্ধাস্পদ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের শ্রীকরকমলে—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন!

হে বন্ধু, তোমার স্বদেশবাসী আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। মুক্তি পথযাত্রী যত নর-নারী যে যেখানে যত লাঞ্ছনা, যত দুঃখ, যত নির্যাতন সহ্য করিয়াছে, হে প্রিয়, তোমার মধ্যে আজ আমরা তাহাদের সমস্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া সগৌরবে সবিস্ময়ে নমস্কার করি। সুজলা, সুফলা শ্যামলা মা আমাদের অবমানিতা শৃঙ্খলিতা। মাতার শৃঙ্খলভার যত সন্তান তাঁহার স্বেচ্ছায় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে, তুমি তাহাদের অগ্রজ; হে বরেণ্য, তোমার সেই সকল খ্যাত ও অখ্যাত ভ্রাতা ও ভগিনিগণের উদ্দেশ্যে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত সমস্ত দেশের প্রীতি শ্রদ্ধার অঞ্জলি গ্রহণ কর।

একদিন দেশের লোক তোমাকে ক্ষুধিত ও পীড়িতের আশ্রয় বলিয়া জানিয়াছিল, সেদিন সে ভুল করে নাই। কিন্তু যে কথা তুমি নিজে চিরদিন গোপন করিয়াছ,—দাতা ও গ্রহীতার সেই নিভৃত করুণ-সম্বন্ধ আজো সে তেমনই গোপন শুধু তোমার জন্যই থাক। কিন্তু আর একদিন এই বাংলা দেশে তোমাকে ভাবুক বলিয়া কবি বলিয়া, বরণ করিয়াছিল। সে দিনও সে ভুল করে নাই। সেদিন এই বাংলার নিগূঢ় মর্মস্থানটি উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিতে, তাহার একান্ত সঞ্চিত অন্তর-বাণীটি নিরন্তর কান পাতিয়া শুনিতে, তাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়া লইতে তোমার একাগ্র

সাধনার অবধি ছিল না। তখন হয়তো তোমার সকল কথা বঙ্গের ঘরে ঘরে গিয়া পৌছায় নাই, হয়ত কাহারো রুদ্ধদ্বারে ঘা খাইয়া সে ফিরিয়াছে, কিন্তু পথ যেখানে মুক্ত ছিল, সেখানে সে কিছুতেই ব্যর্থ হইতে পায় নাই।

তাহার পরে একদিন মাতার কঠিনতম আদেশ তোমার প্রতি পৌছিল। সেদিন দেশের কাছে স্বাধীনতার সত্যকার মূল্য নির্দেশ করিয়া দিতে সর্বস্বপণে তোমাকে পথে বাহির হইতে হইল, সেদিন তুমি দ্বিধা কর নাই। বীর তুমি, দাতা তুমি, কবি তুমি—তোমার ভয় নাই, তোমার মোহ নাই, —তুমি নির্লোভ, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। রাজা তোমাকে বাঁধিতে পারে না, স্বার্থ তোমাকে ভুলাইতে পারে না, সংসার তোমার কাছে হার মানিয়াছে। বিশ্বের ভাগ্যবিধাতা তাই তোমার কাছেই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বলি গ্রহণ করিলেন; তোমাকেই সর্বলোকচক্ষুর সাক্ষাতে দেশের স্বাধীনতার মূল্য প্রমাণ করিয়া দিতে হইল। যে কথা তুমি বার বার বলিয়াছ—স্বাধীনতার জন্য বুকের জালা কি, তাহা তোমাকেই সকল সংশয়ের অতীত করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইল। বুঝাইতে হইল—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

এই ত তোমার ব্যথা। এই ত তোমার দান।

ছলনা তুমি জান না, মিথ্যা তুমি বল না, নিজের তরে কোথাও কিছু লুকাইতে তুমি পার না,—তাই বাংলা যখন তোমাকে 'বন্ধু' বলিয়া আলিঙ্গন করিল, তখন সে ভুল করিল না, তাহার নিঃসঙ্কোচ নির্ভরতার কোথাও লেশমাত্র দাগ লাগিল না।

আপনার বলিয়া, স্বার্থ বলিয়া কিছু তোমার নাই। সমস্ত স্বদেশ, তাইত আজ তোমার করতলে। তাইত,—তোমার ত্যাগ আজ শুধু তোমার নয়, আমাদের। শুধু বাঙালীকে নয়, তোমার প্রায়শ্চিত্ত আজ বিহারী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটি যে যেখানে আছে সকলকে নিষ্পাপ করিয়াছে।

তোমার দান আমাদের জাতীয় সম্পত্তি—এ ঐশ্বর্য বিশ্বের ভাণ্ডারে আজ সমস্ত মানবজাতির জন্য অক্ষয় হইয়া রহিল। এমনি করিয়াই মানবজীবনের দেনা-পাওনার পরিশোধ হয়, এমনি করিয়াই যুগে যুগে মানবাত্মা পশুশক্তিকে অতিক্রম করিয়া চলে।

একদিন নশ্বর দেহ তোমার পঞ্চভূতে মিলাইবে। কিন্তু যত দিন সংসারে অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের, সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের, অধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তির

বিরোধ শান্ত হইয়া না আসিবে, ততদিন অবমানিত, উপদ্রুত মানবজাতি সর্বদেশে, সর্বকালে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমার এই সুকঠোর প্রতিবাদ মাথায় করিয়া বহিবে এবং কোনমতে কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকাটা যে অনুক্ষণ শুধু বাঁচাকেই ধিক্কার দেওয়া, এ সত্য কোন দিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

জীবনতত্ত্বের এই অমোঘবাণী স্বদেশে বিদেশে, দিকে দিকে উদ্ভাসিত করিবার গুরুভার বিধাতা স্বহস্তে যাহাকে অর্পণ করিয়াছেন তাঁহার কারাবসানের তুচ্ছতাকে উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া আমরা উল্লাস করিতে আসি নাই। হে চিত্তরঞ্জন, তুমি আমাদের ভাই, তুমি আমাদের সুহৃদ, তুমি আমাদের প্রিয়, অনেক দিন পরে তোমাকে কাছে পাইয়াছি। তোমার সকল গর্বের বড় গর্ব বাঙালী তুমি, তাইত সমস্ত বাংলার হৃদয় তোমার কাছে আজ বহিয়া আনিয়াছি, আর আনিয়াছি, বঙ্গজননীর একান্তমনের আশীর্বাদ, তুমি চিরজীবী হও, তুমি জয়যুক্ত হও।

তোমার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসীগণ।

মির্জাপুর পার্ক ছিল তখনকার দিনের একটি যজ্ঞপীঠ। সমস্ত সভা-সমিতি সেখানেই অনুষ্ঠিত হইত। কারাবাস হইতে মুক্তি পাওয়ার পর দেশবন্ধুকে হরিশ পার্কে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের পরই বাংলা মায়ের তরুণ ছাত্র সন্তানগণ তাহাদের প্রাণের প্রিয় দেশবন্ধুকে বরণ করিলেন। নেতৃবৃন্দের মধ্যে সুভাষচন্দ্রও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেদিনকার দেশবন্ধুর যে একখানি অপূর্ব মূর্তি লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা কি মূর্তি, কেমন মূর্তি উহা বর্ণনা করা কলমের অসাধ্য।—কিছুটা বলা যায়—'চিত্রকরটি হতেম যদি'—তবে রং আর তুলির সাহায্যে চেষ্টা করা যাইত তাঁহার সেই মূর্তি ফুটাইয়া তুলিতে, অথবা বলা যায়, সে একটি মহান দৃশ্য—যাহা শুধু দেখিবার, বর্ণনা করিবার নহে—এমন কি তুলির টানেও সে ভাবগম্ভীর, সে আনন্দ-বিধুর মোহনীয়রূপ ফুটাইয়া তোলা সম্ভব কি না কে জানে। প্রত্যক্ষদর্শী সুভাষচন্দ্র ১৯২৬ সালের ৩রা মার্চ তারিখে একখানি চিঠিতে ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লিখিয়াছেন: কিন্তু একটা ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তাঁহার কারামুক্তির পর কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদানের জন্য সভা করেন। অভিনন্দনপত্রে দেশবন্ধুর গুণগ্রামের উল্লেখ ছিল এবং দেশের জন্য তিনি কিরূপ ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন তাহারও বর্ণনা ছিল।

তরুণের ভক্তি ও ভালবাসার পূর্ণ অর্ঘ্য যখন তাঁহার নিকট নিবেদিত হইল তখন দেশবন্ধুর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি ছিলেন চির নবীন, চির তরুণ; তাই তরুণের বাণী তাঁহার মরমে গিয়া আঘাত করিত। তিনি যখন সভার অভিনন্দন পত্রের উত্তর দিবার জন্য উঠিলেন, তখন তাঁহার অন্তরে ভাবের জোয়ার ছুটিতেছে। নিজের ত্যাগ ও কষ্টের কথা তুচ্ছ করিয়া তিনি বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের ত্যাগের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু বেশী দূর বলিতে পারিলেন না। উচ্ছ্বসিত ভাবরাশি তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল। তিনি নির্বাক নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুই গণ্ড বহিয়া পবিত্র অশ্রু বারি ঝরিতে লাগিল। তরুণের রাজা কাঁদিলেন, তরুণেরাও কাঁদিল।"

কিন্তু অভিনন্দনের আড়ালেও তাঁহার মনের মধ্যে চিন্তা ছিলই তাঁহারা তখন কোন পথে চলিবেন সে-পথের সন্ধান লইয়া। চিন্তা করিয়া চলিয়াছেন। যতই চিন্তা করিয়া চলিয়াছেন, চিন্তার জাল বাড়িতে লাগিল ততই। তাঁহার এইরূপ মানসিক পরিবেশেই কন্যা কল্যাণীর বিবাহ হয়।

দেশ তখন আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত কি-না সে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য ইতিপূর্বেই কংগ্রেস একটি কমিটি গঠন করিয়াছিল। দেশবন্ধু কমিটির সব সভ্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া তাহাদের মতামত জানিবার অভিপ্রায়ে কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে তাহাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করেন। এই সময়েই স্বরাজ্য দলের কাউন্সিলে প্রবেশ সম্বন্ধে দেশবন্ধু পণ্ডিত মতিলালের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছিলেন।

যথাসময়ে কমিটি তাহাদের রিপোর্ট বাহির করিলে দেখা গেল যে, কমিটির অভিমত, দেশ তখনও আইন অমান্য আন্দোলন অভিযানে অবতীর্ণ হওয়ার উপযুক্ত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ বুরোক্রাসীকে ধ্বংস করিবার জন্য দেশবন্ধু যে কাউন্সিলে প্রবেশ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন সে সম্বন্ধেও সকলে একমত হইতে পারেন নাই। গঠিত কমিটির সভাপতি হাকিম আজমল খাঁন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, বিঠলভাই প্যাটেল প্রভৃতি দেশবন্ধুকে সমর্থন করিয়া কাউন্সিলে প্রবেশ করিতে সম্মত হইলেন। আর যাহারা ইহার বিরুদ্ধে মত পোষণ করিলেন তাহারা হইতেছেন চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী, কস্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গার প্রভৃতি। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বাহির হইলে

যখন তিনি এই দ্বিমত জানিতে পারিলেন তখন তিনি ১৯২২খ্রীঃ ৭ই নভেম্বর এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন, "Reformed councils are really a mask which the bureaucracy has put on. I conceive it our clear duty to tear those masks off the face. To end these councils will be the most effective boycott. It is possible to achieve this if we get a majority. If we stand for elections in the beginning of 1923, the results will show that we have proceeded upon facts and not upon assumptions. I am sure of a majority for men of our views :"

২০শে নভেম্বর কংগ্রেস কমিটির সভা বসিল। দেশবন্ধুই ছিলেন উহার সভাপতি। সভার প্রধান আলোচ্য বিষয়-বস্তুই ছিল কাউন্সিলে প্রবেশ করা উচিত কি-না! প্রবল উত্তেজনার মধ্যে আলোচনা হইল। যাহারা দেশবন্ধুর প্রস্তাবকে সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহারা হইলেন বাংলার জে. এম. সেনগুপ্ত এবং বীরেন্দ্রনাথ শাসমল আর অন্যান্য প্রদেশের পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, হাকিম আজমল খাঁন, বিঠলভাই প্যাটেল, এইচ. এস. মুঞ্জে, অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার এবং আম্বালার লালা দুনিচাঁদ প্রভৃতি। যাহারা কাউন্সিলে প্রবেশ সমীচীন নহে বলিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহারা হইলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, সরোজিনী নাইডু, টি প্রকাশম, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডাক্তার আনসারি, মৌলভী আব্বাস তায়েবজী, গঙ্গাধর দেশপাণ্ডে এবং পট্টাভি সীতা-রামাইয়া।

কিন্তু ইহাতেও দেশবন্ধু তাঁহার নিজের মতে এবং পথে অবিচল রহিলেন। অধিকন্তু পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়া তিনি তাঁহার নিজের পথেই পথ করিয়া অপরকেও সেই পথে আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়া চলিলেন।

দেশবন্ধু যখন কারাবাসে ছিলেন তখন চট্টগ্রামে প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে বাসন্তী দেবীকে সভানেত্রী করা হইয়াছিল। সভা-নেত্রীর ভাষণে বাসন্তী দেবী বলিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস এতদিন যে পথে চলিয়াছে এখন তাহার পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়াছে; এতদিন যে অসহ-

যোগিতা করা হইয়াছে তাহাকে এখন স্থানান্তরিত করিয়া আইন সভাতেও পৌঁছাইয়া দেওয়া দরকার।

বাসন্তী দেবীর এই বক্তৃতা শুনিয়া অনেকে মনে করিল যে উহা জেলে আবদ্ধ দেশবন্ধুরই অভিমত বাসন্তী দেবীর মারফতে দেশবাসীর নিকট উপস্থাপিত করা হইয়াছে। অনেকে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন। সমালোচকরা রূঢ়ভাষায় বলিতে লাগিল, জেলে গিয়া দেশবন্ধু ভীত হইয়া পড়িয়াছেন তাই তাঁহার মনের পরিবর্তন করিয়া এইবার ইংরাজের সঙ্গে হাত মিলাইতে চাহিতেছেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এই কাউন্সিলে প্রবেশ বিষয় লইয়া মতদ্বৈধের চিত্র পূর্বেই দেখান হইয়াছে। এবারে বাংলার চিত্রের উপর কিছুটা আলোকপাত করা হইল। এই মত বিরোধ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যাহার ফলে দেশবন্ধুকে ঘরে এবং বাহিরে দীর্ঘদিন বীরের মত যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইয়াছিল। কাউন্সিলে প্রবেশ কেন এবং ইহার প্রয়োজনীয়তা কতখানি রহিয়াছে সে সম্বন্ধে দেশবন্ধুর ধারণা ছিল স্বচ্ছ। এ সম্বন্ধে কারাবাসের সময় তাঁহাকে যে প্রশ্ন করা হইয়াছিল উহা এবং উহার উত্তর পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত উদ্ধৃত করা হইল।

প্রশ্ন: কাউন্সিলে যদি প্রবেশ করা হয় তবে ভারতব্যাপী এই যে অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছে তাহার কি হইবে?

উত্তর: আমরাও সহযোগিতা করিতে যাচ্ছি না আমার ইচ্ছা কাউন্সিলে অংশ গ্রহণ করে বর্তমানের রিফর্মড্ কাউন্সিল ভেঙ্গে দেওয়া। বুরোক্রাসী তখন আরও অসুবিধায় পড়বে।

প্রশ্ন: কাউন্সিলে আমাদের করণীয় কি থাকবে?

উত্তর: আমলাতন্ত্র যাতে কাজ করতে না পারে সেটাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হবে। সকলকে প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দেব যে রিফর্মসে আমাদের কোন মঙ্গল হয় নি, We shall mend or end. আমরা বাধ্য করাব যাতে তাহারা এই শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করে অথবা ইহাকে পরিপূর্ণভাবে বর্জন করে।

প্রশ্ন: ইতিমধ্যেই তো জনসাধারণের জানতে বাকী নাই যে এই শাসন সংস্কার একেবারে বাজে।

উত্তর : জেনেছে সত্য কিন্তু লাভ কি হচ্ছে? আইনও পাশ হয়ে যাচ্ছে, আমাদের ওপর অত্যাচারও চলছে। রোণাল্ডসে আমাকে বলেছেন ইহা নাকি আমরা যাদের প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছি তারাই করেছেন, উহাতে তাহাদের কোন ইচ্ছাও নাই কোন দায়িত্বও নাই। এ অবস্থায় আমাদের দেখাতে হবে উহাদের আমরা পাঠাইনি, উহারা আমাদের প্রতিনিধি নহেন।

প্রশ্ন : আইনসভা যদি আমাদের অধিকারে আসে তবে ইংরাজের নিষ্ঠুর নিপীড়ন বন্ধ হবে কি?

উত্তর : সেটা এখন বলা কঠিন। তবে বর্তমানে ওরা সব কিছুই আইন-সভার কাজ বলে চালিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের কাধে বন্দুক রেখে গুলি ছুঁড়ছে সেটা চলবে না। সেখানে থাকবে দুটো বিরুদ্ধ শক্তি, এক আমলা-তন্ত্র আর এদিকে জনগণের শক্তি। জনগণের শক্তিকে না মেনে আমলা-তন্ত্র কাজ করে চল্‌লে দেশের বুকে অশান্তির জ্বালা ক্রমেই বেড়ে উঠবে, বুরোক্রাসী দেশের জনগণের নিকট অত্যন্ত বিরাগভাজন হবে, তাকে তখন ধ্বংস করতে সহজ হবে।

প্রশ্ন : ইহাকে কি অধর্ম বলা চলে না?

উত্তর : সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের চেয়ে বেশী অধর্ম নিশ্চয়ই নয়।

মাঝখান হইতে অন্য একজন প্রশ্ন করিলেন, সরকার যাহা আমাদিগকে দিয়াছে সেটুকুও যদি তাহারা ফিরাইয়া নেয়।

এই কথা শুনিয়া চিত্তরঞ্জন যেন একটু অবাক ও বিরক্ত হইলেন। বলিলেন : সরকার আমাদের কি দিয়াছে? প্রকৃতপক্ষে কিছুই দেয় নি। তাছাড়া এই আমলাতন্ত্র দেশের কল্যাণের জন্য কোন কাজই কোন দিন করবে-না। আর মন্ত্রীদেরই তারা বিশ্বাস করে কি না সন্দেহ।

প্রশ্ন : ধরুন আপনি আইন সভায় নির্বাচিত হইলেন। তখন কি আপনি চাকরী অর্থাৎ মন্ত্রিত্ব নিতে রাজী হবেন?

উত্তর : কেন মন্ত্রিত্ব নিতে যাবো, তবে তো সহযোগিতা করাই হ'ল। তবে যদি প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন পাই এবং সমস্ত বিভাগ আমাদের অধীনে আসে তাহলে মন্ত্রী হ'তে রাজী আছি।

প্রশ্ন : আপনারা আইন সভায় গেলে কি স্বরাজ লাভ হবে?

উত্তর: যদি সমস্ত আইন সভা আমাদের অধীনে আসে এবং জনসাধারণের ইচ্ছা প্রতিটি কাজে রূপায়িত হয় তবে বৃটিশ পার্লামেণ্ট আমাদের সঙ্গে একটা আপস করবার চেষ্টা করবেই। তখন আর আমাদের সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের দরকার হবে না।

প্রশ্ন: তাহলে কি আপনি সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স পছন্দ করছেন না?

উত্তর: পছন্দ না করলে আর লড়াই করলাম কেন? আমার একান্ত ইচ্ছা আমরা স্বরাজ লাভ করি, আইন অমান্য তারই জন্য। তবে পুনরায় আইন অমান্য করতে হ'লে আমাদের শক্তি সংগ্রহের দরকার। শক্তিশালী হ'লে আমরা যা চাবো আমাদের তা' না দিয়ে পারবে না। সুতরাং জনগণকে তৈরী করে শক্তি সঞ্চয় করাই আমার প্রধান কাজ।

প্রশ্ন: কাউন্সিলে প্রবেশ করলে তো আপনাকে শপথ নিতে হবে।

উত্তর: শপথ গ্রহণ করায় দোষের কি আছে? যারা অসহযোগী তারাও তো পোস্টাপিসের স্ট্যাম্প বা অন্য সব রকম স্ট্যাম্প ব্যবহার করছেন। আমরা কি চাই?—আমরা ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট বা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছি না—আমরা চাই আমলাতন্ত্রের ধ্বংস করে অথবা পরিবর্তন করে দেশের কল্যাণ সাধন করতে।

প্রশ্ন: এটা আপনার অত্যন্ত নরম সুর। চরমপন্থীগণ চায় পূর্ণ স্বাধীনতা। আপনি কি পূর্ণ স্বাধীনতা চাহেন না?

উত্তর: কংগ্রেস চাইলে আমি নিশ্চয়ই তা সমর্থন করবো। আমরা স্বরাজ চাই যা প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতার চেয়েও অনেক বড়।

প্রশ্ন: স্বরাজ স্বাধীনতার চেয়েও বড় কি করে হয়?

উত্তর: হয়। কি করে হয় একদিন আমি তার প্রমাণ দিয়ে দেব। I want Swaraj for the masses and not for the classes. দেশময় এমন অবস্থা বিরাজ করবে যাতে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ শূদ্র, ধনী, দরিদ্র সকলের সর্বস্তরের মনোমালিন্য দূর হবে। এ অবস্থা দেশে হওয়া সম্ভব,—আমি তাই চাই।

দেশবন্ধু তখন জেলে। একদিন মিঃ সতীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁহার কথা হইতেছিল। সে কথা প্রসঙ্গে বলিল, এটা আপনার বৃথা পরিশ্রম, কিছুতেই সম্ভব হইবে না।

দেশবন্ধু উত্তর দিলেন, "দেখো আমার স্বভাবই এই যে, অসম্ভবের দিকেই উহা ছুটে যেতে চায়, আমি বরাবরই এই impossibility চেষ্টা করেছি, যতদিন বাঁচি করব। পরাজয়ও যদি হয়, তবু এতে প্রাণে আনন্দ আছে।" কথাটি আর কিছু নহে,—স্বরাজ্যদল গঠন সম্বন্ধে। তিনি উহা বিগত কিছু দিন যাবৎ গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলেন।

গয়া কংগ্রেসের পূর্বে দেশের চিত্রটি অতি করুণ। গান্ধীজী তখন বরোদা জেলে ছয় বৎসরের কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। তিনি অবরুদ্ধ হওয়ায় দেশ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল না। কোন রকম আন্দোলনে দেশ আন্দোলিত হইল না। সরকারের পক্ষে উহা একটি সুযোগ। তাহারাও সময় আর সুযোগ মত আইন শৃঙ্খলা আর ভারত রক্ষার অজুহাতে অত্যাচার করার প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করিতে ব্যস্ত। ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতে গয়ায় ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন।

বিহারে ইহা ভারতীয় কংগ্রেসের দ্বিতায় বারের অধিবেশন। অধিবেশনের জন্য অর্থের প্রয়োজনও ছিল যথেষ্ট কারণ তখন প্রতিনিধি সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা, আরও কত রকমের ব্যবস্থা। এ সব কিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তখন পর্যন্ত কংগ্রেসের তহবিলে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতেও আরম্ভ করে নাই, সম্বল শুধু দরিদ্র জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা। জানা গিয়াছে, গয়ার কংগ্রেস অধিবেশনের ব্যবস্থা করিতে রাজেন্দ্রপ্রসাদ কোন ব্যাঙ্ক হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার করিয়াছিলেন।

অধিবেশনের স্থান নির্বাচিত হইয়াছিল গয়া হইতে প্রায় দুই মাইল দূরবর্তী মায়ামাখা শ্যামল একটি গ্রামে। রাঁচীর কয়েক শত আদিবাসী অনেক দিন পরিশ্রম করিয়া এই কংগ্রেস নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়া উহাকে শোভা ও সৌন্দর্যে ভূষিত করিয়া তোলে আর এদিকে অধিবেশনের যিনি মূল, যিনি অধিবেশনের প্রাণ সেই সভাপতি চিত্তরঞ্জন তাঁহার সভাপতির ভাষণ রচনায় ব্যস্ত।

চিত্তরঞ্জন তখন তাঁহার কন্যা অপর্ণা দেবীর বাড়ীতে থাকিতেন। নিজের বাড়ী ছিল শূন্য। তিনি সেই জনশূন্য বাড়ির উপরের বসিবার ঘরে পায়চারি করিতে করিতে ভাষণটি বলিয়া যাইতে লাগিলেন আর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ

গুপ্ত তাহা সর্টহ্যাণ্ডে লিখিতে লাগিলেন। সেই পদচারণা আর বলা! কিন্তু কি অপূর্ব ভাষণ! ভারতের ঐ স্তিমিত পরিবেশে ভারতের জনগণ যেমন আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে সভাপতির মাধ্যমে নূতন কথা, নূতন আশার আলো দেখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তাহারা শুনিলেন, দেখিলেন। কিন্তু ভাষণটি যখন লিখিলেন তখন দেশবন্ধুর মানসিক অবস্থা কেমন ছিল তাহা দুই একটি কথার উল্লেখ করিলে সহজেই অনুমান করা যাইবে।

তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডার তখন শূন্য। স্বদেশ ভাণ্ডারের জন্য অপর্ণা দেবী ও নিশীথবাবু যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাও নিঃশেষ হইয়াছিল। উপরন্তু কংগ্রেসের বাড়ীভাড়া বাবদ প্রায় ৩০ হাজার টাকা বাকী পড়িয়াছে,—এ গেল আর্থিক দিক। ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক দিকে দৃকপাত করিলে দেখা যায় যে, যাহারা এক সময় তাঁহার নিকট প্রচুর অর্থ সাহায্য পাইয়াছে তাহারা তাঁহার বাড়ী ছাড়িয়াছে এবং নিন্দা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ মিথ্যার জাল বুনিয়া সমালোচনায় মুখর,—দেশবন্ধুকে পামর, পাষণ্ড বলিতে শুরু করিয়াছে। কেহ তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়াছে, কেহ বলিয়াছে দেশবন্ধু নহে, দেশশত্রু। কেহ বলিয়াছে বিদ্রোহী, কেহ বলিয়াছে সুবিধাবাদী, মন্ত্রী-পদ লাভ করিবার জন্য লোলুপ, দেশপ্রেম তাহার নাই,—দেশবন্ধু ইহা সবই শুনিয়াছেন। যে বাড়ী সকাল হইতে গভীর রাত পর্যন্ত জনসমাগমে আর কোলাহলে মুখরিত সে-বাড়ী তিনি দেখিয়াছেন জনশূন্য,—নির্জন! খবরের কাগজেও পড়িয়াছেন মিথ্যা অপবাদের বড় বড় শিরোনাম। ছোট-বড় সবগুলি কাগজই তখন তাঁহার বিরুদ্ধে মতবাদ প্রচারের অভিযানে লিপ্ত বিশেষতঃ অমৃতবাজার পত্রিকা।

কিন্তু দেশবন্ধু উহাতে এতটুকু ধৈর্য হারান নাই। তিনি হিমালয়ের মত ধীর, স্থির। তখন তাঁহার একমাত্র সম্বল বিশস্ত সুভাষচন্দ্র, শাসমল প্রভৃতি অনুগামীগণ আর সম্বল ছিল এক পয়সা দামের ৪ পৃষ্ঠার 'বাঙলার কথা' নামে একখানি কাগজ। কাগজখানির সম্পাদনার ভার ছিল সুভাষচন্দ্রের উপর এবং তিনি সুষ্ঠুভাবেই উহা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের স্বাস্থ্য তখন ভালো ছিল না তদুপরি এই আর্থিক দুর্গতি।

তবুও তিনি অনুগামীদের বলিতেন, "কিছু চিন্তা করিও না, মেঘ কেটে যাবে"। সুতরাং গয়া কংগ্রেসে তিনি যে কতখানি সফল হইবেন সে-সম্বন্ধে তাহার মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। বিশেষ করিয়া ডেলিগেট নির্বাচনের সময় দুইটি স্থানের পরাজয়ে সুফল সূচিত হইল না। প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদকরূপে শাসমল বিরোধী দলভুক্ত ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের নিকট পরাজিত হইলেন আর দ্বিতীয় পরাজয় বাসন্তী দেবীর। তিনিও ঢাকা হইতে নির্বাচিত হইতে পারিলেন না।

১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে গয়াতে কংগ্রেসের এই ৩৭তম অধিবেশন। সভাপতি দেশবন্ধু। আমেদাবাদের পর গয়া। উপর্যুপরি দুইবার তাঁহার এই সভাপতির সম্মানিত আসন লাভ তাঁহার গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। আবার অন্য দিক হইতে দেখিতে গেলে তিনি ছাড়া তখনকার পরিস্থিতিতে আর যোগ্যতর কেই-বা ছিল? স্তিমিত ভারতবর্ষ। তাহাকে পুনরায় সতেজ ও সবল করিয়া মেরুদণ্ডের উপর ভর করিয়া দাঁড় করাইবার জন্য দেশবন্ধুর ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা এবং তাঁহার দেশপ্রেমের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিবার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমনই চলিতেছিল যে প্রত্যেকটি কংগ্রেসের অধিবেশনই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে গয়া অধিবেশনও সেই দিক হইতে আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই অধিবেশন হইতেই কংগ্রেস কমিটি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় এবং দেশবন্ধু সম্পূর্ণ ভিন্নমত এবং পথ অনুসরণ করিয়া চলেন। তিনি যখন জেলে বন্দীজীবন যাপন করিতে ছিলেন তখনই, শুধু সেণ্ট্রাল জেল হইতে নহে, সমগ্র ভারতবর্ষ সহ মুক্তির কথা চিন্তা করিয়া কাউন্সিলে প্রবেশের পথকেই একমাত্র পথ বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণে তাঁহার সেই ইচ্ছা এবং পথের কথাই ভারতবাসীর কাছে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

ইহার পূর্বে অবশ্য ইহার কিছুটা আভাস পাওয়া গিয়াছিল। বাসন্তী দেবী চট্টগ্রামে প্রাদেশিক সম্মিলনীতে বলিয়াছিলেন যে কংগ্রেসের এখন নীতির পরিবর্তন করিয়া অন্য পথের কথা চিন্তা করা উচিত। তখনই অনেকে বলিয়াছিল, উহা দেশবন্ধুরই কথা, তিনি জেলে আবদ্ধ থাকায় বলিতে না

পারিয়া বাসন্তী দেবীর মারফত বলিয়া পাঠাইয়াছেন। দেশবন্ধু জেল হইতে মুক্ত হইয়া তাই অন্য পথের দিকে তাঁহার অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। তাই গয়া কংগ্রেসে যোগদানের পূর্বে তিনি দক্ষিণ কলিকাতার হরিশ পার্কে এবং মধ্য-কলিকাতায় মির্জাপুর পার্কে দুইটি সভা করিয়া কাউন্সিলে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। এই বিষয়ে তাহার নিজের বাড়ীতেও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একটি সভায় সভাপতি রূপে দেশবন্ধু সমস্ত সভ্যদের সম্মুখে নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হইতেছে এই যে যদিও দেশবন্ধুর চোখের সম্মুখে বসিয়া, তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে কেহ তেমন ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন নাই বটে তবে তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। সুতরাং গয়া কংগ্রেসে যে চিত্রটি ফুটিয়া উঠিবে তাহা পূর্বাহ্নেই অনুমান করা দেশবন্ধুর পক্ষে মোটেই অসম্ভব ছিল না।

শুরু হইল অধিবেশন। দেশবন্ধু যে ভাষণটি প্রদান করিলেন উহা নানা দিক হইতেই উল্লেখযোগ্য এবং স্মরণীয়।

বক্তৃতায় প্রথমেই তিনি কারাপ্রাচীরের অন্তরালে গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন "Mahatma Gandhi is undoubtedly one of the greatest men the world has ever seen. The world hath need of him." কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনা! যে চিত্তরঞ্জন মহাত্মাজীকে সত্য সত্যই ভক্তি করিতেন, বক্তৃতা করিতে উঠিয়াই যিনি প্রথমে সেই মহাপুরুষ, মহান নেতার উদ্দেশ্যে ভক্তি প্রণত চিত্তে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন, সেই সভাতেই উপস্থিত জনমণ্ডলীর কিছু অংশ দেশবন্ধুকে আক্রমণ করিতে ছাড়িল না। No changer বা পরিবর্তন বিরোধীগণ দেশবন্ধুকে সমালোচনা করিয়া সুবিধাবাদী বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, গান্ধীজী জেলে, তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে কাউন্সিলে প্রবেশ প্রস্তাব পাশ করাইয়া লওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। দেশবন্ধুর পক্ষে ইহা অত্যন্ত মর্মান্তিক হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, দেশবন্ধু জীবনে কোথাও সমালোচনা শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকেন নাই। গয়া অধিবেশনে সভাপতির মঞ্চ হইতে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন নিম্নে সেই ইংরাজী বক্তৃতা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া

হইল :

What is the ideal which we must set before us? The country asks: What is nationality? The following extract from the Presidential speech at Gaya gives the answer :—

What is the ideal which we must set before us? The first and foremost is the ideal of nationalism. Now what is nationalism? It is, I conceive a process through which a nation expresses itself and finds itself not in isolation from other nations, not in opposition to other nations but as part of a great scheme by which, in seeking its own expression and therefore its own identity, it materially assists the self-expression and self-realisation of other nations as well. Diversity is as real as unity. And in order that the unity of the world may be established if it is essential that each nationality should proceed on its own line and fulfilment in self-expression and self-realisation. The nationality of which I am speaking must not be confused with the conception of nationality as it exists in Europe to-day. Nationalism in Europe is an agressive nationalism, a selfish nationalism, commercial nationalism of gain and loss. The gain of France is the loss of Germany, and the gain of Germany is the loss of France. Therefore French nationalism is nurtured on the hatred of Germany and German nationalism is nurtured on the hatred of France. It is not yet realised that you cannot hurt Germany without hurting Humanity and in consequence hurting France; and that you can not hurt France without hurting Humanity, and in consequence hurting Germany. That is European nationalism, that is not the nationalism of which I am speaking to you to-day. I contend that each nationality constitutes a particular stream of the great unity, but no nation can

fulfil itself unless and untill it becomes itself and at the same time realise its identity with Humanity. The whole problem of Nationalism is therefore to find that stream and to face that destiny. If you find the current and establish a continuity with the past, then the process of self-expression has begun and nothing can stop the growth of nationality.

A Great Purpose

Throughout the pages of Indian history, I find a great purpose unfolding itself. Movement after movement has swept over this vast country, apparently creating hostile forces, but in reality stimulating the vitality and moulding the life of the people into one great nationality. If the Aryans and the non-Aryans met it was for the purpose of making one people out of them. Brahmanism with its great culture succeeded in binding the whole of India and was indeed a mighty unifying force. Buddhism with its protests against Brahmanism served the same great historical purpose ; and from Magadha to Taxila was one great Buddhistic empire which succeeded not only in broadening the basis of Indian unity but in creating what is perhaps not less important, the greater India beyond the Himalays and beyond the seas, so much so that the sacred city where we have met may be regarded as a place of pilgrimage of millions and millions of people of Asiatic races. Then came the Mohammadans of divers races, but with one culture which was their common heritage. For a time it looked as if there was disintegrating force, an enemy to the growth of Indian nationalism, but the Mohomedans made their home in India, and while they brought a new outlook and a wonderful vitality to the Indian life, with infinite wisdom, they did as little

as possible to disturb the growth of life in the villages where India really lives. This new outlook was necessary for India; and if the two sister streams met, it was only to fulfil themselves and face the destiny of Indian history. Then came the English with their alien culture, their foreign methods delivering a rude shock to their growing nationality, but the shock has only completed the unifying process so that the purpose of history is practically fulfilled. The great Indian nationality is in sight. It already stretches its hands across the Himalayas not only to Asia but to the whole of the world. not agressively but to demand its recognition and to offer its contribution. I desire to emphasis that there is no hostility between the ideal of nationality and that of world peace. Nationalism is the process through which alone will world peace come. A full and unfettered growth of nationalism is necessary for world peace just as a full and unfettered growth of individuals is necessary for nationality. It is the conception of agressive nationality in Europe that stands in the way of world peace; but once the truth is grasped that it is not possible for a nation to inflict a loss on another nation without at the same time inflicting a loss itself, the problem of Humanity is sloved. The essential truth of nationality lies in this, that it is necessary for each nation to develop itself, express itself, and realise itself so that Humanity itself may develop itself, express itself and realise itself. it is my belief that this truth of nationality will endure, although, for the moment, unmindful of the real issue, the nations are fighting amongest themselves, and, if I am not mistaken it is the very instinct of selfishness and self-preservation which will ultimately solve the problem, not the narrow

and the mistaken selfishness of the present, but a selfishness universalized by intellect and transfigured by spirit a selfishness that will bring home to the nations of the world that in the efforts to put down their neighbours less their own ruin and suppression.

We have therefore, to faster the spirit of Nationality. True development of the Indian nation must necessarily lie in the path of Swaraj. A question has often been asked as to what is Swaraj, Swaraj is indefinable and is not to be confused with any particular system of Government. There is all the difference in the world between Swarajya and Samrajya. Swaraj is the natural expression of the national mind. The full outward expression of that mind covers and must necessarily cover, the whole life history of a nation. Yet it is true that Swaraj begins when the true development of a nation begins because as I have said, Swaraj is the expression of that national mind. The question of nationalism, therefore, looked at from another point of view, is the same question as that of Swaraj. The question of all questions in India to-day is the attainment of Swaraj.

The Great Asiatic Federation

Even more important than this is participation of India in the great Asiatic Federation. Which I see in the course of formation. I have hardly any doubt that the Pan-Islamic movement which was started on a some what narrow basis, has given way or is about to give way to the great Federation of all Asiatic peoples. It is the union of the oppressed nationalities of Asia. Is India to remain out side this union ? I admit that our freedom must be won by ourselves but

such a bond of friendship and love, of sympathy and co-operation, between India and the rest of Asia, nay, between India and all the liberty loving people of the world is destined to bring about world peaee, World pcace to my mind means the freedom of every nationality, and I go further and say that no nation in the face of the earth can be really free when other nations are in bondage. The policy which we have hitherto pursued was absolutely necessary for the concentration of the work which we took upon ourselves to perform, and I agreed to that policy whole heartedly. The hope of the attainment of Swaraj or a substantial basis of Swaraj in the cours of the year made such concentration absolutely necessary. To-day that very work demands broader sympathy and a wider out look,

Scheme Of Government

"Swaraj By Non-Violence & Swaraj By The People"

In his Gaya Speech Deshbandhu outlines a scheme of Government consonant with his ideas of Swaraj:—

It is hardly within the province of this address to deal with any detailed scheme of any such Government. I can not, however, allow this opportunity to pass without giving you an expression of my opinion as to the charactor of that system of Government. No system of Government which is not for the people and by the people can ever be regarded as the true foundation of Swaraj, I am firmly convineed that a Parliamentary Government is not a Government by the people and for the people. Many of us believe that the middle class must win Swaraj for the masses. I

do not believe in the possibility of any class movement being ever converted into a movement for Swaraj. If to-day the British Parliament grants provincial autonomy in the provinces with responsibility in the Central Government, I for one will protest against it, because that will inevitably lead to the concentration of power in the hands of the middle class. I do not believe that the middle class will then par with their power. How will it profit India, if in place of the white Bureaucracy that now rules over her, there is substituted an Indian Bureaucracy of the middle classes. Bureaucracy is Bureaucracy and I believe that the very idea of Swaraj is inconsistent with the existence of a Bureaucracy. My ideal of Swaraj will never be satisfied unless the people co-operate with us in its attainment any other attempt will inevitably lead to what European socialists call the "Bourgeoise" Government. In France and in England and in other European countries it is the middle class who fought the battle of freedom, and the result is that power is still in the hands of this class. Having usurped the power they are unwilling to part with it. If to-day the whole of Europe is engaged in a battle of real freedom it is because the nations of Europe are gathering their strength to wrest this power from the hands of the middle classes. I desire to avoid the repetition of that chapter of European history. It is for India to show the light to the world,—Swaraj by nonviolence and Swaraj by the people.

To me the organisation of village life and the practical autonomy of small local centres are more important than their provincial autonomy or central responsibility; and if the choice lay between the two, I would unhesitatingly

accept the autonomy of the local centres. I must not be understood as implying that the village centres will be disconnected units. They must be held together by a system of co-operation and integration. For the present, there must be power in the hands of the provincial and the Indian Government; but the ideal should be accepted once for all, the proper function of the central authority, whether in the provincial or in the Indian Government is to advise, having a residuary power of control only in case of need and to be exercised under proper safe guards. I maintain that real Swaraj can only be attained by vesting the power of Government in these local centres, and I suggest that the Congress should appoint a committee to draw up a scheme of Government which would be acceptable of the nation.

The most advanced thought of Europe is turning from the false individualism on which European culture and institutions are based to what I know to be the ideal of the ancient village organisation of India. Accord of the ballot box and large crowdsing to this thought modern democracy with all their excresconces are dead wood. In their stead must appear the organisation of non-partisan groups for the begetting, the bringing into being, of common ideas, as a common purpose and the collective will. This means the true development and extension of the individual self. The institutions that exist to-day have made machines of men, No Government will be successful, no true Government is possible which does not rest on the individual. "Up to the present moment," says the gifted authoress of the new state, we have never seen the individual yet. The search for him has been the whole long striving of our

Anglo-saxon history. We sought him through the method of representation and failed to find him. We sought to reach him by extending the suffrage to every man and then to every woman and yet the eludes us. Direct Government now seeks the individual." In another place the same writer says: "Thus group organisation releases us from the domination of mere numbers, thus democracy transcends time and space, It can never be understood except as a spiritual force. Majority rule rests on numbers. democracy rests on the well grounded assumption that society is not a collection of units, but a net work of human relations. Democracy is not worked out of the polling booths; it is the bringing forth of a genuine collective will, one to which every single being must contribute the whole of his complex life, as one which every single being must express the whole of at one point. Thus the essence of democracy is creating. The technique of democracy is group organisation." According to this school of thought no living state is possible without the development and the extension of the individual self. State itself is no static unit. Nor is it an arbitrary creation. "It is a process; a continual self-modification to express its different stages of growth in which each and all must be so flexible that continual change of form is twin-fellow of continual growth." This can only be realised when there is a clear perception that individuals and groups and the nation stand in no antithesis. The integration of all these into one conscious whole means and must necessarily means the integration of the wills of individual into the common and collective will of the entire nation.

The general trend of European thought has not accepted the ideal of this new democracy. But the present problems which are agitating Europe seem to offer no other solution. I have very little doubt that this ideal which appears to many practical politicians as impracticable will be accepted as the real, ideal at no distant future. "There is little yet" I again quote from the same author, "that is practical in practical politics."

The fact is that all the progressive movements in Europe have suffered because of the want of a really spiritual basis and it is refreshing to find that this writer has seized upon it. To those who think that the neighbourhood group is too puny to serve as a real foundation of self-Government, she says, "is our daily life profane and only so far as we rise out of it do we approach the sacred life? Then no wonder politics are what they have become. But this is not the creed of men to-day; We believe in the sacredness of our life; we believe that divinity is forever incarnating in humanity, and so we believe in Humanity and the common daily life of all men."

There is thus a great deal of correspondence between this view of life and the view which I have been endeavouring to place before my countrymen for the last 15 years. For the truth of all truths, is that the outer 'Leela' of God reveals itself in history.

Individual, society, Nation, Humanity are the different aspect of that very 'leela' and no scheme of self-Government which is practically true and which is really practical can be based on any other philosophy of life. It is the realisation of this truth which is the supreme necessity of the

hour. This is the soul of Indian thought and this is the ideal towards which the recent thought of Europe is slowly but surely advancing.

To frame such a scheme of Government regard must, therefore, be had—

1. to the formation of local centres more or less on the lines of the ancient village system of India.

2. the growth of larger and larger groups out of the integration of these village centres,

3. the unifying state should be the result of similar growth.

4. the village centres and the larger groups must be practically autonomous.

5. the residuary power of control must remain in the central Government but the exercise of such power should be exceptional ar' for that purpose proper safeguard should be provided, so that the practical autonomy of the local centres may be maint..ined and at the same time the growth of the central Government into a really unifying state may be possible. The ordinary work of such central Government should be mainly advisory.

As a necessary corollary to what I have ventured to suggest as the form of Government which we should accept, I think that the work of organising these local centres should be forth with commenced. The modern subdivisions or even smallar units may be conveniently taken as the local centres, and larger centres may be conveniently formed. Once we have our local areas—"The neighbourhood groups" we should foster the habit of corporate thinking, and leave all local problems to be worked out by them.

There is no reason why we should not start the Government by these local centres to-day. They would depend for their authority on the voluntary co-operation of the people, and voluntary co-operation is much better than the compulsory co-operation which is at the bottom of the Bureaucratic rule in India. This is not the place to elaborate the scheme which I have in mind; but I think that is essentially necessary to appoint a committee with power, not only to draw up a scheme of Government but to suggest means by which the scheme can be put in operation at once.

Deshbandhu's Message

"The Hope of dawn: The confidence of the Morning"

In concluding his presidential address at the Gaya congress, Deshbandhu sang the song of Titan, the champion of Man, and uttered the following message of hope :—

It remains to me to deliver to you a last message of hope and confidence. There is no royal road to freedom, and dark and difficult will be the path leading to it. But dauntless is your courage, and Firm your resolution; and though there will be reverses, sometimes severe reverses, they will only have the effect of speeding your emancipation from the bondage of a foreign Government. Do not make the mistake of confusing achievement with success. Achievement is an appearance, and appearances are often deceptive. I contend that, though we can not point to a great deal as the solid achievement of the movement, the success of

it is assured. That success was proclaimed by the Bureaucracy in the repeated attempts which were made, and are still being made, to crush the growth of the movement, and the arrest its progress, in the refusal to repeal some of the most obnoxious of the repressive legislations, in the frequent use that has been made of the arbitrary or discretionary authority that is vested in the executive Government, and in sending to prison our beloved leader who offered himself as a sacrifice to the wrath of the Bureaucracy. But though the ultimate success of the movement is assured, I warn you that the issue depends wholly on you, and on how you conduct yourselves in meeting the forces that are arrayed against you. Christianity rose trimphant when Jesus of Nazareth offered himself as a sacrifice to the excessive worship of law and order by the Scribes and the Pharisees. The forces that are arrayed against you are forces, not only of the Bureaucracy, but of the modern Scribes and Pharisees whose interest it is to maintain the Bureaucracy in all its pristine glory. Be it yours to offer yourselves as sacrifices in the interest of truth and justice, so that your children may have the fruit of your sufferings. Be it yours to wage a spiritual warfare so that the victory, when it comes, does not debase you, nor tempt you to retain the power of Government in your own hands. But if yours is to be a spiritual warfare, your weapons must be those of the spiritual soldier. Anger is not for you, hatred is not for you; nor for you is pettiness, meanness or falsehood. For you is the hope of dawn and the confidence of the morning, and for you is the song that was sung of Titan, chained and imprisoned, but the champion

of Man, in the Greek fable. To suffer woes which hope thinks infinite ; To forgive wrongs darker than death or night ; To defy power, which stems omnipotent ; To love, and bear ; to hope till hope creates. From its own wreck the thing it contemplates ; Neither to change, nor falter, nor repent ; This, like thy glory. Titan, is to be Good, great and joyous, beautiful and free ; This is alone Life Joy, Empire and victory.

Bande Mataram

ইহার যথাসম্ভব বাংলা অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল :—

জাতীয়তাবাদ

আমাদের সম্মুখে আমরা কি আদর্শ উত্থাপিত করিব ? আমাদের দেশ জিজ্ঞাসা করিতেছে, জাতীয়তাবাদ কি ? গয়া কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতির বক্তৃতার নিম্নলিখিত সারমর্ম হইতে উত্তর পাওয়া যাইতেছে যে, আমাদের সম্মুখে আমরা কি আদর্শ উত্থাপিত করিব ? প্রথম এবং প্রধান আদর্শ হইতেছে জাতীয়তাবাদ। এখন প্রশ্ন হইতেছে, জাতীয়তাবাদ কি ? আমার মনে হয়, ইহা এমন একটি পদ্ধতি যাহার মাধ্যমে একটি জাতি নিজেকে প্রকাশ করে—যে আত্মপ্রকাশ অন্যান্য জাতিসমূহের সহিত বিনা সংঘর্ষে সাধিত হয়, যে আত্মপ্রকাশ আরও একটি মহত্তর পরিকল্পনারই অংশ যাহা দ্বারা উক্ত জাতি নিজেকে বিকাশ করিতে সচেষ্ট হয় অর্থাৎ নিজের স্বরূপকে ব্যক্ত করে এবং এইভাবে ইহা মূলতঃ অন্যান্য জাতিসমূহেরও আত্মবিকাশ এবং আত্ম-উপলব্ধির পথে সহায়তা করে। ঐক্যের মত বৈচিত্র্য ও সমপরিমানে বাস্তব এবং জগতের ঐক্য সাধন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রত্যেক জাতিকে অবশ্যই স্ব স্ব পথ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ এবং আত্ম-উপলব্ধিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে। আমি বর্তমানে যে জাতীয়তাবাদের কথা বলিতেছি উহা বর্তমানে ইউরোপ মহাদেশে প্রচলিত জাতীয়তাদের ধারণার সহিত এক ভাবিয়া মিলাইয়া ফেলিলে চলিবে না। ইউরোপের জাতীয়তাবাদ হইতেছে

উগ্রপন্থী, স্বার্থপর, লাভ এবং ক্ষতির তুলাদণ্ডে বিবেচিত ব্যবসায়ী-জাতীয়তাবাদ। ফরাসীর লাভের ফল হইতেছে জার্মানীর ক্ষতি এবং জার্মানীর লাভ হইতেছে ফরাসীদেশের ক্ষতি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ফরাসী জাতীয়তাবাদ জার্মান রাষ্ট্রের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের দ্বারা পরিপুষ্ট এবং জার্মান জাতীয়তাবাদ অনুরূপে ফরাসী রাষ্ট্রের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের দ্বারা পরিপুষ্ট। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমরা এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারি নাই যে, মানবতাকে আহত না করিয়া আমরা জার্মান রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি করিতে পারি না এবং ফলতঃ মানবতার ক্ষতি না করিয়া ফরাসী রাষ্ট্রেরও কোন ক্ষতি করিতে পারি না এবং মানবতার কোন ক্ষতি না করিয়া ফরাসী রাষ্ট্রের এবং স্বভাবতই জার্মান রাষ্ট্রের কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারি না। ইহাই হইতেছে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের স্বরূপ এবং আমি আজ আপনাদের নিকট এই জাতীয়তাবাদের বিষয় বলিতেছি না। আমার প্রতিপাদ্য বক্তব্য হইতেছে যে প্রত্যেকটি জাতি একটি মহৎ ঐক্য হইতে নিঃসৃত একটি ক্ষুদ্র স্রোতধারা। কিন্তু কোন জাতি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না যদি না উক্ত জাতি নিজের স্বকীয়তা বজায় রাখিতে পারে এবং একই সঙ্গে উক্ত মহৎ নিখিল মানবতাবাদের সহিত নিজের সম্পর্ক বজায় রাখিতে পারে। সুতরাং জাতীয়তাবাদের মূল সমস্যা হইতেছে ঐ নিখিল মানবতাবাদের স্রোতধারাকে উপলব্ধি করা এবং সাহসের সহিত উক্ত আদর্শের সম্মুখীন হওয়া। আপনারা যদি উক্ত স্রোতধারাকে চিনিতে পারেন এবং অতীতের সহিত একটি অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র স্থাপিত করিতে পারেন তখনই বুঝিতে পারিবেন যে, আত্মপ্রকাশের প্রক্রিয়া সঠিকভাবে শুরু হইয়াছে এবং তখনই জানিবেন উক্ত জাতির সমৃদ্ধিকে কোন কিছুই রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না।

একটি মহান উদ্দেশ্য

ভারতীয় ইতিহাসের সমস্ত পৃষ্ঠাসমূহ হইতে আমি লক্ষ্য করিতেছি, একটি সুমহান উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে নিজেকে প্রকাশ করিতেছে। এই বিশাল উপমহাদেশে আন্দোলনের পর আন্দোলনের ঝড় বহিয়া গিয়াছে, আপাত দৃষ্টিতে ইহা পরস্পর বিরোধী শক্তি সমূহের সৃষ্টি করিয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে

জাতির অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবিত করিয়াছে এবং জনগণের জীবন-ধারাকে এক এবং অভিন্ন জাতীয়তাবাদের ছাঁচে গড়িয়া তুলিয়াছে। যখনই আর্য এবং অনার্যদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়াছে ইহার মূল তাৎপর্য হইতেছে দুইটি পরস্পর বিরোধী জাতিকে এক জাতিতে রূপান্তরিতকরণ।

সুমহান সংস্কৃতির মাধ্যমে ব্রাহ্মণত্ব সমস্ত ভারতবর্ষকে এক সূত্রে, গ্রথিত করিতে সফল হইয়াছে এবং বাস্তবিকই ইহা একটি শক্তিশালী সংগঠন শক্তি বলিয়া পরিগণিত। ব্রাহ্মণত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার বুদ্ধধর্ম একই ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য সাধিত করিয়াছে এবং মগধ হইতে তক্ষশীলা পর্যন্ত একটি বিশাল বৌদ্ধ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। এই বিশাল বৌদ্ধ সাম্রাজ্য একই সঙ্গে ভারতীয় ঐক্যের ভিত্তিকে বিস্তৃত করিয়াছিল এবং ভারতীয় সংস্কৃতিকে উহার সীমারেখা হিমালয়ের পর্বতমালা এবং বেষ্টিত সাগর-সমূহকে অতিক্রম করিয়া এত দূর দুরান্ত পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল যে ইহা এশিয়া মহাদেশের লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

তাহার পর আসিল বিভিন্ন মতাবলম্বী মুসলমান সম্প্রদায় কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে ইহাদের সংস্কৃতি ছিল এক এবং অভিন্ন। কিছুকাল যাবৎ এই মুসলমান সম্প্রদায়কে মনে হইয়াছিল ইহা একটি বিচ্ছেদকারী শক্তি এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ। কিন্তু ক্রমশঃ মুসলমানগণ ভারতবর্ষেই নিজেদের বাসভূমি করিল। এবং ভারতীয় জীবনের সম্মুখে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গি তুলিয়া ধরিল এবং ভারতীয় জীবনধারার সহিত একটি অদ্ভুত সঞ্জীবনী শক্তিধারা-মিশ্রিত করিল যাহারা মধ্যে নিহিত ছিল অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার। ক্রমশঃ ইহা বুঝিতে পারা গেল যে, তাহারা ভারতের প্রাণকেন্দ্র গ্রামাঞ্চলের জীবন সমৃদ্ধিকে কচিৎ বিঘ্নিত করিয়াছিল। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি ভারতবর্ষের পক্ষে প্রয়োজন ছিল। এই দুইটি সহোদরা স্রোতধারা একত্রে মিশিয়াছিল ভারতীয় ইতিহাসের ভাগ্যকে গড়িয়া তুলিবার জন্য। ইহার পর আসিল বৈদেশিক সংস্কৃতি লইয়া ইংরাজগণ। ইহাদের বৈদেশিক নিয়ম-পদ্ধতিসমূহ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমৃদ্ধিকে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই আঘাত সাহায্য করিয়াছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ঐক্য-প্রক্রিয়াকে পরোক্ষভাবে সম্পূর্ণ করিতে এবং এইভাবে ইতিহাসের উদ্দেশ্য যথার্থভাবে সাধিত হইয়াছে। সুমহান ভারতীয় জাতীয়তাবাদের

স্বরূপ উদ্ভাসিত হইতেছে, ইতিমধ্যেই ইহা হিমালয়ের পর্বতমালাকে অতিক্রম করিয়া কেবলমাত্র এশিয়া মহাদেশেই নহে সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে,—আক্রমণাত্মক উগ্রভঙ্গিতে নহে কিন্তু ইহার সুযোগ্য পরিচিতি লাভের দাবী লইয়া এবং নিখিল মানবতাবাদের প্রতি ইহার অবদানের প্রতিশ্রুতি লইয়া। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, জাতীয়তাবাদের আদর্শের সহিত বিশ্বশান্তির কোনরূপ বৈরীভাব নাই, জাতীয়তাবাদই হইতেছে একটি মাত্র প্রক্রিয়া যাহার মাধ্যমেই কেবলমাত্র বিশ্বশান্তি আসিবে। যেমন করিয়া সম্পূর্ণ এবং বাধাহীন ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশের মাধ্যমেই জাতীয়তাবাদ গড়িয়া ওঠে তেমন করিয়াই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বাধাহীন জাতীয়তাবাদের সম্প্রসারণ বিশ্বশান্তির জন্য আবশ্যক। ইউ-রোপের উগ্র এবং আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদের ধারণাই বিশ্বশান্তির পথের প্রধান প্রতিবন্ধক। কিন্তু যখনই এই সত্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যাইবে যে কোন একটি রাষ্ট্র নিজের দেশের কোনরূপ ক্ষতিসাধন না করিয়া অন্য কোন দেশের ক্ষতিসাধন করিতে পারে না কেবলমাত্র তখনই নিখিল মানবতা-বাদের মূল সমস্যা সমাধান সম্ভব হইবে। জাতীয়তাবাদের অন্তর্নিহিত সত্য এই যে, প্রত্যেক জাতিকে অপরিহার্যভাবে আত্মোন্নতি, আত্মপ্রকাশ এবং আত্ম-উপলব্ধি করিতে হইবে যাহাতে নিখিল মানবতাবাদও নিজেকে একই সঙ্গে উন্নত করিতে, প্রকাশ করিতে এবং উপলব্ধি করিতে পারে। ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে জাতীয়তাবাদের এই সত্য স্বরূপ অক্ষুন্ন থাকিবে যদিও আপাততঃ সাময়িকভাবে প্রকৃত সমস্যা হইতে অনবহিত হইয়া বিশ্বরাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের সহিত কলহ এবং বিবাদে লিপ্ত রহিয়াছে এবং যদি আমার ভুল না হইয়া থাকে তবে আমার মনে হয় যে, স্বার্থপরতা বর্তমানের সঙ্কীর্ণ এবং বিভ্রান্ত স্বার্থপরতা নয়—পরন্তু যে স্বার্থপরতা মনীষা দ্বারা বিশ্বজনীন এবং যাহা এমন একটি উদার বোধের দ্বারা উদ্বোধিত যাহা কালক্রমে সমস্ত পৃথিবীর জাতিসমূহকে উপলব্ধি করাইবে যে তাহাদের নিজ নিজ প্রতিবেশী জাতি-সমূহকে দমন করিবার প্রচেষ্টাসমূহ পরিণামে তাহাদের নিজেদেরই ধ্বংস এবং অবদমন ঘটাইবে—এই স্বার্থপরতা এবং আত্মসংরক্ষণতার মূল বৃত্তিসমূহই পরিণামে মূল সমস্যার সমাধান করিবে।

সুতরাং আমাদের জাতীয়তাবাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে ধারণ এবং

পোষণ করিতে হইবে। ভারতীয় জাতির প্রকৃত আত্মোন্নতি অনস্বীকার্য ভাবে স্বরাজের পথ ধরিয়াই আসিবে। একটি প্রশ্ন প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয় যে, স্বরাজ কি? স্বরাজের সংজ্ঞা ঠিক দেওয়া সম্ভব নহে এবং বর্তমানে প্রচলিত রাষ্ট্রের কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির সহিত এক বলিয়া চিহ্নিত করা প্রমাদজনক। পৃথিবীতে স্বরাজ এবং সাম্রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। স্বরাজ হইতেছে জাতীয় মননশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। এই মননশক্তির পূর্ণ এবং বাহ্য অভিব্যক্তি একটা জাতির সম্পূর্ণ ইতিহাসকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তথাপি ইহা সত্য, যখনই একটি জাতির প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হয় তখনই স্বরাজের সূত্রপাত কারণ আমি ইতিপূর্বেই বলিয়াছি যে স্বরাজ জাতীয় মননশক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বিবেচনা করিলে জাতীয়তাবাদের সমস্যা আর স্বরাজের সমস্যা একই। বর্তমান ভারতের সমস্ত সমস্যা সমূহের মূল সমস্যা হইতেছে স্বরাজ অর্জন।

বৃহৎ এশিয়া সম্মেলন

ইহার চাইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে বৃহৎ এশিয়া সম্মেলনে ভারতের যোগদান করা। আমার মনে কোন সন্দেহ নাই যে, কিঞ্চিৎ সংকীর্ণ ভিত্তিভূমির উপর আরব্ধ প্যান ইস্‌লামিক আন্দোলন কালক্রমে সমগ্র এশিয়ার জাতিসমূহের দ্বারা সংগঠিত সুমহান এশিয়ার সম্মেলনের নিকট অবনতি স্বীকার করিতে যাইতেছে। এই সম্মেলন এশিয়ার সমস্ত অত্যাচারিত জাতিসমূহের যৌথ সম্মেলন। ভারতবর্ষ কি এই সম্মেলনের বাহিরে থাকিবে? আমি স্বীকার করি যে, আমাদের স্বাধীনতা আমাদের নিজেদেরই অর্জন করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ বন্ধুত্ব, প্রেম, সহানুভূতি এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত ভারতবর্ষের সহিত এশিয়ার অবশিষ্ট অংশের সহিত সুমহান সম্পর্ক অবিসংবাদিতভাবে বিশ্বশান্তি আনয়ন করিবে। আমার মতে বিশ্বশান্তির অর্থ হইতেছে প্রত্যেকটি জাতির পূর্ণ স্বাধীনতা এবং আমি আরও এক পদক্ষেপ অগ্রসর হইয়া বলিতেছি যে, পৃথিবীর কোন জাতিই সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য জাতিসমূহ পরাধীনতার শৃঙ্খলে জড়িত থাকে। আমরা অদ্যাবধি যে নীতি অনুসরণ করিয়া

আসিতেছি উহা যে কর্ম করিতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ সেই কর্মসংহতির জন্যই অত্যাবশ্যক এবং আমি সর্বান্তকরণে ঐ নীতির সহিত সম্পূর্ণ একমত। স্বরাজ অর্জনের আশা কিংবা স্বরাজেরই সাদৃশ কোন মূল ভিত্তি স্থাপন করা এই কর্মসংহতিকে অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিয়াছে। বর্তমানে আমাদের কর্মোদ্যম আরও অধিকতর সহানুভূতি এবং মহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির দাবী জানাইতেছে।

সরকারী পরিকল্পনা

অহিংসার মাধ্যমে স্বরাজ এবং জনগণের মাধ্যমে স্বরাজ।

তাঁহার স্বরাজ সম্বন্ধে ধারণার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কাঠামো বর্ণনা করেন :—

এইরূপ সরকারের বিস্তৃত পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার এই ভাষণের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য আমি এইরূপ সরকারী পদ্ধতির চরিত্র সম্বন্ধে আমার মতামত ব্যক্ত করিবার এই সুযোগ ছাড়িয়া দিতে নারাজ। যে সরকারী পদ্ধতি জনগণের নিমিত্ত নহে এবং জনসাধারণ কর্তৃক চালিত নহে, সে-সরকারী পদ্ধতি স্বরাজের যথার্থ ভিত্তিস্বরূপ গণ্য করা যায় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কোন পার্লামেণ্টারী সরকার জনসাধারণের নিমিত্ত নহে বা জনসাধারণদ্বারা পরিচালিত নহে। আমাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনসাধারণের জন্য স্বরাজ অর্জন করিবে। আমি এমন কোন শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী নই যাহা স্বরাজ অর্জন আন্দোলনে রূপায়িত হইবে। যদি বর্তমানে বৃটিশ পার্লামেণ্ট আমাদের প্রদেশগুলিকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা অনুমোদন করে যাহার মূল দায়-দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বর্তিত থাকিবে, আমি ব্যক্তিগতভাবে উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করি, কারণ ইহার ফলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হস্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইবে। আমি বিশ্বাস করি না যে এমতাবস্থায় মধ্যবিত্তশ্রেণী উক্ত প্রদত্ত ক্ষমতার সহিত ভারসাম্য বজায় রাখিতে পারিবে। যদি বৃটিশ আমলাতন্ত্রের শাসনের পরিবর্তে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কর্তৃক ভারতীয় আমলাতন্ত্রের শাসন পত্তন হয়, তাহা হইলে কিরূপে ভারতের

উপকার সাধন করিবে? আমলাতন্ত্র আমলাতন্ত্রই এবং আমি বিশ্বাস করি স্বরাজের ধ্যান-ধারণা যে কোন বিদ্যমান আমলাতন্ত্রের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন। আমার স্বরাজের আদর্শ কখনই সম্পূর্ণ হইবে না যদি জনসাধারণ উহা অর্জনের জন্য আমাদের সহিত সহযোগিতা না করে। অন্য যে কোন প্রচেষ্টা অবশ্যম্ভাবীরূপে এমন এক সরকারের সৃষ্টি করিবে, যাহাকে ইউরোপীয় সমাজবাদীরা, 'বুর্জোয়া সরকার' বলিয়া অভিহিত করে। ফরাসীদেশে, ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাইয়াছিল; ফল হইয়াছিল যে ঐ ক্ষমতা মধ্যবিত্তশ্রেণীর হস্তে অদ্যাবধি কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে। একবার ঐ শাসনক্ষমতা দখল করিয়া তাহারা এখন ঐ ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে অস্বীকৃত। যদি বর্তমানে সমগ্র ইউরোপ প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে রত হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ এই যে, ইউরোপের জাতিসমূহ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে এই ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার শক্তি ক্রমশঃ অর্জন করিতেছে। ইউরোপের ইতিহাসের উক্ত অধ্যায়ের পুনরুক্তি বর্তমানে আমি এড়াইয়া যাইতে চাহিতেছি। ভারত পৃথিবীকে আলোক প্রদর্শন করুক—অহিংসা দ্বারা স্বরাজের আলোক এবং জনসাধারণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত স্বরাজের আলোক দেখাক। আমার নিকট পল্লীজীবনের সংগঠন এবং স্থানীয় ক্ষুদ্র সংস্থা সমূহের বাস্তব স্বায়ত্বশাসন, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন অথবা কেন্দ্রীয় যৌথ দায়িত্ব বহন অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই ভিন্ন পথের মধ্যে যদি কোন একটিকে পছন্দ করিতে হয়, আমি নির্দ্বিধায় স্থানীয় সংস্থা সমূহের স্বায়ত্বশাসনকে গ্রহণ করিব, অবশ্য আমি এই বুঝাইতে চাহিতেছি না যে গ্রামীণ সংস্থা সমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন কেন্দ্রস্থান হইবে। উক্ত স্থানীয় গ্রামীণ স্বায়ত্বশাসিত কেন্দ্র সমূহ পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সংযোগ দ্বারা একসূত্রে গ্রথিত থাকিবে। বর্তমানের জন্য অবশ্য প্রাদেশিক ও ভারত সরকারের হস্তে ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু উপরোক্ত আদর্শ চূড়ান্ত রূপে গ্রহণ করিতে হইবে আর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের প্রকৃত কার্য হইবে—সে-কর্তৃত্ব প্রাদেশিক সরকারেরই হউক বা ভারত সরকারেরই হউক—পরামর্শদান, কেবলমাত্র প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করিবার পরিশিষ্ট কর্তৃত্বক্ষমত যাহা যথাযোগ্য সতর্কতার মাধ্যমে উক্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করিবে। ইহা

আমার ধারণা যে প্রকৃত স্বরাজ অর্জন তখনই সম্ভব হইবে যখন সরকারের ঐ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এই সমস্ত আঞ্চলিক গ্রামীণ কেন্দ্রসমূহের উপর অর্পিত হইবে। আমি আপনাদিগকে এই পরামর্শ দিতেছি যে, ভারতীয় কংগ্রেস এমন একটি কমিটি গঠন করুক যাহা সমগ্রজাতির নিকট গ্রহণযোগ্য সরকারী পরিকল্পনার একটি খসড়া প্রস্তুত করিবে।

প্রাচীন ইউরোপীয় সংস্কৃতি এবং আচার-অনুষ্ঠানসমূহের ভিত্তিমূল কৃত্রিম দুষ্ট ইউরোপীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ হইতে সাম্প্রতিক কালের অতি উন্নতিশীল প্রগতিবাদী ইউরোপীয় চিন্তাধারা ক্রমশঃ দূরে সরিয়া আসিতেছে এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের গ্রামীণ সংগঠনের আদর্শের দিকে ঝুঁকিতেছে। এই অগ্রণী চিন্তাধারা অনুসারে আধুনিক বিশাল জনতার গণতন্ত্র এবং ইহার আনুষঙ্গিক ব্যালটবাক্স এবং ইহার অন্যান্য প্রকাশ্য উপকরণসমূহ নিষ্প্রাণ ও নিষ্প্রয়োজনীয় জঞ্জালস্বরূপ। ইহার পরিবর্তে অবশ্যই কায়েমী স্বার্থের দলহীন জনতার নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে যাহা সার্বজনীন চিন্তাধারা সমূহের সৃষ্টি করিবে এবং সার্বজনীন সমষ্টিগতভাবে জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তিরূপে চিহ্নিত হইবে। ইহার অর্থ হইতেছে ব্যক্তি সত্তার যথার্থ উন্নতি ও বিকাশ। যে প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানে প্রচলিত রহিয়াছে তাহারা মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করিযাছে। সাফল্যের জন্য ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল না থাকিলে, কোন সরকার, কোন যথার্থ সরকারের উদ্ভব সম্ভব নহে। "নিউস্টেট" পত্রিকার প্রতিভাময় গ্রন্থকার এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, "আমরা এখনো পর্যন্ত প্রকৃত ব্যক্তিসত্তার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করি নাই। আমাদের এ্যাঙ্গলো স্যাকসন ইতিহাসে সুদীর্ঘকাল যাবৎ এই জীবন্ত যথার্থ ব্যক্তি মানবের সন্ধান আন্তরিকভাবে করিয়া আসিতেছে। আমরা প্রতিনিধিমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে এই বাঞ্ছিত ব্যক্তিত্বের খোঁজ করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছি। আমরা প্রথমতঃ প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে অতঃপর প্রত্যেকটি প্রাপ্ত বয়স্ক নারীকে ভোটাধিকার অর্পণ করিয়া তাহার নাগাল পাইবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তথাপি উক্ত আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিপুরুষ আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে। প্রত্যক্ষ সরকারী শাসন এক এক ব্যক্তিমানবের সন্ধান করিতেছে।" এক প্রসঙ্গে ঐ একই গ্রন্থকার মন্তব্য করিয়াছেন যে, "এইভাবে যৌথ সংগঠন আমাদের কেবলমাত্র সংখ্যাধিক্যের প্রবল প্রভাব হইতে মুক্তি দান করে।

এইভাবে গণতন্ত্র স্থান ও কালকে অতিক্রম করিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রকে আধ্যাত্মিক শক্তি ছাড়া সম্যক উপলব্ধি করা যায় না। সংখ্যাধিক্যের শাসন কেবলমাত্র সংখ্যার উপরই নির্ভরশীল। গণতন্ত্র এই সুদৃঢ়ভিত্তি, ধারণার উপর নির্ভরশীল যে সমাজ কেবলমাত্র স্বতন্ত্রভাবে একক ব্যক্তিগণের সংখ্যাগত সমষ্টিমাত্র নহে; পরন্তু ইহা মানবিক সম্পর্কের অবিচ্ছিন্ন জালের মত বর্তমান থাকে। ভোট নির্বাচনের কেন্দ্রসমূহেই গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে না। গণতন্ত্র যথার্থ যৌথ ও সম্মিলিত ব্যক্তি সমষ্টির আকাঙ্ক্ষার প্রজনক, যে যৌথ আকাঙ্ক্ষার মধ্যে, স্বতন্ত্রভাবে, প্রত্যেকটি ব্যক্তির জটিল জীবনের সমস্ত অবদান যথার্থ প্রতিফলিত হয়, যেখানে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রব্যক্তি কোন একস্থানে সম্পূর্ণ একক ও অভিন্ন হইয়া যায়। এইভাবে গণতন্ত্রের মূলমর্ম হইতেছে সৃজনীশক্তি আর গণতন্ত্রের কলা-কৌশল হইতেছে সম্মিলিত সংগঠন। রাষ্ট্র কখনও স্থাবর যন্ত্র হইতে পারে না, ইহা ভিত্তিহীন হঠাৎ উৎপন্নও নহে। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া, যাহাতে ইহার সমৃদ্ধি ও বিকাশ অক্ষুণ্ণ থাকিয়া এমন পর্যায় থাকে যেখানে ব্যক্তি ও সমষ্টি পারস্পরিক সহযোগী হইয়া সর্বদাই ইহার ক্রমোন্নতি বিকাশ মানসে স্বচ্ছন্দে ইহার পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। সেই জন্য গণতন্ত্রকে সর্বদাই আত্মপরিবর্তনশীল ও নমনীয় রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার সুষ্ঠ মাধ্যম হইতে হইবে। গণতন্ত্রের এই আদর্শকে বাস্তবে সঠিকভাবে রূপায়িত করিতে গেলে একটি পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন যে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি নাগরিক ব্যক্তি সংগঠনসমূহ এবং সমগ্র জাতি পরস্পর বিরোধী, স্ববিরোধী শক্তি সমাবেশ নহে। এই তিন শক্তিসমূহকে একটি সচেতন ও অখণ্ড ঐক্যশক্তিতে সম্মিলিত করণের অর্থ অনস্বীকাযভাবে এই যে প্রত্যেকটি ব্যক্তির ইচ্ছাকে সাধারণ এবং সম্মিলিত জাতীয় ইচ্ছার সহিত সুষ্টুভাবে ও সার্থকভাবে একীকরণ করিতে হইবে।

গণতন্ত্র সম্বন্ধে ইউরোপীয় চিন্তাধারার প্রবণতা গণতন্ত্রের এই নূতন আদর্শ গ্রহণ করে নাই। কিন্তু যে সমস্ত সমস্যাসমূহ বর্তমানে ইউরোপকে আলোড়িত করিতেছে ইহার দ্বিতীয় অন্য কোন সমাধান নাই। এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, বর্তমানে এই আদর্শ বহু বাস্তববাদী রাজনীতি বিশারদগণের নিকট অবাস্তব ও রূপায়ণের অযোগ্য বলিয়া মনে হইলেও অদূর ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের এই আদর্শই পরিণামে গৃহীত হইবে। আমি ঐ

একই গ্রন্থকারের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছি যে, "বর্তমানের বাস্তব রাজনীতির মধ্যে বাস্তবতা খুবই বিরল বা অপ্রচুর।"

বাস্তব সত্য এই যে যথার্থ আধ্যাত্মিক ভিত্তিমূলের অভাবে ইউরোপের সমস্ত উন্নতিকামী আন্দোলন সমূহ ব্যাহত হইতেছে। বর্তমান লেখক এই অভাবের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া নিজের বক্তব্য আদর্শকে জোরালো করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। যাহারা মনে করেন যে প্রতিবেশী অঞ্চলের আঞ্চলিক সংগঠন স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তনের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়, তিনি [উক্ত গ্রন্থকার] তাহাদের নিকট এই প্রশ্ন করেন, "আমাদের দৈনন্দিন জীবন কি এতই কলুষযুক্ত [যে স্বায়ত্তশাসনের দায়িত্ব বহনে অক্ষম ও অনুপযুক্ত হইবে] এবং আমরা কি এই মনে করি যে কলুষমুক্ত হইতে পারিলেই আমরা পবিত্র আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি সঠিকভাবে অগ্রসর হইতে পারিব ? যদি ইহাই আমাদের ধারণা হয়, তবে [উক্ত লেখিকা সখেদে মন্তব্য করেন] ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই যে রাজনীতি বলিতে বুঝান হইতেছে বর্তমানে রাজনীতি যে পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের মানুষের ধর্ম ইহা নহে। আমরা আমাদের জীবনের পবিত্রতায় আস্থাবান, আমরা বিশ্বাস করি, মানবতার মধ্যেই দৈবশক্তি নিহিত রহিয়াছে এবং স্বভাবতই আমরা মানবতাবাদে এবং সমস্ত মানবজাতির সাধারণ দৈনন্দিন জীবনধারাতে বিশ্বাস করি।

এইভাবে এই জীবনধারার মতবাদ এবং আমি যে জীবনধারার মতবাদ বিগত পঞ্চদশ বৎসর কাল ধরিয়া আমার দেশবাসীগণের সম্মুখে সমুপস্থিত করিবার চেষ্টা চালাইয়া আসিতেছি—এই দুই জীবনধারার মতবাদের মধ্যে বহুল সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে, কারণ সকল সত্য সমূহের মধ্যে চরম এবং পরম সত্য এই যে ঈশ্বরের বহির্লীলা ইতিহাসের মাধ্যমেই নিজেকে প্রকাশিত করে। ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ও মানবতাবাদ ঐ ঈশ্বরের লীলারই বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র এবং স্বায়ত্তশাসনের কোন বাস্তব সত্য এবং বাস্তবিকই রূপায়ণের যোগ্য কোন পরিকল্পনা এতৎব্যতীত অন্য কোন জীবন দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বর্তমান সময়ের চরম এবং আশু প্রয়োজন হইতেছে এই সত্যের সম্যক উপলব্ধিকরণ। ইহাই ভারতীয় চিন্তাধারার অন্তর্নিহিত আত্মাস্বরূপ এবং এই চিন্তাধারার প্রতি সাম্প্রতিক কালের ইউ-

য়োপের চিন্তারাশি ধীরে অথচ নিঃসন্দেহে আকৃষ্ট ও আগুয়ান হইয়া চলিয়াছে।

এইরূপ কোন সরকারী পরিকল্পনা মুসাবিদা করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখিতে হইবে:

(১) প্রাচীন ভারতের গ্রামীণ ব্যবস্থার প্রায় অনুরূপ পদ্ধতিতে আঞ্চলিক সংস্থা সমূহের সংগঠন।

(২) এই সমস্ত ক্ষুদ্র গ্রামীণ সংস্থা সমূহকে বৃহত্তর যৌথ সংগঠনে সংগঠিত করিতে হইবে।

(৩) এই সমস্ত সংগঠনের পরস্পর যোগসূত্র রক্ষাকারী সরকার ইহাদের মাধ্যমেই গড়িয়া উঠিবে।

(৪) গ্রামীণ সংস্থাসমূহ এবং তদোৎপন্ন বৃহত্তর যৌথ সংগঠনসমূহ বাস্তবিকভাবে স্বায়ত্বশাসিত হইতে হইবে।

(৫) এই সমস্ত সংগঠনগুলিকে নিয়ন্ত্রণের অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারে বর্তাইবে কিন্তু এইরূপ ক্ষমতার প্রয়োগ সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত সতর্কতামূলক নিবারণী ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যেন এই সমস্ত আঞ্চলিক সংস্থা সমূহের যথার্থ স্বায়ত্তশাসন বজায় থাকে এবং একই সঙ্গে যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার একটি সুষ্ঠু যোগসূত্র রক্ষাকারী রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে। —এইরূপ কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ কার্যাবলী হইবে মূলতঃ উপদেশদান।

সরকারের যে রূপ গঠনের জন্য আমি পরামর্শ দিয়াছি উহারই সূত্র ধরিয়া আমি বলিতেছি যে এই সমস্ত আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের সংগঠনমূলক কার্যাবলী অনতিবিলম্বে আরম্ভ করিতে হইবে। সাম্প্রতিক কালের জেলা সমূহের বিভাগগুলিকে কিংবা আরও ক্ষুদ্রতর আয়তন বিশিষ্ট অঞ্চল সমূহকে সুবিধা অনুযায়ী উক্ত গ্রামীণ আঞ্চলিক সংস্থারূপে পরিগণিত করা যাইতে পারে। আমাদের এই আঞ্চলিক সংস্থাসমূহ গঠিত হইবার পর আমরা জনসাধারণের মনে চিন্তা বিষয়ে সহযোগিতার অভ্যাস সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিব এবং আঞ্চলিক সমস্ত সমস্যাসমূহের সমাধানের দায়িত্ব তাহাদের উপরই ন্যস্ত করিব। এই সমস্ত আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের দ্বারা চালিত স্বায়ত্বশাসনের মাধ্যমে আমরা এখন হইতেই নূতন সরকার কেন সৃষ্টি করিব না—তাহার পশ্চাতে কোন যুক্তি নাই। ইহারা কর্তৃত্বের জন্য জনসাধারণের স্বেচ্ছা-

প্রণোদিত সহযোগিতার উপর নির্ভর করিবে এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা আবশ্যিক সহযোগিতা, যাহা ভারতবর্ষের আমলাতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তিভূমি স্বরূপ,—অপেক্ষা অনেক শ্রেয়। আমার মনে এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে যে ধারণা আছে তাহাকে বিস্তৃত করিয়া ব্যাখ্যা করার প্রকৃত স্থান ইহা নহে কিন্তু আমি মনে করি, ক্ষমতা বিশিষ্ট একটি কমিটি স্থাপন করা অপরিহার্য, যে কমিটি কেবলমাত্র সরকারের পরিকল্পনার মুসাবিদাই করিবে না, উপরন্তু উহাকে বাস্তবে রূপায়িত করণের উপায় সম্বন্ধে নির্দেশ দিবে।

দেশবন্ধুর বাণী
নূতন উষার আশা
সুপ্রভাতের সুদৃঢ় বিশ্বাস

গয়া কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণ সমাপনের মুখে দেশবন্ধু মানবদরদী 'টাইটানের' গীত গাহিয়া শুনাইলেন এবং নিম্নলিখিত আশার বাণী শুনাইলেন :—

আপনাদিগকে আশা ও আশ্বাসের শেষ বাণী শুনাইবার দায়িত্ব আমার রহিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের কোন সহজ, সুগম পথ নাই এবং মুক্তির পথ অন্ধকার সমাচ্ছন্ন ও দুর্যোগপূর্ণ হইবে। কিন্তু আপনাদের অমিত সাহস, কঠোর সংকল্প, যদিও ব্যর্থতা আসিবে, সময় সময় কঠিন প্রতিবন্ধক দেখা দিবে কিন্তু বিদেশী সরকারের শাসন হইতে মুক্তিকে ত্বরান্বিত করিয়া তুলিবে। জয় এবং সাফল্যকে এক এবং অভিন্ন করিয়া দেখিবার ভুল আপনারা করিবেন না। সাফল্য মাত্রই দৃষ্টিভ্রম এবং দৃষ্টিভ্রম মাত্রই ছলনা। কিন্তু আমি এই যুক্তি প্রদর্শন করিতেছি যে, যদিও এই আন্দোলনের সুষ্ঠু সাফল্য দেখাইতে পারি না তবুও ইহার জয় অবশ্যম্ভাবী,—ঐ জয় আমলাতন্ত্রের দ্বারাই ঘোষিত হইয়া গিয়াছে—সে আমলাতন্ত্র বারবার এই আন্দোলনের অগ্রগতিকে রোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এই আন্দোলনকে চূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে; দমন পীড়ন মূলক দুষ্ট আইন বাতিল করিতে অস্বীকার করিয়াছে, প্রশাসনকে যে কর্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহার পুনঃ পুনঃ অপব্যবহার করিয়াছে এবং আমাদের সেই প্রিয় নেতা যিনি আমলাতন্ত্রের ক্রোধাগ্নিতে নিজেকে আহুতি দিয়াছেন তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছে। যদিও

এই আন্দোলনে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী তবুও আমি আপনাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, এই জয় সম্পূর্ণভাবেই আপনাদের উপর নির্ভর করিতেছে; আপনাদের বিরুদ্ধে যে শক্তি সমূহ পুঞ্জীভূত রহিয়াছে কিরূপে তাহার সম্মুখীন হইবেন—তাহার উপর নির্ভর করিতেছে। খ্রীষ্টধর্মের জয় তখনই হইল যখন নাজারাতের পুরোহিত এবং ফ্যারিসিস্‌দের আইন-কানুনের প্রতি অত্যাধিক ভক্তি, নিজেকে আহুতি দিয়াছিলেন। আপনাদের বিরুদ্ধে যে সকল শক্তি সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে, সে-শক্তি যে কেবল আমলাতন্ত্রের শক্তি তাহা নহে, সেই শক্তি সেই সকল আধুনিক পুরোহিত এবং ফ্যারি-সিস্‌দের শক্তি—যে ফ্যারিসিস্‌দের একমাত্র স্বার্থ হইল আমলাতন্ত্রকে ইহার পূর্ব গৌরবে অধিষ্ঠিত রাখা। সত্য এবং ন্যায়ে আপনারা যেন নিজদিগকে আহুতি দিতে পারেন যাহাতে আপনাদের সন্তান-সন্ততি বংশ পরম্পরায় আপনাদের এই আহুতিদানের ফল লাভ করিতে পারে। একটি অধ্যাত্ম-সংগ্রাম আপনারা চালাইয়া যান, যেন, যখন জয় আপনাদের করতলগত হইবে—তখন উহা যেন আপনাদিগকে সংকীর্ণমনা না করিয়া দেয়,—উহা যেন আপনাদিগকে নিজেদের হাতে সরকারী ক্ষমতা রাখিতে প্রলুব্ধ না করে। আপনাদের এই সংগ্রাম যখন অধ্যাত্মসংগ্রাম তখন আপনাদের অস্ত্রও অধ্যাত্ম সৈনিকের অস্ত্র হইতে হইবে, আপনারা ক্রোধকে পোষণ করিবেন না, ঘৃণাকে প্রশ্রয় দিবেন না, সংকীর্ণতা, নীচতা এবং মিথ্যাকে মনে পোষণ করিবেন না।

আপনাদের মধ্যে নূতন প্রভাতের নূতন আশা এবং সুপ্রভাতের সুদৃঢ় বিশ্বাস আসুক এবং আপনাদের জন্য বন্দীদশায় শৃঙ্খলিত মানবদরদী গ্রীক উপকথায় বর্ণিত টাইটানের সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—যে দুঃখ অনন্ত, অসীম সেই দুঃখ যেন বহন করিতে পারি; মৃত্যু অথবা রাত্রির চাইতেও তমোময় অন্যায়কেও যেন ক্ষমা করিতে পারি; যে শক্তি সর্বশক্তিমান বলিয়া মনে হয় তাহাকে যেন অগ্রাহ্য করিতে পারি; যেন প্রেম ও ধৈর্য অবলম্বন করিতে পারি, যেন আশায় ভর করিয়া চলিতে পারি যতক্ষণ না সেই আশা নিজের ধ্বংসস্তূপ হইতে সেই ধ্যানের বস্তুকে সৃষ্টি না করিতেছে; আদর্শের পথ হইতে পরিবর্তন চাহি না, বিচ্যুতি চাহি না এবং অনুশোচনাও যেন না করি; হে টাইটান, আপনার গৌরবের মত ইহাই কল্যাণবাহী,

মহান এবং আনন্দময়, সুন্দর, মুক্ত, ইহাই জীবন, আনন্দ, সাম্রাজ্য এবং জয়লাভ। বন্দেমাতরম্।

বড়ই অনুতাপের বিষয় যে একটা জিদের হাওয়া সেখানে প্রবাহিত হইতেছিল। গান্ধীজী ছিলেন না, তাঁহার অনুপস্থিতিতে দেশবন্ধু তাঁহার ইচ্ছা, কাউন্সিলে প্রবেশ প্রস্তাব পাশ করাইয়া লইতে চাহিতেছেন, এই মনোভাবের জন্যই দেশবন্ধুর বক্তৃতা, তাঁহার যুক্তি ও তথ্য সবই পণ্ডশ্রমে পরিণত হইল। যখন বিষয় নির্বাচনী সভায় দেশবন্ধু কাউন্সিলে প্রবেশ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইল তখন দেখা গেল দেশবন্ধু বিপুল ভোটে পরাজিত হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষে ভোট পান ৮৯০টি এবং বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া হয় ১৭৪৮ টি। প্রদত্ত ভোটের সংখ্যায় দেখা যায়, ইহা দেশবন্ধুর শোচনীয় পরাজয়। এ প্রসঙ্গে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন: The subject committee rejected the council entry proposal by a large majority······Heated debate continued in the open session also and it was long-drawn-out······I opposed the amendment vehemently. C. Rajagopalachari, leader of the No-changers advocated our case with remarkable lucidity S. Srinivasa Iyenger moved a compromise amendment, but it was rejected ···The Gaya Congress adopted a number of resolutions but to us every thing seemed secondary compared to the council entry resolution which, when put to vote, was lost, two thirds of the aelegates voting against it.

আঘাতে ব্যথা লাগে। গয়া কংগ্রেসের এই পরাজয়ে দেশবন্ধু মর্মাহত হইলেন কিন্তু তিনি তাঁহার নিজের মতে অটল রহিলেন। পরাজয় যেন তাঁহার পরাজয়ই নয় এমনি সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে মুখের হাসি মুখে রাখিয়াই গয়া কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ করিলেন। তবে একটি কথা, সভাশেষে যখন কেহ কেহ বিজয় উল্লাসে জয়ধ্বনি করিতেছিল আবার কেহ কেহ পরাজয়ের বেদনায় মুখে নিরাশার ছায়া লইয়া আশঙ্কিত হইয়া উঠিল তখন দেশবন্ধু তাঁহার আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছিলেন: "Although to-day I differ from the majority of the members, I have not given

up the hope that a day will come when I shall get the majority on my side."

এক দলের বিজয় উল্লাস, এক দলের ম্লান মুখ—দুইটি দল। সত্য সত্যই গয়া কংগ্রেস হইতে কংগ্রেসের মধ্যে দুইটি দলের সৃষ্টি। পর পর চার দিন অধিবেশনের পরও দেশবন্ধুর বিশ্রাম ছিল না। No changer এবং Pro-changer—দুই দল তখন রাজনৈতিক দুই মতবাদের অধিকারী; ইহার সংক্ষেপিত ইতিহাস দেশবন্ধু বনাম গান্ধীজী।

ভোটে পরাজিত হইয়া দেশবন্ধু কংগ্রেসের সভাপতি পদে থাকিতে চাহিলেন না। স্থির করিলেন পদত্যাগ করিবেন। সেই অনুসারে তিনি তাঁহার পদত্যাগ পত্রও ওয়ার্কিং কমিটির কাছে পেশ করিলেন কিন্তু কমিটির No-changer দলভুক্ত সভ্যগণও দেশবন্ধুকে তাঁহার এই পদত্যাগের সিদ্ধান্তের বিষয় পুনরায় বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু দেশবন্ধু নিজের মতের পরিবর্তন করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি তখন পদত্যাগের সিদ্ধান্তে স্থির থাকিয়া বলিয়াছিলেন, "As I cannot carry the majority with me, I cannot continue as President and I will try to win over the majority through a new party which I am going to form."

মতিলাল নেহরুও সেই সঙ্গে কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীর পদ পরিত্যাগ করেন।

দেশবন্ধু নিজে যাহা বুঝিয়াছেন তাহার শেষ না দেখিয়া তিনি কোন দিন তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার লক্ষ্য কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া ভারতের স্বরাজ সাধনা। ৩১শে ডিসেম্বর (১৯২২ খ্রীঃ) গয়াতেই পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর বাসাবাড়ী টিকারীর রাজবাড়ীতে দেশবন্ধু তাঁহার নূতন দলের সৃষ্টি করেন। তাঁহার এই দলের নামকরণ হইল "কংগ্রেস খিলাফৎ স্বরাজ পার্টি"। এই স্বরাজ পার্টির প্রথম সভাতে দেশবন্ধু সভাপতিত্ব করেন এবং বলেন যে "গয়া অধিবেশনের প্রস্তাবের সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই। এই ভাবে কার্য চলিতে পারে না এবং স্বরাজের পথ এখন সুদূর। এখন আমাদের কর্তব্য কি? আমরা কি একেবারে কংগ্রেস ছাড়িয়া দিব? না কংগ্রেসে থাকিয়াই সমগ্র সভ্যমণ্ডলী ও দেশবাসীকে

আমাদের মতানুযায়ী পথে টানিয়া আনিব? আমার বিশ্বাস, বর্তমান সময়ের অবস্থানুসারে কেবল 'চরকার' সহায়তায়ই স্বরাজলাভ হইবে না। যেমন চরকা ও গঠনমূলক কার্য আবশ্যক, সেরূপ কাউন্সিলের ভিতরে প্রবেশ করিয়াও অমাত্যতন্ত্র অচল করা একান্ত কর্তব্য। এই পথেই দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।"

ইহার প্রায় পৌনে দুই মাস পরে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে এলাহাবাদে জেনারেল কমিটিতে পার্টির নাম কিছুটা সংক্ষেপ করিয়া রাখা হইল 'স্বরাজ্য দল'। এই দলভুক্তদের মধ্যে ছিলেন সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, কিরণশঙ্কর রায়, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সাতকড়িপতি রায়, মনোমোহন নিয়োগী, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, হেমপ্রভা মজুমদার, বসন্তকুমার মজুমদার এবং প্রতাপচন্দ্র গুহরায় প্রভৃতি।

এই দল গঠন সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র তাঁহার "The Indian struggle" গ্রন্থে একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, "The announcement came as an unexpected blow and cast a shadow on the jubilant faces of the Mahatma's supporters. Most of the outstanding intellectuals were on the side of the Deshbandhu."

মৌলানা আবুল কালাম আজাদও গয়া কংগ্রেসের পটভূমিকায় দেশবন্ধুর এই "স্বরাজ্যদল" গঠন সম্বন্ধে নীরব ছিলেন না। তিনিও তাঁহার "India Wins Freedom" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "During the Gaya session of the Congress, sharp differences of opinion appeared among the congress leaders. C. R. Das, Moti Lal Nehru and Hakim Ajmal Khan formed the Swaraj Party and presented the council entry programme which was opposed by the orthodox followers of Gandhiji. Congress was thus divided between No-changers and pro-changers. I tried to bring about a reconciliation between the two groups and we were able to reach an agreement in the special session of the congress in September, 1923."

গয়া কংগ্রেসের সময় আবুল কালাম আজাদ জেলে ছিলেন। কিছু পরেই

তিনি আলিপুর জেল হইতে মুক্তি পাইয়া নিজের কাজে ব্রতী হইলেন। গয়া কংগ্রেসের অধিবেশনে যে মতদ্বৈধের সৃষ্টি হয় এবং প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হয় ইহা অনেকেরই মনঃপূত ছিল না। উপরের লেখা হইতেও আজাদের মনোভাব বুঝিতে পারা যায়। তাই তিনি এই মতদ্বৈধভাব দূর করিয়া দ্বিধা বিভক্ত কংগ্রেসকে যাহাতে একতাবদ্ধ করা যায় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ওদিকে গান্ধীজীর অনুপস্থিতিতে কংগ্রেসের এই অবস্থা হওয়ায় বিশেষতঃ দেশবন্ধু ও মতিলাল নেহরু বাহির হইয়া নূতন দল গঠন করায় তিনিও জেলে থাকিতেও গভীর চিন্তা মগ্ন হইলেন।

আজাদ একটা মিলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি দেশবন্ধুকে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত কিছু না করিবার জন্য অনুরোধ জানান এবং অনুরোধ করিয়া বলেন যে কংগ্রেস যদি ঐ সময়ের মধ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অবতীর্ণ না হয় তবে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক বিশেষ অধিবেশনে দেশবন্ধুর উত্থাপিত কাউন্সিলে প্রবেশ প্রস্তাব পাশ করাইয়া দিবেন। আজাদ যখন দেশবন্ধুর সঙ্গে এই মর্মে কথা বলেন তখন রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই ব্যাপারে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও আজাদের মত মতবাদ গ্রহণ করেন। অবশেষে ২৪শে এপ্রিল No-changers এবং Pro-changers-দের একটি মিলিত বৈঠক দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে যাহারা উপস্থিত ছিলেন তাহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাজাগোপালচারী, সরোজিনী নাইডু, দেশবন্ধুও পণ্ডিত মতিলাল প্রভৃতি। তিন চার দিন এই অধিবেশনে চলে এবং ঐ আলোচনার ফলে উভয় দলের সম্মতিতে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইহার কয়েক দিন পরেই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং যমুনালাল বাজাজের বিরোধিতায় পূর্ব-গৃহীত উভয় দলের ঐ সম্মতিজ্ঞাপক কর্মসূচী বানচাল হইয়া যায়। বাধ্য হইয়া দেশবন্ধু পরবর্তী নির্বাচন যুদ্ধে জয় লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং উহার উপযুক্ত প্রচার কার্য চালাইবার জন্য দলের সকলকে নির্দেশ দিলেন।

বাহিরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে দেশবন্ধুর এই মতদ্বৈধ এবং ভিতরেও তাহাই অর্থাৎ বাংলা দেশে তাঁহার সমালোচকের অভাব ছিল না। বাংলাদেশের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা তাঁহার এবং তাঁহার দলের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া মিথ্যা প্রচারে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করিত না।

সুভাষচন্দ্র একখানি পত্রে লিখিয়াছেন, "সেদিনকার কথা এখনও আমার মনে স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। আমরা যখন গয়া কংগ্রেসের পর কলিকাতায় ফিরি, তখন নানাপ্রকার অসত্যে এবং অর্ধসত্যে বাংলার সব কাগজ ভরপুর। আমাদের স্বপক্ষে তো কথা বলেই নাই—এমন কি আমাদের বক্তব্যটিও তাদের কাগজে স্থান দিতে চায় নাই। তখন স্বরাজ্য ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ। যখন অর্থের খুব প্রয়োজন তখন অর্থ পাওয়া যায় না। যে বাড়িতে এক সময়ে লোক ধরিত না, সেখানে কি বন্ধু, কি শত্রু কাহারও চরণধূলি আর পড়ে না। কাজেই আমরা কয়েকটি প্রাণী মিলে আসর জমাতুম।"

কয়েকটি প্রাণীই দেশবন্ধুর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তিনি স্বরাজ্য দলের ব্যাখ্যা করিয়া দেশের সর্বত্র সভা-সমিতি করিয়া বেড়াইতেছিলেন। ঐ সময় বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় বরিশালে। উহা ১৯২৩ সালের ১২ই ও ১৩ই মে। উক্ত সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। দেশবন্ধু এই সভাতেও বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, কাউন্সিলে প্রবেশ করিবার প্রস্তাবটি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নিকট পুনরায় তাহাদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হউক। কিন্তু সভাপতি মহাশয় উহা মানিয়া লইতে সম্মত হইলেন না। ফলে স্বরাজ্য দল সেখান হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং আরও তিন চার দিন সেখানে থাকিয়া দেশবন্ধু স্বরাজ্য দল সম্বন্ধে তাঁহার ব্যাখ্যা সকলকে বুঝাইয়া বলেন। বিভিন্ন জায়গায় তাঁহার বক্তৃতার সময় দেশবন্ধু গান্ধীজীর সম্বন্ধে সুষ্ঠু সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, "Mahatma Gandhi has bungled and mismanaged the affairs of the Congress". ইহাতে গান্ধীজীর ভক্তগণ দেশবন্ধুর উপর বিরক্ত হইয়া বলিয়াছেন যে, দেশবন্ধু গান্ধীজীর নিন্দা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। দেশবন্ধু সত্যই গান্ধীজিকে শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়া কি শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির সমালোচনা করা যায় না? দেশবন্ধু তাহাই করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে তিনি গান্ধীজীর নিন্দা কখনও করেন নাই তবে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভুল-ত্রুটি বুঝিলে সমালোচনা করিবে ইহা তো গণতান্ত্রিক অধিকার। শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি থাকিলে উহা সংশোধনের জন্য সমালোচনা করাই তো দরকার, ইহাতে অশ্রদ্ধার কিছু নাই। বরং তাঁহার এই শ্রদ্ধার কথাই তিনি

বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যোগদান করিতে প্রথমেই বলিয়াছেন, "আমার চেয়ে গান্ধীভক্ত আর কেউ নেই। আমি তাঁর নিন্দা করেছি, এটা ভুল ধারণা। আমি তাঁর কাজের সমালোচনা করেছি এবং সেটা করার অধিকার আমার আছে। কারণ আমি মনে করি কংগ্রেস তথা দেশ গান্ধীর চেয়ে বড়ো।"

মে মাসের ২৭ তারিখে বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনেই স্বরাজ্য দলের সঙ্গে গান্ধী-কংগ্রেসের যে মতদ্বৈধ হইয়াছিল তাহার মিলনের জন্য যোগসূত্র স্থাপিত হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়াছিলেন পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন এবং উহা সমর্থন করিয়াছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। এই প্রস্তাব এবং উহা সমর্থনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহা হইল, যে সততা এবং উদ্দেশ্য লইয়া দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দল কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া দেশের সেবা করিতে চাহিতেছেন, তাহারা যদি সেইভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন তবে কংগ্রেস স্বরাজ্য দলের পথের বাধা হইয়া দাঁড়াইবে না।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বরাজ্য দল পরবর্তী নির্বাচনে জয়লাভ করিবার জন্য বিরাট এবং ব্যাপক প্রচার অভিযানে অবতীর্ণ হইলেন। দেশবন্ধুর তখন চোখে ঘুম নাই, মনে প্রত্যয়,—জয়লাভ তিনি করিবেনই। শুধু বাংলাই নয়, সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া প্রত্যেকটি প্রদেশে প্রদেশে তাঁহার প্রচারের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি চলিতে লাগিল। চতুর্দিকে সাজ সাজ রব, প্রচার যন্ত্রের পুরোভাগে স্বয়ং দেশবন্ধু। তিনি বোম্বাই হইতে বাংলায় প্রত্যাবর্তন না করিয়া সোজা চলিয়া গেলেন তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশ। গতিতে তাঁহার যতি নাই। বয়স হইয়াছিল তদুপরি তাঁহার স্বাস্থ্য মোটেই ভালো ছিল না। কিন্তু তাঁহার হিসাবে তাঁহার স্বাস্থ্য তখন গৌণ, তাঁহার সম্মুখের লক্ষ্য বিশাল ভারতের কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষ,—তাহাদের সেবা, তাহাদের মুখে হাসি ফুটাইবার প্রচেষ্টা, হাসি ফুটাইবার দায়িত্ব।

দেশবন্ধু তখন ঝড়ের গতিতে চলিয়াছেন। তিনি অন্ধ্রে প্রচার কার্য শেষ করিয়া মাদ্রাজ গেলেন। মাদ্রাজই ছিল গান্ধী-কংগ্রেসর মূল ঘাঁটি। মাদ্রাজকেই স্বরাজ্য দলের প্রধান স্তম্ভরূপে পরিণত করিবার উদ্দেশ্য তাই তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিলেন। এই অভিযানে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন আসামের

স্বরাজ্য দলের তরুণরাম ফুকন। তিনি প্রচারের কার্যোপলক্ষে গেলেন ভেলোর, কাঞ্চীভরম, কাভেলোর, কুম্ভকনাম, চিদম্বরম্, ট্রিচিনপলী, তাঞ্জোর, মাদুরা, তুতীর্কন, গুণ্টুর, সালেম, চিতোর ও নেলোর প্রভৃতি স্থানে। ইহার প্রত্যেকটি স্থানেই দেশবন্ধু অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, কাউন্সিলে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা, কংগ্রেসের ভিতর ও বাহিরের সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কথা প্রকাশ করিয়া শ্রোতাগণকে স্বরাজ্য দলে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার এই প্রচার অভিযানের সময় ভারতের আবহাওয়া এমন হইয়াছিল যে কংগ্রেসের অবস্থা অত্যন্ত নির্জীব হইয়া পড়ে কারণ তাঁহার অভিযানের সফলতা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কংগ্রেসের উপর অনেকের বিরূপ মনোভাব আনয়ন করিয়াছিল। তরুণরাম ফুকন এই অভিযান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "স্বরাজ্য দলের প্রচার কার্যের জন্য দক্ষিণ ভারত সফরের সময়ে দেশবন্ধুর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম যে, তাঁর বক্তৃতা শুনবার পর বহুলোক স্বরাজ্য দলের মতাদর্শ গ্রহণ করেছিল এবং গান্ধীপন্থীগণ যেন কিছু কালের জন্য ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। দেশবন্ধুই তখন দেশের প্রকৃত নেতা।"

এই মাদ্রাজেই একস্থানে দেশবন্ধু তাঁহার সমালোচকদের সমালোচনার উত্তরে তীব্র এবং গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন, "Am I a rebel? I would rather rebel against the congress and any institution in India if I feel that the realisation of the demand of Swaraj makes it necessary. I want Swaraj. I want my liberty. I am prepared to fight. I have not been a coward in my life. I want to fight and if necessary I am prepared to lay down my life. Begin to day, test me and I shall prove if I can not come up to your standard."

এই সময়ে দেশবন্ধু মহারাষ্ট্রে ছিলেন। সেখানে তিনি প্রাদেশিক সম্মিলনীতে যোগদান করিয়া কাউন্সিলে প্রবেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার সময়, সমালোচনার মনোবৃত্তি লইয়া নহে, শুধু ঘটনা প্রবাহের উল্লেখ করিতে গিয়া, ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজী বড় লাটের

আপস প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া যে ভুল করিয়াছিলেন, দেশবন্ধু সে-কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে তখন হইতে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করিতে থাকে এবং এই জটিল-জাল ছিন্ন করিতে কাউন্সিলে প্রবেশ করাই একমাত্র পথ। আইন-সভায় প্রবেশ করিয়াই দেশের সেবা করিবার অপূর্ব সুযোগ,—বুরোক্রাসী তখন প্রতিপদে বাধাপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে। তিনি একটি সভায় বলিয়াছিলেন, "Not that I love the congress less but I love the country more."

তিনি বলিয়াছিলেন, "Is council entry against Non-co-operation? No, it is only another form of the same activity. Is council boycott a sacred thing not to be touched? My answer is: there is another thing which is more sacred than the congress; that is the liberty of the Indian people."

অপূর্ব বক্তৃতা আর কথার যৌক্তিকতায় চিত্তরঞ্জন উপস্থিত জনসাধারণের মন জয় করিতে লাগিলেন। মানুষকে মুগ্ধ করিতে তিনি যেন মন্ত্র জানিতেন। সুভাষচন্দ্র তাঁহার 'Indian struggle' গ্রন্থে দেশবন্ধুর এই গুণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন। দেশবন্ধু তখন দাক্ষিণাত্যের একটি সভাস্থলে জনগণকে কাউন্সিলে প্রবেশ করিবার জন্য বক্তৃতা করিতেছিলেন। বক্তৃতা করিতে করিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "You test me and I shall prove if I cannot come up to your standard." সভায় শুধু স্বপক্ষের লোকই উপস্থিত ছিলেন না। অনেক বিরুদ্ধ পক্ষের লোকও উপস্থিত ছিলেন। দেশবন্ধু নিজে জনগণের সম্মুখে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত, জনগণ তাঁহাকে পরীক্ষা করুক। কিন্তু দেখা গেল সেই বিরুদ্ধবাদীগণ পরীক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ না করিয়া পরিণত হইল দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের সভ্যে।

বাংলা-ভূমিতেও দেশবন্ধু তাঁহার স্বরাজ্য দলের প্রচারে গভীর মনোনিবেশ করিলেন। কোথাও গেলেন পায়ে হাঁটিয়া, কোথাও গাড়ীতে। তাঁহার তখন বিশ্রাম নাই। তিনি একাই একশ' হইয়া সর্বত্র ঘুরিতে লাগিলেন। এমন সময় এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহাতে পরোক্ষভাবে দেশবন্ধুর প্রচার অভিযানে অনেক সুবিধা হইল। ঘটনাটি এই: লর্ড লিটন তখন বাংলার গভর্ণর আর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-

চ্যান্সেলার। বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি বিলের খসড়া লইয়া এক দিকে লর্ড লিটন ও শিক্ষামন্ত্রী স্যার প্রভাস মিত্র এবং অন্য দিকে স্যার আশুতোষ ও সিণ্ডিকেটের মধ্যে মনের অমিলতা সৃষ্টি হয়। ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই লর্ড লিটন আশুতোষকে তোষণ করিয়া ও একটু ভয় দেখাইয়া একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। চিঠিখানি এই মর্মে লেখা ছিল যে আশুতোষ যদি লর্ড লিটনের আদেশ ও ইচ্ছা অনুসারে কার্য করেন তবে তাঁহাকে সেই বারের মত ভাইস-চ্যান্সেলারের কার্যকাল শেষ হইলেও পুনরায় তাঁহাকেই উক্তপদে বহাল রাখা হইবে। ইহা ছাড়া লর্ড লিটনের আরও অভিযোগ ছিল যে আশুতোষ সরকারকে সাহায্য না করিয়া বিরোধিতাই করিয়া চলিয়াছেন এবং নিজে উক্ত বিলের সমালোচনা করিয়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে উহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করাইয়াছেন যাহা পাঠে মানুষের মনে সরকারের শাসন সম্বন্ধে অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হইতে পারে।

বাংলার বাঘ আশুতোষ! তাঁহাকে পদমর্যাদার প্রলোভন দেখাইয়া বা ভয় দেখাইয়া হাত করা তাই লিটনের অসাধ্য হইল। ফলে বিদ্বেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল আরো। সরকারের বিরুদ্ধে আশুতোষের মন বিষিয়া উঠিল। চিত্তরঞ্জন এই সুযোগ ছাড়িবেন কেন? এই প্রসঙ্গে Life and Times of C. R. Das পুস্তকে Prithwis Roy বলিয়াছেন: At this time. Sir Ashutosh Mookerjee and chitta Ranjan Das were concerting a joint measure of opposition to paralyse all sinisiter attempts to rob the University of calcutta of its academie freedom. Strengthened by the moral support of Sir Ashutosh and by his undertaking that, on his retirement from the bench, he would come and work with the Swarajya Party, Chitta Ranjan went about the country with renewed hope and confidence for the propagation of the new gospel and raised a raging agitation on behalf of his new creed. He knew no rest or peace and passed sleepless nights over his campaign, and such was the magic of his personality and his persuasive tongue that within six or seven months time,

he had induced a large number of non-co-operating congress men to accept his new programme."

পূর্বে ছাত্র আন্দোলন ব্যাপারে স্যার আশুতোষ চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে একটু বিরূপ সমালোচনা করিলে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, ঐ পুরুষ-সিংহ একদিন দেশ সেবার মহান ব্রতকে তাহার জীবনেরও একমাত্র স্থির লক্ষ্য করিয়া ঐ ব্রতে যোগদান করিবেনই। চিত্তরঞ্জনের মনে মনে পোষণ করা সেই ধারণা তখন সত্যে পরিণত হইল। আবার চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে আশুতোষেরও খুব উচ্চ ধারণা ছিল। চিত্তরঞ্জন যখন বিশাল সাম্রাজ্যের বিপুল আয় স্বরূপ তাঁহার আইন-ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া দেশসেবাকেই জীবনের ধ্রুব-লক্ষ্য-রূপে গ্রহণ করিলেন তখন নাকি আশুতোষ বলিয়াছিলেন, ইচ্ছা হয় চিত্তের মত সব ত্যাগ করিয়া দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করি। সেই দেশ-সেবার কাজে চিত্তরঞ্জন এখন স্যার আশুতোষকে তাহার সহায়রূপে পাইলেন। নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় দেশবন্ধু তখন এক দিক হইতে অন্য দিকে ছুটিলেন তাঁহার স্বরাজ্য দলকে শক্তিশালী করিতে। তখন তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা তিরোহিত হইয়াছে, চোখের ঘুম বিদায় লইয়াছে। এমন দিনও গিয়াছে যে পথের ক্লান্তি, তদুপরি ১০।১২ ঘণ্টা সভার পর সভায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। তখন তিনি শুধু বক্তা নহেন, তিনি সাধক; ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ম করা নয়,—নিশ্চিত ফল লাভের দৃঢ় প্রত্যয় লইয়া কর্মের সাধনা করিয়া চলিয়াছেন।

কিন্তু প্রচার কার্যে যেমন বক্তৃতার অভিযান প্রয়োজন ঠিক তেমনি প্রয়োজন মুদ্রাযন্ত্রের অর্থাৎ কাগজের। ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে যে আর্থিক দুর্গতির সময় দেশবন্ধুর একমাত্র সহায় ছিল তাঁহার এক পয়সা মূল্যের কাগজ 'বাংলার কথা'। কিন্তু নির্বাচন পর্বের জন্য নিজস্ব একখানি ইংরাজী কাগজ থাকা দরকারই। কিন্তু টাকা কোথায়? দেশবন্ধু তাই কিছুদিন যাবৎই 'সার্ভেণ্ট' কাগজখানি নিতে পারেন কিনা সে-সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন। সার্ভেণ্ট কাগজখানিও তখন টাকার অভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। দেশবন্ধু একদিন সার্ভেণ্ট অফিসে গিয়াই উপস্থিত হইলেন এবং শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীকে তাঁহার মনের কথা খুলিয়া বলিলেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে শ্যামসুন্দর দেশবন্ধুর বিরুদ্ধ পক্ষে, তিনি ছিলেন No-changer. সুতরাং দেশবন্ধু তাঁহার

মনের সরলতা লইয়া যেমন প্রস্তাব করিতে পারিয়াছিলেন, শ্যামসুন্দর কিন্তু তেমন ভাবে সাড়া দিতে পারিলেন না।

ওদিকে নির্বাচন আসন্ন। দিন যতই নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হইতেছে একখানি ইংরাজী কাগজের তীব্র প্রয়োজনীয়তা ততই বেশী করিয়া অনুভূত হইতেছে। কথায় বলে, 'সাধু যাহার উদ্দেশ্য ভগবান তাহার সহায়'। নভেম্বরের শেষে নির্বাচন। দেশবন্ধু অক্টোবরের ২০শে 'ফরোয়ার্ড পাবলিশিং কোম্পানী লিমিটেড্' নামে একটি সংস্থা গঠন করিয়া 'ফরোয়ার্ড' কাগজ বাহির করেন। ইহার পরিচালক সমিতিতে ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, তুলসীচরণ গোস্বামী এবং প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা। আর যাহারা এই কাগজ বাহির করিবার প্রয়াসে দেশবন্ধুকে সেদিন অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন তাহারা হইলেন মেদিনীপুর জেলার নাড়াজোলের দেবেন্দ্রলাল খান, তুলসীচরণ গোস্বামী এবং নির্মলচন্দ্র চন্দ। দেশবন্ধু কিছু দিন ইহার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। আর সম্পাদকরূপে ছিলেন প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী। কে সম্পাদক আর কে সম্পাদক নহেন উহা তখন বড় কথা ছিল না। উহার সামগ্রিক দায়িত্ব বলা চলে সুভাষচন্দ্রের উপরই ছিল। স্বাভাবিকই বুঝিতে হইবে যেখানে দেশবন্ধু এ সুভাষচন্দ্র রহিয়াছেন সে-কাগজের প্রচার এবং আদর্শ কি ধরনের হইবে। তখনকার দিনে এই ফরোয়ার্ড কাগজখানি সত্য প্রকাশে অকুতোভয়। দলীয় প্রচারের সঙ্গে সরকারের সমালোচনাও ছিল ইহার একটি অঙ্গ। সরকারী অফিসের যাহা গোপন তথ্য, ফরোয়ার্ড কোথা হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়া দিত, ফলে পাঠক মহলে ইহার জনপ্রিয়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দেশবন্ধুর এই ফরোয়ার্ড কাগজ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র তাঁহার Indian struggle গ্রন্থে বলিয়াছেন "In the field of journalism, too, the Swarajist made much progress. In calcutta, the Deshabandhu launched his daily paper Forward in October, soon after his Victory at Delhi. As some of the organisers of the paper were suddenly put into prison without trial, I was entrusted with the organisation of the paper……success followed rapidly and in its career the paper was able to keep pace with growing popularity and strength

of the party. Within a short time Forward came to hold a leading position among the nationalist journals in the country. Its articles were forceful, its news service varied and up-to-date and the paper developed a special skill in the art of discovering and exposing official secrets."

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে বাংলা দেশের অনেক কাগজ দেশবন্ধুকে সমর্থন করেন নাই অধিকন্তু তাহারা সমালোচনাও করিয়াছেন। শ্যামসুন্দর বাবুকে দেশবন্ধু পাইলেন না। বিপিন পাল মহাশয় লোকমান্য তিলকের Responsive Co-operation যাহার অর্থ সরকারের ভালো কাজের সহায়ক এবং মন্দ কাজের বিরোধী এই মধ্যবর্তী মতবাদের সমর্থন করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকায় মাঝে মাঝে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিতেন। স্যার সুরেন্দ্রনাথের একখানি কাগজ ছিল,—তাহার নাম 'বেঙ্গলী'। উহার তখনকার সম্পাদক ছিলেন পৃথ্বীশ চন্দ্র রায়। তিনি ছিলেন দেশবন্ধুর বন্ধু এবং দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলকে তিনি সমর্থন করিবেন বলিয়াও কথা দেন। এ প্রসঙ্গে পৃথ্বীশ চন্দ্র রায় Life and times or C. R. Das গ্রন্থে লিখিয়াছেন: In his effort to capture as many seats as possible in the local Council for his party at the General Election of November that year (1923), Chitta Ranjan was greatly helped by the Advocacy of the Bengalee which of all newspapers in the province had taken up his cause with a singular enthusiasm."

চট্টলের বীর যতীন্দ্রমোহন এখন দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের সম্পাদক। তিনি আবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতিও। নির্বাচনের দিন সমাগত। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় হইতে মোট ৫৭ জন প্রার্থীকে স্বরাজ্য দল দাঁড় করাইল। এই আসনগুলির মধ্যে কয়েকটি আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খুব সাড়া পড়িয়াছিল। যেমন বড়বাজার, ব্যারাকপুর, ভবানীপুর এবং নদীয়া। দেশবন্ধু বাংলার জেলায় জেলায় প্রত্যেকটি নির্বাচন কেন্দ্রে একাধিকবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া নির্বাচনী বক্তৃতা দিতেছিলেন। আর পশ্চাতে ছিল মুদ্রাযন্ত্র,—তাঁহার দলীয় কাগজ 'ফরোয়ার্ড'। ফরোয়ার্ডে ভোটদাতাদের উদ্দেশ্যে চিত্তরঞ্জনের একখানি

আবেদন ছাপা হইল। আবেদনটি এই: Limited monarchy is a theory of Law, unlimited power of the people is a political fact. The constitutional cry of a 'limited bureaucracy' is a servile imitation of the law in England. In India freedom is inconsistant with the maintenance of bureaucracy in any shape or form. The system must be ended. That is the practical ideal of the Swarajya Party within the congress. I appeal to all Voters in Bengal,· Mohammedan and Non-Mohammedan, for the council or the Assembly to vote solid for all Swarajya candidates for the Assembly as well as for the council, including those who have stood for the Universities of Calcutta and Dacca. Patriotism requires it. The honour of Bengal demands it [Forward, Nov. 21, 1923]

চিত্তরঞ্জনের তখন হাত শূন্য। মাত্র শ'দুই টাকা তখন তাঁহার ছিল। কিন্তু নির্বাচন-যুদ্ধে অর্থের প্রয়োজন আছেই। বাধ্য হইয়া তিনি টাকা ধার করিলেন। ভূকৈলাসে' রাজার নিকট তিনি পূর্বেই ঋণী ছিলেন। তখন দেশবন্ধু তাঁহার বাসভবনখানি দায়াবদ্ধ রাখিয়া আরও চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিলেন।

বড়বাজার নির্বাচনী কেন্দ্রে স্বরাজ্য দলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন এড্-ভোকেট জেনারেল সতীশরঞ্জন। আর ব্যারাকপুর কেন্দ্রে নির্বাচন প্রার্থী হইয়াছিলেন মডারেট দলের প্রধান স্তম্ভ এবং ব্যারাকপুর অধিবাসী স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ব্যার'কপর নির্বাচন যুদ্ধেই বাংলা তথা ভারতের দৃষ্টিকে সমধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল। যুবক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কোন দলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি স্বতন্ত্রপ্রার্থী হিসাবে ব্যারাকপুর কেন্দ্রে নির্বাচনপ্রার্থী হইয়াছিলেন। ঐ নির্বাচন যুদ্ধে দেশবন্ধু বিধানচন্দ্রকেই সমর্থন করিয়া তাঁহার স্বরাজ্য দলের সমস্ত শক্তি সেখানে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ওদিকে সুরেন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তাও কম ছিল না। তিনি অবশ্য মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া কিছু লোকের অসন্তুষ্টির কারণ হইয়াছিলেন। আবার মন্ত্রী হইয়া তিনি কলিকাতা করপোরেশনের এমন আইন রচনা এবং প্রবর্তন

করেন যাহা পরবর্তী সময়ে করপোরেশনকে স্বরাজের পথে চলিবার পথকে সুগম করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং এই মিউনিসিপাল আইন পাশ করাইয়া তিনি তাঁহার হৃত গৌরব অনেকটা পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। সুতরাং শক্তিশালী সুরেন্দ্রনাথ। নির্বাচন দ্বন্দ্ব ওখানে দেশবন্ধু আর সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে; স্বরাজ্য দলের সঙ্গে মডারেট দলের,—নো-চেঞ্জারের সঙ্গে প্রো-চেঞ্জারের।

সুতরাং দেশবন্ধু ব্যারাকপুরে অনেক সভা আর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিপক্ষের সকল বক্তৃতা শুনিতেন এবং পরে ধীরে ধীরে তাঁহার প্রতিপক্ষের প্রতিটি কথার উত্তর দিতেন। একদিন সভায় দেশবন্ধুর আঙ্গুলে একটি ঢিল আসিয়া তাঁহাকে আঘাত করে। অপূর্ব সহনশক্তি তাঁহার। রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন না, শুধু একটু হাসিলেন। পরে বলিলেন যে, "ভাই! যদি সাহস থাকে তবে সম্মুখে আসিয়া আঘাত কর। দূর হইতে ঢিল ছুঁড়িয়া আঘাত করা কাপুরুষের লক্ষণ। ঐ কাপুরুষের কলঙ্ক কেন বহন কর"।

বলা বাহুল্য ব্যারাকপুরে বিধানচন্দ্র বিপুল ভোটে সুরেন্দ্রনাথকে পরাজিত করিয়াছিলেন আর বড়বাজারেও দেশবন্ধুর নিকট আত্মীয় এড্‌ভোকেট জেনারেল সতীশরঞ্জন স্বরাজ্য দলের প্রার্থী সাতকড়িপতি রায়ের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছিলেন।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ভবানীপুর কেন্দ্র। ভবানীপুরে সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক দাঁড়াইয়াছিলন স্বরাজ্য দলের বিরুদ্ধে। মিঃ মল্লিক ভবানীপুরের বিখ্যাত ব্যক্তি, পূর্বে তিনি কলিকাতা করপোরেশনের চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন এবং সেই অঞ্চলের অনেকের অনেক প্রকার সুযোগ-সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। সকলেই দেশবন্ধুকে ঐ কেন্দ্রে দাঁড়াইবার জন্য অনুরোধ করিল কিন্তু দেশবন্ধু নিজে না দাঁড়াইয়া সুরেন হালদারকে দাঁড করাইবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। দলের অনেকেই অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। —বলিল, "ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া পার্টি এখনও বুঝিতে পারি না। আপনি নিজে দাঁড়ান"।—তাহারা আরও বলিল, "এই কেন্দ্রটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং আপনার নিজেরই এখানে দাঁড়ান উচিত নতুবা এখানে অকৃতকার্য হইতে হইবে।" বক্তাদের মধ্যে কেহ unsuccessful কথাটি উচ্চারণ করিয়াছিল। কথাটি দেশবন্ধুর কানে পৌছিয়াছিল। তিনি উত্তর দিলেন, "unsuccessful! জীবনে কখনই হই নাই, হইবও না।

আপনারা কেবল আমার ভাবে কাজ করিয়া যান।" বলা বাহুল্য যে, নির্বাচনে স্বরাজ্য দলেরই জয়লাভ হইয়াছিল।

তৎপর নদীয়া কেন্দ্রের নির্বাচনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে স্বরাজ্য দলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল কৃষ্ণনগরের আইনজীবী ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী। স্বরাজ্য দলের প্রার্থী ছিলেন দেশবন্ধুর স্নেহভাজন সহকর্মী অধ্যাপক হেমন্ত-কুমার সরকার। এই নির্বাচন উপলক্ষে নবদ্বীপে বড় আখড়ায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। দেশবন্ধুর পূর্বে বিরুদ্ধপক্ষের প্রার্থী ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী বক্তৃতা করিয়া গেলেন। নিজের মতবাদকে সমর্থন করিয়া অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথের উপযুক্ত শিষ্যের মতই তিনি বলিলেন যে যাহারা এই শাসন সংস্কারকে ভূয়া বলে তাহারা ঠিক নহে; যাহারা বলেন মন্ত্রীগণ বুরোক্রাট্ তাহারাও ঠিক নহে। এই শাসন সংস্কারের মধ্য দিয়াই, এই মন্ত্রীদের মাধ্যমেই দেশের কাজ করিয়া যাইতে হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

পরে দেশবন্ধু সেই সভাতেই বক্তৃতার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সভা তখন নিস্তব্ধ, দেশবন্ধু কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য সকলেই উন্মুখ। বিশেষতঃ ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী যাহা বলিয়া গেলেন তাহার বিরুদ্ধে দেশবন্ধু কি যুক্তি উপস্থাপিত করেন তাহা শুনিবার জন্য সকলেই আগ্রহী। দেশবন্ধুও বলিতে লাগিলেন: আমার প্রিয় বন্ধু আপনাদের বলেছেন, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। কথাটা শুনতে ভাল কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যদি সেই কানা মামা লম্পট হয়, তবুও কি তাকে আপনারা ভাল বলবেন? এই শাসন সংস্কার আমাদের কিছুই দেয়নি,—কাউন্সিলে গিয়ে আমি এর স্বরূপটি উদ্ঘাটন করতে চাই। কংগ্রেস কেন এই নতুন শাসন-সংস্কার প্রত্যাখ্যান করেছে? ঋষি বঙ্কিমের কমলাকান্তের দপ্তরে শিবু তেলির গল্পটা একবার স্মরণ করুন—স্মরণ করুণ সেই শীর্ণকায় কুকুরটার কথা। সে করুণ চোখে ও প্রার্থনাপূর্ণ দৃষ্টিতে তার মনিবের আহারের থালার দিকে তাকিয়ে আছে। মনিব তার পাতের মাছের কাঁটাখানি উত্তমরূপে চুষে তার মুখের সামনে ফেলে দেয়, কিন্তু তাতে কুকুরের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। এই রিফর্মটাও ঠিক তাই,—কাঁটা চোষা মাছ। আমাদের জাতীয় দাবী পূর্ণ হয় এমন কিছু এর মধ্যে নেই। যদি বুঝতাম আছে, তাহলে অমৃতসর কংগ্রেসে আমিই সকলের আগে এটা

গ্রহণ করতাম ও আপনাদের গ্রহণ করতে বলতাম"। বলাবাহুল্য যে নদীয়ায় এই নির্বাচনে হেমন্ত সরকারই ইন্দুভূষণ ভাদুড়ীকে পরাজিত করিয়া কাউন্সিলে নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

আর একটি উল্লেখযোগ্য নির্বাচন কেন্দ্র ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এই কেন্দ্রেই সবচেয়ে অধিক সংখ্যক নির্বাচন প্রার্থী দাঁড়াইয়াছিলেন। প্রার্থী ছিলেন পাঁচ জন। স্যার নীলরতন সরকার, বাগের হাটের বিখ্যাত শিক্ষক প্রসন্নকুমার রায়, বিপন কলেজের অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ, রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র ঘোষ এবং বিখ্যাত উকিল বিজয়কৃষ্ণ বসু। বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন স্বরাজ্য দলের প্রার্থী। পাঁচজনের জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এ-যুদ্ধে স্বরাজ্য দলের প্রার্থী বিজয়কৃষ্ণই জয়লাভ করিষা কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

আবার কলিকাতার মধ্যেই স্বরাজ্য দলের একটি পরাজয়ও উল্লেখযোগ্য। উত্তর কলিকাতা নির্বাচন কেন্দ্রে স্বরাজ্য দলের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন ডাক্তার শশীকুমার সেন। তিনি সেখানে যতীন্দ্রনাথ বসুর নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।

তবে জয়জয়কার স্বরাজ্য দলের,—দেশবন্ধুব। তিনি জীবনে অকৃতকার্য হন নাই, এবারেও তাহাই দেখাইয়া দিলেন। গান্ধীজী এবং গান্ধীজীর প্রভাবিত কংগ্রেসকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্বরাজ্যদল গঠন করিয়া যে অসীম সাহস ও দৃঢ মনোবলের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার চাইতেও No-changerদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সর্বভাবতীয় কাউন্সিল নির্বাচনে তাঁহার স্বরাজ্য দলের প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও জয় লাভ করা দেশবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক। এই সময়ে কোন কোন সংবাদপত্রেও দেশবন্ধুর এই জয়লাভে তাহাদের কাগজের পৃষ্ঠায় ইহাকে উল্লেখযোগ্য জয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে S. Gopal নামক একজন ঐতিহাসিক তাহার "The Viceroyalty of Lord Irwin" পুস্তকে লিখিয়াছেন, "The Swarajists were elected to a majority of seats in the Central Provinces, formed the single largest party in Bengal and acquired considerable strength in Bombay and the United Provinces. Their success in Madras, the Punjab and Bihar and Orissa was less spectacular."

দেশবন্ধু তাঁহার স্বরাজ্য দলের জয়লাভের জন্য নির্বাচনী কেন্দ্রে শত শত সভা-সমিতি করিয়াছিলেন। অধিকাংশ সভাতেই তিনি তাঁহার বক্তৃতার শেষে জোরের সঙ্গে বলিয়াছিলেন, "The Reforms are mere moonshine. They mean nothing. I want to expose them and wreck them."

স্বরাজ্য দলের জয়লাভের পর গভর্ণর লর্ড লিটন দলপতি হিসাবে দেশবন্ধুকে গভর্ণমেণ্ট হাউসে (রাজ-ভবন) ডাকিয়া তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব গঠন করিবার জন্য আহ্বান জানান। সেদিনটি ছিল ১৯২৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর। গভর্ণর এবং দেশবন্ধুর মধ্যে সেদিন প্রায় দেড় ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা হয়। পূর্ণ ক্ষমতা হাতে না পাইলে দেশবন্ধু মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন না ইহাই ছিল তাঁহার ও স্বরাজ্য দলের অভিমত। সুতরাং তাঁহার দলের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া তিনি কোন অভিমত প্রকাশ করিতে পারিলেন না এবং দলের সঙ্গে কথা বলিয়া তাহাদের সিদ্ধান্ত জানাইবেন বলিয়া লর্ড লিটনকে জানাইয়া আসিলেন। কয়েক দিন পরে চিত্তরঞ্জন লর্ড লিটনকে চিঠি লিখিলেন :

148, Russa Road South,
Bhowanipur, the 16th Dec, 1923,

Your Excellency,

I placed before our party the position as explained by your Excellency and they have just declined not to accept your Excellency's kind offer. The members of this party are pledged to do everything in their power by using the legal right granted under the Reforms Act to put an end to the system of dyarchy. This duty they can not discharge if they accept office. The party is aware that it is possible to offer obstruction from within by accepting office, but they do not consider it honest to accept office which is under the existing system in your Excellency's gift and then turn it into an instrument of obstruction. The awakened consciousness of the people of this country demands a

change in the present system of Government and until that is done or unless there is some change in the general administration indicating a change of heart, the people of the country can not offer willing co-operation. Under the circumstances I regret I cannot undertake responsibility regarding the transferred departments. My party however wishes to place on record their appreciation of the spirit of constitutionalism which actuated you in making the offer which we feel bound not to accept.

C. R. Das

১৪৮নং রসা রোড সাউথ

ভবানীপুর, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯২৩

মান্যবর,

পরিস্থিতিটি মান্যবর কর্তৃক যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা আমি আমার দলের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছি কিন্তু দল ঐ আহ্বান গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। এই দলের সভ্য-সদস্যগণ দ্বৈত শাসনের রীতি-পদ্ধতির উপর যবনিকা পাত করিতে চাহেন এবং উহা করিতে গিয়া শাসন সংস্কার বিলে প্রদত্ত সকল আইনানুগ অধিকার প্রয়োগ করিয়া তাহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পদ্ধপরিকর আছেন। তাহারা যদি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন তবে তাহারা এই কর্তব্য সম্পাদনে অসমর্থ হইবেন। শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া অভ্যন্তর হইতে বাধা প্রদান সম্ভব; পার্টি এই সম্পর্কে সচেতন আছেন কিন্তু মান্যবরের নিকট হইতে বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী ঐ ক্ষমতা উপহাস হিসাবে গ্রহণ করিয়া ঐ যন্ত্রকে একটি বাধা-প্রদানকারী শক্তিরূপে ব্যবহার করিতে আমার দল অসদুপায় বলিয়া মনে করেন। দেশ শাসনের বর্তমান পদ্ধতির পরিবর্তন দেশবাসীর জাগ্রত চেতনা দাবী করিতেছে এবং যতদিন না ঐ পরিবর্তন আসে, যতদিন না প্রশাসনের ব্যাপারে হৃদয়ের পরিবর্তন সূচিত হয় দেশবাসী স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া সহযোগিতা করিতে পারে না। এই অবস্থায়, হস্তান্তরিত বিভাগগুলির দায়িত্ব লইতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। আপনি যে

সংবিধান সম্মত পদ্ধতির মনোভাব দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এই আহ্বান জানাইয়াছেন, যাহা আমাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নহে তথাপি আমার দল সেই মনোভাবটির প্রশংসা করিয়া উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে ইচ্ছুক।

সি. আর. দাশ

সুতরাং কাউন্সিলে দেশবন্ধুর নূতন চেহারায় প্রবেশ। সদলবলে চিত্তরঞ্জন সিংহ-বিক্রমে বিরোধী দলের নেতা হইলেন। তিনি হইলেন সরকারের ভীতির কারণ।

আইন সভায় প্রবেশ করিয়া চিত্তরঞ্জন রাজনীতির ক্ষেত্রে আবার এক নূতন মোড নিলেন। তিনি মনে করিলেন এ-দেশে হিন্দু-মুসলমানের দেশ, তাহাদের ঘর-বাড়ী পাশাপাশি, জীবন-যাত্রার প্রণালী, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে প্রায় একই প্রকার। সুতরাং এ-দেশের স্বাধীনতা, সুখ-সমৃদ্ধির জন্য এই দুই জাতির মিলিত প্রচেষ্টা একান্তই প্রয়োজন। তাই তিনি কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট করিলেন। এই হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট লইয়া তখন দেশের বুকে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছিল। বিভিন্ন দল এবং মতাবলম্বীগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার সমালোচনা করিতে লাগিলেন। দেশ-প্রেমিক, বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম এই হিন্দু-মুসলমানের প্যাক্ট সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

নিন্দা গ্লানির পঙ্ক মাখিয়া, পাগল মিলন হেতু
হিন্দু-মুসলমানের পরাণে তুমিই বাঁধিলে সেতু।

এই প্যাক্ট সম্বন্ধে বিস্তারিত না হইলেও একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। ১৯০৯ সালে মিন্টো-মর্লি শাসন সংস্কার এদেশে প্রবর্তিত হয়। তখন হইতেই হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার সৃষ্টি, যাহার রাজনৈতিক অর্থ এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের বীজ পুঁতিয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহার পরে অবশ্য লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস অধিবেশনের পর কংগ্রেস-লীগের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। কংগ্রেসের কোকনদ অধিবেশন এ সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। অধিবেশনে মৌলানা মহম্মদ আলি ছিলেন সভাপতি। বাংলাদেশ হইতে অনেকে

গিয়াছিলেন, তাহারা দেশবন্ধুর বেঙ্গল প্যাক্টের বিরুদ্ধে ছিলেন। চিত্তরঞ্জন নিশ্চিত করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, বেঙ্গল প্যাক্টকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়া কার্যকরী করিতে হইলে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে উহা পাশ করাইয়া লওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে তিনি অধিবেশনে ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করিলে দেশবন্ধু আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারিলেন না, উহা অধিবেশনে অগ্রাহ্য হয়। অধিবেশনের মণ্ডপে তখন হৈ-হৈ ব্যাপার,—নানা দিক হইতে একটি রব উঠিল, 'Delete the Bengal Pact', 'Delete the Bengal Pact'.

জীবনে তাঁহার বিরুদ্ধে এমন বিক্ষোভ দেশবন্ধু দেখেন নাই। তিনিও উহা সহজ ভাবে গ্রহণ না করিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "You can delete the Bengal Pact from the resolution, but you cannot delete Bengal from the history of the Indian National Congress. Bengal demands her right of having her suggestion considered by the national assembly. What right has any body to say that Bengal has to be deprived of her right. Bengal will not be deleted in his unceremonious fashion. He could not understand the argument of those "Delete Bengal Pact".

Is Bengal untouchable? Will you deny Bengal the suggestion on such a vital question? If you do, Bengal can take care of itself. You can't refuse Bengal to make a suggestion."

দেশবন্ধু করিয়াছিলেন Bengal Pact আর কংগ্রেসের অধিবেশনে ঠিক হইল যে, একটি 'ভারতীয় প্যাক্ট কমিটি,' ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি চুক্তির কথা বিবেচনা করিয়া দেখিবে। কংগ্রেসের মধ্যে অনেকে বলিলেন, এই কারণেই দেশবন্ধুর Bengal Pact সমর্থন করা হয় নাই। আবার দেশবন্ধুও বলিলেন, "এতে আমাদের কথাই রয়েছে। আমরাও তো Bengal Pact বিচার করার কথাই বলেছিলাম।"

দেশবন্ধুর এই Bengal Pact যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা মোটামুটি ভাবে নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১। ব্যবস্থাপক সভাতে হিন্দু-মুসলমান লোক-সংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে। কিছু সময় পর্যন্ত পৃথক নির্বাচন হইবে।

২। জিলা বোর্ডে এবং স্থানীয় বোর্ডের নির্বাচনের সময় যে স্থানে মুসলমানগণ সংখ্যায় অধিক সেখানে তাহারা শতকরা ষাটজন নির্বাচিত হইবেন আবার যেখানে হিন্দুগণ সংখ্যাধিক্য সেখানে হিন্দুগণ নির্বাচিত হইবেন। বাকী চল্লিশজন পৃথক অথবা মিশ্রিত।

৩। জনসংখ্যা অনুপাতে মুসলমানগণের জন্য চাকুরীর ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী শতকরা ৫৫টি সরকারী চাকুরী মুসলমানগণ পাইবেন। এই সংখ্যা পরে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ৫২তে দাঁড়ায় কারণ দেখা যায় যে জনসংখ্যার হিসাব মুসলমানগণ ৫২ এবং হিন্দু ৪৮।

৪। আইন প্রণয়ন করিয়া ধর্ম বিষয়ের কোন ব্যাপারে (যেমন ঈদের সময় গো কোরবানি) বাধা-নিষেধ করা হইবে না। ধর্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা চলিতে পারিবে যদি সেই বিষয়ে সেই সম্প্রদায়ের শতকরা পঁচাত্তর জন ঐ হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন। ধর্মীয় ব্যাপারে যদি গো কোরবানির প্রয়োজন হয় তবে হিন্দুগণ উহাতে বাধা দিতে পারিবেন না আবার মুসলমানগণও এমন ভাবে এবং স্থানে গো হত্যা করিবেন না যাহাতে হিন্দুগণ প্রাণে ব্যথা পান। মসজিদে নামাজ পড়িবার সময় হিন্দুগণ মসজিদের সম্মুখ দিয়া শোভাযাত্রায় কোন রকম বাজনা বাজাইতে বা সঙ্গীত করিয়া যাইতে পারিবেন না।

উপরোক্ত এই চুক্তি দেশবন্ধু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া উহা যথাসময়ে কোকনদ কংগ্রেস অধিবেশনে উত্থাপিত করেন। সেখানেও তিনি তাঁহার এই চুক্তি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, Swaraj was impossible without non-Violent Non-co-operation and non-co-operation could not be effective without unity between Hindu and Mohamedans. They must therefore work for that unity if they meant to achieve Swaraj,"

কিন্তু তবুও কোকনদ কংগ্রেসে দেশবন্ধুর এই চুক্তি ও বক্তৃতার কি ফল হইয়াছিল তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই কোকনদ কংগ্রেসেই কিছু লোক আসিয়া দেশবন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "মহাশয় আইন করিয়া গোহত্যা বন্ধ করুন।"

দেশবন্ধু তাহাদিগকে শান্তভাবে বলিয়াছিলেন, "আইন হইলে আরও গোহত্যা বাড়িবে। আপস করিয়া করিব।"

"তাহা হইলে আপনি যে unpopular হইবেন।"

একটু বিরক্ত ও রাগান্বিত হইয়া দেশবন্ধু উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি কখনও popularity seek করি নাই, জীবনে কখনও করিবও না। seek করি নাই বলিয়াই ইহা আপনা হইতেই আসে তাই unpopular হলেও আমার তাতে দুঃখ নাই। যা ভাল বুঝি করব।"

এই চুক্তি সম্বন্ধে দেশময় তখন প্রচুর আলোচনা আর সমালোচনা। বিরুদ্ধবাদীগণ বিরুদ্ধ কথাই বলিয়া চলিয়াছে। কিন্তু দেশবন্ধুর একজন স্নেহ-ভাজন এবং অন্তরঙ্গ H. N. Das Gupta তাহার 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ'-এ. বলিয়াছেন, "The pact was conceived in the best of spirits but it became the nucleus of political controvercy. Communal sections among the Hindus Vilivied Deshabandhu Das and said that he had surrendered the rights of the Hindus. Even the more moderate opinion among the Hindus held that Deshabandhu Das had gone too far in trying to win the confidence of the Muslims...The majority of Muslim, however, hailed this pact as a charter of their rights and almost overnight Deshabandhu Das became their unchallenged leader."

এই unchallenged leaderই তখন আইন সভায় বিরোধী দলের দলপতি। সরকার পক্ষের তিনি ভয়ের কারণ। অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে দেশবন্ধু আইন সভায় প্রত্যেকটি দিনের কাজ-কর্ম সমাধা করিতেছিলেন। মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড প্রদত্ত শাসন সংস্কার যে ভারতীয়দের পক্ষে কোন উপকারেই আসিবে না এবং উহা যে সম্পূর্ণ লোকভুলান বলিয়া পূর্বে তিনি জন-সাধারণকে বলিয়াছিলেন তিনি তখন তাহা প্রমাণ করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এ প্রস্তুতি যেমন আইন-সভার ভিতরে তেমনি আইন-সভার বাহিরে। যেমন পরিচয় দিলেন তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির তেমন দেখাইলেন তাঁহার দেশপ্রেমের প্রবল বন্যা। সুতরাং দেশের জনসাধারণের

দৃষ্টি তখন একমাত্র দেশবন্ধুর উপর।

আইন-সভায় ভারতবাসী এমন দৃশ্য ইহার পুর্বে কখনও দেখে নাই। বিখ্যাত ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন প্রখ্যাত বাগ্মী, তিনি দেশপ্রেমিক। প্রথম যেদিন দল-বল সহ আইন-সভায় প্রবেশ করেন সে-দৃশ্যটি ছিল অতি মনোরম। আলোয় উদ্ভাসিত দেশবন্ধুর মুখখানি,—আয়ত চক্ষুতে অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতা, শির উন্নত, প্রতি পদক্ষেপে দৃঢ়তার স্বাক্ষর। সকলের খদ্দরের পোশাক, শুভ্র খদ্দরে আবৃত দেশবন্ধু—মাথায় খদ্দরের টুপি।

জীবনে দেশবন্ধু অনেক বক্তৃতা করিয়াছিলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সরকারের বিরোধী পক্ষের প্রধান হিসাবে আইন-সভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে হইলে বহুবিধ সংবাদ সংগ্রহ এবং যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন হয়। তাহাতেও তিনি কৃতকার্য হইলেন এবং তাঁহার পয়েন্ট ও যুক্তি এমন অকাট্য ছিল যে, যাহারা শুনিত তাহারা চমৎকৃত হইত এবং সরকার পক্ষকে নিরুপায় হইয়া বিব্রত বোধ করিতে হইত।

দেশবন্ধু তাঁহার দাবী কাগজে প্রকাশ করিলেন। ইহার অর্থ সহজ। তিনি জানাইয়া দিলেন, তাঁহার দাবী পূর্ণ না হইলে তিনি 'বাজেট' চলা-কালে উহাকে অচল করিয়া দিবেন এবং বুরোক্রাসীকে হয় সংস্কার করিয়া দিবেন নতুবা উহাকে একেবারে সংহার করিয়া দিবেন। প্রকৃতপক্ষে দেশবন্ধু কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়াই 'বাজেট' পাশ করিতে দেন নাই এবং মন্ত্রীদের বেতন নিয়াও তিনি এক ইতিহাসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সরকারী তরফ হইতে কাউন্সিলে মন্ত্রীগণের মাহিয়ানার প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। বিপুল বিক্রমে দেশবন্ধু তাঁহার বিরোধী পক্ষের ভোটের আধিক্যে উহা অগ্রাহ্য করিতে সমর্থ হন। তখন মন্ত্রী ছিলেন মৌলভী এ. কে. ফজলুল হক আর ছিলেন মিঃ গজনভী। তাহাদের মাহিয়ানার বিল পাশ না হইলেও তাহারা তখনও মন্ত্রী-ই রহিয়া গেলেন।

এদিকে সরকার মন্ত্রীদের বেতনের বিল যাহাতে পাশ করাইয়া লইতে পারেন তাহার চেষ্টায় পুনরায় উহা উত্থাপন করেন। স্বরাজ্যদল তখন উহার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করিয়া একটি Temporary injunction পাইলে কাউন্সিল Prorogue করিয়া দেওয়া হয়। বড়লাট বাহাদুর আবার তখন এমন একটি আইন প্রণয়ন করেন যাহার বলে যে কোন প্রস্তাবকে

যতবার ইচ্ছা ততবারই পাশ করাইবার জন্য কাউন্সিলে উপস্থিত করান যাইতে পারে। সে-অনুসারে মন্ত্রীদের বেতন সম্বন্ধে পুনরায় কাউন্সিলে প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে সরকার পক্ষ স্বরাজ্য দলের নিকট পরাজিত হন। সরকার পক্ষ তখন নিরুপায় হইয়া মৌলভী ফজলুল হক সাহেবকে এবং মিঃ গজনভীকে মন্ত্রীপদে আর বহাল রাখিতে পারিলেন না। সরকার পরে আবার নবাব নবাবালী চৌধুরী এবং রাজা মন্মথ রায় চৌধুরীকে মন্ত্রীরূপে মনোনীত করিযাছিলেন। কিন্তু দেশবন্ধুকে ইতিমধ্যে 'The high priest of destruction in Indian politics নামে আখ্যা দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ দেশবন্ধু ধ্বংসের পুরোহিত। সুতরাং সেবারেও এই অমাত্যতন্ত্রকে ধূলায় লুণ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এইবারে মৌলভী ফজলুল হক সাহেব তাহার সমর্থকদের লইয়া দেশবন্ধুকে সমর্থন জানাইয়াছিলেন। পরিষদীয় রাজনীতিতে ইহাই ছিল দেশবন্ধুর শেষ কাজ। ইহার পূর্বে তিনি অবশ্য আরও একটি কার্য করিয়াছিলেন। তিনি কাউন্সিল হইতে অর্ডিনান্স আইনকেও অচল করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কাউন্সিলে তিনি পর পর ধ্বংস করিয়া চলিয়াছিলেন আবার গঠনমূলক কাজ করিয়াও তিনি জনসেবা করিয়াছেন। ধ্বংস সম্বন্ধে দেশবন্ধু আইন সভায় দাঁড়াইয়া অমাত্যতন্ত্রের উদ্দেশ্যে তাঁহার দৃপ্তকণ্ঠে, ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়াছেন, "It has been said I am the highest priest of destruction in Indian politics. I ask my critic to point out one single instance where there has been real constructive work without destruction somewhere. If I want destruction, it is because I want to construct. If I am a Non-co-operator, it is because I believe in Co-operation. I believe no Co-operation is possible in the country, unless you start with Non-Co-operation. What kind of Co-operation you can expect between masters and slaves" ?

আর একদিন এই 'Priest of destruction' এর উত্তরে বাজেট আলোচনার সময় তিনি বুরোক্রাসীকে তাঁহার সহজ অথচ দৃঢ়ভাষায় জানাইয়াছিলেন, "আমার হাতে টাকা দাও, দেখবে প্রজাবর্গের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য

আমি কিরূপে গঠন কার্য সুনির্বাহ করি, কারণ আমি জানি পচা অসার নষ্ট না করলে এই বৈচিত্র্যময় জগতে সুন্দর গড়ে উঠতে পারে না।"

১৯২৪ সাল। এই বৎসর দেশবন্ধু কলিকাতা করপোরেশন জয় করিয়া উহার প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন। কাউন্সিলে তাঁহার জয়লাভ যেমন উল্লেখ-যোগ্য, কলিকাতা করপোরেশনকে করায়ত্ত করাও তাঁহার জীবনের তেমনি আর একটি গৌরব দীপ্ত স্মরণীয় ইতিহাস। পৌরসভা তখন সরকারের অধীনে। নাগরিকগণের কোন মতামতের মূল্য সেখানে ছিল না। সরকার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে মনোনীত করিয়া উহার সভাপতি পদে নিযুক্ত করিতেন। নূতন শাসন সংস্কার অনুযায়ী স্যার সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রী হইয়া একটি বিল পাশ করান যাহাতে করপোরেশনে জনমতের মূল্য স্বীকৃত হয়। এই বিল পাশ হওয়ায় করপোরেশন অধিকার করার পক্ষে দেশবন্ধুর খুব সুবিধা হইয়াছিল কিন্তু তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কলিকাতা শহরের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে তিনি ঘুরিয়াছেন, ঘুরিয়াছেন প্রত্যেকটি বাড়ীর দরজায় দরজায়। অসংখ্য সভা-সমিতি করিয়া স্বরাজ্য দলের উদ্দেশ্য ও আদর্শ জন সাধারণকে দিনের পর দিন বুঝাইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার এই পরিশ্রমের ফল অবশ্য তিনি জয়ের মধ্য দিয়া হাতে হাতেই পাইয়াছিলেন।

১৯২৪ সালের এপ্রিল মাস। দেশবন্ধু ঠিক করিলেন তাঁহার স্বরাজ্য দলের শক্তি লইয়া তিনি করপোরেশন অধিকার করিবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ একটু অন্য ধরনের ছিল। যাহা দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে তাহাতে বিশ্বাসী হইয়া তাহাকেই আঁকড়াইয়া থাকিতে তাহারা আগ্রহী। চলিত প্রথাকে পরিবর্তন করিয়া নূতনকে বরণ করিতে বলায় তাহাদের মন সংশয়ে দুলিয়া উঠিল কেহ কেহ দেশবন্ধুকে বলিয়া-ছিলেন যে, সুরেনবাবু দীর্ঘদিন চেয়ারম্যানরূপে করপোরেশনে ছিলেন, তাহার কাছে বাধ্যবাধকতা আছে। সুতরাং তাহাকে ভোট না দিয়া কি করিয়া আপনাকে ভোট দিই?

জবাবে চিত্তরঞ্জন, পরিবর্তনে বিশ্বাসী হইয়া একবার তাহাদের ভোট দেওয়ার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। আবার ইহার বিপরীত চিত্রও দেখা গিয়াছে। কেহ কেহ কাহারো দ্বারা প্ররোচিত না হইয়া নিজের ইচ্ছাতেই দেশবন্ধুর নিকট আসিয়া তাঁহার দলভুক্ত হইয়া তাঁহার দলের

মনোনয়ন প্রার্থনা করিয়াছে। ইহার চাইতেও আশ্চর্যের বিষয় রহিয়াছে। প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয় তখন বয়সে বৃদ্ধ। দীর্ঘ ২৫ বৎসর তিনি কলিকাতা করপোরেশনের একজন কমিশনার ছিলেন। তিনি একদিন হঠাৎ দেশবন্ধুর নিকট আসিয়া স্বরাজ্য দলের সভ্য হইয়া স্বরাজ্য দলের কাজ করিতে চাহিয়াছিলেন। আরও দেখা গিয়াছে যে, যাহারা দীর্ঘদিন সুরেন্দ্রনাথের সমর্থক ছিলেন তাহারাও তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চিত্তরঞ্জনের নিকট আসিয়া আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছিলেন। ফলে, পৌরসভার নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হইলে দেখা গেল যে ৭৫ জন সদস্যের মধ্যে দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের ৫৫ জন প্রার্থী নির্বাচনে জয়যুক্ত হইয়া পৌরসভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন। পৌরসভার প্রথম নির্বাচনেই এই ফল, পরিচিত চিত্রের পটপরিবর্তন, নূতন চেহারা! এইভাবে সেদিন দীর্ঘদিনের অধিকৃত স্থান কলিকাতা করপোরেশন ভবন হইতে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদায় গ্রহণ করিলেন। আর সেখানে স্থান করিয়া লইলেন নূতন দল। সে নূতন তারুণ্যের প্রতীক, প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্যদল।

চিত্তরঞ্জন নিজেই করপোরেশনের মেয়র হন ইহা তিনি চাহেন নাই। কিন্তু এই বিরাট পৌরসভার প্রথম দিকের কার্যাবলী সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিবার জন্য একজন উপযুক্ত লোকেরই দরকার। সুতরাং অনেক ভাবনা চিন্তার পর তিনিই উহার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিয়া নিজেই প্রথম মেয়রের পদ অলঙ্কৃত করেন এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্ত রূপে সুভাষচন্দ্রকে উহার চীফ একজিকিউটিভ্ অফিসারের পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, এই বিরাট শহরের প্রত্যেকটি লোক যাহাতে কম মূল্যে দুধ, মাছ, তরি-তরকারি পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করেন, ব্যবস্থা করেন যাহাতে দেশীয় প্রথায় শহরের বালক-বালিকাগণ প্রাথমিক শিক্ষা পাইতে পারে।

সুতরাং দেশবন্ধু তাঁহার কর্মসূচী লইয়া করপোরেশনের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং মেয়রের আসন অলঙ্কৃত করিয়া প্রথম যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল: I have to thank you heartily for the great honour you have conferred on me to-day. Somehow or other I cannot dissociate myself from the great cause which I represent. I take this honour given not to me per-

sonally but to that great cause which I have always represented. After all, what is that great cause? If you leave out the details of work, sometimes in this and sometimes in that, the great work which I have undertaken for the last ten or fifteen years is the building up of a Pan-Indian people consisting of diverse Communities with diverse interests but united and federated as a nation. In this Corporation I find plenty of work possible in that direction. So far as it lies in me you will find that no Communal interest will be sacrificed unless that interest goes against the well-being of the whole Community by which I mean the Indian people or the Citizens of Calcutta in this particular respect.

It is necessary—although I am in such poor health that I find it difficult to speak—it is necessary to remove some of the misapprehensions which have been expressed in newspapers about the Cong‧.ss party capturing the Carporation. I really do not understand what is meant by Capturing the Corporation. People have stood as candidates and retepayers have voted for them and they have come here in the same right as those who do not represent the Congress. Here we find gentlemen who represent the Congress, and gentlemen who do not represent the Congress. But what is the apprehension? I really cannot understand it. It has been said that this corporation is going to be anti Government. Well, I will place before you some of the important details of work which then will be my privilege to place before this corporation. I have it to you to judge if by carrying out that programme you do in any way go against the Government. I find nothing in that programme which goes against the Government in any way, against any Government which seeks

the welfare of the citizens of Calcutta.

May I point out to you that it is not the policy—(when I say it is not the policy. I mean it is not the policy if it accepts my advice) to offer any obstruction. My policy here will be to disect you to carry out constructive work. We are here not to destroy the corporation but to carry it on, on improved line for the welfare of the citizens of Calcutta. We are not here to enter into conflict with the Government but it is as well to say that if any conflict is forced upon this corporation by the attitude or the Government this corporation will not be slow to engage itself in that conflic and to vindicate its duty to the citizens of Calcutta.

It has been said that the corporation is going to be anti-European. I laughed to myself when I read this criticism. How was it possible for this corporation to be anti-European except in the sense that to be pro-Indian is to be anti-European. That of course is a view in which no Indian corporation can share. It is said that the European part of the city will be neglected. I am sure, gentlemen present here will not accept that view. But at the sametime, let me tell you that the development of any one part or locality or the city will not be allowed if it means the sacrifice of every other part of the city. If that is anti-European, I am afraid, this corporation may have to plead guilty to the charge.

With these two observations I propose to read out to you the diffierent items of work upon which I shall advise the corporation to enter. All this is so far as the Act and circumstances will allow.

1. Free Primary education ;
2. Free medical relief for the poor ;

3. Purer and cheaper food and milk supply ;
4. Better supply of filtered and unfiltered water ;
5. Better sanitation in 'bustees' and congested areas ;
6. Housing of the poor ;
7. Development of suburban areas ;
8. Improved transport facilities and ;
9. Geater efficiency of administration at a cheaper cost.

When I put down this programme, it occurred to me that it was easier to put down the items on a piece of paper than to carry them out. The task before this corporation is difficult. It is not impossible. I do not for a moment suggest that we will be able to accomplish all that in the course of the next three years, but what I desire is that the corporation should sincerely embark on this work and if we can proceed a little way in advance I should think that we shall have accomplished a great deal.

We must not forget also that as we are coming into our inheritance, that inheritance is subject to encumbrances. We hear of the water difficulty and to-day certain questions were put and I listened to the answers. I am certain that within the next few months you will be face to face with a great difficulty in connection with the water supply of Calcutta. It will be for us to engage our best endeavours to provide Calcutta with water. But whether we succeed or whether we fail—if we fail all that I desire to impress upon you is please do not give us the whole credit because we hear of the bursting of engines of this power and that power and we hear that they have been for months in that condition without any attempt to renovate them.

It is that great ideal of the Indian people that they regard

the poor a "Daridra Narayan". To them, God comes in the shape of the poor and the service of the poor is the service of God to the Indian mind. I shall, therefore, try to direct your activities to the service of the poor and you will have seen that in the programme which I have drawn up most of the items deal with the poor—housing of the poor, free primary education and free medical relief—these are all blessings for the poor and if the Corporation succeeds even to a very limited extent in this work it will have justified itself.

দেশবন্ধুর এই ইংরাজী বক্তৃতার যথাসম্ভব বাংলা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

আজ আপনারা যে সম্মানে আমাকে ভূষিত করিয়াছেন সেই জন্য আমি আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমি যে মহান কর্মের প্রতিনিধি সে কথা আমি ভুলিতে পারি না। তাই এই সম্মান ব্যক্তি-গত আমার নহে, এ- সম্মান সেই মহান ব্রতকে আমি যাহার প্রতিনিধিত্ব করিয়া আসিতেছি। কথা হইল সেই মহান ব্রত কি? এখানে একটু, ওখানে একটু এই খুঁটিনাটি বিষয় ছাড়িয়া দিয়া লক্ষ্য করিবেন, বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং নানাবিধ স্বার্থের অথচ তাহাদেরই একত্রিত করিয়া এক বৃহৎ ভারতীয় মহান জাতি গঠনের কাজের ভার আমি গত দশ পনের বৎসর যাবৎ গ্রহণ করিয়াছি। সেই ভার নিয়া এই পৌর প্রতিষ্ঠানে অনেক কাজ করা সম্ভব বলিয়া আমি মনে করি। আমার দিক হইতে আমি বলিতে পারি, ইহাতে কোন সম্প্রদায়ের কোন স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে না যদি-না ঐ স্বার্থ সমগ্র সম্প্রদায়ের বৃহত্তর স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ না করে অর্থাৎ সম্প্রদায় বলিতে ভারতীয় জনগণ, এই বিশেষ ক্ষেত্রে কলিকাতার অধিবাসী-বৃন্দকে মনে করি।

যদিও আমার স্বাস্থ্য এমন দুর্বল যে কথা বলিতে কষ্টবোধ করি তথাপি কংগ্রেস দল কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান অধিকার করিয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে কিছু কিছু যে আশঙ্কা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দূর করিবার প্রয়োজন আছে। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান 'অধিকার' কথাটি বলিয়া তাহারা কি অর্থ করিতে চাহেন আমি তাহা সত্যই বুঝি না। জনগণ নির্বাচনপ্রার্থী

হইয়াছেন এবং করদাতাগণ তাহাদিগকে ভোট দিয়া নির্বাচন করিয়াছেন এবং সেই অধিকারে তাহারা এখানে আসিয়াছেন যেমন কংগ্রেসের যাহারা প্রতিনিধি নন তাহারাও আসিয়াছেন। এখানে যেমন কংগ্রেসের প্রতিনিধি ভদ্রমহোদয়গণ রহিয়াছেন তেমন কংগ্রেসের প্রতিনিধি নন এমন ভদ্রমহোদয়-গণও রহিয়াছেন। কিন্তু আতঙ্ক কিসের? আমি সত্যই ইহা বুঝিতে পারি না। বলা হইয়াছে যে পৌর প্রতিষ্ঠান সরকার বিরোধী হইতে চলিয়াছে। বেশ! আমি কিছু প্রয়োজনীয় কাজের কথা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব যাহা এই পৌর প্রতিষ্ঠানের সমীপে উপস্থাপিত করিবার আমার সুযোগ আসিয়াছে। সেই কর্মতালিকা কার্যে রূপায়িত হইলে কি সরকারের বিরুদ্ধে যাওয়া হয়,—সেই বিচারের ভার আমি আপনাদের উপর ন্যস্ত করিতে চাই। সেই কর্মতালিকা রূপায়ণে কোন প্রকারেই সরকারের বিরুদ্ধে যাওয়া হয় বলিয়া আমি মনে করি না, মনে করি না কোন সরকারেরই বিরুদ্ধে যাওয়া হয় যে সরকার নাকি কলিকাতার নাগরিক বৃন্দের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করেন।

আমি এ কথা নিবেদন করিতে চাই যে কোনরূপ বাধা দানের নীতি ইহা নয়, আমি যখন বলিতেছি ইহা নীতি নয় তখন আমি বলিতেছি আমার উপদেশ যদি গ্রহণ করা হয় তবে ইহা নীতি নয়। গঠনমূলক কার্যে আপনা-দিগকে পরিচালিত করি তাহাই আমার ইচ্ছা। আমরা কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করিবার জন্য আসি নাই, আসিয়াছি ইহার উন্নতি বিধান করিয়া কলিকাতাবাসীগণের মঙ্গল সাধনের জন্য কাজ করিতে। আমরা সরকারের সঙ্গে বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হইতে চাই না কিন্তু ইহাও বলিয়া রাখার প্রয়োজন আছে যে, যদি সরকারের ব্যব. র জোর করিয়া এই পৌর প্রতিষ্ঠানের উপর বিরোধ চাপাইয়া দেওয়া হয় তবে এই পৌর প্রতিষ্ঠান, নাগরিক বৃন্দের প্রতি তাহার দায়িত্ব পালন করিতে সেই বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে এবং তাহার অস্তিত্বের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে দ্বিধা করিবে না।

বলা হইয়াছে যে, এই পৌর প্রতিষ্ঠান ইউরোপীয়ান বিরোধী হইতে চলিয়াছে। এই সমালোচনা পড়িয়া আমি নিজেই হাসিয়া উঠিয়াছি। ভারতের অনুকূলে হওয়াই ইংরাজ বিরোধিতা করা এই অর্থে ছাড়া পৌর প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইংরাজের বিরুদ্ধবাদী হওয়া কিরূপে সম্ভব হয়? এই

ধারণার বশবর্তী কোন ভারতীয় পৌর প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। ইহাও বলা হইয়াছে যে, শহরের ইউরোপীয়ান অধ্যুষিত অঞ্চলকে অবজ্ঞা করা হইবে। আমি নিশ্চিত জানি, উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ এই কথা স্বীকার করিবেন না। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি ইহাও বলিতে চাই, শহরের অন্য কোন অঞ্চলের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া একটি মাত্র লোকালয়ের উন্নতি বিধান বরদাস্ত করা হইবে না। উহা যদি ইউরোপীয়ান বিরোধিতা হয় তবে মাপ করিবেন, পৌর প্রতিষ্ঠানকে তাহা হইলে সে অপরাধ মানিয়া লইতে হইবে।

এই দুইটি কথার ভূমিকার পর পৌর প্রতিষ্ঠানকে যে বিভিন্ন কার্যতালিকা লইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইতে আমি উপদেশ দিব তাহা আমি আপনাদের নিকট পড়িতে চাই। ইহা সমস্তই আইন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যত দূর করা সম্ভব তত দূর করা হইবে : ১। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ২। দরিদ্রের জন্য বিনা খরচে চিকিৎসা ৩। কম মূল্যে বিশুদ্ধ খাদ্য এবং খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহ ৪। পরিশ্রুত এবং অপরিশ্রুত জলের অধিকতর সরবরাহ ব্যবস্থা ৫। বস্তি এবং ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় উন্নত ধরনের ব্যবস্থা ৬। দরিদ্রের জন্য গৃহ সংস্থান ৭। শহরতলির উন্নতি বিধান ৮। পরিবহনের অধিকতর সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাপনা এবং ৯। স্বল্প ব্যয়ে শাসন ব্যবস্থায় অধিকতর দক্ষতার প্রকাশ।

আমি যখন ইহা লিখি তখন আমার মনে হইয়াছে যে ইহা লেখা যত সহজ, কাজে তাহা করা তত কঠিন। এই পৌর প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে যে কাজ তাহা দুরূহ কিন্তু ইহা অসম্ভব নহে। পরবর্তী তিন বৎসরের মধ্যেই আমরা উহা সম্পূর্ণ করিতে পারিব ইহা আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভাবি না কিন্তু আমার ইচ্ছা যে পৌর প্রতিষ্ঠান ইহার রূপায়ণের জন্য আন্তরিক ভাবে কর্মে প্রবিষ্ট হউক এবং আমরা যদি উন্নতির পথে কিছু দূর অগ্রসর হইতে পারি তাহা হইলে অনেকখানিই করিয়া ফেলিতে পারিব বলিয়া মনে করি।

আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে আমরা অনেক দায়-দায়িত্বের মধ্য দিয়া বর্তমান এই উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছি। আমরা জলকষ্টের কথা শুনি এবং আজও সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছে এবং তাহার যে উত্তর দেওয়া হইয়াছে তাহাও আমি মনোযোগের সহিত শুনিয়াছি। আমি নিশ্চিত যে,

কয়েক মাসের মধ্যেই কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের জল সরবরাহ ব্যাপার লইয়া আপনারা অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হইবেন। আমাদের পক্ষে তখন সর্বপ্রচেষ্টায় কলিকাতার জল সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখাই কর্তব্য হইবে। কিন্তু হয় আমরা কৃতকার্য হইব নয়তো অকৃতকার্য,—যদি অকৃতকার্যই হই তবে আমি আপনাদের মনে এই ধারণারই সৃষ্টি করিতে চাই যে দয়া করিয়া উহার জন্য সব সুখ্যাতিটুকু আমাদেরই করিবেন না কারণ আমরা শুনিতে পাই কখনও ঐ জলশক্তির ভগ্ন ইঞ্জিনের বিস্ফোরণ হইয়াছে, কখনও বা ঐ ইঞ্জিনের বিস্ফোরণ হইয়াছে এবং প্রায়ই শুনিতে পাই উহারা ঐ ভগ্ন-অবস্থাতেই মাসের পর মাস পড়িয়া রহিয়াছে এবং উহাদের মেরামতের কোনরূপ ব্যবস্থাই হইতেছে না।

ভারতবাসীগণের মধ্যে দরিদ্রকে "দরিদ্রনারায়ণ" রূপে পূজা করিবার একটা উচ্চ আদর্শ রহিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস, ঈশ্বর দরিদ্রের বেশে আসেন এবং সেই দরিদ্রের সেবাই ভারতীয় জন-মানসে ঈশ্বরের আরাধনা। সুতরাং আপনাদের কর্মপদ্ধতি যাহাতে দরিদ্রের সেবায় নিয়োজিত হয় আমি সেই চেষ্টাই করিব এবং কাজের জন্য যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ-পত্র আমি উপস্থাপিত করিয়াছি তাহাতে আপনারা দেখিয়াছেন যে উহার অধিকাংশই দরিদ্রের সেবামানসে দরিদ্রের গৃহ সংস্থান, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং বিনা খরচে চিকিৎসা ব্যবস্থা—ইহা সবই দরিদ্রের সাহায্যার্থে এবং পৌরপ্রতিষ্ঠান যদি ইহার রূপায়ণে কিছুটা সাফল্য লাভ করে তবে নিজেদের কথার সারবত্তা প্রমাণ করিতে পারিবে।

দেশবন্ধু বলিতেন, চেয়ারম্যান হইতে আরম্ভ করিয়া ধাঙড় আর ঝাড়ুদারদের কাজ সবই দরিদ্রনারায়ণের সেবা এবং আমাদিগকে সেই ভাবেই করপোরেশনের সেবা করিতে হইবে।

একবার ঝাড়ুদারদের ধর্মঘট হয়। তাহারা কাজে যোগদান না করায় দেশবন্ধু তাহাদের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন যে তাহারাই সেবা করিয়া চলিয়াছে এবং সেবার অধিকারী হইয়া তাহারা পুণ্যবান। তিনি তাহাদিগকে অবিলম্বে কার্যে 'যোগদান করিতে বলিলেন এবং তাহাদিগকে ইহা বলিয়াও আশা দিয়াছিলেন যে তাহাদের অবস্থার যাহাতে উন্নতি হয় সে-ব্যবস্থা তিনি করিবেন।

আবার তিনি ধাঙড়দের ইহাও বলিয়াছিলেন যে যদি প্রয়োজন হয় তবে তাঁহার অনুরক্ত সেবকদল লইয়া তিনি নিজেই ঝাড়ু হাতে রাজপথ পরিষ্কার করিতে নামিয়া পড়িবেন।—ইহাতে লজ্জার কিছু নাই, অসম্মানেরও কিছু নাই।

দেশবন্ধুর কথায় ধাঙড়দল অত্যন্ত আনন্দিত হইল। তাহারা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, 'দেশবন্ধু কি জয়'।

দেশবন্ধুও অত্যন্ত আনন্দিত। বলিলেন, "দেশকে এই ভাবেই গঠিত করিতে হইবে, এ সমস্ত তো আমাদের কাজ, এরাও তো আমাদেরই। এদের প্রতি যেমন কড়া হওয়ার দরকার, সহানুভূতি প্রদর্শন করাও সেইরূপই উচিত।"

১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে লক্ষ্ণৌতে স্বরাজ্যদলের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দেশবন্ধুই উহাতে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য ছিল, তাহাদের দলের নেতা ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে-সমস্ত প্রস্তাব তুলিবেন তাহা নির্ধারণ করা। সেই অনুসারে স্বরাজ্য দলের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে যে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা হইতেছে (১) বিনা বিচারে যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাদিগকে এবং রাজনৈতিক বন্দীদিগকে খালাস করিতে হইবে (২) যে সমস্ত আইন দ্বারা উৎপীড়ন ও দমন করা হইতেছে উহা প্রত্যাহার করিতে হইবে (৩) ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে যে শাসনতন্ত্র রচিত হইবে উহার জন্য একটা ন্যাশনাল কন্‌ভেন্‌শন ডাকার প্রয়োজন।

মতিলাল নেহেরু ছিলেন সেই সময় স্বরাজ্যদলের কেন্দ্রীয় পরিষদের বিরোধী দলের নেতা। তিনি যথা সময়ে দলীয় নির্দেশ এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিষদে ঐ দাবীগুলি উত্থাপন করিলে স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার ম্যালকম্ হ্যালে উহাতে বাধা প্রদান করেন এবং বলেন যে, যে সমস্ত আইনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষ তখন শাসিত হইতেছে তাহাতে স্বরাজ্যদলপতি মতিলাল নেহেরুর ঐ উত্থাপিত প্রস্তাবগুলি মানিয়া লওয়া যায় না।

ওদিকে ১৯২৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী তাঁহার কারাভোগের কাল পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মুক্তিলাভ করেন। ভারতের সর্বত্র তখন স্বরাজ্য দলের প্রভূত প্রতিপত্তি। গান্ধীজী সে-খবর নিশ্চয়ই রাখিতেন। চিত্তরঞ্জন খুব আশা করিয়াছিলেন যে, জেল হইতে এই দীর্ঘদিন পরে বাহিরে আসিয়া গান্ধীজীর

মতের অনেক পরিবর্তন হইবে এবং স্বরাজ্য দলের কাউন্সিলে প্রবেশকে সমর্থন জানাইবেন। সকলেই ঔৎসুক্য নিয়া তখন দেখিতে লাগিলেন গান্ধীজীর মতামত বহনকারী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকা। তিনি কারাপ্রাচীরের বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "The policy of council entry is inconsistent with non-co-operation which require a certain mental attitude which cannot be reconciled with membership of the legislatures. Non-co-operation within is a contradiction in terms.

[Young India : 12th March, 1924]

জেল হইতে মুক্তিলাভের পর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য গান্ধাজী জুহুতে গিয়াছিলেন। ভারতের তৎকালীন সমস্ত বিষয় এবং কাউন্সিলে প্রবেশের ব্যাপার নিয়াই তিনি দেশবন্ধু ও মতিলালের সঙ্গে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন বোধ করেন। গান্ধীজীর এই ইচ্ছানুসারেই দেশবন্ধু এবং মতিলাল ১৮ই মে মহাত্মার সঙ্গে দেখা করেন এবং এই তিন মহান নেতার মধ্যে সবিশেষ আলোচনা হয়। কিন্তু এই আলোচনা শেষেও দেখা গেল গান্ধীজী পূর্বেও যেখানে ছিলেন তখনও সেখানেই রহিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতামতের এতটুকু পরিবর্তন হয় নাই। স্বরাজ্য দলের কাউন্সিলে প্রবেশ করিবার বিষয় নিয়া দিল্লী ও কোকনদ কংগ্রেসের অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাও গান্ধীজী সমর্থন করিতে পারিলেন না। তাঁহার ঐ এক মত,—স্বরাজ্য দলের কাউন্সিলে প্রবেশ করার অর্থই হইতেছে তাঁহার অসহযোগ আন্দোলনের পরিপন্থী কাজ করা। তবে গান্ধীজী যেটুকু পর্যন্ত মিলনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন তাহা এই যে স্বরাজ্য দলের কোন কাজে কংগ্রেসীগণ কোন বাধার সৃষ্টি করিবেন না। স্বরাজ্য দলের দুই নেতা দেশবন্ধু ও মতিলাল নেহরু ইহাতে খুশী হইতে পারিলেন না। তাঁহারা গান্ধীজীর নিকট হইতে যাহা আশা করিয়াছিলেন তাঁহাদের সে-আশা পূর্ণ হইল না।

এই প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহরু তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন: The juhu talks, so far as the Swarajists were concerned did not succeed in winning Gandhiji or even in influencing him to any extent. Behind all the friendly talk, and the courteous

gestures, the fact remained that there was no compromise. They agreed to differ, and statements to this effect were issued to the press.

দেশবন্ধু যখন জুহুতে তখনই পাটনায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় ১৯২৪ সালের ২৫শে মে। সংবাদ শুনিয়া দেশবন্ধু অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার এই মনোবেদনার অভিব্যক্তি স্বরূপ তিনি কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিয়া পৌর সভার এক বিশেষ সভায় মেয়রের আসন হইতে নিম্নোক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি তুলিয়া ধরিলেন: You will allow me to associate myself with the resolutions which you have just passed. Indeed it seems to me that we have honoured ourselves in honouring the memory of this great man. The Corporation of Calcutta would have been a poor institution indeed if it did not honour the greatness of this great citizen of Calcutta. To me the loss is something like a personal loss. Years of association, years of living together in the some neighbourhood made me look upon him as my elder brother. It is difficult for me to make any long speech to-day because I cannot trust myself to do so. But I will say one or two words. It has been said that he was a great lawyer. So indeed he was, but his greatness was greater than the greatness of a mere lawyer. It has been said that he was a great judge. I know he was a great judge but here again his greatness was greater—far greater than the greatness of merely a great judge. It has been said that he was a great educationist, Undoubtedly he was. He was one of the foremost, and if you count the number of educationists all the world over I doubt whether you can come across a greater educationist than sir Ashutosh Mukherjee. But here again I stand on my original abservation—he was far greater than merely a

great educationist. His heart was with nation. He was a builder. He tried to build this great Indian nation and honour it by his activities and I know many were the plans he formed, of work after his retirement. Death has snatched him away and I do not see before me any other man who can take up the work which he intended to take up. But trust to God there will be some others who will carry on the work which he has left unfinished. One word more about the last resolution which you have just passed. I approve of this committee because I feel that a paintiug or a picture or the erection of a bust or a statue cannot commemorate the greatness of this great man. He was a dynamic personality. We want something living, something growing to commemorate in a fitting manner his greatness—something which will carry with it the message of the struggle of to-day to the fullness of to-morrow.

দেশবন্ধুর উপরোক্ত বক্তৃতার যথা সম্ভব বাংলা অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল : আপনারা যে প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন তাহার সঙ্গে আমাকে যুক্ত রাখিতে অনুরোধ করি। এই মহৎ ব্যক্তির স্মৃতির উদ্দেশ্যে সম্মান প্রদর্শন করিয়া বাস্তবিক, আমার মনে হয়, আমরা নিজেরাই নিজেদিগকে সম্মানিত করিয়াছি। কলিকাতার এই মহান নাগরিকের মহত্বকে সম্মান না করিলে সত্যই কলিকাতা পৌরসভার দৈন্য প্রকাশ পাইত। এই ক্ষতি আমার নিকট স্বজন বিয়োগ তুল্য। দীর্ঘ দিনের সান্নিধ্য এবং দীর্ঘ বছর প্রতিবেশী হিসাবে বসবাস করায় তাঁহাকে আমি বড় ভাইয়ের মত দেখিতাম। আজ আমার পক্ষে বক্তৃতা করা কষ্টকর কারণ তাহা করিতে পারিব বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। কিন্তু আমি দুই একটি কথা বলিব। বলা হইয়াছে, তিনি একজন বিখ্যাত আইনজীবী ছিলেন, বাস্তবিক তিনি তাহাই ছিলেন কিন্তু আইনজীবীর বিরাটত্বের চাইতেও তাঁহার মহানুভবতা মহত্তর ছিল। বলা হইয়াছে, তিনি একজন বিখ্যাত বিচারপতি ছিলেন। আমিও জানি, তিনি বিখ্যাত বিচার-

পতি ছিলেন কিন্তু আবারও বলিতেছি শুধুমাত্র বিখ্যাত বিচারপতির বিরাটত্বের চাইতেও তাঁহার মহানুভবতা অনেক,—অনেক বেশী ছিল। বলা হইয়াছে, তিনি একজন প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাহাই ছিলেন। তিনি ছিলেন শিক্ষাবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য এবং পৃথিবীর শিক্ষাবিদ্‌দের গণনা করিলে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চাইতে বড় শিক্ষাবিদ পাইবেন কি না সন্দেহ! কিন্তু এ-স্থলেও আমি আমার পূর্ব অভিমতে স্থির। শুধু শিক্ষাবিদের প্রসিদ্ধির চাইতেও তিনি অধিকতর মহান ছিলেন। তিনি ছিলেন জাতির পাশে পাশে। কর্মযোগী তিনি। এই মহান ভারতের জাতীয়তা গঠন করিয়া তিনি তাঁহার কার্যদ্বারা ইহাকে সম্মানিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং আমি জানি অবসর গ্রহণের পর কাজ করিবার জন্য তিনি কর্মতালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মৃত্যু তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া গেল এবং তিনি যে কাজ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন তাহা করিবার মত অপর কাহাকেও দেখি না। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখুন, দেখিবেন, যে কাজ তিনি অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা করিবার লোক পাওয়া যাইবে। এই মাত্র আপনারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন সে-সম্বন্ধে আমি মাত্র আর একটি কথা বলিব। কমিটির সংগে আমি একমত কারণ আমি মনে করি যে, চিত্র ছবি, আবক্ষ মূর্তি গড়া অথবা প্রস্তরমূর্তি কিছুই এই মহাপুরুষের মহত্ত্বের স্মৃতিরক্ষা করিতে পারে না। তিনি ছিলেন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। তাঁহার মহিমাকে শোভন-সুন্দরভাবে স্মৃতিতে জাগরুক রাখিতে আমরা এমন কিছু চাহি যাহা জীবন্ত এবং প্রাণবন্ত,—যাহা আজিকার দিনের সমস্ত দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের বাণীকে বহন করিয়া আগামী কালের পরিপূর্ণতাতে লইয়া যাইবে।

গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনার ফল আশাপ্রদ না হওয়ায় দেশবন্ধু ও মতিলাল তাঁহাদের মতামত বিবৃতিরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, কাউন্সিলে প্রবেশ অসহযোগিতার পরিপন্থী। দেশবন্ধু ও মতিলাল বিবৃতির মাধ্যমে জানাইলেন, স্বরাজ্য দল অসহযোগীই এবং কাউন্সিলে প্রবেশ অসহযোগীতাই কারণ তাঁহারা সরকারের শাসনযন্ত্রকে বাধা দিতে দিতে সম্পূর্ণ অচল করিয়া দিবেন ইহাই তাঁহাদের নীতি।

১৯২৪ সাল দেশবন্ধুর জীবনে সুবর্ণ-কাল কারণ এই সময় তিনি ক্ষমতায়

এবং জনপ্রিয়তায় উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিলেন। কাউন্সিল এবং কলিকাতা করপোরেশন জয় করিয়া তিনি ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে গুরুত্বপূর্ণ আর একটি আন্দোলনে অগ্রসর হন,—উহা তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ। এই আন্দোলনের মধ্যে তাঁহার দেশপ্রেম, দেশসেবা এবং সমাজ সংস্কারের একটি বলিষ্ঠ মন মাথা উঁচু করিয়া উঠিয়াছে দেখা যায়।

কলিকাতা হইতে কিছু দূরে 'বাবা তারকনাথ' বা 'শিবের' একটি মন্দির রহিয়াছে। বাবা তারকনাথের নামেই ঐ স্থানের নামকরণ হইয়াছে তারকেশ্বর। অন্যান্য মন্দিরের যেমন ধন-সম্পদ থাকে এই তীর্থ-মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও তেমন ধন সম্পদ ছিল। উহার তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত ছিল একজন মোহান্তের উপর। মন্দিরের যাগ-যজ্ঞ, পূজা-অর্চনাদির সমস্ত ভারও মোহান্ত মহারাজের উপরই ন্যস্ত এবং ঐ সঙ্গে তীর্থস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করিবার দায়িত্বও তাহার। কিন্তু তদানীন্তন মোহান্ত মহারাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে তিনি অনাচারী, অত্যাচারী এবং তাহার কুরুচিপূর্ণ কর্মের দ্বারা হিন্দুর এই মহাতীর্থের পবিত্রতা নষ্ট হইয়া কলুষিত হইয়াছে। আরও অভিযোগ ওঠে যে, মোহান্ত মহারাজের প্রাসাদের নিকটে লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দিরে জনসাধারণকে পূজা দিতে দেওয়া হয় না বা বিগ্রহ দর্শন করিতে দেওয়া হয় না। এই অনাচার আর অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া চিত্তরঞ্জন স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি এই মহাতীর্থের মহাগ্লানি দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। পাপাচারী মোহান্তের বিরুদ্ধে ইহা তাঁহার এক ধর্ম-যুদ্ধ, এক মহিমান্বিত আন্দোলন। শুধু কলিকাতাই নহে, বাংলা দেশের সমস্ত রাস্তা তখন তারকেশ্বরের দিকে, সকল মানুষের মন তখন তারকেশ্বরের দিকে। দেশবন্ধুর আদেশ ও অনুরোধে বন্ধু শ্যামসুন্দর এই সত্যাগ্রহে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া আর একজন ছিলেন দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ।—ইনি কাজী নজরুল ইসলাম। দেশবন্ধু নজরুলকে এই আন্দোলনের প্রচার সচিবরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সত্যাগ্রহীগণ যাহাতে সত্যাগ্রহে উৎসাহ পায় সেই জন্য নজরুল মোহান্তের 'মোহ-অন্তের' গান লেখেন:

জাগো আজ দণ্ড হাতে চণ্ড বঙ্গবাসী।
ডুবালো পাপ-চণ্ডাল তোদের বাংলা দেশের কাশী।

জাগো বঙ্গবাসী ॥
তোরা হত্যা দিতিস্ যাঁর থানে, আজ সেই দেবতাই কেঁদে
ওরে তোদের দ্বারেই হত্যা দিয়ে মাগেন সহায় আপ্‌নি আসি'।
জাগো বঙ্গবাসী ॥
মোহের যার নাইক অন্ত
পূজারী সেই মোহান্ত,
মা বোনে সর্বস্বান্ত কর্‌ছে বেদীমূলে।
তোদেরে পূজার প্রসাদ ব'লে খাওয়ায় পাপ-পুঁজ সে গুলে।
তোরা তীর্থে গিয়ে দেখে আসিস্ পাপ ব্যাভিচার রাশি রাশি।
জাগো বঙ্গবাসী ॥
পুণ্যের ব্যবসাদারী
চালায় সব এই ব্যাপারী,
জমাচ্ছে হাঁড়ি হাঁড়ি টাকার কাঁড়ি ঘরে।
হায় ছাই মেখে যে ভিখারী শিব বেড়ান ভিক্ষা ক'রে—
ওরে তাঁর পূজারী দিনের দিনে ফুলে হচ্ছে খোদার খাসী।
জাগো বঙ্গবাসী ॥
এই সব ধর্ম-ঘাগী
দেবতায় করছে দাগী,
মুখে কয় সর্বত্যাগী ভোগ-নরকে ব'সে।
সে যে পাপের ঘণ্টা বাজায় পাপী দেব-দেউলে প'শে।
আর ভক্ত তোরা পূজিস্ তারেই, যোগাস্ খোরাক সেবা-দাসী।
জাগো বঙ্গবাসী ॥
দিয়ে নিজ রক্ত-বিন্দু
ভরালি পাপের সিন্ধু
ডুব্‌লি তায় ডুব্‌লি হিন্দু ডুবালি দেব্‌তারে।
ভাখ্ ভোগের বিষ্ঠা-পুড়ছে তোদের বেদীর ধূপাধারে।
পূজারীর কমণ্ডলুর গঙ্গা-জলে মদের ফেনা উঠ্‌ছে ভাসি'।
জাগো বঙ্গবাসী ॥
দিতে যায় পূজা আরতি

সতীত্ব হারায় সতী,
পুণ্য-খাতায় ক্ষতি লেখায় ভক্তি দিয়ে,
তার ভোগ-মহলের জ্বলছে প্রদীপ তোদের পুণ্য-ঘিয়ে।
তোদের ফাঁকা ভক্তির ভণ্ডামিতে মহাদেব আজ ঘোড়ার ঘাসী।
জাগো বঙ্গবাসী ॥

তোরা সব ভক্তিশালী
বুকে নয়, মুখে খালি।
বেড়ালকে বাছ্‌তে দিলি মাছের কাঁটা যে রে
তোরা পূজারীকে কবিস্‌ পূজা পূজার ঠাকুর ছেড়ে।
মার্‌ অসুর, শোধ্‌ রা সে ভুল, আদেশ দেন মা সর্বনাশী।
"জয় তারকেশ্বর" বলে পরবি রে নয় গলায় ফাঁসি।
জাগো বঙ্গবাসী ॥

ওদিকে মোহান্ত সরকারের নিকট সাহায্যেব জন্য আবেদন জানাইলেন। সরকারও মোহান্তের আবেদনে সাড়া দিয়া পুলিশ পাঠাইয়া দিল। মুখে মোহ-অন্তের গান গাহিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণ মন্দিরে নিকটবর্তী হইলে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং স্বেচ্ছাসেবকগণের উপর নির্মম ভাবে প্রহার করিতে লাগিল। অনেককে আবার গ্রেপ্তারও করিল। ফলে এই আন্দোলনটা রাজনৈতিক আন্দোলনের প গ্রহণ কবে।

কয়েক মাস ধরিয়া এই আন্দোলন চলে। এই ধর্ম-যুদ্ধের সেনাপতি দেশবন্ধুর চোখে তখন ঘুম নাই। বাংলার জনসাধারণের মধ্যে আব ·একবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবার জন্য তিনি পুত্র চিরবঞ্জনকে এই আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবক করিয়া পাঠাইলে তাহাকেও গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পাঠান হয়। তিনিও জেলে যাইবার জন্য প্রস্তুত ।ি২.লেন এমন কি এই দুর্নীতির মূল উৎপাটন করিতে তাঁহার যদি প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় সে জন্যও তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

মোহান্ত মহারাজ সতীশ গিরি নিজের বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া গদি পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, তিনি কংগ্রেসের সভ্য হইতে চাহেন, তাহা ছাড়া সমস্ত সঞ্চিত দেব-সম্পত্তি যাত্রীগণের সুখ-সুবিধার জন্য ব্যয় করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু ব্রাহ্মণ সভার

বিরোধিতায় মোহান্তের এই মিটমাটের প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় না।

তারকেশ্বরের এই সত্যাগ্রহ বাংলার শাসন কর্তা লর্ড লিটন সুনজরে দেখেন নাই। সেই সময়ে শ্রীরামপুরের একটি সভায় তিনি এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে Colossial hoax বা বিরাট ভণ্ডামি বলিয়া ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের নিকট এই অন্যায় ব্যঙ্গকারীর ক্ষমা ছিল না। ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত একটি সভায় তিনি লর্ড লিটনকে তাহার কথার যথাযথ উত্তর দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন: The whole of British Empire is a colossus hoax—a big fraud in history.

বিদেশী লিটনকে না হয় জবাব দিয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশের কয়েকখানি পত্র-পত্রিকাও দেশবন্ধুর এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করিতে ছাড়ে নাই। অনেকে ইহাও বলিয়াছে যে চিত্তরঞ্জন হিন্দু নহে সুতরাং হিন্দুধর্মের পক্ষে কথা বলিবার তিনি কে ?

চিত্তরঞ্জন তাহাদের জবাব দিয়াছিলেন, "I am a better Hindu than many of those who pose as such."

যাহা হউক, দেশব্যাপী এই প্রবল সত্যাগ্রহ আন্দোলনে মোহান্ত মহারাজ সত্যই ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন যাহার ফলে মোহান্ত সতীশ গিরির স্থলে প্রভাত গিরিকে তখন তারকেশ্বরের মোহান্তের গদিতে বসাইয়া দেশবন্ধু একটি আপস-রফা করেন।

এদিকে মে মাসের শেষের দিকে সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি হইয়াছিলেন মৌলানা আক্রাম খাঁ। এই সম্মিলন এক দিক হইতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দেশবন্ধুর হিন্দু মুসলমান চুক্তি সম্বন্ধে ইতিমধ্যে অনেকে অনেক বিরূপ সমালোচনা করিয়াছে। বিরোধী পক্ষের সেই সব সমালোচনার উত্তর দিয়া তাহাদের সব যুক্তিকে খণ্ডন করিতে দেশবন্ধুকে রাত একটা পর্যন্ত বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। সুখের বিষয় যে দেশবন্ধু বিরোধীগণের যুক্তির বাণকে তাঁহার অকাট্য যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়া জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সাফল্যের মধ্যেও অসুবিধায় পড়িলেন আর একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া।

তখন কলিকাতার পুলিশ কমিশনার ছিলেন মিঃ টেগার্ট। সিরাজগঞ্জ অধিবেশনের মাস চারেক পূর্বে গোপীনাথ সাহা নামে একজন বিপ্লবী যুবক

দিনের আলোতে, কলিকাতার জনাকীর্ণ ও কর্মমুখর অঞ্চল চৌরঙ্গীতে টেগার্টকে গুলি করিতে গিয়া ভুলবশতঃ মিঃ ডে নামক একজন সাহেবকে হত্যা করে। মিঃ টেগার্ট ছিলেন বিপ্লবীদের উপর অত্যাচারী, তাই বিপ্লবী-দের প্রধান শত্রু। সুতরাং তাহাকে পৃথিবীর এপার হইতে অন্য পারে পাঠাইবার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্তু টেগার্ট সাহেবের আয়ুর জোর ছিল বেশী, প্রত্যেকবারই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। শোনা গিয়াছে যে, বালেশ্বরে বুড়িবালামের যুদ্ধে নিহত হওয়ার পুর্বে বীর যতীন মুখার্জী নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন যে মিঃ টেগার্টকে যেন গুলি করিয়া পরপারে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বিপ্লবী যতীন মুখার্জীর অনুচরবৃন্দ নেতার সে আদেশ ভুলিতে পারেন নাই, তাই নূতন বিপ্লব। নূতন পর্যায়ে বলিবার কারণ এই যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হইবার পর, দেশবন্ধুর বাড়ীতেই বিপ্লবী পুলিন দাস ও বিপ্লবী পুর্ণচন্দ্র দাসের সাক্ষাৎ এবং দেশবন্ধুর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে পুর্ণ সমর্থনের ফলে বাংলার বিপ্লবীগণ তাহাদের বৈপ্লবিক কর্মপন্থা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহারা ফল লাভের আশায় বৈপ্লবিক কর্মপন্থা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু আশানুরূপ ফল না পাইয়া তাহারা হতাশ হইয়া পড়িলেন। নূতন পর্যায়ে তাই তাহাদের কার্য কলাপ আরম্ভ হওয়ার মুখেই মিঃ টেগার্টকে হত্যা করিবার ভার গোপীনাথের উপর ন্যস্ত হয়। সুতরাং না নাই,—গোপীনাথ সম্মত হইলেন। কিন্তু হইল ভুল, মিঃ টেগার্ট নয়, গুলি খাইয়া মরিল মিঃ ডে।

গোপীনাথ অবিচল। মৃত্যুকে সে ভয় করিল না। আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়োজনও সে বোধ করিল না। তাহার অবিচল ভাব দেখিয়া মনে হইল সে যেন অবজ্ঞাভরে নিজের তুচ্ছ জীবনটিকে দান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই রহিয়াছে। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া যে কয়েকটি কথা সে উচ্চারণ করিয়াছিল তাহা তাহার জীবন রক্ষার জন্য নহে, টেগার্টকে শঙ্কিত করিয়া রাখিবার জন্যই। গোপীনাথ বলিয়াছিল যে সে কৃতকার্য হইতে পারিল না বটে কিন্তু আগামী দিনে অন্য কেউ কৃতকার্য হইবেই।

সিরাজগঞ্জের এই প্রাদেশিক সম্মিলনীতে বাংলার বিপ্লবীগণ উপস্থিত ছিলেন। গোপীনাথের আত্মোৎসর্গের জন্য একটা শোক প্রস্তাব গৃহীত হউক এই মর্মে একটি প্রস্তাব আসিল। বিপ্লবীদের সংগে দেশবন্ধুর অন্তরের যোগা-

যোগ দীর্ঘদিনের। ১৯০৭ সাল হইতেই তিনি বিপ্লবীদের পাশে পাশে। বিপ্লবীদের হিংসার পথকে তিনি সমর্থন করিতে পারেন নাই কিন্তু তিনি তাহাদের দেশপ্রেম এবং দেশের মুক্তির জন্য তাহাদের সাধনাকে শ্রদ্ধা জানাইতেন; সময়ে সময়ে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। আইনজীবীরূপে পাশে দাঁড়াইয়া সাহায্য করিয়াছেন চিরকাল। তাহা ছাড়া যাহারা বিপ্লবী হইয়াছেন, তাহাদের এ পথে আসিবার কারণ সরকারের স্বৈরাচারী অত্যাচার, ইহাই ছিল দেশবন্ধুর অভিমত।

যাহা হউক, সিরাজগঞ্জ সম্মিলনীতে প্রস্তাব গৃহীত হইল: "The conference while denouncing or dissociating itself from Violence and adhering to the principle of Non-Violence, appreciates Gopinath Shaha's ideal of self-sacrifice, misguided though that is in respect of the country's best interests and expresses its respects for his great self sacrifice"—অর্থাৎ সর্বপ্রকার হিংসামূলক নীতির নিন্দা করিয়া এবং অহিংসামূলক নীতির উপর সম্পূর্ণ আস্থা দৃঢ়ীভূত রাখিয়া, গোপীনাথ যতই বিপথে চালিত হউক না কেন এবং তাহার কার্য স্বদেশের স্বার্থ পরিপন্থী হইলেও এই সম্মিলনী তাহার আত্মোৎসর্গের আদর্শের জন্য তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে খবরের কাগজে ইহার বিকৃত রূপ প্রকাশিত হইল: "The conference though not supporting the method of action of Gopinath Shaha pays its regards to his exceptional love of country."

সম্মিলনীতে গৃহীত প্রস্তাব এবং খবরের কাগজে যাহা প্রকাশিত হইল তাহার মধ্যে অনেক পার্থক্য। দেশের সংবাদপত্র দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে সমালোচনা আরম্ভ করিল। অনেকে বলিতে ছাড়িল না যে দেশবন্ধু অহিংসবাদী বলিয়া পরিচিত কিন্তু হিংসামূলক এবং বিপ্লবীদের কার্যকলাপও তিনি সমর্থন করেন।

এই নিন্দা প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম বলিয়াছেন, "নিন্দা গ্লানির পঙ্ক মাখিয়া" দেশবন্ধু তাঁহার সমগ্র জীবনে দেশ-প্রেমের জন্ত অনেক পুরস্কার পাইয়াছেন। হিংসা তিনি পছন্দ করেন নাই কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে রাজ-

দ্বারে বিপ্লবীদের পাশে গিয়া তিনি না দাঁড়াইয়া পারেন নাই। অনেক বিপ্লবী তাঁহার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়াছেন, অনেক বিপ্লবী তাঁহার নিকট আশ্রয় পাইয়াছেন। বিপ্লবী গোপীনাথ; পরম বৈষ্ণব দেশবন্ধু! কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীরাধা যেমন কালোমেঘে, কালো তমালে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া বাঁধ-না-মানা আকুল বাসনায় কাঁদিয়া উঠিতেন, পরম-বৈষ্ণব দেশবন্ধুও গোপীনাথের মধ্যে সেই ব্রজের গোপ-দুলাল গোপীমোহনকে দেখিয়া তাহারই প্রতি ভক্তিতে নয়ন-ভরা অশ্রুবারি লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের পর তাঁহারই পরমভক্ত আর এক দেশপ্রেমিক বিপ্লবী-কবি নজরুল তাঁহার অন্তর-কান্নার অশ্রু-মালা সাজাইয়া বলিয়াছেন :

আজ দিকে দিকে বিপ্লব—অহিদল খুঁজে ফেরে ডেরা,
তুমি ছিলে এই নাগ শিশুদের ফণী-মনসার বেড়া।
তুমি দেখেছিলে ফাঁসির গোপীতে বাঁশীর গোপীমোহন,
রক্ত-যমুনা কূলে রচে গেলে প্রেমের বৃন্দাবন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিত্তরঞ্জন হিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি অনেকবার বলিয়াছেন যে, হিংসার পথে কখনও স্থায়ী স্বরাজ লাভ হইতে পারে না। উহা তাঁহার শুধু মুখের কথাই ছিল না, উহা ছিল অন্তরেরই কথা। হিংসামূলক কোন ঘটনা তাঁহার কানে আসিলে তিনি বলিয়া উঠিতেন, "ওঃ হ'ল না, দেশটাকে পিছিয়ে দিলে দেখ্‌ছি।"

এখানে উল্লেখযোগ্য যে গোপীনাথ সাহা সম্বন্ধে সিরাজগঞ্জে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা গান্ধীজী সমর্থন করিতে পারেন নাই। গান্ধীজী যে সমর্থন করেন নাই ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদও তাঁহার আত্মজীবনীতে সে-কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন : Gandhiji did not like this resolution because actions like these were not in tune with the Congress policy of non-violence and impeded the freedom movement."

অসহযোগ প্রথা তখন অনেকটা মন্থরগতি হইয়া আসিতেছিল। মহাত্মাজী উহাকে গতিশীল করিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ২৪শে জুন আমেদাবাদে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভা আহ্বান করেন।

সভায় No-changerগণ স্বরাজ্য দলকে পরাজিত করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন দেশবন্ধু ও পণ্ডিত মতিলাল।

অধিবেশনে গান্ধীজী প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন যে, কংগ্রেসের যাহারা সভ্য তাহাদের প্রত্যেকের প্রত্যেক মাসেই দুই হাজার গজ সূতা নিজ হাতে চরকায় প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে হইবে। যে না পাঠাইবে তাহার নাম কংগ্রেসের সভ্য তালিকা হইতে বিলুপ্ত হইবে। স্বরাজ্য দল গান্ধীজীর এই প্রস্তাবে একটি Point of order তুলিয়া বলিলেন, "যাঁহারা ক্রীড্ সহি করিয়া সভ্য ও অল্ ইণ্ডিয়ায় নির্বাচিত হইয়াছেন এবং যাঁহারা কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতিরূপে নিয়মানুসারে সর্বদাই অল ইণ্ডিয়ার সভ্য এই প্রস্তাবে কংগ্রেস প্রদত্ত তাঁহাদের সেই অধিকার খর্ব করা হইবে। অতএব এই বিষয় এক মূল কংগ্রেস দ্বারাই নির্ধারিত হইতে পারে, অল্ ইণ্ডিয়া দ্বারা নয়।"

সভাপতি মৌলানা সাহেব ভোট গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিলেন। ভোট গণনা করিলে দেখা গেল যে স্বরাজ্যদল পরাজিত। মহাত্মাজীর সমর্থনে ভোট প্রদত্ত হয় ৮৩ আর স্বরাজ্য দলের সমর্থনে ভোট দেওয়া হয় ৬৭।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাত্মাজী প্রস্তাবটি উত্থাপন করিলে দেশবন্ধু ও পণ্ডিত মতিলাল উহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া, 'উহা যে অন্যায় এমন মন্তব্য করিয়া তাঁহাদের দলের উপস্থিত ৭০ জন সদস্য সমভিব্যাহারে সভামণ্ডপ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। স্বরাজ্য দল চলিয়া গেলেও আলোচনা অচল পর্যায়ে রহিল না। অনেকে দণ্ড-সর্ত (penalty clause) যাহাতে আরোপিত না হয় সেজন্য বক্তৃতা করিয়াছিল। যখনই মতদ্বৈধ তখনই ভোটের প্রশ্ন আসে। এবারও সভায় ভোট গ্রহণ করা হইল। ভোটে মহাত্মাজীই জয়লাভ করেন। তিনি পান ৬৭ ভোট আর তাঁহার বিরুদ্ধে ৩৭। কিন্তু স্বরাজ্য দল যদি সভা পরিত্যাগ করিয়া না যাইতেন তাহা হইলে মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে ভোটের সংখ্যা হইত ১০৭। মহাত্মাজী উহা বুঝিয়াই বার বার বলিয়াছিলেন, "হাম্‌কো হারা দিয়া, হাম্‌কো হারা দিয়া।"

বৈকালে স্বরাজ্য দলের সকলে উপস্থিত হইলে মহাত্মাজীর সঙ্গে কথা বলিবার প্রশ্ন ওঠে। চিত্তরঞ্জন মহাত্মাজীর সঙ্গে কথা বলিতে রাজী হন। মহাত্মাজী না ডাকিলে দেশবন্ধু কেন কথা বলিতে যাইবেন এমন মন্তব্যও কেহ

কেহ করেন। দেশবন্ধু তাহাদের উত্তর দেন, "মহাত্মাজীর সঙ্গে সহস্রবার সাক্ষাৎ করিতে দোষ মনে করি না।"

মহাত্মাজীর সঙ্গে দেশবন্ধু আলোচনা করিলেন। আলোচনায় সুফলই হইল। পূর্ব নির্ধারিত মত উপাধি, বিদ্যালয়, বিলাতীবস্ত্র বর্জন সবই বহাল থাকে। দ্বিতীয়তঃ স্থির হয় যে, কাউন্সিলে প্রবেশ সম্বন্ধে দিল্লী ও কোকনদ কংগ্রেসের মন্তব্যানুযায়ী কার্য চলিতে থাকিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আমেদাবাদের এই কংগ্রেস অধিবেশনে মহাত্মাজীর সঙ্গে দেশবন্ধুর ব্যবধানের দূরত্ব কমিয়া গিয়া বলা যায় পুনর্মিলন হইল। অনেকে ভাবিয়াছিল যে দেশবন্ধু এইবার গান্ধীজীর প্রভাবান্বিত কংগ্রেস হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে চলিয়া যাইবেন অথবা গান্ধীজীর কংগ্রেস দ্বারা পরিত্যক্ত হইবেন, তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইল না। তাহারা আরও হতাশ হইয়া পড়িল যে, কাউন্সিলে প্রবেশ নিষিদ্ধ অথবা কাউন্সিলে প্রবেশের বিরুদ্ধে আমেদাবাদ অধিবেশনে কোন প্রস্তাবই উঠিল না।

কিন্তু গোপীনাথ প্রস্তাবে দেশবন্ধু হারিয়া যান। এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধু বলিয়াছেন, "মহাত্মার প্রস্তাবে ও আমাদের প্রস্তাবে মূলতঃ কোন পার্থক্য ছিল না। তিনিও গোপীনাথের আত্মোৎসর্গের প্রশংসা করিয়াছেন, আমরাও করিয়াছি। তিনিও তাহার কার্য বিপথ-চালিত মনে করেন, আমরাও তাহাই করি। তিনিও নিরুপদ্রব অসহযোগের পক্ষপাতী, আমরাও তাই।"

তাহা হইলেও গোপীনাথকে লইয়াই নূতন করিয়া অশান্তির ঝড় উঠিল। সিরাজগঞ্জ সম্মিলনীতে গোপীনাথ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে সরকার তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন এবং ঐ প্রস্তাব গ্রহণের মূল অধিনায়ক দেশবন্ধু সম্বন্ধেও তাহারা নূতন করিয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। দেশবন্ধুর গলদেশে তখন জয়ের মালা থরে-থরে দোদুল্যমান। কাউন্সিলে তাঁহার বিজয় পতাকা উড্ডীন, কলিকাতা করপোরেশন তাঁহার করতলগত এবং তারকেশ্বরের মোহান্তের ব্যাপারেও জয়লাভ করিয়াছেন।

চিত্তরঞ্জন তখন গৌরবের শীর্ষদেশে, দেশ তাঁহার অনুরক্ত। তাঁহার একটি অঙ্গুলী হেলনে দেশ যে কোন আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে। রাজনৈতিক ব্যাপারে তো দেখা গিয়াছেই, তারকেশ্বরের মোহান্তের অত্যাচারকে কেন্দ্র করিয়া ধর্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়েও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এই সময়েই ১৯২৪ সালের প্রথম দিকে আর একটি অত্যাচারের কাহিনী তাঁহার কানে পৌঁছিল। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মাদারীপুর মহকুমার অধীনে কোন একটি স্থানে। ঘটনাটি অতি ঘৃণ্য, জঘন্য এবং পশু প্রবৃত্তির পরিচায়ক। স্থানীয় কয়েকজন পুলিশ মেয়েদের শ্লীলতাহানি করিয়াছিল। পুলিশের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে স্বরাজ্য দলভুক্ত একজন সভ্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। আরও দুঃখের বিষয় যে তদানীন্তন গভর্ণর বাহাদুর লর্ড লিটন পুলিশের ঐ অত্যাচারের কাহিনী বিশ্বাস করেন নাই। তিনি ঢাকাতে অনুষ্ঠিত পুলিশ দরবারে সেই বৎসরই নভেম্বর মাসে বলিয়াছিলেন যে ঐ ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং পুলিশের নামে মিথ্যা দুর্নাম দেওয়ার জন্যই মেয়েরা শ্লীলতাহানির মিথ্যা কাহিনী বানাইয়া প্রচার করিয়াছে।

সুযোগের সন্ধান পাইলেন দেশবন্ধু। ইতিপূর্বে আমলাতন্ত্রকে তিনি অনেক আঘাত করিয়াছেন। এই বারও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি আমলাতন্ত্রকে আর একটি প্রচণ্ড আঘাত করিবার জন্য প্রবল আন্দোলনে অবতীর্ণ হইলেন। মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার, শ্লীলতাহানি,—ইহাতে কোথায় শাসককুলের প্রধান হিসাবে গভর্ণর লিটন লজ্জিত হইবেন তাহা না হইয়' তিনি, মেয়েরাই মিথ্যা নিজেদের শ্লীলতাহানির কথা বলিয়াছে বলায় দেশবন্ধু ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্রোধের প্রকাশ হইল দেশব্যাপী স্বরাজ্য দলের প্রবল আন্দোলনে। লিটনের এই ঘৃণ্য কথার.জন্য টাউন হলে একটি বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। শোনা যায়, প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক সে সভায় উপস্থিত হইয়াছিল। টাউন হলে আর তিল ধরণের স্থান না থাকায় আরও পাঁচ, ছয়টি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রচণ্ড আলোড়ন এবং প্রবল প্রতিবাদের ফলেই লর্ড লিটনকে কৈফিয়ত প্রদান করিয়া ক্ষমা চাহিতে হইয়াছিল।

নিঃসন্দেহে ইহা আমলাতন্ত্রের উপর স্বরাজ্য দলের একটি প্রচণ্ড আঘাত এবং সেই সঙ্গে স্বরাজ্য দলের একটি বিরাট জয়।

এদিকে আমেদাবাদে অধিবেশনের পর ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট স্থান এলাহাবাদ, জামালপুর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। দাঙ্গা প্রবল ভাবে দেখা দেয় মালাবারে মোপলা জেলায়। সেখানে

দাঙ্গার আকার এমন নির্মম রূপে দেখা দেয় যে, হাজার হাজার লোক প্রাণের মায়ায় বসত-বাড়ী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সমস্ত সংবাদ জানিয়া গান্ধীজী বিচলিত হইয়া পড়েন। এই দাঙ্গার মূল কারণ অনুসন্ধানের জন্য মহাত্মাজী একটি কমিটি গঠন করেন। তাহাতে সৌকত আলিও ছিলেন। গান্ধীজী আর সৌকত আলির কমিটি। সৌকত আলির অভিমত হইল যে, এই দাঙ্গা হিন্দুদের জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গান্ধীজী ইহার বিপরীত মত পোষণ করিলেন। দুঃখের বিষয়, দীর্ঘদিনের অনুচর সৌকত আলি, গান্ধীজীর সঙ্গে মতের পার্থক্য হইলে, গান্ধীজীর বিরুদ্ধেও অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

গান্ধীজী ইহাতে দুঃখিত হইলেন আরও বেশী। তিনি তখন দুঃখিত অন্তরে ঘোষণা করিলেন যে ২১ দিন অনশন করিবেন। ইহার পরিপ্রেক্ষিতেই দিল্লীতে একটি 'Unity Confernce' বসিল। দেশবন্ধু সেখানে উপস্থিত হইলেন। হিন্দু মুসলমান ঐক্যের জন্য এই বৈঠকে যে আলোচনা হইয়াছিল তাহাতে দেশবন্ধুব অংশই প্রধান। আলোচনান্তে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহা দেশবন্ধু পুর্বে যে হিন্দু-মুসলমান চুক্তি করিয়াছিলেন তাহারই নূতন রূপ মাত্র।

কর্মক্লান্ত দেশবন্ধু, তদুপরি শরীরও ভালো যাইতেছিল না। একটু বিশ্রামের জন্য তিনি সস্ত্রীক দিল্লী হইতে সিমলা চলিয়া গেলেন। কয়েক দিন বিশ্রাম করিবার পরই একটি দুঃসংবাদ শুনিলেন।

পুর্বেই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে যে, গোপীনাথের ঐ কার্যের মধ্যে, বাংলা দেশে আবার বিপ্লববাদ উগ্রমূর্তিতে জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা সরকার ধরিয়া লইয়াছেন। এদিকে দেশবন্ধুও যে তাঁহার স্বরাজ্য দল গোটা বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষে প্রাধান্যলাভ করিতেছেন ইহাও তাহাদের অনভিপ্রেত। অথচ তেমন কোন সুযোগ না পাইলে দেশবন্ধুকে তাহার অগ্রগতিতে বাধা দিতে পারিতেছিলেন না। গোপীনাথের ঐ কার্য এবং সিরাজগঞ্জ সম্মিলনীতে গৃহীত প্রস্তাব সরকারের হাতে সে-সুযোগ আনিয়া দিল। সুতরাং দেশবন্ধুকে দমিত করিবার জন্য দাবার চাল চালিয়া দেশবন্ধুর যাহারা প্রিয়, বিশ্বস্ত অনুগামী এবং দক্ষিণহস্ত স্বরূপ, সরকার তাহাদের প্রতি কু-নজর দিলেন। ২৫শে অক্টোবর (১৯২৪ সাল) সন্ত্রাসবাদীদের জালে আবৃত করিবার জন্য সরকার

যে অর্ডিনান্স জারী করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই অর্ডিনান্সের জালে প্রথম বারেই বাংলার ৮০ জন তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। বলা বাহুল্য যে ইহাদের মধ্যে স্বরাজ্য দলের সভ্যই বেশী আর ছিলেন সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র তখন কলিকাতা করপোরেশনের চিফ্ একজিকিউটিভ্ অফিসার।

সিমলা শৈলে বসিয়া দেশবন্ধু এই দুঃসংবাদ শুনিলেন এবং তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। চতুর্দিকে প্রচারিত হইল যে দেশবন্ধুকেও গ্রেপ্তার করা হইবে। এই প্রচার শুনিয়া দেশবন্ধুর অনুরাগীগণ এবং জনসাধারণও তাঁহার রসা রোডের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেরই শঙ্কিত বুক, মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

সিমলা শৈলে চিত্তরঞ্জনের চিত্ত চঞ্চল। তাঁহার একান্ত প্রিয় অনুগামীদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তিনি কি করিয়া সিমলায় বিশ্রাম গ্রহণ করিবেন? ঠিক করিলেন, কলিকাতা রওনা হইবেন। কেহ কেহ বাধা দিয়া বলিল যে, কলিকাতা গেলে তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করিবে। সুতরাং তাঁহার তখন কলিকাতা না যাওয়াই উচিত।

কিন্তু তিনি কি উহাতে ভীত? বলিলেন, "দেশের জন্য কাজ করি, এতে ভয়ের কি আছে। ভয় পেয়ে ছাড়ার চেয়ে ফাঁসিকাষ্ঠও ভাল, সুভাষদের জন্য আমার প্রাণ যে অস্থির হয়ে উঠেছে।"

চিত্তরঞ্জন বুঝিলেন যে, আইন-সভায় তিনি বার বার মন্ত্রীদের বেতন বিল না মঞ্জুর করিয়াছেল, দ্বৈতশাসন অচল করিয়াছেন, ফলে স্বরাজ্য দলের প্রভাব ক্রমশই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চলিয়াছে। সুভাষচন্দ্র সহ বাংলার তরুণগণকে গ্রেপ্তার করিয়া সরকার পরোক্ষে তাঁহার উপরে তাহাদের আক্রোশ মিটাই-তেছেনে। সুতরাং তিনিও ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সন্দেহ-বশতঃ; বিনা প্রমাণ-প্রয়োগে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে আটক করিয়া রাখিবে এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তিনি কিছুতেই চুপ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। যেমন করিয়াই হউক, তাঁহার প্রিয় অনুগামীদের তিনি এই অন্যায় কারাবাস হইতে মুক্ত করিয়া আনিবেনই। সারা মনময় এই দৃঢ় মনোবল লইয়া তিনি কলিকাতা রওনা হইলেন।

সুভাষচন্দ্র তখন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। দেশবন্ধু প্রথমেই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। পরে প্রধান কর্ম-কর্তার এই অন্যায় গ্রেপ্তারের

প্রতিবাদে কলিকাতা করপোরেশনে একটি সভা করিয়া তিনি মেয়রের আসন হইতে যে দীপ্ত ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবেই, উল্লেখযোগ্য। তাঁহার গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে সেদিন উচ্চারিত হইয়াছিল :

Although it is late you will certainly allow me to say a few words on this resolution which is certainly one of the most important that has even been moved before this corporation. If a bomb was thrown anywhere or a pistol is fired we are accustomed to cry out it is a dastardly outrage. We cry out 'this is a dastardly outrage' because we feel it is a dastardly outrage. But the time has come now to condemn not only the violence of the people who are addicted to violent methods but also to the violence of the Government. (hear hear). This is a clear illustration of what I consider to be a violence on the part of Government. They have passed a law which is a lawless law. If you ask me what is a lawless law, you will allow me to quote a passage from my own speech which I delivered at a meeting in March 1918. Mr. Byomkesh Chakraborti occupied the chair of the meeting which was held at the Town Hall of Calcutta and he made use of the expression 'lawless law'. We were then dealing with the defence of India Act, pointing to Mr. Chakraborti I said :

He described this act as "lawless law" (hear, hear). I want you to fully realise the meeting of that observation made by the distinguished Chairman, I say that behind that observation lies the fundamental objection which we have got against the Act. What is "lawless law"? Any law of which the object is not to serve and secure the justice upon which the stability of society depends, must necessarily be "lawless law". It is something which is put forward under

cover of law which is not law, which offends against every principle of justice, which is a negation of justice and therefore negation of law (cheers). We protest against this Act because it is the destructive of the fundamental rights of man (hear, hear). To be taken and kept in custody for an indefinite period of time without being told what evidence there is and without being brought to justice, according to the law of the land, (Shame Shame) is a denial of the primary rights of humanity (hear, hear). "This is lawless law". Laws such as these were enacted in England in the days of the Stuarts' tyranny. And I am sorry to say that Government of India to-day is not able to govern this land except by the use of violence.

Sheer Brute Force

I shall tell you why I regard this as violence and it is for this simple reason. What are the facts ? Mr. Subhas Chandra Bose was elected by this Corporation as its Chief Executive officer on April 24, 1924. Under the law it required the approval of the Government. They had this case before them for over a month and they approved of his appointment by their letter. Subhas Chandra Bose was arrested under Regulation III on oct. 25, 1924. One fine morning he went out to do his work as the chief Executive Officer of the Corporation. He returned home and found the police force in his house. Not one charge was made against him. Not one explanation was asked from him. Not one reason was urged before him but he was simply told—we have got the physical—brute force here and we will drag you to imprisonment (cries of hear, hear). Is this low ? Is this justice ? If it was one we would have expected the officer to say "Well, we charge you

with this, you have done this, that or other thing. What have you got to say for your explanation." No, not one charge was formulated. Not one explanation was taken. But they simply carried him by force from his house and lodged him in jail.

I really do not think that when a revolutionary—in the enthusiasm of his heart fires a pistol or throws a bomb is guilty of more violence than what the Government is to-day (cries of hear, hear). Violence begets violence. It is because of these acts of violence from the year 1907 down to the present day—acts of legislative violence, that I say—and I repeat it again—that revolutionary crimes have increased.

The Government has honoured me by quoting me in support of their action. But what I said does not support them in their action. I said and I say it to-day that, there is a revolutionary party in this country. I said so in 1907. Let me read a passage from the same speech.

We feel it is our bounden duty to raise our voice of protest against this Act. The object ascribed is wrong. What is the real object? They s y "there is a vast conspiracy in the country," My answer is, I admit it, I know and believe and I am sure of it—as sure as I am standing here to night, —that there is a revolutionary party in Bengal. But what then? Do you think that you will be able to supress that revolutionary party in this way. Has revolution ever been checked by unjust legislation? Give me one instance from history where the Government has succeeded in putting down revolutionary movements by oppressive legislation. I admit that the thing is an evil. I admit that the activity of the revolutionary party is an evil in this country which has to be eradicated. But what is the duty of the Govern-

ment ? Is it not their duty to take such step as will effectually eradicate it ? (hear, hear). Does the Government really believe that the revolutionary party wants any other foreign power in this country ? (Cries of No, No) I venture to think that they do not. If not, what do they want ? Has the Government ever enquired in to the case which led to that revolutionary movement ? From 1905 we have been hearing of it, up to now ; repressive measure after repressive measure has been passed (cries of shame, shame) but has any attempt of any kind whatsoever been made to discover the real causes of the revolutionary movement ? (cries of No, No). I may tell you as I have told many of those in authority that I know more about these people than probably any body else in this hall. I have defended so many of these cases and I know the cause of these revolutionary movements is nothing but hunger for freedom (hear, hear), Within the last 150 years, what have you done to make the people of this country free or even realy fit for freedom ? Do we not constantly hear that we are not fit for self-Government ? (Shame, Shame) that we are illiterate, that we are not sufficiently educated (Shame, Shame). May I retort by asking—"you have been here for the last 150 years, with the best of motives, with the object of making us fit for self-Government : Why is it then that you have done nothing to this end ?" (Loud Cheers).

This is the psychology of the revolutionary movement. Our educated young men see that nations all over the world are free. They compare their position with the position of other nations, and they say to themselves, "Why should We remain So : We also want liberty." (cheers) Is there

any thing wrong in that desire? Is it difficult to understand that point of view? Do we not all know this hunger for liberty? These young men burning with the enthusiasm of youth feel that they have not been given the opportunity of taking their legitimate part in the Government of their country, in shaping the course of their national development. Give them that right to-day, you will hear no more of the revolutinary movement.

Gentlemen, Government is never tired of quoting my admission of the existence of a revolutionary party. I admitted it over and over again. I admit to-day and shall never refuse to admit what I believe to be true. But have they ever thought for the remedy which I suggested? Have they ever given their minds to it? Are they incapable of thinking any thing but ripression inspite of the testimony of history of the world being against them? Can't they think of any thing else—but repression, repression, repression! I tell them again that no amount of repression will ever put a check to this revolutionary movement. You cannot wipe out a nation from the face of the earth! You cannot check a people who are bent upon attaining freedom.

I shall lay down my life for liberty. I am not a revolutionary so far as the methods are concerned, but I feel like that. Standing here to-day I proclaim that if it is necessary to lay down my life for my liberty, I am prepared to do it (Applause and loud cheers).

If I believed in the revolutionary movement—If I believe it to-day that, it will be a success—I shall join the revolutionary movement to-morrow. But my belief is that, it will not succeed, that is why I do not join it. But so far

as their enthusiasm for liberty is concerned, I am with them. So far as their love for freedom is concerned I am with them. But if my suffering or struggle or every drop of my blood is necessary to achieve this freedom, I am ready.

I was told at simla that as soon as I got down at Howrah I should be arrested. I am not afraid of being arrested. I have done nothing wrong. I have done what every honest man in India is bound to do (Loud applause and cries of hear, hear).

Crime of Patriotism

Every honest man in this country is bound to say "I love my country—I love my freedom. I will have the right—the birthright, to manage my own affairs."

If that is a crime, I plead guilty to that charge. If that is a crime, I am willing to be hanged for that rather than to shirk the duty which I feel to be the only duty of every Indian of the present day.

"Subhas No More a Criminal Than I"

Gentlemen, probably I got a little beyond the topic of to-day. All that I is no more a revolutionary than I am. Why have they not arrested me? I should like to know, why? If love of country is a crime I am a criminal. If Mr. Subhash chandra Bose is a criminal, I am a criminal—not only the Chief Executive Officer of this corporation but the Mayor of this Corporation is equally guilty. (Cries of hear, hear and applause).

I can not believe that it is intended to put down revolutionary crime. These ordinances are directed against lawful organisations. They want to put down lawful organisations—I say Mr. Wilson read out a passage to you from the

speech of Pandit Motilal Nehru. You will permit me to read out a little more of that speech which not only diagnose the disease but deals with the remedy too.

"Well, Mr. Das said that there is more serious anarchical crime than the authorities realise and I do not know upon what materials he made that statement. But I wholly endorse it. Not only that, but I say that if you do not take care, you will one fine morning wake up to find the whole country fully honey-combed with secret Societies and you will not know how to deal with it. But what I do say is, not because I am in concert with any of these conspirators—if I were I would have admitted it but in fact I am not and my ways and implications do not take me that way. But I say as a reasonable man who can put two and two together—that know what ails my country. You know of it also. You may pride yourself in the belief that your repressive laws will put down anarchy, Nothing can be further from that. It was Mahatma Gandhi who with his non-violent non-co-operation was trying to put an effectual stop to all these anarchical crimes, but it was you who deprived him of that opportunity and you must take the consequences. Conspiracy must revive in the ordinary course of things and you can not expect otherwise. These acts have nothing to do with the activities of anarchists because they work under ground. You can not touch them ; you have no name for their associations excepting 'Red Bengal'. But if you declare them unlawful how many of them will you crush ? Who will come and say that he is a member of that Society. But 'Red Bengal' will commit its crime under ground. Hence the red use of the Act has been against people of a more dangerous character than the

anarchists against people like Mr. C. R. Das and myself."

That is all these ordinances can do.

They suppress the people who fight for their liberty in a legitimate way. They suppress or try to suppress lawful organisations. And what is the result ? Revolutionary crime is increased. Do you expect honest people who fight for the liberty of their country with nothing but peaceful and legitimate methods ; do you expect young men of that character when they are lodged in jail without any rhyme or reason, when they are snatched away from the bosom of their families, to entertain kindly feelings towards the Government or would you not rather expect that one case of such an outrage would lead to the increase of hundred eases of revolutionary crimes ? I admit that there is a revolutionary conspiracy in Bengal, one or more. But at the same time I suggest to the Government and if God spares me for a a few years more I shall prove it to demonstration wherever I am, that these repressive laws, these lawless laws, are incapable of putting down revolutionary crime. They have not succeeded in the past. They will not succeed in the future.

উপরে উদ্ধৃত ইংরাজী বক্তৃতার যথা সম্ভব বাংলা নিম্নে দেওয়া হইল :—

যদিও বিলম্ব হইয়াছে তবুও আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে এই সিদ্ধান্তের উপর কয়েকটি কথা বলিতে অনুমতি দিবেন। এই করপোরেশনে যতগুলি সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই সিদ্ধান্তটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোথাও বোমা নিক্ষিপ্ত হয় অথবা পিস্তল চালান হয় তবে আমরা উহাকে কাপুরুষোচিত নৃশংস অত্যাচার বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠি। আমরা উহাকে ঐরূপ নিন্দা করি কারণ আমরা উহাকে অতি গর্হিত নৃশংস বলিয়াই মনে করি। আমাদের দেশের যাহারা পশু বলে বিশ্বাসী, এখন শুধু তাহাদেরই নিন্দা করিবার সময় নয় উপরন্তু সরকারের নৃশংসতারও নিন্দা করিতে হইবে

(সাধু, সাধু)। সরকারের পক্ষ হইতে যাহা উগ্র হিংসাত্মক কার্য বলিয়া আমি মনে করি, ইহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাহারা একটি আইন পাশ করিয়াছেন। ইহা বে-আইনী আইন। আপনারা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, বে-আইনী আইন কি বস্তু তবে আমাকে আমারই ১৯১৮ সালের মার্চ মাসের প্রদত্ত বক্তৃতার একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করিতে হয়। কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত সেই সভায় ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং তিনি "বে-আইনী আইন" এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন। তখন আমরা ভারত রক্ষা আইন বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলাম। চক্রবর্তী মহাশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া আমি বলিয়াছিলাম, "তিনি এই আইনকে বে-আইনী আইন বলিয়া বলিয়াছিলেন (সাধু, সাধু)। মাননীয় সভাপতি মহাশয় যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহার অর্থ আপনারা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করুন ইহা আমি চাই। আমি বলিতে চাই যে, এই মন্তব্যের পশ্চাতে রহিয়াছে ঐ আইনের বিরুদ্ধে আমাদের মৌলিক আপত্তি। বে-আইনী আইন কি বস্তু? সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার উপর হইল সমাজের ভিত্তি, উহার সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ যে আইনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য নয়, সেই আইনকেই বে-আইনী আইন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এই বে-আইনী আইন এমন এক বস্তু যাহা আইনের আবরণে উপস্থাপিত করা হয়,—তাহা আইন-ই নয়, ইহা ন্যায়পরায়ণতার প্রতিটি নীতিকে লঙ্ঘন করে, ইহা ন্যায়পরায়ণতার সম্পূর্ণ বিপরীত সুতরাং আইনেরও বিপরীত ধর্মী (হর্ষধ্বনি)। আমরা এই আইনের বিরোধিতা করি, এই জন্য করি, কেন-না ইহা মানুষের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত (হিয়ার হিয়ার)। অনির্দিষ্ট কালের জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, সাক্ষ্য প্রমাণ কি আছে তাহা না জানাইলে এবং বিচারালয়ে বিচারার্থে প্রেরণ না করিলে (শেম্ শেম্) মানবিকতার প্রাথমিক অধিকারকে অস্বীকার করা হয়, (সাধু সাধু) ইহাই বে-আইনী আইন। এই ধরনের আইন ইংলণ্ডেই স্টুয়ার্ট রাজাদের অত্যাচারী আমলে ছিল এবং ভারত সরকার আজ উগ্র-হিংসাত্মক বলপ্রয়োগ না করিয়া দেশ শাসন করিতে পারিতেছেন না ইহা বড়ই ক্ষোভের কথা।

শুধু পশুশক্তি

আমি ইহাকে কেন উগ্রহিংসাত্মক কার্য বলিয়া মনে করি তাহা আমি আপনাদের নিকট বলিব। ইহার কারণ অতি সাধারণ। সত্য ঘটনা হইল, ১৯২৪ সালের ২৪শে এপ্রিল সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় করপোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা নির্বাচিত হইলেন। আইন অনুসারে ইহাতে সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন রহিয়াছে। তাহারা এই ব্যাপারটি লইয়া এক মাস কাটাইলেন, তাহার পর চিঠি দিয়া তাহার নিয়োগ অনুমোদন করিলেন। ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর 'রেগুলেশন থ্রি' অনুসারে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হইল। একদিন সকালবেলা তিনি করপোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করিতে গেলেন। বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিলেন, তাহার বাড়ীতে পুলিশ মোতায়েন রহিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা হইল না; তাহার নিকট হইতে একটিও কৈফিয়ত চাওয়া হইল না। তাহাকে একটিও কারণ দেখান হইল না, শুধু মাত্র তাহাকে বলা হইল, আমাদের গায়ের শক্তি রহিয়াছে এবং আমরা আপনাকে বলপূর্বক কারাগারে লইয়া যাইব। (হিয়ার, হিয়ার), ইহা কি উগ্র হিংসাত্মক কার্যকলাপ নহে? ইহা কি আইন? ইহাই কি ন্যায় নীতি? ইহাই যদি ন্যায় নীতি হইত তবে আমরা আশা করিতাম যে, সেই পদস্থ কর্মচারী নিশ্চয়ই বলিত যে, "দেখুন, আমরা আপনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিয়াছি, আপনি এই কার্যটি করিয়াছেন, আপনার কৈফিয়ত স্বরূপ আপনার কি বলিবার আছে।" একটি অভিযোগ উপস্থাপিত করা হইল না, একটি কৈফিয়তও তলব করা হইল না, তাহারা শুধু তাহাকে বলপূর্বক বাড়ী হইতে ধরিয়া লইয়া গেল আর কারারুদ্ধ করিয়া রাখিল।

আন্তরিক প্রেরণায় বিপ্লবী যখন পিস্তল চালনা করে অথবা বোমা নিক্ষেপ করে তিনি, সরকার আজ যাহা করিয়াছেন তাহা হইতে বেশী অপরাধী বলিয়া আমি সত্যই মনে করি না (হিয়ার হিয়ার)। উগ্র হিংসাত্মক কার্যকলাপ হইতেই আরও অধিক হিংসাত্মক কার্যের জন্ম হয়। ১৯০৭ সাল হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত যতগুলি হিংসাত্মক কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা আইনের সাহায্যেই চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। তাই আমি আবার বলিতেছি, এই একমাত্র কারণেই দেশে বিপ্লবাত্মক অপরাধ বৃদ্ধি পাইতেছে।

সরকার তাহার কাজের সমর্থনের জন্য আমার উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহাতে তাহাদের কাজের সমর্থন হয় না। আমি বলিয়াছিলাম এবং আমি আজও বলি যে, এই দেশে একটি সন্ত্রাসবাদী দল আছে। আমি ইহা ১৯১৭ সালেও বলিয়াছিলাম। সেই বক্তৃতা হইতে একটি অনুচ্ছেদ আমি পড়িতেছি।

এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। যে উদ্দেশ্য আরোপিত হইয়াছে তাহা ভুল। প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? তাহারা বলেন, "দেশময় বিরাট ষড়যন্ত্র চলিতেছে।" আমার উত্তর, আমি ইহা স্বীকার করি। আমি জানি, বিশ্বাস করি এবং এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত, যেমন নিশ্চিত আপনাদের সম্মুখে আজ এইখানে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছি, যে বাংলাদেশে বৈপ্লবিক দল আছে। কিন্তু তাহাতে কি হইয়াছে? আপনারা কি মনে করেন যে, এই ভাবে বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কর্ম স্তব্ধ করিয়া রাখিতে পারিবেন? বে-আইনী আইন দ্বারা বিপ্লবকে কি কোথাও স্তব্ধ করা গিয়াছে? সরকার ইতিহাস হইতে এমন একটি দৃষ্টান্ত আমাকে দেখান, যেখানে সরকার দমনমূলক আইন দ্বারা বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কর্ম দমন করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন? আমি স্বীকার করি যে, ইহা অন্যায়। আমি স্বীকার করি যে এই দেশে বিপ্লবী দলের ক্রিয়া-কর্ম অন্যায় যাহা উচ্ছেদ করা দরকার। কিন্তু সরকারের কর্তব্য কি? সার্থকভাবে যাহাতে এই ক্রিয়া-কর্ম বন্ধ হয় তাহা করিবার জন্য সঠিক পথ গ্রহণ করা কি তাহাদের উচিত নয়? (হিয়ার হিয়ার) সরকার কি সত্যই বিশ্বাস করেন যে, বিপ্লবীদল এই দেশে অন্য কোন বিদেশী শক্তিকে চাহেন? (না না ধ্বনি) আমি জানি তাহারা তাহা চান না। যদি না চান তবে তাহারা কি চান?—কেন এই বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কর্ম তাহার কারণ সরকার কি কখনও অনুসন্ধান করিয়াছেন? ১৯০৫ সাল হইতে আজ পর্যন্ত আমরা ইহা শুনিয়া আসিতেছি। একটির পর আর একটি পীড়নমূলক আইন পাশ হইয়া চলিয়াছে (ধ্বনি শেম শেম) কিন্তু বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কর্মের কারণ অনুসন্ধানের জন্য কোন চেষ্টা বা তেমন কিছু করিয়াছে কি? (না না ধ্বনি) যেমন আমি কর্তৃপক্ষকে বলিয়াছি তেমন আজকের এই সভায় যাহারা উপস্থিত আছেন তাহাদেরও বলিতেছি যে, আপনাদের সকলের চাইতে আমি তাহাদের বেশী জানি। আমি তাহাদের

অনেক মোকদ্দমা পরিচালনা করিয়াছি এবং তাহাদের মনোগত ভাবের সঙ্গে আমি পরিচিত। আমি জানি, বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কর্মের মূল কারণ স্বাধীনতার জন্য ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই নহে (হিয়ার হিয়ার ধ্বনি)। গত দেড় শত বৎসরের মধ্যে এই দেশের জনগণকে স্বাধীন করিবার জন্য অথবা স্বাধীনতার জন্য উপযুক্ত করিয়া তুলিতে তোমরা কি করিয়াছ? আমরা কি অনবরত শুনিতেছি না যে, আমরা স্বায়ত্ত শাসনের উপযুক্ত নই (শেম শেম ধ্বনি), আমরা শুনিতেছি,—আমরা নিরক্ষর, আমরা উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষিত নই। (শেম শেম ধ্বনি) আমি কি উল্টা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, আমাদিগকে স্বায়ত্ত শাসনের উপযুক্ত করিবার সদিচ্ছা লইয়া তোমরা গত দেড় শত বৎসর এখানে রহিয়াছ, তবে তোমরা সেদিকে কি করিয়াছ? (প্রবল হর্ষধ্বনি)।

বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কর্মের এই হইল মানসিকতা। আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ দেখে যে, সমগ্র বিশ্বের জাতি সমূহ স্বাধীন। অন্যান্য জাতির সঙ্গে তাহারা নিজেদিগকে তুলনা করে এবং নিজেদিগকে প্রশ্ন করে, আমরা কেন এমন থাকিব? আমরাও স্বাধীনতা চাই। (হর্ষধ্বনি) আমাদের এই ইচ্ছা কি অন্যায়? ঐ মনোগতভাব বুঝিতে পারা কি খুব কষ্ট? আমরা কি সকলেই এই স্বাধীনতার ক্ষুধায় কাতর নই? যৌবনের তারুণ্যে উজ্জ্বল এই যুবকবৃন্দ ভাবিতেছে যে, দেশ শাসনের ন্যায্য অধিকারে তাহাদের কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই, সুযোগ দেওয়া হয় নাই জাতীয় উন্নতির বিধান নির্ধারণের। আজ তাহাদের সেই অধিকার দেওয়া হউক তবে আপনারা আর বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কর্মের কথা শুনিবেন না।

ভদ্রমহোদয়গণ, দেশে যে বিপ্লবীদল রহিয়াছে, আমার এই উক্তি ব্যবহার করিতে সরকার কখনই ক্লান্ত হন না। আমি বার বারই ইহা স্বীকার করি। আমি ইহা আজও স্বীকার করি এবং যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি তাহা স্বীকার করিতে কখনও অস্বীকার করিব না। কিন্তু তাহারা কি আমার নির্দেশিত পথে সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করিয়াছেন? তাহারা কি এই দিকে মনোযোগ দিয়াছেন? জগতের ইতিহাসের স্বাক্ষর তাহাদের বিরুদ্ধে জানা সত্ত্বেও, নির্যাতন ছাড়া তাহারা কি আর কিছু ভাবিতে অক্ষম? নির্যাতন ছাড়া কি তাহারা আর কিছু ভাবিতে পারেন না? শুধু নির্যাতন আর নির্যাতন! আমি তাহাদের আবার বলি যে, কোন প্রকার নির্যাতনই

এই বৈপ্লবিক আন্দোলন দমন করিতে পারিবে না। এই পৃথিবীর বুক হইতে একটি জাতিকে তোমরা নিশ্চিহ্ন করিতে পার না। স্বাধীনতার তৃষ্ণায় তৃষ্ণার্ত একটি জাতিকে তোমরা কিছুতেই স্তব্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না।

স্বাধীনতার জন্য আমি আমার জীবন বিসর্জন দিব। পদ্ধতিগতভাবে আমি একজন বিপ্লববাদী নই কিন্তু মনোগতভাবে আমি তাহাদের সঙ্গে আছি। আজ, এইখানে দাঁড়াইয়া আমি ঘোষণা করিতেছি যে, স্বাধীনতার জন্য আমার প্রাণ বিসর্জনের যদি প্রয়োজন হয় তবে তাহা করিতেও আমি প্রস্তুত (প্রবল হর্ষধ্বনি)।

যদি আমি বিপ্লবী ক্রিয়া-কর্মে বিশ্বাসী হইতাম, যদি আমি ইহা আজও বিশ্বাস করি যে, ইহা সফল হইবে তবে আগামী কালই আমি বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগদান করিব। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ইহা সফল হইবে না এবং সেই কারণেই আমি ইহাতে যোগদান করি নাই। কিন্তু স্বাধীনতার সাধনায় আমি তাহাদের সঙ্গে আছি। এই স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য যদি আমার দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয় অথবা আমার প্রত্যেকটি রক্ত বিন্দুর প্রয়োজন হয় আমি তাহা দিতেও প্রস্তুত আছি।

আমি যখন সিমলাতে ছিলাম তখন আমাকে বলা হইয়াছিল যে, হাওড়া স্টেশনে নামামাত্র আমাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। গ্রেপ্তার বরণ করিতে আমি ভীত নই। আমি কোন অন্যায় করি নাই। ভারতের প্রত্যেকটি সজ্জনের যাহা কর্তব্য আমি তাহাই করিয়াছি (প্রবল হর্ষধ্বনি হিয়ার হিয়ার)

স্বদেশপ্রীতির অপরাধ

এই দেশের প্রত্যেকটি সজ্জন বলিতে বাধ্য, "আমি আমার দেশকে ভালবাসি,—আমার স্বাধীনতাকে ভালবাসি। আমি আমার অধিকার চাই—আমার জন্মগত অধিকার, নিজেরটা নিজের হাতে করিবার অধিকার চাই।"

যদি তাহা অপরাধ হয়, সে-অপরাধে আমি অপরাধী। উহা যদি অপরাধ হয় তবে আজিকার প্রত্যেকটি ভারতবাসীর যাহা একমাত্র কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি, তাহা পরিহার করার চাইতে, ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিতেও আমি প্রস্তুত।

আমার চেয়ে সুভাষ অধিক অপরাধী নহে

ভদ্রমহোদয়গণ, আজিকার আলোচ্য বিষয় ছাড়াইয়া আমি হয়ত আরও

একটু অগ্রসর হইয়া গিয়াছি। আমি যতখানি বিপ্লবী সুভাষও তাহার চেয়ে বেশী বিপ্লবী নহে তবে আমাকে কেন গ্রেপ্তার করা হইল না?—কেন করা হইল না আমি জানিতে চাই। দেশকে ভালবাসা যদি অপরাধ হইয়া থাকে তবে আমি অপরাধী। সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় যদি অপরাধী হইয়া থাকেন তবে আমিও অপরাধী। এই করপোরেশনের প্রধান কর্মকর্তাই শুধু অপরাধী নহে এই করপোরেশনের মেয়রও সমান অপরাধী (সাধু, সাধু)। বিপ্লবাত্মক অপরাধ দমন করাই ইহার উদ্দেশ্য, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। এই সকল কানুনের উদ্দেশ্য হইল আইনসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান সমূহের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য। আমি বলিতে চাই যে, আইনসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহারা দমন করিয়া রাখিতে চাহেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর বক্তৃতার একটি অনুচ্ছেদ উইলসন সাহেব আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইয়াছেন। আপনাদের অনুমত্যানুসারে ঐ বক্তৃতার আর একটু অংশ আমি আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইব। ঐ অংশে রোগ নির্ণয় করা হইয়াছে এবং তাহার প্রতিষেধক ঔষধের কথাও আলোচনা করা হইয়াছে, দাশ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে কর্তৃপক্ষের যতটা গোচরীভূত হইয়াছে তাহার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবাত্মক অপরাধ অনুষ্ঠিত হইতেছে। কোন্ তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি এই বিবৃতি দিয়াছেন তাহা আমি জানি না কিন্তু আমি ইহা সর্বান্তকরণে সত্য বলিয়া মনে করি। শুধু তাহা নহে, কিন্তু আমি বলিব যে, আপনারা যদি যত্নবান না হন এক সুপ্রভাতে আপনারা জাগিয়া দেখিবেন যে, দেশময় এই গুপ্ত সমিতিগুলি ছড়াইয়া রহিয়াছে। তখন ইহাদের সহিত পারিয়া উঠিবেন না। আমি যে এই সব ষড়যন্ত্রকারীদের সহিত যুক্ত আছি তাহা নহে, যদি থাকিতাম তবে নিশ্চয়ই আমি স্বীকার করিতাম। বস্তুতঃ আমি যুক্ত নহি এবং আমার চাল-চলন এবং উদ্দেশ্য আমাকে ঐ পথে লইয়া যায় না। কিন্তু আমি একজন কঠোর যুক্তিবাদী মানুষ হিসাবে বলি যে, আমার দেশের কি রোগ তাহা আমি জানি। আপনারাও তাহা জানেন। আপনাদের দমন-পীড়নমূলক আইন-গুলি এই নৈরাজ্য দমন করিতে পারিবে—এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে আপনারা গর্ব অনুভব করিতে পারেন। ইহা হইতে অধিক মিথ্যা আর কিছুই হইতে পারে না। এই সকল নৈরাজ্যবাদী অপরাধ বন্ধ করিতে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অহিংস অসহযোগ দ্বারা চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু আপনারা তাঁহাকে

সেই সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন এবং উহার ফলও আপনাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। যথারীতি পুরাতন নিয়মে ষড়যন্ত্র আবার মাথা জাগাইয়া উঠিবে। ইহার অন্যথা আপনারা আশা করিতে পারেন না। এই সকল কার্য-কলাপ নৈরাজ্যবাদীদের কার্য-কলাপের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। কেন না তাহারা গোপনে কার্য করে, আপনারা তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারিবেন না। তাহাদের সংঘ সংগঠনের নামও নাই। একটি মাত্র নাম আছে 'লাল বাংলা'। আপনারা যদি তাহাদিগকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত করেন, কতজনকে নিষ্পেষিত করিতে পারিবেন?—কে বা কাহারা আসিয়া আপনাদিগকে বলিয়া দিবে যে অমুকে ঐ সংঘের সদস্য, কিন্তু লাল বাংলা তাহার অপরাধ অনুষ্ঠান গোপনেই সমাধা করিবে। সুতরাং এই আইনের সত্যিকার ব্যবহার হইবে এই সকল নৈরাজ্যবাদীদের চাইতেও ভয়ঙ্কর চরিত্রের লোকদের উপর যথা সি. আর. দাশ মহাশয় এবং আমি।"

এই সব কানুন এতটুকুই করিতে পারে। যে সকল লোক যুক্তির জন্য আইনানুগ পথে সংগ্রাম করে তাহাদিগকেই দমন করিতে পারে। আইন-সিদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহকে দমন করিতে পারে বা দমন করিতে চেষ্টা করিতে পারে। ইহার পরিণতি কি?—বিপ্লবাত্মক অপরাধ অনুষ্ঠানের বৃদ্ধি। যে সকল সজ্জন নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য আইনানুগ পথে সংগ্রাম করিয়া থাকে, যে সকল চরিত্রবান যুবককে তাহাদের পরিবারের বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়া বিনা কারণে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয়, আপনারা কি আশা করেন যে তাহারা সরকারের অনুকূলে সদয়ভাব পোষণ করিবে? বরং ঐ সকল বর্বরতার শিকার বিপ্লবাত্মক শত শত অপরাধ অনুষ্ঠানগুলিকে আরও বাড়াইয়া তুলিবে। বাংলাদেশে বিপ্লবাত্মক সংঘ রহিয়াছে তাহা আমি স্বীকার করি; হয়তো একটি আছে, হয়তো একাধিক রহিয়াছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমি সরকারের নিকট প্রস্তাব করি এবং ঈশ্বর যদি আরও কিছুদিন বাঁচাইয়া রাখেন তবে আমি যেখানেই থাকি না কেন, প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করিব যে ঐ সকল দমন-পীড়ন-মূলক আইন, এই সকল বে-আইনী আইন, বিপ্লবাত্মক অপরাধ অনুষ্ঠান দমন করিতে পারিবে না। অতীতেও ইহারা সফল হয় নাই, ভবিষ্যতেও ইহারা সফল হইবে না।

শুধু করপোরেশনের মেয়রের আসন হইতে এই বক্তৃতা করিয়াই দেশবন্ধু

তাঁহার কর্তব্য শেষ করিলেন না। তিনি ইংরাজের এই স্বৈরাচারী নীতির প্রতিবাদ চিরকালই করিয়াছেন এবারেও তিনি আমলাতন্ত্রের এই স্বেচ্ছাচারিতাকে "Lawless Law" বলিয়া আখ্যা দিয়া ইহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে টেলিগ্রাম করিলেন। এদিকে কলিকাতাসহ সমগ্র বাংলার অবস্থা অত্যন্ত তপ্ত। ইংরাজের এই দমন নীতিকে তাহারা কিছুতেই সহ্য না করিবার প্রতিজ্ঞা লইয়া সিংহের গর্জনে গর্জিয়া উঠিলেন। ইহারই সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ ৩১শে অক্টোবর [১৯২৪] টাউন হলের সম্মুখে এক বিরাট জনসভা। শহর ভাঙ্গিয়া চতুর্দিক হইতে মানুষের পর মানুষ আসিয়া সংখ্যা হইয়াছিল প্রায় দেড লক্ষ। সেই সময়ের পূর্বে এত বড বিশাল সমাবেশ আর কখনও নাকি হয় নাই।

দেশবন্ধু সিমলা হইতে যখন ফিরিলেন তখন শরীর অসুস্থ। কিন্তু কলিকাতা ফিরিয়া ক্ষোভে, উত্তেজনায় শরীরের অসুস্থতাকে মনে স্থান না দিয়া তিনি বীরের মত একটির পর একটি কার্য করিয়া চলিলেন। টাউন হলের সম্মুখে সম্মিলিত জনতাকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "বাঙলার যুবক, তোমাদের হৃদয়ে স্বাধীনতার আগুন জ্বলিয়া উঠুক, স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া এস, আত্মবিসর্জন দিতে দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া ওঠ। এই জরাজীর্ণ, পীড়াশীর্ণ, দেহ লইয়া সর্বাগ্রে আমি সম্মুখীন হইব। তোমরা আমার অনুসরণ কর। মা, একবার সংহার মূর্তিতে প্রকাশ হও মা, আমরা সকলে তোমার সম্মুখে আত্মোৎসর্গ করিয়া স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখি।"

সুভাষচন্দ্রসহ বাংলার তরুণগণের এই গ্রেপ্তারে মহাত্মাজীও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। দেশবন্ধুর নিকট হইতে ঐ তারবার্তা পাইয়া তিনিও দেশবন্ধুর পার্শ্বে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে নূতন করিয়া আলোচনার প্রয়োজন বোধ করিলেন। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি ৪ঠা নভেম্বর কলিকাতা আসিয়া পৌছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল ইতিপূর্বেই কলিকাতা আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। তাঁহারা দুইজনেই মহাত্মাজীকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের জন্য ব্যাণ্ডেল হইতে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া কলিকাতা লইয়া আসিলেন।

মহাত্মাজী বুঝিয়াছিলেন যে রাজ্যে এবং কেন্দ্রে স্বরাজ্য দলের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং সমস্ত সভ্যগণের ঐকান্তিকতা, কর্মকুশলতা এবং শৃঙ্খলাবোধ সরকারের অত্যন্ত ভয়ের কারণ হইয়াছিল। সরকার তাই স্বরাজ্য দলের শক্তি হরণের উদ্দেশ্যে 'Lawless Law' দ্বারা গ্রেপ্তার করিতে শুরু করিয়াছেন। সে যাহা হউক, গান্ধীজী নূতন পর্যায়ে তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া নূতন মত এবং পথের কথা চিন্তা করিয়া সেদিনই অর্থাৎ ৪ঠা নভেম্বর বৈকালে দেশবন্ধুর বাড়ীতেই এক বৈঠক আহ্বান করিলেন।

বৈঠকে গান্ধীজীর বক্তব্য হইল, নিজেদের মধ্যে যে বিরুদ্ধ মনোভাব রহিয়াছে তাহা দূরীভূত করিয়া তখন ঐক্যের প্রয়োজন, প্রয়োজন একই মঞ্চে, একই পতাকাতলে সকলের আসিয়া সমবেত হওয়া। আলোচনান্তে দেখা গেল যে মহাত্মাজী তাঁহার মতের পরিবর্তন করিয়াছেন। বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত হইল তাহা হইতেছে: (১) তখনকার মত অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ রাখা হইবে। (২) বিদেশী বস্ত্র পরিত্যাগ এবং খদ্দর পরিধান কংগ্রেসীদের একান্তই কর্তব্য। (৩) নিজের হাতে বা অপরকে দিয়া প্রতি মাসে ২০০০ গজ সূতা দিয়া কংগ্রেসের সভ্য হইতে হইবে। (৪) কংগ্রেস তখন হইতে স্বরাজ্য দলের কার্যকে নিজেদের কার্য বলিয়া মনে করিবেন কিন্তু পরিচালনা এবং অর্থ সংগ্রহের যে দায়ীত্ব তাহা স্বরাজ্য দলের উপরেই ন্যস্ত থাকিবে,—এক কথায় স্বরাজ্য দলের কাউন্সিলে প্রবেশকে কংগ্রেসও তাহার কর্মসূচীরূপে গ্রহণ করিলেন।

এই ঐক্য বৈঠকের পর মহাত্মাজী, দেশবন্ধু ও পণ্ডিত মতিলাল এই তিন নেতৃবৃন্দ যৌথভাবে উপরোক্তমর্মে এক বিবৃতি প্রচারিত করিলেন। পরে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির ২৩শে নভেম্বর বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে এই তিন নেতৃবৃন্দের যৌথ বিবৃতিকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন জানান হয়। নিঃসন্দেহে ইহা স্বরাজ্য দল তথা দেশবন্ধুর বিজয় গৌরব। শুধু বাংলা কাউন্সিল আর কলিকাতা কর্পোরেশন নহে, সমগ্র ভারতীয় কংগ্রেসকেও তাঁহার মতাবলম্বী করিয়া জয় করিলেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গান্ধীজী স্বরাজ্য দলের সঙ্গে এই আপস করিলে অর্থাৎ স্বরাজ্য দলের কার্য কংগ্রেসের কার্য বলিয়া পরিগণিত হইবে স্থির হওয়ায় কিছু কিছু দক্ষিণপন্থী নেতা এবং No-changerগণ গান্ধীজীর উপরও অসন্তুষ্ট

হইয়াছিলেন। গান্ধীজী কিন্তু তাহাতে এতটুকু বিচলিত না হইয়া স্বরাজ্য দলকেই দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া দেশবন্ধুকেই সমর্থন জানাইয়াছিলেন। এ-প্রসঙ্গে গান্ধীজী দীর্ঘদিন পরেও তাঁহার নিজের মনের কথাটা সহজ ও সরল করিয়া ২৮. ৭.'৪৬ তারিখে 'হরিজন' পত্রিকায় লিখিয়াছেন: **The Labours of Desh Bandhu and Motilal Nehru had opened my eyes that the Parliamentary Programme had a place in the national activity for independence.**

তারপর দেশবন্ধু নিজের সম্পূর্ণ কর্মশক্তি নিযুক্ত করিতে চাহিলেন গঠনমূলক কার্যে। ১৯১৭ সালে ভবানীপুরে তিনি যে 'বাংলার কথা' বলিয়াছিলেন সেই বাংলা,—সেই পল্লীবাংলা, যেখানে দরিদ্র ভাই-বোনগণ বাস করেন, কামার, কুমার, মিস্ত্রী-মজুর বাস করেন, যেখানে রোগে কারোর মুখে ঔষধ তো দূরের কথা, একটু নির্মল জল পর্যন্ত পড়ে না, যেখানে রাস্তার অভাবে মানুষ পায়ে হাঁটিতে পারে না, যেখানে সংহার মূর্তিতে ম্যালেরিয়া আসিয়া গ্রামের পর গ্রাম শ্মশানে পরিণত করিয়া দিয়া যায়—তাহার দিকেই তিনি নজর দিতে চাহিলেন। কিন্তু পল্লীসংগঠন এবং গঠনমূলক কার্যে অর্থের প্রয়োজন একান্তই। তিন লক্ষ টাকা তাঁহার চাই।—এই টাকা দিয়া তিনি বাঁচাইবেন তাহাদের যাহারা বাংলার প্রাণ, যাহাদের প্রাণভরা স্নেহ, মায়া আর মমতা।

স্থির করিলেন, ডিসেম্বরের ১লা হইতে সাত দিন তিনি 'স্বরাজ্য-সপ্তাহ' পালন করিবেন এবং অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিবেন। মহান্ কাজ, পবিত্র ব্রত। কিন্তু এ-মহান্ কাজে দেশবন্ধুর অনুগামী কোথায়! কোথায় কর্মী? তাঁহার যাহারা অনুরক্ত তাঁহারা কারাগারে। সুভাষচন্দ্র কাছে ছিলেন না, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল অনুপস্থিত, অনিলবরণ নির্বাসিত। জানা যায় যে, দেশবন্ধুর এই মহানব্রতে এই সময় প্রতাপচন্দ্র গুহরায় তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। বাহির হইলেন দেশবন্ধু ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া,—নূতন বৈরাগী! ঘুরিলেন এক দুয়ার হইতে অন্য দুয়ারে—এক গলি হইতে অন্য গলিতে। নজরুল ইহার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন:

> "জাগিয়া প্রভাতে হেরে পুরবাসী
> রাজা দ্বারে দ্বারে ফেরে উপবাসী"

নজরুল বুঝিলেন, নারায়ণ নবরূপে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন—কিন্তু আর কে বুঝিল? আর তো কেহ বুঝিল না? দেশের লোক তাহাকে চিনিল না,—অথচ দেশের লোকের জন্যই তিনি আরও ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের বন্যাপীড়িত মানুষের জন্য তাঁহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিয়াছিল তাই তিনি একবার ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন। আবারও তিনি দেশের দুয়ারে দুয়ারে তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য ঘুরিয়াছিলেন—কিন্তু সে—অর্থ কি তাঁহার জন্য? তাঁহার জন্য নয়,—উহা দেশের জন্য, জাতির জন্য। তাঁহার নিজের জন্য তিনি ভিক্ষায় বাহির হইবেন কেন? তিনি হইতে পারিতেন অসীম সম্পদশালী, ইচ্ছা করিলেই কুবেরের অর্থাগার নিজের করতলগত করিতে পারিতেন, চঞ্চলালক্ষ্মীকে স্থির করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিতেন নিজের ঘরে। এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে যে কোন সন্দেহ নাই দেশবাসী তাহা সকলেই জানে—জানে যাহার দুয়ারে তিনি ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন তিনিও—তবুও—তবুও দেশের লোক সাহায্যের দক্ষিণ হাতখানি বাড়াইয়া রাজ-ভিখারীকে, দেশের মুক্তি পাগল মহানব্রতীকে, সর্বস্বত্যাগী ভোলানাথের ভিক্ষার ঝুলিতে দান করিয়া নিজেরা ধন্য হইতে চাহিল না।

কিন্তু রাজ-ভিখারীর ধৈর্য অসীম। শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন তিনি। এ প্রসঙ্গে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এক বিবরণ হইতে জানা যায় যে, একদিন দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র এবং তিনি শিয়ালদহের নিকট এক ধনী ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু টাকার আশায় গিয়াছিলেন। বাহিরে প্রবলভাবে বারিবর্ষণ হইতেছিল; রাত প্রায় দশটা হইবে। বৃষ্টিও থামিতেছে না, ধনীব্যক্তিরও দয়া হইতেছে না। শরৎচন্দ্র ধৈর্য হারাইয়া দেশবন্ধুকে বলিলেন, "গরজ কি একা আপনারই? দেশের লোক সাহায্য করিতে যদি এতটাই বিমুখ হ'য়ে ওঠে ত তবে থাক্।"

শরৎচন্দ্রের কথা শুনিয়া দেশবন্ধু ধীরে ধীরে বলিলেন, "দোষ আমাদেরই, আমরাই কার্য করতে পারিনে। বাঙালী ভাবুকের জাত, বাঙালী কৃপণ নয়। একদিন যখন সে বুঝবে, তার যথাসর্বস্ব এনে আমাদের হাতে ঢেলে দেবে।"

তিনি ঘুরিতে লাগিলেন, সভা করিতে লাগিলেন। হাওড়ায় এই স্বরাজ্য সপ্তাহেই এক জায়গায় দেশবন্ধু বলেন: আজ জীবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া

আমি স্থির বুঝিয়াছি পল্লী সমাজেই ভারতের জীবন, পল্লী সংগঠনেই ভারতের মুক্তি। কিন্তু এই বিপুল অনুষ্ঠানের অর্থ কোথায়? স্বরাজ্য দলের মধ্যে প্রায় সকলেই তো অর্থহীন। গত নির্বাচনের সময়ে আমি নিজ নামে চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ করিয়া এই দ্বন্দ্বে সাহায্য করিয়াছি। আপনারা জানেন, আমি ব্যবসা ছাড়িয়াছি, অন্য কোন আয়েরও সংস্থান নাই, আজ আমি কপর্দকহীন। যদি আমার অর্থ থাকিত বা আইন-ব্যবসা-কার্যে লিপ্ত থাকিতাম, সামান্ত অর্থের জন্ত আপনাদের নিকটে প্রার্থী হইতাম না। বরাবর তো ঋণ করা যায় না আর বিনা অর্থে এই জাতীয় সংগ্রামই বা কি প্রকারে পরিচালিত হইবে? কত অর্থ আপনারা থিয়েটার, বায়স্কোপ, ঘোড়দৌড়, সিগারেটে ব্যয় করেন, সেই অর্থ হইতে যাহা কিছু বাঁচাইতে পারেন, দান করিলে আপনাদের কোন অসচ্ছলতা হইবে না।

ইংরাজদের অন্য দোষ থাকিতে পারে। কিন্তু স্বদেশ হিতৈষণায় সমবায় যত্নের তুলনা নাই। জাতীয় স্বত্ব সংরক্ষণে তাহারা অকাতরে অর্থ বিতরণ করিতেছে। য়্যাঙ্গলো ইণ্ডিয়ান পত্র সম্পাদকগণ আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার জন্য কোনরূপ যত্নের ত্রুটি করিতেছে না। আমেরিকা, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশেও আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ প্রচারিত হইতেছে। আমাদেরও সেইরূপ organisation দরকার। কিন্তু সমস্ত কার্য চালাইবার অর্থ কোথায়? আপনারা যদি সকলে মিলিয়া সেই ভার বহন না করেন, আমি একা কি করিয়া পারি? ব্যবসা না ছাড়িলে আমি সমস্ত অর্থ দিতে পারিতাম কিন্তু আজ যে আমি দরিদ্র, অক্ষম, কপর্দকহীন। আমি তো ভিক্ষার ঝুলি লইয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত হই নাই। আমি চাই ভারতের মুক্তির জন্য আপনার প্রদেয় শুল্ক। দেশের লক্ষ লক্ষ প্রাণ কি জাতীয় জীবন সংরক্ষণে মুক্তহস্তে ছুটিয়া আসিবে না? এই দুঃসাধ্য সংগ্রামে কি উপায়ে বিজয়লক্ষ্মী আমাদের করতলগত হইবে? আমি তো চিন্তা করিয়া পাগলের ন্যায় হইয়াছি। বুরোক্রেসী কেবল অর্ডিনান্স পাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না, ক্রমে কংগ্রেস ধ্বংসের দিকে তাহাদের লক্ষ্য হইবে। আমার কথা শুনিয়া আপনারা দৃঢ়পণ করুন, ছয় মাস কি এক বৎসরের মধ্যে প্রমাণ করিয়া দিতে পারি এই চণ্ডনীতিমূলক আইন কত ব্যর্থ ও অচল। আর যদি স্বরাজ লাভের পূর্বে আমার মৃত্যু হয় তবে আমার চিতাভস্মের উপর

কোন স্মৃতিচিহ্ন না রাখিয়া কেবল এইমাত্র লিখিয়া রাখিবেন, "বাঙলার একটা বাতুল জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এই পথ দিয়া তাহার অতৃপ্ত আত্মা চলিয়া গিয়াছে।"

ভিক্ষালাভের জন্য দেশবন্ধুর ইহা আবেদন, তাঁহার কান্না। দেশবাসীর জন্যেই দেশবাসীর নিকট তাঁহার করুণ ক্রন্দন কিন্তু কেহই তেমন ফিরিয়া তাকাইল না তাঁহার দিকে, কান দিল না তাঁহার কান্না শুনিতে। সাত দিন নয়, প্রায় ডিসেম্বর মাস এইরূপে অসুস্থ শরীরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাইলেন মাত্র এক লক্ষ টাকা। দেশ তখন তাঁহাকে চিনিল না; রাজ-ভিখারী মনে করিল না;—মনে করিল ভিখারী-ই—তাই জানাল না সম্মান। দেশবন্ধুকে দুয়ারে পাইয়াও ঘরের দুয়ার খুলিয়া, মনের দুয়ার খুলিয়া পারিল না গ্রহণ করিতে। নজরুল তাই এই ব্যথার ব্যথী হইয়া 'রাজ-ভিখারী' শীর্ষক কবিতায় আক্ষেপ করিয়া কাঁদিয়াছেন :

'দেহি ভবতি ভিক্ষাম' বলি, দাঁড়াল রাজ-ভিখারী,
খুলিল না দ্বার, পেলে না ভিক্ষা, দ্বারে দ্বারে ভয় দ্বারী!
বলিলে, 'নেবে না ? লহ তবে দান—
ভিক্ষাপূর্ণ আমার এ প্রাণ।'—
দিল না ভিক্ষা, নিল নাক' দান, ফিরিয়া চলিলে যোগী
যে-জীবন কেহ লইল না তাহ. মৃত্যু লইল মাগি'।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শরীর অসুস্থ বলিয়াই তিনি সিমলা গিয়াছিলেন একটু বিশ্রাম লাভের আশায়। কিন্তু কয়েক দিন পরেই সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির গ্রেপ্তারের সংবাদে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কলিকাতা আসিয়াও সভা-সমিতি এবং কর্মযজ্ঞে নিজেকে এমনভাবে নিয়োজিত করিলেন যে নিজের শরীরের কথা চিন্তা করিবারও তাঁহার সময় ছিল না। তৎপরে আবার স্বরাজ্য সপ্তাহের নামে সারা ডিসেম্বর মাসেও তাঁহার এতটুকু বিশ্রাম ছিল না বরং এত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তখন তিনি পুরো-পুরি অসুস্থ। এই অসুস্থ শরীরেই আবার ছুটিলেন ভারতীয় কংগ্রেসের ৩৯তম অধিবেশনে যোগদানের জন্য বেলগাঁও। তখন ডিসেম্বর ১৯২৪ সাল।

বেলগাঁও কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন মহাত্মা গান্ধীজী। বিশেষ কারণেই এই অধিবেশন সকলের কাছে স্মরণীয় হইয়া আছে। সে কারণটি দেশবন্ধুর সঙ্গে

গান্ধীজীর পুনর্মিলন; দেশবন্ধুর জয়। জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে ইহাই দেশবন্ধুর শেষ যোগদান; মিলনান্তক এই শেষ অধিবেশন। ইহাতে দেশবন্ধু বলিয়াছিলেন: "The Bureaucracy expected a feast of quarrels at Belgaun but Mahatma has disappointed it. I fully believe in Constructive programme......Council work is not the permanent point of activity with the Swarajists.

এই সভাতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, আইনসভা দখল করাই কংগ্রেসের প্রধান কর্মসূচী

শেষ হইল ১৯২৪ সাল।

১৯২৪ সালে ভারতের বড়লাট বাহাদুর যে অর্ডিনান্স জারি করেন তাহা দ্বারাই বাংলা দেশে প্রকৃতপক্ষে শাসন কার্য পরিচালিত হইতেছিল—তাহাতেই ছিল যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে কোন কারণ না দর্শাইয়া গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা এবং বিচার না করিয়া কারাগারে পাঠাইবার ক্ষমতা। কিন্তু এই অর্ডিনান্সের মেয়াদ ছিল ১৯২৫ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত। সুতরাং ঐ সময়ের মধ্যে সরকার পক্ষ আইন সভার আলোচনার জন্য Ordinance Bill নামে একটি বিলের খসড়া প্রস্তুত করেন। রৌলট বিল সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই Ordinance Bill-এ সেই রৌলট বিলের সমস্ত ধারাগুলি আনিয়া যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

দেশবন্ধু বেলগাঁওতে বাসন্তী দেবীকে সঙ্গে করিয়া যান নাই। সে জন্য তাঁহার খাওয়ার খুব অসুবিধা হইয়াছিল এমন কি থাকারও অসুবিধা হইয়াছিল। অসুস্থ শরীরের উপর আবার ঐ অসুবিধায় আরও অসুস্থ হইয়া বেলগাঁও হইতে রওনা হইয়া ৩১শে ডিসেম্বর কলিকাতা আসিয়া পৌছান। দেশবন্ধু তখন পিত্তশূল বেদনায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। যন্ত্রণা এমন আকার ধারণ করিয়াছিল যে নিরুপায় হইয়া মর্ফিয়া ইন্‌জেক্‌শান করিয়া যন্ত্রণার বোধকে লাঘব করিতে হইয়াছিল। একটি রোগ কমিলে দেখা দিল আর একটি। জ্বর এবং অতিসার হইয়া শরীরটাকে আরও দুর্বল করিয়া দিয়া গেল।

এই অসুখ খুব বাড়াবাড়ি হয় ৪ঠা জানুয়ারী। পেটের অসহ্য যন্ত্রণায় ডাক্তারগণও চিন্তান্বিত হইয়া পড়েন। রাত্রিতে ঘুমাইতে পারেন না এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াও অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। পরে ৬ তারিখের পর হইতে

তিনি একটু ভালোর দিকে চলিতে থাকেন তবে শরীর থাকে অত্যন্ত দুর্বল।

আইন সভায় তখন স্বরাজ্য দল মাইনরিটি। সুতরাং সরকার পক্ষের ইহা ধারণা যে, আইন সভায় ইহা তোলা হইলে বিলটি অনায়াসে পাশ হইয়া যাইবে। তবুও সরকার পক্ষ পূর্ব হইতেই ইহার জন্য তাহাদের সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

৭ই জানুয়ারী ভোর হইয়াছে। দেশবন্ধু অত্যন্ত দুর্বল, কথা বলিবার মত শক্তিও তাঁহার নাই। তথাপি সকালের দিকে সকলকে ডাকিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন: **"The Black Bill is coming up for discussion. I must attend at any cost and oppose it."**

শুনিয়া সকলে প্রমাদ গুনিল,—তাহারা বিস্মিত! শঙ্কিতচিত্তে একে অপরের দিকে তাকাইলেন। নিষেধ করিল নীরবে।

চিত্তরঞ্জন উত্তর দিয়া বলিলেন, "তোমরা বুঝতে পারছ না ওরা আমাকে মারবার জন্যই অর্ডিনান্স জারি করেছিল আর সেই একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে ওরা এই বিল নিয়ে আসছে। আমার ছেলেরা সব বিনা বিচারে আটক রয়েছে, তাদের আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যেমন করে পারি জেল থেকে তাদের বের করে নিয়ে আসব। আমাকে তোমরা নিষেধ করো না।"

লর্ড লিটন বিল পাশ করাইবেন, দেশবন্ধু বাধা দিবেন। তিনি কাউন্সিলে যাইবেনই।

ডাক্তারগণ বাধা দিলেন,—না যেতে পারবেন না।

দেশবন্ধুর এক কথা, তিনি যাবেনই।

বাসন্তী দেবী নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। তিনি ডাক্তারগণকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন যে উঁনি যখন যাইবেন বলিয়াছেন তখন যাইবেনই। ওঁকে যাইতে না দিলে ওঁর মানসিক অস্থিরতা এবং অশান্তি এত হইবে যে তাহাতে ওঁর শরীর আরও খারাপ হইয়া পড়িবে,—সেটা হইবে আরও মারাত্মক।

বাসন্তী দেবীর কথার যৌক্তিকতা ডাক্তারগণ বুঝিলেন। অন্য উপায় না দেখিয়া বাধ্য হইয়াই তাহারাও মত দিলেন।

অগ্রসর হইলেন তুলসী গোস্বামী। তিনি তাহার রোল্‌স্‌রইস গাড়ীখানা লইয়া আসিলেন দেশবন্ধুকে কাউন্সিল হাউসে লইয়া যাইবার জন্য।

দেশবন্ধুর তখন দুই রকম যন্ত্রণায় দেহ-মন অস্থির। বাংলার দেশভক্ত

তরুণগণ বিনা বিচারে জেলখানার ইটের চার দেয়ালে নিষ্পেষিত—আর তিনি বাহিরে থাকিয়া তাহা নীরবে দেখিতেছেন। না……না আর দেখিতে চাহেন না। দেশের প্রতিনিধিগণের ভোট লইয়া আমলাতন্ত্র তাহাদের অত্যাচারের নিষ্ঠুর চাকা আরও চালাইয়া যাইবে—প্রাণ থাকিতে তিনি তাহা হইতে দিবেন না।…কিন্তু দেহ যে তাঁহার অচল, মন চলিয়া গিয়াছে কাউন্সিল গৃহে। তিনি তখন যেন তাঁহার মনের-ই অনুগামী হইলেন।

দেশবন্ধুর সারাদেহ আচ্ছাদিত করা হইল গরম কাপড়-জামায়। দোতলায় ছিলেন। সেই উপর হইতে স্ট্রেচারে বাহিত হইয়া মটরে উঠিলেন আবার মটর হইতে স্ট্রেচারে করিয়াই কাউন্সিল গৃহে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আছেন আইন-সভার সদস্য দুইজন বিখ্যাত ডাক্তার। একজন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং অন্যজন ডাঃ জে, এন, দাশগুপ্ত।

মুহূর্তের মধ্যে কাউন্সিল গৃহের এ কোণে ও কোণে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল, অসুস্থ দেশবন্ধু স্ট্রেচারে শায়িত অবস্থাতেই কাউন্সিলে আসিয়াছেন। সংবাদে যেন যাদু ছিল—কাউন্সিল গৃহের চেহারার পরিবর্তন হইল সেই মুহূর্তেই।

দলে দলে সকলে ছুটিয়া আসিতে লাগিল অসুস্থ দেশবন্ধুকে দেখিতে। লোকের পর লোক। কিন্তু রুগ্ন হইলেও যেমন দেশবন্ধু ছিলেন তেমন দেশবন্ধুই—তেমন বিনয়ী, নম্র। মুখে হাসি লইয়া অসুস্থ দেশবন্ধু কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন সকলের।

দর্শনার্থীদের মধ্যে আবার কেহ কেহ বলিলেন, আপনার এ অবস্থায় আসা ঠিক হয় নাই। আপনি আসিলেন কেন ?

ম্লান হাসি দেশবন্ধুর ঠোঁটে,—না আসিয়া কি তিনি পারেন! ঐ ব্লাক-বিল পাশ হওয়া মানেই তাঁহার বুকে শক্তিশেল। ঐ ব্লাক-বিলের জালে বাংলার তরুণদের বিনা বিচারে অন্তরীণ করিয়া তাঁহাকেই যে সরকার অমোঘ আঘাত হানিবে।— তাই তিনি গিয়াছেন দেশমাতার পূজায় উৎসর্গীকৃত তরুণদের জন্য ভোট প্রার্থনা করিতে,—দেশেরই মানুষের কাছে দেশেরই তরুণদের জন্য ভোট ভিক্ষা করিতে।

সময় সমাগত। ট্রেজারী বেঞ্চ হইতে অর্ডিনান্স বিল উত্থাপিত হইল। আরম্ভ হইল ঐ অর্ডিনান্স বিল সম্বন্ধে আলোচনা। আলোচনার মাধ্যমেই কাউন্সিল কক্ষের আবহাওয়া বুঝিতে পারিয়া সরকার পক্ষ বেশ বিপদ মনে

করিল। সত্যই সরকারের বিপদ। দেশবন্ধু যখন সুস্থ ছিলেন তখন যাহারা তাঁহার পক্ষে ভোট দেন নাই, সেই দিন তাহারাই দেশবন্ধুকে দেখিয়া অর্ডিনান্স বিলের বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করিয়াছিলেন। যখন ভোট গণনা শেষ হইল তখন দেখা গেল অনেক ভোটের ব্যবধানে অর্ডিনান্স বিল নাকচ হইয়াছে।

বিল পরিত্যক্ত।

জয় স্বরাজ্য দলের—কাউন্সিল কক্ষে জয় দেশবন্ধুর। চতুর্দিকে প্রবল উৎসাহ আর উদ্দীপনা, সকলের মুখে মুখে হাসি।

কিন্তু সরকারী খবরদারী শেষ হইল না। পরিত্যক্ত বিল পুনরায় প্রাণ লইয়া আসিল কয়েক দিনের মধ্যেই। গভর্ণরের অতিরিক্ত ক্ষমতা আছে। সেই অতিরিক্ত ক্ষমতার বলেই লর্ড লিটন ঐ বিল মঞ্জুর করিয়া দিলেন।

দেশবন্ধু তখন অসুস্থই। শরীর দুর্বল। ডাক্তারগণ বিশেষ করিয়া পরামর্শ দিলেন বিশ্রাম গ্রহণ করিবার জন্য। শেষ পর্যন্ত পরামর্শ নয়, তাহাদের অনুরোধেই দেশবন্ধু ২৭শে জানুয়ারী বায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্রাম গ্রহণের জন্য পাটনা রওনা হইলেন।

পাঞ্জাব মেল। দেশবন্ধুর সঙ্গে ডাঃ জে, এন, দাশগুপ্ত। বাসন্তী দেবী তাঁহার সঙ্গে নাই। জ্যেষ্ঠা কন্যা অসুস্থ থাকায় তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গে যাইতে পারিলেন না।

পাটনায় গিয়া দেশবন্ধু সমস্ত রক্ম কার্য হইতে মুক্তি নিয়া বিশ্রাম লইলেন বটে কিন্তু মন হইতে দেশ, জাতি, স্বরাজ্যদল প্রভৃতি নিয়া যে চিন্তা সে চিন্তাকে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারিলেন না। ঐ চিন্তা এবং দুশ্চিন্তায় তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইল,—রাত্রে ঘুম আসিত না। পাটনা হইতে রাজগৃহ গেলেন। সেখানে গিয়াও স্বাস্থ্যের এতটুকু উন্নতি পরিলক্ষিত হইল না। সেখানেও চোখে ঘুম নাই। উপরন্তু একদিন বলিয়াছিলেন, "আর শক্তি নাই, পা আর চলিতে চায় না"। সুতরাং রাজগৃহে গিয়াও স্বাস্থ্যের উন্নতি হইল না। তিনি সেখান হইতে পাটনাতেই আবার ফিরিয়া আসিলেন।

ডাঃ শেষপ্রকাশ সান্যাল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। চিকিৎসায় তাঁহার হাত-যশের কথা দেশবন্ধু শুনিয়াছিলেন। মণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চিররঞ্জনের স্ত্রী সুজাতা দেবীকে রাজগৃহে পৌছাইতে গেলে দেশবন্ধু ডাঃ সান্যালকে সেখানে পাঠাইবার জন্য তাহাকে বলিয়াছিলেন।

ডাঃ সান্যাল তো এক কথায় সম্মত। তাহাকে কত 'ফি' দিতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "দেশবন্ধুর মত লোকের চিকিৎসা করে টাকা নেওয়ার কথা বলা insult to Gentleman. আমি যাবই তবে একটা টাইফয়েড কেস্ আছে, বন্দোবস্ত করে দিয়ে আসি। কিন্তু তাহাকে আর রাজগৃহে যাইতে হয় নাই, দেশবন্ধুই পাটনা আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

ডাঃ সান্যাল আসিলে দেশবন্ধু বলিলেন, ডাক্তারবাবু, না ঘুমিয়ে মারা গেলুম। তিন মাস ঘুমাই নি, কিছু ঔষধ দিয়ে ভাল কর্ত্তে পারেন?

রোগীকে অনেক জেরা এবং জিজ্ঞাসা করিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, ভাবনা-চিন্তা ছাড়ুন।

দেশবন্ধু—ভাবনা ছেড়েছি, ব্যারামের দরুণ ঘুম হয় না।

ডাক্তারবাবু দেশবন্ধুর মল-মূত্র পরীক্ষার রিপোর্ট দেখিয়া বলিলেন, আপনার রোগের মূল কারণ বাত; অনিদ্রাও বাতজনিত।

দেশবন্ধু—কলিকাতায় কোন ডাক্তার তো এরূপ বলে নি?

ডাঃ—কলিকাতায় কেউ বলে নি বলেই কি pancretitis নয়? Gouty deposits-ই মুখ্য কারণ। আপনার বহুমূত্র হচ্ছে Secondary.

দেশবন্ধু ডাঃ সান্যালের চিকিৎসায় একটু একটু করিয়া সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন পরে আবার দেশবন্ধুর সঙ্গে তাঁহার কথা হয়। দেশবন্ধু বলিলেন, খুব ভালো আছি, রাত্রিতে ৭ ঘণ্টা করে সুনিদ্রা হয়, এত উপকার করলেন!—আপনাকে কিছু নিতে হবে—কেন নিবেন না?

ডাঃ—আপনি কি দেবেন? দেশের জন্য সর্বস্ব দিয়ে আপনার কি আছে?

দেশবন্ধু—না, আমার কিছুই নাই। অবশ্য দ্বিধা করবারও কিছু নাই।

ডাঃ—আপনি বড় ভাবেন। তারপর Thinkingই Subconscious প্রত্যেক cell automatically Think করে। এক সঙ্গে অনেক বিষয় চিন্তা করতে পারেন ও করেন।

একদিন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে এমনই কথাবার্তা হইতেছিল। বলিতে বলিতে দেশবন্ধু বলিলেন, "আমার কিছু দিন বাঁচা দরকার মনে করি। কিন্তু বেশী দিন বাঁচব না। My days are numbered."

পাটনায় অবস্থানকালে কে, বি, দত্ত মহাশয় দেশবন্ধুকে দেখিবার জন্য প্রায়ই আসিতেন। দুইজনের মধ্যে গভীর বন্ধন। দুইজনের মধ্যে আলাপ

হইত, পরামর্শ হইত। সরকারের সঙ্গে একটা আপস হইলে দেশবন্ধু তাহাকে বাংলাদেশে আনাইয়া মন্ত্রী-গঠনের ভারও তাহার উপর দিবেন—এমন কথাও হইয়াছিল বলিয়া শোনা গিয়াছে। সেই কে, বি, দত্ত মহাশয় একদিন কথা প্রসঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করিয়াই বলিয়াছিলেন, "চিত্ত, তুমি যে গান্ধীর কথা শুনে কি করে উল্লুক হলে তা' ভাবি নি, এক বছরে আবার স্বরাজ হয় ?"

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন দেশবন্ধু, "আপনাদের মত পাষণ্ড ছিল বলেই কথা শোনার ফল দেখাতে পারি নি।"

দেখিতে দেখিতে মার্চ মাস আসিয়া পড়িল। আবার কাউন্সিল। সরকার মন্ত্রী নিযুক্ত করিবার ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নূতন পর্যায়ে আবার আলোচনা হবে। সুতরাং দেশবন্ধু কলিকাতা আসিতে বাধ্য হইলেন। তিনি না আসিলে চলিবে কেন?—তিনি ছাড়া আর কেই-বা আছে, যে নাকি, তাঁহার মত যুক্তির জাল বিস্তার করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় কাউন্সিল কক্ষে মন্ত্রী নিয়োগের বিবোধিতা করিবেন ?

দেশবন্ধু তখন সম্পূর্ণ সুস্থ হন নাই বটে কিন্তু অনেক ভাল। উহাতেই তাঁহার মনে অসীম জোর হইয়াছে। কেহ কেহ অবশ্য বলিল যে, এবারে আর জয়লাভ করা সম্ভব হইবে না।

দেশবন্ধু তাহাদের জানাইলেন, "আশা যে বড কম তা' আমি বুঝি কিন্তু প্রাণ বলছে, জয়লাভ হবে। My heart whispers success."

মনের জোর দ্বিগুণ করিয়া দেশবন্ধু কাউন্সিলের সভ্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "যদি মায়ের ডাক কানে পৌছিয়া থাকে, তবে আবার সকলে মিলিয়া মন্ত্রীর বেতন অগ্রাহ্য করুন। আপনার নিজের বলিতে আছে এক বিবেক বাণী, আজ স্বার্থ চালিত হইয়া সে বাণীর কণ্ঠ রোধ করিবেন না। আপনাদের স্বদেশপ্রাণ বীরগণ আজ জেলে শৃঙ্খলিত, আপনার কোন স্বাধীনতা নাই, আজ আপনার স্বদেশবাসী বুভুক্ষিত, ব্যাধি ক্লেশ ও অনাহারে জর্জরিত। ম্যালেরিয়া, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু আপনাকে হি হি রবে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। আজ বুরোক্রাসীর হস্ত হইতে সমস্ত সহায়তা অপসারিত করুন, আর বুরোক্রাসীর নিরূপিত মন্ত্রীর বেতন অগ্রাহ্য করুন।"

কাউন্সিলে যথাসময়ে প্রস্তাবটি উত্থাপিত হইল। এই প্রস্তাবকে কেন্দ্র করিয়া দেশবন্ধু যে ঐতিহাসিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার কিছু অংশ নিয়ে

প্রদত্ত হইল :

In spite of my ill halth I feel constrained to say just one or two words on the motion before the House. Mr. Fazl-ul Haq's speech has been criticized very severely by some of my friends. This point of view is entirely different from mine, but I fail to understand why his position should be regarded as so unintelligable. I can understand his position although I differ from him. All the arguments I have heard to-day in favour of dyarchy is that the nation building departments must be worked, something must be done for the good of the people, for the good of the masses and so on. Mr. Fazl-ul Haq's position is that unles there is a stable Ministry, unless the condition which can make that little good possible, it is no use trying for it. (hear, hear) The ground upon which I support this motion is different as I shall explain immediately but I can understand his position, I can respect it and I do not see any reason why such severe criticism should be levelled against him. But if I can understand Mr. Fazl-ul Haq's position and I respect it. I must say I cannot understand Sir Provash chandra Mitter's (hear, hear) what after all is his position ? Mr. Fazl-ul Haq believes in dyarchy ; Sir Provash chandra Mitter does not. He said it so often and he has repeated it here to-day. Let me quote from his evidence. "I am difinitely of opinion that dyarchy has failed. I am further of opinion that the difficulties of running dyarchy will grow more and more in future," and in his oral evidence he said, "I have always condemned dyarchy". He has referred to something which he calls principle. On what principle may I ask can one say : "I have always condemned dyarchy : I do not

believe in dyarchy; dyarchy is unworkable, and yet I undertake to work it?" (hear, hear) If you undertake to work dyarchy it must be on the footing that some good will come out of it and if some good may come out of it why call it unworkable? I fail to understand the logic of his position. If you really condemn dyarchy, condemn it not only in words but also in your action. The vote which you cast to-day will be taken by the Government as an indication of what you think, what your real view is. You say "I condemn dyarchy, I have always condemn dyarchy but I must work it for what it is work". If it is worth anything at all you have got no right to condemn it. If any the least good can come out of it—which I deny—you have no right to condemn it. But if you condemn dyarchy, stand up like a man and say: "I condemn it, I refuse my co-operation, because I feel it is a system which can bring no good to the country." I could have appreciated Sir Provash taking up that position but he has not.

Now with regard to the swarajist view much criticism has been levelled not only to-day but over and over again. My surprise is that my friends do not get tired of such criticism, do not get tired of repeating the same kind of thing over and over again—which to me only shows that they are thorougly ignorant of the swarajist literature. It has been said that our cry is destroy, destroy—why destroy that our only point is destruction. It betrays such an utter ignorance of the swarajist position that it is difficult to reply to it. Why do we want to destroy? Why do we want to get rid of? We want to destroy and get rid of a system which does no good, which can do no good. We want to destroy

it because we want to contruct a system which can be worked with success—it is because we want a system which will enable us to do good to the masses. Can you lay your hands on your breast and say you can do anything for the masses under this system ? What have you yourself done ? It was tried for three long years with Sir Provash chandra Mitter as one of the Ministers. May I ask in what way the condition of the masses has been improved ? Has there been more education ? Have they grown into anything ? Has their provision been better off financially ? No. You have not got the power, you know that you can do no good in the present circumstances. It is a sham business altogether. On the one hand the Ministers are Ministers of responsibility and power and so on but without funds they cannot do any thing. So these nation-building departments are made over to the Ministers, but the question of funds is on the hands of the reserved side, which can starve the nation-building departments just as they like and when the people say that nothing has been done for them in the way of nation-building schemes Government can always turn round and say "There are your Ministers." It is a beautiful system. Then a threat has been held out that these transferred departments may be taken back by the Government. What I want to know is, what harm will it do to you ? If these departments are taken up by the Government and run by the Government they can only do as little as has been done by the Ministers and when the people get dissatisfied they will have to look to the Government. We want to transfer along with these departments the responsibility also on the Government it will be for the Ministers to say that they cannot do anything,

they have not got the money to do anything, they have not the opportunity to do good to the people and yet they are entrusted with the nation-building department—a big phrase "the nation-building departments"—under circumstances in which it is possible to build up anything. My answer to those who ask why I want to destroy this. I want to destroy because this rotten structure is occupying the place where a beautiful mansion may be erected. May I ask how else you can put up a beautiful building without pulling down the rotten structure which has already occupied the place ? You cannot. Therefore there is no sense in that criticism-destruction, destruction ! We do not want to destroy merely. It is a gross libel on the Swarajist members to say that we want only to destroy—we want to destroy in order that we may be able to build up. We want to obstruct, it is because we may get the opportunity of constructing. It is to my mind a principle as simple as it can be. Why it is so difficult for my friends to realise it. I cannot make out Why ! Look at the history of any country, look at the history of England. This sort of things has gone on there and no power has come to the people without this obstruction. It is a wicked and pernicious system. One thing was good for England because it brought freedom for the English people, but that very thing is bad in this country because it is the wicked Swarajists who apply it.

Then, I have been asked one question. I won't take up much of your time because I feel already exhausted. One question has been put to me. First of all it is this : the principle of Co-operation has been extoiled by Sir Provash and other speakers. Well, may I point out for the last time

—I think it is the thousand time that I am speaking on it—that I am not opposed to Co-operation, no Swarajist is ever opposed to Co-operation but Co-operation is not possible under this system. (hear, hear) If you drop the prefix "Co", then I can explain, otherwise I do not understand this system. Does Co-operation merely mean submission ? Does the Government give up anything ? No: they must have everything in their own way, and Co-operation means that we the people of India must follow them. Well, I have never understood the word "Co-operation" in that sense, and I say that I want to Co-operate but put me in the way of honest Co-operation, but Co operation, honest Co-operation cannot be offered now, to-day. It can be done when you have improved your system—when there is give and take, when there is anxiety on the part of the Government to relieve the distress of the people, to recognise the rights of the Indian people, whereas what do you find now ? There is no such desire at all. Every cry for freedom must be checked. Every attempt to make ourselves free must be cried down. Every effort on our part to work out our salvation must be treated as the criminal offence; and under these circumstances you ask for the Co-operation of the people. What Co-operation can they give you ? Those who say that they want to Co-operate with you, do you think you get their sincere view ? I do not think so. I do not think that sincere Co-operation is possible under these circumstances. I will not allow you to say that the Swarajists are against Co-operation. The Swarajists want to Co-operate with a Government which is honourable, which is for the people, that is the kind of Government with which the Swa-

rajists are willing to Co-operate. Now, Sir, another friend has asked me, what would be the effect of killing dyarchy? Well, it reminds me of the question which was put to an Indian sage of ancient times, He was the follower of God Krishna and one of his disciples asked him what was the good of seeing Krishna and his answer was: "Seeing Krishna is the good of seeing Krishna." Here it is that we want a living Constitution—a free Constitution in which honourable men can work with honourable friends and we say that the whole field is covered with a sham institution. The effect of killing dyarchy is to enable the beautiful mansion to which I have referred to be constructed that is the effect of it. It is not very difficult to understand, if you leave out your race prejudice, if you take the good of the country to heart, if you put yourselves the simple question that afterall Government must mean a Government by the people for the people and for the good of the people. If you accept that it is easy to understand what the effect of killing dyarchis.

A further question has been put to me—what are you going to do afterwards? That as circumstances develop. What we want to do and what we want not to do we make no secret of it. Even if the House decides to day against this motion we the swarajits will always adopt this attitude; this system is bad, this system is wicked and as honourable men and as honest men we cannot Co-operate with the Government under this system. What is the position of the swarajists. It is asked what we are to do next. I will try to oppose this motion to-day. If it is not accepted there are only two courses open to the Government—either to take back the transferred departments in which I shall glory and then all

the iniquties, the responsibilities of the system be on the Government which started it. If on the other hand they order a dissolution, I should also be equally glad because that means and on that point I am in entire agreement with the Government of Bengal that the swarajists would come back in over whelming numbers. That would be to our advantage also, one of these two things must follow and then there is the country behind us. My friends who put this question to me think that this Council is everything in this country. It is not and I venture to say so to-day. I have been told that the Conservative Governemt will not be Coerced. I do not know whether they will be coerced. I do not know whether they will be coerced or not. I do not want them to be coerced. I do not want any nůmber of honourable men to be coerced by anything. But surely even the conservative Government must see that there is such a thing as the will of the people and that is the end the will of the people must be carried out. I do not want whether it is the conservative of the labour of the Liberal Government which carries it out. They are empty words so far as I am concerned. I am for giving effect to the will of the people, that will must be declared and I venture to think that no Government in the world—conservative Labour or Liberal—no Government in the world can for ever despise the will of a great country like India.

দেশবন্ধুর ইংরাজী বক্তৃতার যথাসম্ভব বাংলা নিম্নে দেওয়া হইল :

আমার এই অসুস্থ শরীরেও আজ এই সভায় আমি মূল প্রস্তাবের উপর দুই একটি কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমার কয়েকজন বন্ধু ফজলুল হক সাহেবের ভাষণের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টিভঙ্গি আমার সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, আজিকার

প্রস্তাব সম্পর্কে তাহার মনোভাব অবোধ্য হইল কেন? তাহার সঙ্গে আমার মতের অমিল হইলেও এ ব্যাপারে আমি তাহার বক্তব্য বুঝিয়াছি। দ্বৈত-শাসনের পক্ষে যে-সমস্ত যুক্তি আজ শুনিলাম তাহা মোটামুটি এই; জাতি-গঠনের বিভাগগুলি কার্যকর হইবে, জাতির মঙ্গল সাধনের জন্য, আপামর জনসাধারণের উন্নতি বিধানের জন্য অবশ্যই কিছু করা হইবে ইত্যাদি। ফজ-লুল হক সাহেবের বক্তব্য হইল, যদি কোনো স্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠিত না হয়, সামান্য কিছু ভাল করিবার মত অবস্থাও না আসে তাহা হইলে ইহার জন্য চেষ্টা করিয়া কোন লাভ নাই (সাধু! সাধু!)। যে কারণে আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি তাহা অবশ্য স্বতন্ত্র—যাহার ব্যাখ্যায় আমি একটু পরেই আসিতেছি। কিন্তু এ-ব্যাপারে তাহার আসল বক্তব্যটি আমি বুঝিতে পারিয়াছি এবং তাহাকে শ্রদ্ধাও করিতে পারি। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে যে প্রতিপক্ষীয় সমালোচনা দাঁড় করান হইয়াছে আমি তাহার মধ্যে কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাইতেছি না। হক্‌সাহেবের বক্তব্য যদিও বা বুঝিয়াছি এবং তাহাতে শ্রদ্ধাশীল হইয়াছি, এ কথা আমাকে বলিতেই হইতেছে যে আমি বুঝিয়াই উঠিতে পারিলাম না প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের মোটের উপর বক্তব্যটা কী! (সাধু! সাধু!) ফজলুল হক সাহেব দ্বৈতশাসন বিশ্বাস করেন, স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র করেন না। তিনি এ কথা প্রায়ই বলিয়া থাকেন এবং আজও তাহার পুনরাবৃত্তি করিলেন। তাহার নিজের ভাষণই উদ্ধৃত করা যাউক—"আমি নিশ্চিতভাবে মনে করি, দ্বৈতশাসন ব্যর্থ হইয়াছে। আমার আরও এই ধারণা যে, দ্বৈতশাসন পরিচালনার অসুবিধাগুলি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।" তিনি নিজের মুখেই বলিয়াছেন,—"আমি সর্বদাই দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া আসিতেছি।" প্রসঙ্গত তিনি ˋতির কথা তুলিয়াছেন। আমি কি প্রশ্ন করিতে পারি—কোন্ আদর্শের উপর দাঁড়াইয়া একজন বলিতে পারেন, "আমি দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার সর্বদাই নিন্দা করি, আমি এই শাসন ব্যবস্থা বিশ্বাস করি না; এই শাসন ব্যবস্থা কার্যকর নয়, তথাপি ইহাকে কার্যকর করিবার জন্যই আমি এই ব্যবস্থাকে গ্রহণ করিলাম (সাধু! সাধু!)" যদি আপনি দ্বৈতশাসনের কর্মভার গ্রহণ করেন তবে নিশ্চয় এমন কিছুর আশায় গ্রহণ করিবেন যাহা হইতে কিছু মঙ্গল হইতে পারে। আর যদি ইহা দ্বারা ভাল কিছু সম্ভব হয় তবে আর ইহাকে কার্যকর নহে

বলা কেন? আমি তো তাহার বক্তব্যের কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাইতেছি না। বাস্তবিকই যদি আপনি দ্বৈতশাসনের নিন্দাই করেন, তবে তাহা শুধু কথায় কেন—কার্যেও তাহার প্রমাণ দিন। যে ভোটটি আপনি আজ প্রয়োগ করিলেন, কর্তৃপক্ষ সেটাকেই আপনার চিন্তাধারার সূচক বলিয়া গ্রহণ করিবেন। আপনার বাস্তব দৃষ্টিটা কী? আপনি বলিয়াছেন, "আমি দ্বৈত শাসনের নিন্দা করি, আমি সর্বদাই ইহার নিন্দা করিয়াছি, কিন্তু আমি ইহার ততটুকু কার্য করিব যতটুকু ইহার মূল্য আছে।" কথা হইতেছে, ইহার মূল্য যদি কিছুও থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাকে নিন্দা করিবার কোন অধিকার আপনার নাই। যদি সামান্ত কিছু ভাল ফলও ইহা হইতে ফলিতে পারে, যাহা আমি স্বীকার করি না, তাহা হইলে ইহাকে নিন্দা করিবার অধিকার আপনার নাই। কিন্তু যদি আপনি সত্য সত্যই দ্বৈতশাসনের নিন্দা করিতে চান, তাহা হইলে মানুষের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলেন,—"আমি ইহার নিন্দা করি,—আমি এই ব্যাপারে কোন সহযোগিতাই করিব না, কেন না আমি অনুভব করি, ইহা এমন এক শাসনব্যবস্থা—যাহার দ্বারা দেশের কোন কল্যাণসাধন হইতে পারে না।" প্রভাসবাবু যদি এই কথাগুলি বলিতেন, আমি তাহার প্রশংসা করিতে পারিতাম কিন্তু তিনি তাহা বলেন নাই।

এখন স্বরাজ্য দলের মতবাদে আসা যাউক—যাহার বিরুদ্ধে সমালোচনা আজই কেবল নহে, বার বার প্রতিপক্ষে দাঁড় করান হইয়াছে। ভাবিয়া বিস্মিত হই যে, আমার বন্ধুবর্গ এই জাতীয় সমালোচনায় ক্লান্তিবোধ করেন না। বারংবার একই ধরনের জিনিসের পৌনঃপুনিকতায় বিন্দুমাত্র ক্লান্ত হইতেছেন না, মনে হয় স্বরাজ্য দলের প্রচার পুস্তিকা সম্পর্কে তাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বলা হইয়াছে,—আমার ধ্বনি হইল—ভাঙ্গিয়া ফেল। ভাঙ্গিয়া ফেল! ভাঙ্গিয়া ফেল, ভাঙ্গিয়া ফেল বলি কেন—আমাদের লক্ষ্যই হইল বিনাশ। স্বরাজ্য দলের মতবাদ সম্পর্কে ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞতাজনিত এমন এক ভ্রান্ত ধারণা যে, ইহার উত্তর দেওয়াই কঠিন। কেন আমরা ভাঙ্গিতে চাই? কেন আমরা মুক্তি চাই? আমরা চাই এমন এক সমাজ ব্যবস্থার বিলোপ সাধন, এমন এক সমাজব্যবস্থার নাগপাশ হইতে মুক্তি—যাহা কোন কল্যাণসাধন করে না—করতে পারে না। আমরা চাই ইহারই বিলোপ সাধন, তাহার কারণ আমরা এমন এক সমাজব্যবস্থা গঠন করিতে চাই যাহা কিনা সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত

হইবে, হইবে তাহার কারণ, আমরা চাই এমন এক সমাজব্যবস্থা যাহার দ্বারা আপামর জনসাধারণের মঙ্গল সাধনে আমরা সক্ষম হইব। আপনারা কি বুকে হাত রাখিয়া বলিতে পারেন—বর্তমান ব্যবস্থায় আপনি আপামর জনসাধারণের জন্য কোন মঙ্গলজনক কিছু করিতে পারিবেন? আপনি নিজে কি করিয়াছেন? দীর্ঘ তিন বৎসর যাবৎ অন্যতম সদস্য স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র সহ মন্ত্রীমণ্ডলী তো সেই চেষ্টা করিয়াই আসিয়াছেন। প্রশ্ন করিতে পারি—কোন্ দিক হইতে জনসাধারণের উন্নতি হইয়াছে? শিক্ষার আর প্রসার হইয়াছে কি? তাহাদের কোন কিছু শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে? তাহাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের সম্ভাবনা কিছুমাত্র উজ্জ্বল হইয়াছে? না,—আপনার সে ক্ষমতা নাই; আপনি জানেন, বর্তমান অবস্থায় আপনি কল্যাণকর কিছু করিতে পারেন না। আসলে এই ব্যবস্থা একটা ভণ্ডামি মাত্র। একদিকে মন্ত্রীরা সব দায়িত্বশীল, ক্ষমতাবান ইত্যাদি গালভরা বিশেষণের অধিকারী হইবেন অথচ পুঁজি না থাকায় তাহারা কিছুই করিতে পারিবেন না। এখন এই জাতি গঠনের দপ্তরগুলিই মন্ত্রীদের হস্তে ন্যস্ত হইল কিন্তু পুঁজির ব্যাপারটি সংরক্ষিত রহিল অন্যত্র যেখান হইতে ঐ জাতি গঠনের দপ্তরগুলিকে তাহাদের ইচ্ছামত যখন খুশী অকেজো করিয়া রাখিতে পারা যায়। তারপর দেশের লোক যখন বলিবে, জাতিগঠনের প্রকল্প অনুসারে তাহাদের জন্য কিছুই করা হয় নাই—কর্তৃপক্ষ তখন পরিষ্কার উত্তর দিবেন "—সেখানে তো তোমাদের সব মন্ত্রীরাই রহিয়াছেন।" সত্যই চমৎকার ব্যবস্থা! তাহার পর একদিন ভয় দেখান হইবে—এই হস্তান্তরিত দপ্তরগুলি কর্তৃপক্ষ আবার নিজের হাতেই ফিরাইয়া নিবেন। আমি জানিতে চাই—ইহাতে আপনার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে? যদি এই কার্য-দপ্তরগুলি কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন এবং সেইগুলির পরিচালনা তাহারাই করেন—তবে তাহারাও ততটুকু করিতে পারিবেন যতটুকু মন্ত্রীগণও করিতে পারিয়াছেন। তৎপর যখন জনসাধারণের মনে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইবে তখন তাহারা কর্তৃপক্ষের দিকেই দৃষ্টি দেবে। আমরা এই দপ্তরগুলির সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বগুলিকেও কর্তৃপক্ষকে ফিরাইয়া দিতে চাই। মন্ত্রীদের তখন বলিবার সুবিধা হইবে যে তাহারা কিছুই করিতে পারেন নাই কেন না কিছু করিবার মত অর্থ সংস্থান তাঁহাদের ছিল না অথচ তাহাদের উপর জাতিগঠন বিভাগের এক জমকাল নাম "জাতিগঠন বিভাগ"-এর

দায়-দায়িত্ব এমন এক পরিস্থিতিতে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যেখানে গঠনমূলক কোন কিছু করাই সম্ভব ছিল না। আমি দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার বিলোপ সাধন চাহিতেছি কেন—যাহারা আমাকে এই প্রশ্ন করিয়াছেন, এইবার আমি তাহাদের সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। আমি ইহার বিলোপ চাইছি এই কারণে যে, ঐ জরাজীর্ণ কাঠামোটা এমন একটি স্থান জুড়িয়া বসিয়া আছে যেখানে একটি প্রাসাদোপম মনোরম অট্টালিকা রচনা করা যায়। আমি কি প্রশ্ন করিতে পারি, অন্য আর কি এমন উপায় আছে যাহার দ্বারা আপনি জমির দখলদারী ঐ জরাজীর্ণ কাঠামোটিকে না ভাঙ্গিয়া ঐ জমিতেই আর একটি নূতন সুন্দর গৃহ নির্মাণ করিতে পারেন। আপনি তাহা পারিবেন না। অতএব 'ভাঙ্গিয়া ফেল! ভাঙ্গিয়া ফেল!'—এই সমালোচনার কোন অর্থই হয় না। আমরা কেবলমাত্র বিলোপ চাই না। কেবলমাত্র বিলোপই আমরা চাই—স্বরাজ্য দলের সদস্যের পক্ষে এ কথা বলা একটা বিদ্বেষপূর্ণ কুৎসা প্রচার হইয়া দাঁড়ায়। আমরা শুধু এই জন্য বিলোপ চাই যে, আবার গঠন করিতে সক্ষম হইব। আমরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে চাই—কেন না তাহা দ্বারা গঠনের সুযোগ পাইতে পারি। আমার কাছে তো ইহা অত্যন্ত সহজ, সরল নীতি বলিয়া মনে হয়। বন্ধুগণের নিকট ইহা এত দুর্বোধ্য হইল কেন বুঝিতে পারিতেছি না। বেশ তো! যে কোন দেশের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন; ইংলণ্ডের ইতিহাস দেখেন। এ জাতীয় জিনিস সেখানেও লোপ পাইয়াছে; আর এই বিলোপ সাধন ছাড়া সেখানেও জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা আসে নাই। ইহা একটি দুষ্ট অনিষ্টকর শাসনব্যবস্থা। ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে ইহার একটি ভাল দিক ছিল কারণ এই ব্যবস্থা ইংরাজ জাতিকে স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছিল; কিন্তু সেই একই জিনিস এ দেশের ক্ষেত্রে অহিতকর যেহেতু এক দুষ্ট প্রকৃতির স্বরাজ্য দল ইহার প্রয়োগ করিতেছে।

আমাকে একটি প্রশ্ন করা হইয়াছে। আমি আপনাদের আর বেশী সময় লইব না কারণ এখনই আমি অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করিতেছি। একটি প্রশ্ন আমার সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। প্রথমতঃ প্রশ্নটি এই: স্যার প্রভাস প্রমুখ ব্যক্তিগণ পারস্পরিক সহযোগিতার নীতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। ভাল কথা, আমিও শেষবারের মত এ-ব্যাপারে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই,—মনে হয় এইবার লইয়া এই হাজার বার আমি ইহার উপর

বলিয়াছি; আমি পারস্পরিক সহযোগিতা নীতির বিরোধিতা করি না; স্বরাজ্য দলের কোন সদস্যই সহযোগিতার বিরোধিতা করেন না। কিন্তু বর্তমান শাসনতন্ত্রে সহযোগিতা অসম্ভব (সাধু! সাধু!) যদি এই 'সহ' উপসর্গটি বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে কথাটি বিশ্লেষণ করিয়া বলিতে পারি, নচেৎ এই ব্যবস্থা আমি বুঝিতে পারি না। সহযোগিতার অর্থ কি কেবলমাত্র আত্ম-সমর্পণ? কর্তৃপক্ষ কি কোন স্বত্ব হাতছাড়া করিবেন?—না তাহাদের নিজেদের নিয়মের অধীনেই সব কিছু তাহারা রাখিবেন। আর 'সহযোগিতা' কথাটির অর্থ দাঁড়াইবে আমরা ভারতীয়েরা তাহাদের অন্ধ অনুসরণ করিয়া চলিব। এই অর্থে 'সহযোগিতা' কথাটি আমি কোনদিন বুঝি নাই। আমি তো বলিয়াছি, সহযোগিতা করিতে আমি চাই কিন্তু সৎ-সহযোগিতার যে উপায়গুলি আছে আমার জন্য তাহা উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। সহযোগিতা, সৎ-সহযোগিতা অবস্থা আর আজ নাই। ইহা তখনই কেবলমাত্র সম্ভব হইবে যখন আপনার অবস্থার উন্নতি হইয়াছে, যখন সেখানে আদান-প্রদান চলি-তেছে, যখন জাতির দুঃখ-দুর্দশা মোচনের জন্য ভারতবাসীর স্বাধিকার স্বীকার করিবার জন্য সরকারের নিজেরই চিন্তা থাকিবে। এখন আপনারা সেখানে কি দেখিতেছেন? সরকারের আদৌ সে সদিচ্ছা নাই। এখানে স্বাধীনতার প্রতিটি দাবীই দমন করা হইবে? ্ক্তি আন্দোলনের প্রতিটি প্রয়াসকেই কণ্ঠরোধ করিয়া দমন করা হইবে। আমাদের প্রতিটি মুক্তি-প্রয়াসই ফৌজ-দারী দণ্ড বিধির শিকার হইবে। আর এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আপনারা কিনা জাতির সহযোগিতার কথা বলিতেছেন? তাহারা আপনাদের কি সহযোগিতা দিতে পারেন। যাহারা বলেন, তাহারা আমাদের সঙ্গে সহ-যোগিতা করিতে চাহেন, আপনারা কি মনে করেন—তাহাদের প্রকৃত মনোভাব আপনারা জানিতে পারিয়াছেন? আমি তো মনে করি না। আমি মনে করি না, এই অবস্থায় প্রকৃত সহযোগিতা সম্ভব। আবার স্বরাজ্য দল সহযোগিতা চাহে না আপনাদের এ কথাটি বলিতে দিতেও আমি নারাজ। স্বরাজ্যদল সেই সরকারের সঙ্গেই সহযোগিতা করিতে চাহে যে সরকার সত্যি সম্মানীয়, যে-সরকার জনগণেরই সরকার; সে হইবে এমন এক ধরনের সরকার যাহার সঙ্গে স্বরাজ্যদল সহযোগিতা করিতে নিজেরাই আগ্রহী।

আমার আর এক বন্ধু প্রশ্ন করিয়াছেন, দ্বৈতশাসন বিলোপের ফলটি কি দাঁড়াইবে। প্রশ্নটি শুনিয়া প্রাচীন কালে এক ঋষিকে তাহার এক শিষ্য যে-প্রশ্ন করিয়াছিল তাহা মনে পড়িয়া গেল। ঋষি ছিলেন কৃষ্ণ সাধক। শিষ্য প্রশ্ন করিয়াছিল, "কৃষ্ণকে দর্শন করিলে কি ফল?" উত্তরে ঋষি বলিয়াছিলেন, "কৃষ্ণ দর্শনের ফল হইল কৃষ্ণ দর্শন"। এখানেও সেই কথা। আমরা একটি জীবন্ত স্বাধীন সংবিধান চাই, যাহার অধিকারে সম্মানীয় মানুষেরা তাহাদের সম্মানীয় বন্ধুবর্গের সঙ্গে কাজ করিতে পারিবে। আমরা বলি, সমগ্র দেশ আজ মিথ্যা নিয়ম-কানুনে আচ্ছন্ন। আমাদের মনোরম প্রাসাদোপম সৌধ নির্মাণের সামর্থ্যই দ্বৈতশাসন বিলোপের পরিণাম। প্রসঙ্গত আমি যাহার গঠনের কথা বলিয়াছি সেইটাই ইহার পরিণাম। যদি আপনি আপনার জাতি-সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারেন তবে ইহা অনুধাবন করা মোটেই শক্ত নহে যে, মনে-প্রাণে যদি আপনি দেশের মঙ্গল চাহেন এবং আপনি যদি নিজের কাছেই এই সহজ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেন যে, জনগণের দ্বারা পরিচালিত, জনগণের জন্য,—জনগণের হিতের জন্য নিয়োজিত সরকারকেই সরকার বলিয়া অনুধাবন করেন, যদি এ কথা স্বীকার করেন তবে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার বিলোপের ফলটিও সহজবোধ্য হইবে।

আরও একটি প্রশ্ন আমাকে করা হইয়াছে, অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনারা কি করিতে চাহেন? আমরা কি করিতে চাই আর কি করিতে চাই-না এ-ব্যাপারে আমাদের গোপনীয়তা কিছুই নাই। এমন কি যদি এই সভা আজ এই প্রস্তাবের বিপক্ষে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহা হইলেও আমরা স্বরাজ্যদল এই মনোভাবই পোষণ করিব, এ ব্যবস্থা বাজে, এ ব্যবস্থা দুষ্ট এবং মাননীয় ব্যক্তি হিসাবে, সজ্জন হিসাবে আমরা এই ব্যবস্থার অধীনস্থ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে পারি না। স্বরাজ্য দলের এইটিই হইল প্রকৃত মনোভাব। জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, ইহার পর আমাদের কর্মসূচী কি? আজ এই সভায় প্রস্তাবের বিরোধিতার চেষ্টা করিব। যদি তাহা গৃহীত না হয়, তাহা হইলে সরকারের সম্মুখে দুইটি পথই উন্মুক্ত থাকিবে; হস্তান্তরিত দপ্তরগুলি ফিরাইয়া লওয়া যাহার ফলে এই ব্যবস্থার যাহা কিছু দোষ-ত্রুটি, দায়-দায়িত্ব সমস্তই সেই সরকারের ওপরই বর্তাইবে যে সরকার ইহার সূচনা করিয়াছিল। অন্যপক্ষে এই সভা ভাঙিয়া দিবার জন্য আদেশ জারী করা,

তাহা হইলেও আমি খুশী হইব। কারণ ইহার অর্থ হইল, এই ব্যাপারে বাংলা-সরকারের সঙ্গে আমরা একটা সামগ্রিক চুক্তিতে আসিতে পারি, যে, স্বরাজ্য দলের সদস্যগণ বিপুল সংখ্যায় আবার ফিরিয়া আসিবে। উহা আমাদের পক্ষে একটি সুবিধাও বটে। এই দুইটির একটি অবশ্যই হইবে। আর ইহার পর তো সমগ্র দেশই আমাদের পশ্চাতে। যে বন্ধু আমাকে এই প্রশ্নটি করিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন এই সভাই বুঝি দেশের সব কিছু। কিন্তু তাহা নহে,—আর এ কথাটি আমি আজ সাহসের সঙ্গেই বলিতে পারি। আমাকে বলা হইয়াছে, রক্ষণশীল সরকারকে বলপ্রয়োগে বাধ্য করা যাইবে না। আমি জানি না তাহারা বাধ্য হইবেন কি-না। আমি চাই না তাহাদের জোর করিয়া বাধ্য করা হউক। আমি চাই না কোন মাননীয় ব্যক্তি তা সে সংখ্যায় যাহাই হউন—কোন কিছুর জবরদস্তির দ্বারা বাধ্য হন। তবে এই কথাটিও ঠিক, এমন কি রক্ষণশীল সরকারকেও অবশ্যই দেখিতে হইবে যে, জনগণের ইচ্ছা বলিয়াও সেখানে একটি বস্তু আছে এবং ইহাও দেখিতে হইবে, সেই জনগণের ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হইয়াছে। আমার কাছে ইহা বড কথা নহে—কে সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিল—কোন্ সরকার রক্ষণশীল, শ্রমিক না উদারপন্থী সরকার। আমার কাছে ঐগুলি শূন্যগর্ভ শব্দ মাত্র। আমি জনগণের ইচ্ছাকেই সফল করিবার স্বপক্ষে। আর সে ইচ্ছা অবশ্যই ঘোষণা করিতে হইবে। আমি আজ সাহসের সঙ্গে এই চিন্তা করিতে পারি যে, পৃথিবীতে এমন কোন সরকার নাই—রক্ষণশীল, শ্রমিক বা উদারপন্থী এমন কোন সরকার যে সরকার ভারতবর্ষের ন্যায় এক সুমহান দেশের জাগ্রত ইচ্ছাকে চিরকাল অবজ্ঞা করিয়া থাকিতে পারে।

দেশবন্ধুর এই অপূর্ব যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় ২৩শে মার্চ, [১৯২৫] এই তৃতীয়বার মন্ত্রীদের বেতন অগ্রাহ্য হইল,—জয় দেশবন্ধুর।

বাংলাদেশের বুকে সরকারের দ্বৈতশাসনের শেষ। সংবাদপত্র 'Statesman' অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দেশবন্ধুকে আক্রমণ করিল, "Mr. C. R. Das is India's evil genious, servant of chaos, whose spritual home is Moscow the general head quarters of the forces of hate."

কিন্তু সংবাদপত্র যাহাই বলুক এবং ইংরাজ যাহাই মনে করুক এই দ্বৈত

শাসন অচল করা দেশবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি, বিরাট জয় এবং মহান সাফল্য !

দ্বৈতশাসন অচল হইলে বাংলা সরকার চঞ্চল হইলেন। ওদিকে দেশবন্ধুও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশবন্ধু ও লিটনের একটি সাক্ষাৎকার হয়। এই সাক্ষাৎকারের উদ্যোক্তা ছিলেন কলিকাতার সাহেবগণ। সরকার দেশবন্ধুকে একটি বিবৃতি দিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন যাহাতে হিংসার নিন্দা এবং হিংসাত্মক কার্য দ্বারা রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না ইহা উল্লেখ থাকে।

২৯শে মার্চ [১৯২৫] দেশবন্ধু তাঁহার বিবৃতি প্রদান করিলেন : "আমি আগেও বলেছি আবার এখনো বলছি যে, আমি রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা—যে কোন প্রকারের হিংসাত্মক কাজের বিরোধী। আমি মনে করি ইহা আমাদের ধর্মীয় শিক্ষারও বিরোধী। আমি সুনিশ্চিতভাবেই অনুভব করি যে, যদি হিংসাত্মক কার্য আমাদের রাজনৈতিক জীবনের গভীরে প্রবেশ করে, তাহলে স্বরাজের পথ চিরদিনের মতো রুদ্ধ হয়ে যাবে। কাজেই এখন আমরা দেশে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে আমি এর অবসান কামনা করি।

আমি আগেও বলেছি, আবার এখনো বলছি যে, আমি সকল রকম সরকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং হিংসাত্মক কার্যের মতো আমি এই জাতীয় অত্যাচারকেও ঘৃণা করি। অত্যাচার দ্বারা রাজনৈতিক গুপ্ত হত্যা কখনো বন্ধ হয় না। এবং অত্যাচারের ফলে ইহার পরমায়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া বিচিত্র নয়, অস্বাভাবিক নয়। আমরা স্বরাজ লাভের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প এবং সাম্রাজ্যের মধ্যে সম্মানজনক অংশীদারত্বে ও সমতার ভিত্তিতেই আমরা ভারতের স্বাধীনতা চাই। হয়তো এই সংগ্রাম সুদীর্ঘ হবে, কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করার জন্য দৃঢ় সংকল্প !

বাংলার তরুণদের আমি বলি—স্বরাজ লাভের জন্ত তোমরা সংগ্রাম কর কিন্তু পরিষ্কারভাবে সংগ্রাম কর। তোমাদের অভীষ্টের উপরে যেন কলঙ্ক আরোপিত না হয়। কঠিন ও অবিশ্রান্ত সংগ্রামের পথে আমি তোমাদের আহ্বান করছি। স্বরাজ লাভ করতে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে এগিয়ে চলো।

আর ইংরেজদের আমি বলি, তোমরা আমাদের ভুল বুঝো না। তোমরা

তোমাদের মনের বৃথা সন্দেহ দূর করো। সরকারের অত্যাচারকে তোমরা সমর্থন করো না—তা যদি করো তবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের রাজনৈতিক জীবনে হিংসাত্মক পদ্ধতি অনিবার্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।"

তখন লর্ড বার্কেনহেড Secretary of state for India. সংবাদপত্রে দেশবন্ধুর বিবৃতি তাহার নজরে পড়িয়াছিল। দেশবন্ধুর এই মন-খোলা বিবৃতিতে লর্ড বার্কেনহেডও সাড়া দিয়া বলিলেন যে তিনিও তাহার মন হইতে সমস্ত প্রকার সন্দেহ দূর করিতে প্রস্তুত আছেন। বার্কেনহেডও তখন ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে দেশবন্ধুর মতই একটি আবেদন বিবৃতির আকারে জানাইলেন যাহাতে তাহারা হিংসায় বিশ্বাসী না হইয়া সরকারের পাশে থাকিয়া সাহায্যের হাত বাড়াইয়া চলেন।

লর্ড বার্কেনহেডের বিবৃতির উল্লেখ করিয়া দেশবন্ধু ৩রা এপ্রিল পাটনাতে বলেন: "লর্ড বার্কেনহেড খোলা মন নিয়েই কথা বলেছেন। তিনি যে তাঁর মন থেকে সমস্ত সন্দেহ দূর করতে সম্মত হয়েছেন, এজন্য আমি খুব আনন্দ বোধ করছি। ভারত সচিবের এই বিবৃতিটি গুরুত্বপূর্ণ। আমি ১৯২২ সালে আমার গয়ার ভাষণে আমার কথা খোলাখুলি ভাবেই জানিয়েছি। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। বেঙ্গল অর্ডিনান্স কর্তৃপক্ষের হাতে অবাধ ক্ষমতা তুলে দিয়েছে যার ফলে আইন-আদালতের কাজ সংকুচিত হয়ে গিয়েছে। কি কি কারণের জন্য ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে, লর্ড বার্কেনহেডকে আমি অনুরোধ করছি, তিনি যেন এই বিষয়ে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করেন। আমি দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা একমাত্র অহিংসার পথেই সম্ভব। বিপ্লবীদের হিংসাত্মক কাজের আমি যেমন নিন্দা করি,—তেমনি আমি সরকারের স্বৈরাচারেরও নিন্দা করি,—ইহাও এক প্রকার হিংসাত্মক কাজ। আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন একটি জাতি কোন্ কোন্ শর্তে সহযোগিতা করতে পারে, তা'আমি বলেছি। এখন সবটাই নির্ভর করছে সরকার ও ইংরাজদের সুবিবেচনার উপর।"

দেশবন্ধুর সত্য ভাষণ। বিলাতের 'দি টাইমস্' এবং 'দি ডেইলি হেরাল্ড' পত্রিকা দেশবন্ধুর এই বক্তৃতার প্রশংসা করিলেন। সহকারী ভারত সচিবও

হাউস অব্ কমন্স-এ হিংসার বিরুদ্ধে দেশবন্ধুর এই বিবৃতি এবং বক্তৃতার প্রশংসা করিলেন।

রাজনৈতিক এই পটভূমিকাতেই ফরিদপুরে প্রাদেশিক সম্মিলনীর অনুষ্ঠান।

দেশবন্ধু পাটনাতে প্রায় তিন মাস ছিলেন। শরীরও অনেকটা ভাল হইয়াছিল। ডাঃ সান্ন্যাল তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। দেশবন্ধু নিজেই সান্ন্যাল মহাশয়কে বলিলেন, সান্ন্যাল মশায়, ভাল হয়ে গেছি, আর কোন অসুখ নাই, প্রস্রাবও কম হয়।

দ্বৈতশাসন অচল করিয়া দেশবন্ধুর মনে তখন অসীম জোর হইয়াছে। পূর্বে তিনি যে সমস্ত চিন্তা করিয়াছিলেন, সে সমস্ত চিন্তা ও কল্পনা আবার আসিয়া তাঁহার মনোরাজ্য অধিকার করিয়া বসিল।—কি করিয়া পল্লী সংগঠন করিবেন; গ্রাম বাংলার সংস্কার করিয়া সেখানকার মানুষদিগকে মানুষের মত করিয়া বাঁচাইয়া তুলিবেন ইহাই তাঁহার তখনকার একমাত্র চিন্তা। পল্লীর সেই কৃষকগণ, যাহারা খাদ্য জোগায় অথচ নিজেরা না খাইয়া মরে; কামার, কুমার, ছুতোর যাহারা গ্রামে থাকিয়া ম্যালেরিয়ার হাতে পড়িয়া অকালে প্রাণ হারায়, তাহাদের জন্য কিছু করিতেই হইবে। সুতরাং দেশ বন্ধু তাহাদের বাঁচাইতে চাহেন, তাহাদের অভাব অভিযোগ দূর করিতে চাহেন। এই উদ্দেশ্যে বড় একটি ব্যাঙ্ক করিয়া, তাহাতে ত্রিশ কোটি টাকা রাখিয়া তিনি কৃষকদের অবস্থার পরিবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন এবং দেশের মানুষ যাহাতে অর্থনৈতিক মুক্তিলাভ করিতে পারে সেজন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাও সময় সময় আলোচনা করিতেন।

ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকেও তাঁহার মন ছিল। রাজনীতিতে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে তিনি অনেক ব্যবসায়ীকে অর্থ দিয়াছেন। একটা নেভিগেশন কোম্পানী, একটি কাঁচের কারখানা এবং নিজের যখন অর্থের প্রয়োজন সেই সময়ও একটা **water proof** কোম্পানীকে আর্থিক সাহায্য করিয়া ব্যবসায়ীদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া পলতার 'কার কোম্পানী' এবং হিন্দুস্থান কোম্পানী-কে বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে ঋণ করিয়া কিছু টাকা আনিয়া তিনি যশোহরে ঝিনাইদহ রেলওয়ে-কে দিয়াছিলেন।

দেশবন্ধুর ইচ্ছা ছিল, ভারতবর্ষ যেন শিল্প ও ব্যবসায়ে সর্বদিকে উন্নতি করিয়া আত্মনির্ভর হইতে পারে। ভারতবর্ষ যেন পারে **European Market**

কে command করিতে। এই উদ্দেশ্যে পাটনাতে কি রকম ব্যবসা-বাণিজ্য চলিতে পারে তাহার জন্য একটা 'লিষ্ট' করিতে তিনি বলিয়াছিলেন এবং ইহাও বলিতেন যে, রাজনৈতিক দিকে সুভাষ, তুলসী প্রভৃতি রহিয়াছে, উহারাই পারিবে।—আর তিনি নিজে থাকিবেন ব্যবসায়ের সংগঠন ও অর্থ-নৈতিক দিকে।

ডাঃ সান্ন্যাল দেশবন্ধুর মনের উপরোক্ত পরিচয় পাইয়া বলিলেন, ইহাতে তো আপনার অনেক টাকার দরকার।

দেশবন্ধু,—অনেক টাকা রোজগার করেছি।—আজ যদি ৩০।৪০ লক্ষ টাকা থাকত তবে এর জন্যই ব্যয় করতাম। কর্পোরেশনের মধ্য দিয়ে যদি লোককে টাকায় ৫ সের দুগ্ধ দিতে পারি, পাচ আনা ছয় আনা মাছের সের হয় আর ভালো খাওয়ার সঙ্গে Free educationটা দিতে পারি, তবেই কলকাতার লোকেরও সুবিধা হয় আশপাশের থেকে মাছ-এলে পাড়াগাঁয়ের লোকও বেঁচে যায়। বিলাতের idea of selfish politics পেট পুরণ করতে আর ভারত-বর্ষের সেই idea নয়। Idea of economic independence for one's one existence is foreign to Indian soil আর healthy and plenty of food, spiritual development, political unity এই হচ্ছে ভারত-বর্ষের ideal.

ডাক্তার সান্ন্যাল বলিলেন,—আপনি যদি আবার প্রাক্‌টিস্ করিতে আরম্ভ করেন তবে তো অনেক টাকা রোজগার করতে পারেন।

উত্তর দিলেন দেশবন্ধু, বহু জায়গায় গিয়াছি বহু সৎলোকের সঙ্গ লাভ করিয়াছি। সৎ সঙ্গের অনেক দাম। রাজা-মহারাজার আয় অপেক্ষাও এই সৎসঙ্গের দাম অনেক বেশী। কিন্তু আমার মন জাগতিক অর্থের জন্য নয়, একটু আশ্রমের জন্য—গঙ্গার তীরে একটু পবিত্র আশ্রমের জন্য লালায়িত।

ডাক্তার সান্ন্যালের চিকিৎসায় দেশবন্ধু ক্রমে ভালো হইয়া উঠিতেছিলেন। একদিন রাত্রে আবার হঠাৎ রক্তামাশয়ে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। অসুস্থ হওয়ার কারণ তিনি কাঁঠালের ইঁচড় খাইয়াছিলেন, যাহা খাওয়া তাঁহার পক্ষে মোটেই উচিত হয় নাই।

সান্ন্যাল মহাশয় সেই দিন সারারাত্রি দেশবন্ধুর শিয়রে জাগিয়া বসিয়াছিলেন এবং প্রয়োজনমত ঔষধ দিয়া দেশবন্ধুকে নিরাময় করিয়া তোলেন।

রক্তামাশয় সারিল কিন্তু দেশবন্ধু অত্যন্ত দুর্বল। কেহ কেহ কলিকাতা হইতে বিধান রায়কে আনিবার প্রস্তাবও করিল।

শুনিয়া দেশবন্ধু বিরক্ত হইলেন, তাহা ছাড়া তিনি এলোপ্যাথি খুব পছন্দ করিতেন না। তাই উত্তর দিলেন,—কেন, ডাঃ সান্ন্যাল পায়ে ষ্টকিং দেন না বলিয়া?

দেশবন্ধুর যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল ডাঃ সান্ন্যালের উপর। ইহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় প্রফুল্লরঞ্জনের অসুখের সময়। পাটনাতেই প্রফুল্লরঞ্জন অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেশবন্ধু ডাঃ সান্ন্যালকে বলিলেন, "আপনি প্রফুল্লকে ভাল করে দিন। এখন তো একটা ভাই-ই আছে। ওকে বিলাত পাঠাই পরিবারের গয়না বাঁধা দিয়ে। সংসার যাত্রা আরম্ভ করি দুর্বহ ঋণের বোঝা কাঁধে করে সে। একদিন গিয়েছে।"

আর একদিন হঠাৎ বাসন্তী দেবীর হৃৎ-কম্প [palpitation] হইলে দেশবন্ধু ডাঃ সান্ন্যালকে বলিলেন, "আপনি ওকে ভালো করে দিন।"

অর্থাৎ ডাঃ সান্ন্যাল যাহাকে দেখিবেন তাহাকেই ভালো করিতে পারিবেন এমন বিশ্বাস দেশবন্ধুর ছিল। এই জন্যই দেশবন্ধু তাহাকে খুব স্নেহও করিতেন। মাঝে মাঝে ডাঃ সান্ন্যালকে বলিতেন,—"আপনি এখানে না থাকিয়া কলিকাতা চলুন। আপনার কত টাকা চাই?—আপনার ব্যবসা যাহাতে ভালো হয় আমি সে। ব্যবস্থা করিব।"

দেশবন্ধু সান্ন্যালের জন্ত ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন কিন্তু নিজের জন্য তখন যে ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল তাহা তিনি করিতে পারিতেছিলেন না। ডাক্তারগণ এবং বন্ধু-বান্ধব তাঁহাকে জল-বায়ু পরিবর্তনের কথা বার বার বলিতেছিলেন। তখনকার দিনের প্রসিদ্ধ ডাক্তার নীলরতন সরকার দেশবন্ধুকে তাঁহার উপযোগী স্বাস্থ্যকর স্থান সিংহল অথবা ইংলণ্ডে যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। বিখ্যাত আই, সি, এস জে, এন গুপ্ত তাঁহার সহপাঠী এবং বন্ধু ছিলেন। তিনিও দেশবন্ধুকে বায়ু পরিবর্তনের কথা বার বার লিখিতেছিলেন। দেশবন্ধুও তাঁহাকে অকপটে সব কথা খুলিয়া একই উত্তর দিয়াছিলেন, "কি করব ভাই; আমার অর্থের বড় অভাব। নিজের হাত একেবারে শূন্য। নিজের জন্ত কখনও পার্টির ফণ্ডের টাকা ব্যয় করি না।"

দেশবন্ধু সিংহল নহে, ইংলণ্ড যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সে যাওয়া

তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্য নহে, সরকারের সঙ্গে একটা রাজনৈতিক মিটমাটের জন্য। শোনা গিয়াছিল যে, সাগর পার হইতে মিটমাটের কিছু শর্ত-ও দেশবন্ধুর কাছে আসিয়াছিল। সেই সম্বন্ধেই বিলাত যাইতে পারিলে পার্লামেণ্টের কোন কোন সভ্যের সঙ্গেও কথা বলিবার সুযোগ পাইতেন। কিন্তু তাঁহার মনের এ কথা তিনি কাহাকেও তেমন পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই, তাহা হইলেও একদিনের দাতা তখন নিঃস্ব। ভগবান তাঁহাকে অকৃপণভাবে প্রচুর দান করিয়াছিলেন আবার তাঁহাকে দাতা আর ত্যাগী করিয়া রিক্ত করিতেও কার্পণ্য করেন নাই। দেশবন্ধু টাকার অভাবে তাঁহার স্বাস্থ্যোদ্ধার করিবার জন্য বিলাত যাইতে পারিলেন না, ইহা একটা জাতীয় লজ্জার কারণ। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, দেশবন্ধু কলিকাতার কোন এক ভদ্রলোকের নিকট ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের হাতে একখানা চিঠি দিয়াছিলেন। এই ভদ্রলোকই এক সময় নিজের ইচ্ছায় এক লক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু দেশবন্ধু তখন তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। তাই দেশবন্ধুর খুব আশা ছিল যে ভদ্রলোক তাঁহার এই প্রয়োজনের মুহূর্তে নিরাশ করিবেন না।

যথাসময়ে হেমেন্দ্রনাথ ভদ্রলোকের হাতে দেশবন্ধুর চিঠিখানি দিয়া দশ হাজার টাকা চাহিলেন কিন্তু ভদ্রলোক টাকা দিতে তাহার অসম্মতি জানাইল। বাংলার চিত্তরঞ্জন! রোগগ্রস্ত হইয়া তখন শীর্ণ ও পাণ্ডুর। যিনি প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বিচার না করিয়া নিজের অর্থ চেনা-অচেনা মানুষকে দুই হাতে দান করিয়াছেন, সেই দাতার হাত অপরের কাছে অর্থ চাহিয়া রিক্ত অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। দাতা যখন দান করেন তাহা চোখে দেখা যায় কিন্তু ত্যাগীর মহান ত্যাগ দেখা যায় না—তাহা অনুভবের। সেই দান করিয়া যিনি রিক্ত, ত্যাগ করিয়া যিনি তাপস তাঁহার এই অবস্থা! কিন্তু বাংলার বাহিরের একজন দয়ালু ভদ্রলোক স্ব-ইচ্ছায় এই সময় দশ হাজার টাকার ব্যবস্থা করিয়াছিল, দেশবন্ধু তাহা গ্রহণ করিলেন না। বলিয়াছিলেন, "টাকাটা স্বরাজ ফাণ্ডে দিও, তাহাতে অনেক কাজ হবে।"

দেশবন্ধুর এই স্বাস্থ্যহীন অবস্থায় সরকারের সঙ্গে একটা মিটমাটের আশায় যখন মন চঞ্চল তখন ফরিদপুরে বাংলা প্রদেশের প্রাদেশিক সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং দেশবন্ধু পাটনা হইতে ২৮শে এপ্রিল [১৯২৫] মঙ্গলবার কলিকাতা আসিয়া পৌছিলেন।

ফরিদপুর সম্মিলনীর সভাপতি দেশবন্ধু। দেশবন্ধুরই ইচ্ছানুযায়ী উহার উদ্বোধক হইয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধীজী।

সম্মিলন ২রা মে ১৯২৫ সাল।

সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সভাপতির অভিভাষণের বক্তব্য জানিবার জন্য এক দিকে যেমন সরকার উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন অন্য দিকে দেশের যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সমস্ত জনসাধারণও উদ্‌গ্রীব। অভিভাষণও রচিত হইয়া গিয়াছে ইংরাজী ও বাংলা দুই ভাষায়। মঙ্গলবার এবং বুধবার অর্থাৎ ২৮শে এবং ২৯শে এপ্রিল স্বরাজ্য দল এবং কংগ্রেস দেশবন্ধুর সভাপতির অভিভাষণের সমস্ত উল্লিখিত প্রস্তাবই সমর্থন করিলেন। ৩০শে এপ্রিলই ভিড় এড়াইবার জন্য দেশবন্ধু ফরিদপুর রওনা হইলেন। সঙ্গে ছিলেন বাসন্তী দেবী।

মহাত্মা গান্ধীজী ১লা মে, [১৯২৫] কলিকাতা আসিয়া পৌছিলেন। তিনি সেদিনই মির্জাপুর পার্কে এক মহতী জনসভায় দেশবন্ধু সম্বন্ধে বলিতে উঠিয়া আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, That house a beautiful mansion no longer belongs to Deshbandhu. He has placed it in the hands of the trustees in order to divest himself of the least vestige of wealth that he possessed in the world......I can not conceive of such stupendous sacrifice of every thing one may call one's own.

নিজের বসত বাড়ীখানাও দেশবন্ধু দান করিয়াছেন for charitable and Education purpose, অপূর্ব ত্যাগ! পাটনা হইতে তাই কলিকাতা ফিরিয়া তিনি তাঁহার সমস্ত জিনিসপত্র 'বিশপ লেফ্রয় লেনে' রাখিয়া উঠিয়াছিলেন বড় জামাতা সুধীর রায়ের বাড়ীতে।

অসুস্থ শরীর দেশবন্ধুর। তাঁহার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থাই সুষ্ঠুভাবে করিয়া রাখা হইয়াছিল। গোটা সম্মিলনীর ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এবং প্রতাপচন্দ্র গুহরায়।

কিন্তু সে ব্যবস্থাপনার চাইতেও দেশবন্ধু খোঁজ করিলেন খাওয়ার কি যোগাড় করেছ?

একজন স্বেচ্ছাসেবক জানাইল, "আজ্ঞে আপনার জন্য কই, মাগুর মাছ

আনিয়াছি।"

দেশবন্ধু—"কি কই মাগুর? কই মাগুরে পিত্তি জলে গেছে, তা হলে খাবই না।"

স্বেচ্ছাসেবক—"তবে আপনার জন্য কি মাছ আনিব?"

দেশবন্ধু—ইলিশমাছ, চিতলমাছ।

দেশবন্ধুর ইচ্ছা ইলিশ মাছ, চিতল মাছ খাইবেন। সুতরাং খোঁজ পড়িল মাছের। পাওয়া গেল চিতল মাছ, ইলিশ মাছ পাওয়া গেল না। কিন্তু মনের ইচ্ছাই, দেশবন্ধু বেশী খাইতে পারিলেন না। মাত্র দুই এক টুক্‌রা চিতল মাছ খাইলেন।

২রা মে [১৯২৫] সম্মিলন আরম্ভ হইল। শীর্ণ শরীর দেশবন্ধুর। পরিধানে তুষার-শুভ্র খদ্দর, মাথায় খদ্দরের টুপি! অভিভাষণ প্রদানের পূর্বে অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধার মিশ্রিত একটি অর্ঘ তুলিয়া ধরিয়া তিনি মহাত্মাজীকে অভ্যর্থনা জানাইলেন: Mahatma it is my proud priviledge to welcome you as President of the Bengal Provincial Congress. I have been your follower from the beginning of the non-co-operation movement and I am still your follower and Co-worker......We want your inspiration and guidance.

সুভাষচন্দ্র তাঁহার ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বলিয়াছেন, "ফরিদপুরে বাংলার কংগ্রেসীদের বার্ষিক সম্মেলন আহূত হয় এবং দেশের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি হেতু দেশবন্ধু দাশকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। চিকিৎসকদের সকল পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সেখানে গিয়া আলোচনায় সভাপতিত্ব করার সঙ্কল্প করেন। এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য কেন তিনি এত পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন লোকে তখন বুঝিতে পারেন নাই। যাহা কিছুই তিনি বলিতেন, এমন কি পত্রিকার বিবৃতিও তাহার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইত। যাহাই হউক, তিনি সেখানে যাইতে চাহিবার আসল কারণ ছিল এই যে, কংগ্রেসীদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছেন; তাহাতে গভর্ণমেণ্ট বুঝিবেন যে, কোনও মীমাংসার লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে দেশবন্ধুর পক্ষে সাহায্য করা সম্ভব। সেই সময় গভর্ণমেণ্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনকে যথেষ্ট মূল্য দিতেন; কারণ বাংলা ছিল তখন সমগ্র আন্দোলনের কেন্দ্র এবং

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সর্বাপেক্ষা চরমপন্থীদের মধ্যে কেহ কেহ এখানে ছিলেন। কাজেই বাংলায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইত, অন্যত্র কংগ্রেসীদের দ্বারা তাহা গৃহীত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকিত।"

২রা মে, রাত্রিতে আলোচনা সভা বসিল। বাসন্তী দেবী সহ দেশবন্ধুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিই ছিলেন সভাপতি। সভায় স্বরাজের অর্থ লইয়া আলোচনা হয়। পাশ হয় ব্রিটিশের অধীনে স্বরাজ লাভের প্রস্তাব। তৎপরে কারারুদ্ধ ও নির্বাসিতগণের—যেমন সুভাষচন্দ্র, অনিলবরণ ও সত্যেন্দ্র সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। দেশবন্ধু অভিমত প্রকাশ করেন যে তাঁহারা দোষী নয় সুতরাং অনতিবিলম্বেই তাহাদের মুক্তি দেওয়া উচিত।

একদল ছিলেন বিরুদ্ধ মতাবলম্বী। তাহারা ঐ প্রস্তাবে তখন পর্যন্ত যত রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন তাহাদের সকলেরই অনতিবিলম্বে মুক্তির কথা বলেন।

দেশবন্ধু উত্তরে বলিলেন, হিংসা নীতিবিরুদ্ধ, আবার বিনা বিচারে যাহাদের কারারুদ্ধ করা হইয়াছে তাহাও অন্যায়। সকলেরই বিচার হওয়া কর্তব্য। দেশে হিংসার পক্ষপাতী লোক নাই তাহা নহে। তবে সুভাষ, সত্যেন্দ্র ও অনিল প্রভৃতিকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি, চিনি,—ওরা নির্দোষী।"

কেহ কেহ দেশবন্ধুর এ কথা পছন্দ করিলেন না। আবার হিংসার পক্ষপাতী লোক আছে এ-কথাও কেহ কেহ বিশ্বাস করিতে রাজী হইল না।

দেশবন্ধু তাহাদের জানাইলেন, "আমার রাজনীতির ভিত্তি কোন সময়ই মিথ্যার উপর স্থাপিত নয়, স্থাপিত হইবেও না।"

দেশবন্ধুর এ-কথায় কেহ কেহ তাহাদের মতি-বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়া বলিলেন, "আমরা কি নাকে খত দিব।"

এইরূপে বাদানুবাদ ক্রমে সপ্তমে চড়িলে দেশবন্ধু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বাসন্তী দেবীকে লইয়া সভা ত্যাগ করিলেন। তিনি চলিয়া আসিলেন বাসায়। তিনি যে সভার কার্যে কতখানি মর্মাহত হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল বাসাতেও। বার বার তিনি বলিতেছিলেন, "ওরা না বুঝে গোলমাল কচ্ছে।"

দেশবন্ধু সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে বিরুদ্ধবাদীগণ হয়তো নিজেদের ভুল-ত্রুটি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কারণ পরের দিন ৩রা মে, দুপুরবেলা

তাহারা আসিয়া দেশবন্ধু যাহাতে তাঁহার ইচ্ছামত প্রস্তাব সম্মিলনীতে উত্থাপিত করেন সেজন্য অনুরোধ জানাইলেন। প্রস্তাবের সামান্য একটু পরিবর্তন করিয়া দেশবন্ধুর ইচ্ছামতই উহা মূল সম্মিলনীতে পাশ হয়।

ফরিদপুরের এই সম্মিলনীতে দেশবন্ধু যে অভিভাষণ দেন তাহা জাতির ইতিহাসে দেশবন্ধুর শেষ অভিভাষণ এবং শেষ নির্দেশনামা। অভিভাষণটি সর্বদিক হইতে এত সুন্দর, সুষ্ঠ এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন, "দেশবন্ধু দাশের প্রত্যেকটি কথার সহিত আমি একমত। আমাকে যদি কেউ আমার বলিয়া ইহা সহি করিতে বলে, আমি সানন্দে করিব; তবে তফাত এই, এমন সুযুক্তিপূর্ণ এবং সুলিখিত অভিভাষণটি আমার কলম হইতে বাহির হইবে না।"

ফরিদপুর সম্মিলনীর সভাপতিরূপে দেশবন্ধু যে অভিভাষণ প্রদান করেন তাহার মূলকথা ছিল—সরকারের সঙ্গে honourable settlement অর্থাৎ সম্মানজনক শর্তে সহযোগিতা।

পূর্বে দেশবন্ধু হিংসানীতির বিরুদ্ধে এক বিবৃতি দিয়াছিলেন, সে বিবৃতি ভারতসচিব বার্কেনহেডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তখন হইতেই বার্কেনহেড আশা পোষণ করি ছিলেন যে দেশবন্ধু আর একটু অগ্রসর হইলেই তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া কাজ করিতে পারিবেন। দেশবন্ধুর পূর্ব বিবৃতিতেই বিপ্লবীগণ অসন্তুষ্ট। ফরিদপুর সম্মিলনীর অভিভাষণ, বার্কেনহেডের সেই আকাঙ্ক্ষিত 'আর এক ধাপ অগ্রসর' হওয়া মনে করিয়া বিপ্লববাদীগণ আরও অসন্তুষ্ট হইলেন। অসন্তুষ্ট হইলেন দেশবন্ধুর যাহারা সহকর্মী ছিলেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই। তখন দিকে দিকে নানা প্রশ্ন, নানা সন্দেহ। অসহযোগের প্রধান ঋত্বিক দেশবন্ধু কি ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সহযোগিতার অঞ্জলি তুলিয়া ধরিলেন? তিনি কি রণক্লান্ত হইয়া যুদ্ধ বিমুখ হইলেন অথবা মন্ত্রী-পদ প্রাপ্তির আশায় অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন?

এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধুর বন্ধু ও জীবনীকার পৃথ্বীশ রায় তাঁহার Life and Times of C. R. Das গ্রন্থে বলিয়াছেন: In his presidential address at the Bengal Provincial Conference at Faridpur on May 2nd, Chittaranjan defined his new position as one of willingness, under certain condition, to accept the gesture from White-

hall. In this address he struck all together a new note and invited the Government to meet him half way on terms of honourable Co-operation, a gesture which surprised both his friends and enemies. But beyond declaring his change of heart, he did not commit himself to any details.

মানুষের মন অপরিবর্তনীয় নয়। দেশবন্ধুও তাঁহার মনের পরিবর্তন করিয়া দেখিতে চাহিলেন ইংরাজ সরকারের কতখানি মনের পরিবর্তন হয়। ফরিদপুরের অভিভাষণে তিনি তাঁহার মন পরিষ্কার করিলেন—উহার প্রতিউত্তরের দায়িত্ব তখন সরকারের, ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেডের।

সভাপতি হিসাবে দেশবন্ধু ফরিদপুরের অধিবেশনে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :

A Few Extracts

India's Position in Relation To the Empire

What then we have to fix upon in the matter of ideal is what I call Swaraj and not mere Independence which may be the negation of Swaraj. When we are asked as to what is our national ideal of freedom, the only answer which is possible to give is Swaraj. I do not like either Home Rule or self-Government. Possibly they come within what I have described as Swaraj. But my culture some how or other:is antagonistic to the word 'rule' be it Home Rule or Foreign Rule My objection to the word self Government is exactly the same. If it is defined as Government by self and for self, my objection may be met, but in that case Swaraj includes all those elements.

Then comes the question as to whether this ideal is to be realized within the Empire or outside it. The answer which the congress has always given is "within the Empire if the Empire will recognise our rights" and "outside the

Empire" "if it does not." We must have opportunity to live our life, opportunity for self-realization, self-development and self-fulfilment, The question is of living our life. If the Empire furnishes sufficient scope for the growth and development of our national life, the Empire idea is to be preferred. If on the contrary the Empire like the car of Jagannath crushes our life in the sweep of its imperialistic march there will be justification for the idea of the establishment of swaraj outside the Empire.

Indeed, the Empire idea gives us a vivid sense of many advantages. Dominion Status to-day is in no sense servitude. It is essentially an alliance by consent of those who form part of the Empire for material advantages in the real spirit of co-operation. Free allinace necessarily carries with it the right of separation. Before the war a separatist tendency was growing up in several parts of the Empire but after the war it is generally believed that it is only as a great confederation that the Empire or its component parts can live. It is realised that under modern conditions no nation can live in isolation and the Dominion status while it affords Complete protection to each constituent composing the great Common Wealth of Nations called the British Empire secures to each the right to realize itself, develop itself and fulfill itself and therefore it expresses and implies all the elements of Swaraj which I have mentioned.

To me the idea is specially attractive because of its deep spiritual significance. I believe in world peace, in the ultimate federation of the world; and I think that the great Commonwealth of Nations called the British Empire a federation of diverse races each with its distinct life, distinct civiliza-

tion, its distinct mental outlook if properly led with statesmen at the helm is bound to make lasting contribution to the great problem that awaits the statesman the problem of knitting the world into the greatest federation of the human race. But if only properly 'led' with statesman at the helm :—for the development of the idea involves apparent sacrifice on the part of the constituent nations, and it certainly involves the giving up for good the Empire Idea with its ugly attribute of Domination. I think it is for the good of India, for the good of the Common-Wealth, for the good of the world that India should strive for freedom with the Commonwealth and so serve the cause of humanity.

Repressive Policy Condemned

The discretionary power which the Government in this country enjoys of promulgating illegal laws is capable of being abused. Indeed it must be so from the very nature of things. The history of the world shows that bureaucratic Governments have always tried to consolidate their power through the process of "Law and Order" which is an exellent phrase, but which means, in countries where the rule of law does not prevail, the exercise by persons in authority of wide arbitrary or discretionary powers of constant. Repression is a process in the consolidation of arbitrary powers"—and I condemn the violence of the Government—for repression is the most violent form of violence—just as strongly as I condemn violence as a method of winning political liberty. I must warn the Government that the policy of repression is a short sighted policy. It may strengthen its hands for the time being, but I am sure, Lord Birkenhead realizes that as an instrument of Government it is bound to fail.

The reforms

We have been gravely told that Swaraj is within our grasp if only we Co-operate with the Government in working the present reform Act. With regard to that argument my position is perfectly clear, and I shall like to restate it, so that there may be no controversy about it. If I were satisfied that the present Act has transferred any real responsibility to the people,—that there is opportunity for self-realization, self development and self fulfilment under the Act—I would unhesitatingly Co-operate with the Government and begin the constructive work within the Counsil chamber. But I am not willing to sacrifice the substance for the shadow. I will not detain you to day with any arguments tending to show that the reforms Act has not transferred any responsibility to the people. I have dealt with the question exhustively in my address at the Ahmedabad Congress, and if further argument are necessary they will be found in the evidence given before the Muddiman Committee by men whose moderation cannot be questioned by the Government. The basis of the present Act is distrust of the Ministers; and there can be no talk of Co-operation in an atmosphere of distrust. All the same time, I must make clear my position,—and I hope of the Bengal provincial Conference—that provided some real responsibility is transferred to the people there is no reason why we should not co-operate with the Government. But to make such Co-operation real and effective two things are necessary; first there should be a real change of heart in our rulers, secondly, swaraj in the fullest sense must be guaranteed to us at once, to come automatically in the near future. I have always maintained that we should

make large sacrifices in order to have the opportunity to begin our constructive work at once; and I think you will realize that a few years are nothing in the history of a nation, provided the foundation of swaraj laid at once and there is a real change of heart both in the rulers and in the subject. You will tell me that 'change of heart' is a fine phrase, and that some practical demonstration should be given of that change. I agree. But that demonstration must necessarily depend on the atmosphere created by any proposed settlement. An atmosphere of trust or distrust may be easily felt and in any matter of peaceful settlement great deal more depends on the spirit behind the terms than the actual terms themselves. It is impossible to lay down the exact terms of any such settlement, at the present moment, but if a change of heart takes place and negotiations are carried on by both sides in the spirit of peace, harmony and mutual trust, such terms are capable of precise definition.

Deshbandhu's Last Message

If, however, our offer of a settlement should not meet with any response; we must go on with our national work on the lines which we have pursued for the last two years so that it may become impossible for the Government to carry on the administration of the Country except by the exercise of its exceptional powers. There are some who shrink from this step, who point out with perfect logic that we have no right to refuse supplies unless we are prepared to go to the country and advise the subject not to pay the taxes. My answer is that I want to create the atmosphere for national, civil disobedience, which must be the last weapon in the hand of the people striving for

freedom. I have no use for historical precedent, but if reference is to be made to English history in owr present struggle, I may point out that refusal to pay taxes in England in the time of the Stuarts came many years after the determination of the Parliament to refuse supplies. The atmosphere for civil disobedience is created by compelling the Government to raise money by the exercise of its exceptional powers and when the time comes we shall not hesitate to advise our countrymen not to pay taxes which are sought to be raised by exercise of the exceptional powers vested in the Government.

I hope that time will never come indeed I see signs of a real change of heart every where—but let us face the fact that civil disobedience requirs a high stage of organization, an infinite capacity for sacrifice, and a real desire to subordinate personal and communal interest to the common interest of the nation; and I can see little hope of India ever being ready for civil disobedience until she is prepared to work Mahatma Gandhi's constructive programme to the fullest extent. The end, however, must be kept in view, for freedom must be won.

But, as I have said I see signs of reconciliation everywhere. The world is tired of conflicts and I think I see a real desire for construction, for consolidation. I believe that India has a great part to play in the history of the world. She has a message to deliver and she is anxious to deliver it in the Council Chamber of that great Common Wealth of nations of which I have spoken. Will British Statesmen rise to the occasion? To them I say, you can have peace to-day on terms that are honourable both to you and to us. To the

British Community in India, I say, you have come with traditions of freedom and you cannot refuse to Co-operate with us in our national struggle, provided we recognize your right to be hard in the final settlement. To the people of Bengal I say, you have made great sacrifices for daring to win political freedom, and on you has fallen the burnt of official wrath. "The time is not yet for putting aside your political weapons" Fight hard, but fight clean and when the time for settlement comes, as it is bound to come, enter the peace conference, not in a spirit of arrogance but with becoming humility, so that it may be said of you that you were greater in your achievment than in adversity. Nationalism is merely a process in self realization, self development and self fulfilment. It is not an end itself. The growth and development of nationalism is necessary so that humanity may realize itself and I beseech you, when you discuss the terms of settlement, do not forget the larger claim of humanity in your pride of nationalism. For myself, I have a clear vision as to what I seek. I seek a Federation of the states of India ; each free to follow, as it must follow, the culture and the tradition of its own people : each bound to each in the common service of all ; a great federation within a greater federation, the federation of free nations, whose freedom is the measure of their service to man and whose unity the hope of peace among the peoples of the earth.

যাহা হউক, বহু প্রশংসিত এবং নিন্দিত দেশবন্ধুর এই ফরিদপুরের অভিভাষণ। অভিভাষণটি আরম্ভ করিলেন : ভারতবর্ষ বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছে—মুক্তি কোন্ পথে ? সুদূর অতীতে এই প্রশ্ন ছিল একান্ত ভাবেই আধ্যাত্মিক। কিন্তু বর্তমানে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে ইহা নিপীড়িত ভারত আত্মার ক্রন্দন-মুক্তি কোন্ পথে ? অতীতকালে যাহা ছিল ব্যক্তি-মানবের

পরমাত্মা লাভের প্রশ্ন, বর্তমানে উহাই জাতীয় প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে প্রশ্ন হইল: অধীনতা ও পাপ হইতে মুক্তি লাভের অর্থ কি? যাঁহারা অধীনতার শৃঙ্খল তৈরী করেন তাঁহাদের পক্ষে উহা যেমন পাপ, তেমনি যাঁহারা ঐ শৃঙ্খল নির্মাণে আপত্তি করেন না, তাঁহাদের পক্ষেও ইহা পাপ।"

আধ্যাত্মিক আলোচনার ভিত্তিতে রাজনীতি আলোচনা। দেশবন্ধুর উপরে উদ্ধৃত ইংরাজী অভিভাষণের যথা সম্ভব বাংলা তর্জমা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

সাম্রাজ্যে ভারতের স্থান

আমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের আদর্শ স্বরাজ লাভ, শুধু স্বাধীনতা নয়। শেষোক্তটি স্বরাজের অপলাপ হইতে পারে। আমাদের স্বাধীনতার জাতীয় আদর্শ কি তাহার উত্তরে বলিব, তাহা স্বরাজ। আমি 'হোমরুল' বা স্বায়ত্তশাসন চাই না। স্বরাজ বলি যাহাকে এই নাম দুইটি তাহার অন্তর্ভুক্ত। আমার সংস্কৃতি, শাসন শব্দটির প্রতিকূল কারণ যাহাই হউক, •শাসন বলিতে তাহা স্বায়ত্তশাসন হউক বা বৈদেশিক শাসন হউক। স্বায়ত্ত-শাসনের সংজ্ঞা যদি নিজের জন্য নিজের শাসন বুঝায়, তাহা হইলে আমার আপত্তির খণ্ডন হয়। স্বরাজের অন্তর্নিহিত অর্থ তাহাই।

পরবর্তী প্রশ্ন—এই অ' র্শ বাস্তবে পরিণত করা সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়া না বাহিরে গিয়া। কংগ্রেসের বক্তব্য হইল, আমাদের অধিকারগুলি পূর্ণ স্বীকৃতি পাইলে সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়া অন্যথা বাহিরে গিয়া। জীবন স্বকীয় আদর্শানুযায়ী রূপায়িত করার, আত্মোপলব্ধি করার, আত্মপূর্ণতা সাধন করার সুযোগ থাকা চাই—ইহা যাহার যাহার স্বরূপানুযায়ী জীবন গঠন করিবার প্রশ্ন। আমাদের জীবন গঠনের ও বিকাশের পূর্ণ সুযোগ যদি সাম্রাজ্যের ভিতরে সম্ভবপর হয় তবে সাম্রাজ্য অবাঞ্ছিত নয়। অপর পক্ষে জগন্নাথের রথের ন্যায় এই সাম্রাজ্য সাড়ম্বরে অগ্রসর হইতে হইতে যদি আমাদের জীবন নিষ্পেষিত করে, তাহা হইলে সাম্রাজ্যের বাহিরে গিয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠার কথা অবশ্যই চিন্তনীয়। বস্তুতঃ সাম্রাজ্য চিন্তার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে বিবিধ জীবন্ত সুযোগ-সুবিধার চিন্তা জড়িত রহিয়াছে। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন আজ কোন অর্থেই দাসত্ব নয়। ইহা মূলতঃ একটি সম্মেলন। ইহার অংশীদারগণ যথার্থ বৈষয়িক উন্নতি কল্পে পরস্পর সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। অবাধ সম্মেলনের অংশীদারদের স্বভাবতই পৃথক হওয়ার অধি-

কার স্বীকৃত। প্রাক যুদ্ধ সময়ে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে শরিকদের মধ্যে পৃথক হওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে এই ধারণাই সৃষ্টি হয় যে অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সন্ধিসূত্রে গ্রথিত সাম্রাজ্য বা অঙ্গীভূত রাজ্য-পুঞ্জই দরকার। ইহাও উপলব্ধি করা হইয়াছে যে আধুনিক বিশ্বে কোন জাতি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন বিরাট সাধারণতন্ত্র বনাম বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। তাহারা সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। বৃটিশ সাম্রাজ্য তাহার অন্তর্গত জাতিসমূহকে নিজস্ব ধারায় আত্মোপলব্ধির, আত্মবিকাশের সর্ববিধ সুযোগ সুবিধার দায়িত্ব দিতে প্রতিশ্রুত। অতএব আমার স্বরাজ চিন্তার আদর্শ ও মূল উপাদান সাধারণতন্ত্রে অন্তর্নিহিত।

ইহার গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আমাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। আমি বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাসী। আমি চরম নিয়মতান্ত্রিক বিশ্বরাষ্ট্রে বিশ্বাসী। আমার মতে জাতিপুঞ্জের বিরাট সাধারণতন্ত্র বনাম বৃটিশ সাম্রাজ্য বিভিন্ন জাতির একটি সংহতি। ইহার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি জাতির স্বতন্ত্র জীবন, স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ও সভ্যতা, স্বতন্ত্র মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি। কোন একজন দক্ষ, সুনিপুণ কর্ণধারের নেতৃত্বাধীনে যদি পরিচালিত হয়, তবে তাহারা বিশ্ব সমস্যা সমাধানে স্থায়ী অবদান যোগাইবে। সমস্যা সমাধান কল্পে রাজনীতিবিদগণ অপেক্ষমান। সমস্যাটি হইল বৃহত্তম গণতন্ত্র—মানবজাতিকে একসূত্রে গাঁথার মূলমন্ত্র, মানসলোকে যাহা কল্পনীয়। উচ্চ স্তরের রাজনীতিবিদগণ যদি ইহার রূপায়ণের জন্য অগ্রসর হইয়া আসেন তাহা হইলে এই পরিকল্পনা সার্থক হইতে পারে কারণ এই ভাবধারার বাস্তব রূপায়ণে সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে—সে হইল ত্যাগ স্বীকার। যথেচ্ছাচার শাসন, কোনরূপ অত্যাচার, নিপীড়নের লেশ থাকিবে না এখানে—সাম্রাজ্যবাদ চিরতরে লুপ্ত হইবে। আমি মনে করি, ভারতবর্ষের পক্ষে, গণতন্ত্রের পক্ষে ইহা মঙ্গলজনক। সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করিতে সচেষ্ট হইবে, এইরূপে ভারতবর্ষ মানব জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে।

দমনমূলক নীতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ

এই দেশের সরকার ইচ্ছাধীন অবৈধ আইন ঘোষণা করিবার ক্ষমতা ভোগ করেন। অবস্থাধীনে ইহার অপপ্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাসে দেখা

যায়, আমলাতান্ত্রিক সরকার আইন-শৃঙ্খলার অজুহাতে শক্তি সুদৃঢ় করিতে সর্বদাই সচেষ্ট। আইন-শৃঙ্খলা একটি উত্তম বাক্যাংশ। কিন্তু যে সব দেশে আইন-শৃঙ্খলা একেবারে অনুপস্থিত, সেই সব দেশে ইহার নামে কর্তৃপক্ষ ব্যাপক যথেচ্ছ আইন প্রয়োগ করিয়া থাকে। স্বৈরাচার শাসন সুদৃঢ় করিবার উপায় হইল অত্যাচার। হিংসার ভয়ঙ্কর প্রকাশ এই দমনমূলক নীতি। ইহা আমি ঘৃণা করি। সমভাবেই আমি ঘৃণা করি, রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের উদ্দেশ্যে এই হিংসার প্রয়োগ। আমি সরকারকে হুঁশিয়ার করিয়া দিতেছি যে, অত্যাচারমূলক নীতি অদূরদর্শিতা সঞ্জাত। এই নীতি সাময়িকভাবে সরকারের শক্তি যোগায়—কিন্তু আমি সুনিশ্চিত যে লর্ড বার্কেনহেড সরকারের হাতিয়ার হিসাবে এই নীতির ব্যর্থতা উপলব্ধি করিবেন।

শাসন সংস্কার

আমাদিগকে গুরু গম্ভীরভাবে বলা হইয়াছে যে, স্বরাজ আমাদের করায়ত্ত হইবে, যদি নূতন সংস্কার আইন বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যাপারে আমরা সরকারের সংগে সহযোগিতা করি। এই যুক্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য একেবারে স্বচ্ছ, নির্বিরোধ। আমি যদি নিঃসন্দেহ হই, বর্তমান সংস্কার-আইন লোকেদের প্রকৃত দায়িত্ব হস্তান্তরিত করিয়াছে, আত্মোপলব্ধির, আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগ দিয়াছে, তবে আমি খোলা মনে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিব, প্রকৃত গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিব এবং আইন সভায় সহযোগিতা করিব। কিন্তু মরীচিকার পশ্চাৎ ধাবিত হইব না। সংস্কার আইন লোকদের কোন দায়িত্ব হস্তান্তরিত করে নাই এই কথা বলিবার জন্য আপনাদের নিকট কোন যুক্তি উপস্থাপিত করিব না। আমেদাবাদের কংগ্রেস অধিবেশনে আমার ভাষণে এই বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছি। যদি তদতিরিক্ত যুক্তি আবশ্যক হয় তবে মুদালিয়র কমিশনের নিকট সাক্ষ্যে তাহা দ্রষ্টব্য। সেখানে যাহারা সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাহাদের সংযম প্রশ্নাতীত। বর্তমান আইনের পটভূমিকা মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর অনাস্থা এবং এইরূপ অবিশ্বাসের পরিবেশে সহযোগিতার প্রশ্ন অবাস্তব। এই ব্যাপারে আমার বক্তব্য হইল,—আমি প্রাদেশিক কংগ্রেস সভার নিকট আশা করিব, যদি প্রকৃত দায়িত্ব আমাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা

না করিবার কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু সেইরূপ সহযোগিতা বাস্তবে ফলপ্রসূ করিতে হইলে দুইটি বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ শাসক-গণের দৃষ্টিভঙ্গির সত্যিকার পরিবর্তন আবশ্যক দ্বিতীয়তঃ স্বরাজের প্রতিশ্রুতি দেওয়া—তাহা অদূর ভবিষ্যতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হওয়া চাই। আমার বক্তব্য এই, গঠনমূলক কার্যের জন্য এই মুহূর্তেই ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন। আপনারা অবশ্যই উপলব্ধি করিবেন, অল্প কয়েক বৎসর একটি জাতির ইতিহাসে কিছুই নয়, যদি স্বরাজের ভিত্তি এই মুহূর্তেই স্থাপিত হয় এবং শাসক-শাসিতের চিত্তের সত্যিকার পরিবর্তন ঘটে। আপনারা বলিবেন 'চিত্তের পরিবর্তন' কথাটি শ্রুতিমধুর এবং এই মুহূর্তেই ইহার বাস্তব নিদর্শন আবশ্যক। এই বিষয় আপনাদের অভিমত সমর্থন করি। কিন্তু সেই পরিবর্তনের নিদর্শন একটি প্রস্তাবিত মীমাংসার পরিবেশেই মাত্র সম্ভবপর। বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের পরিবেশ সহজেই অনুভব করা যায়, এবং যে কোন শান্তিপূর্ণ মীমাংসার ক্ষেত্রে বাস্তব শর্তাবলীর চাইতে শর্তাবলীর পশ্চাতে যে মনোবৃত্তি ক্রিয়া করিতে থাকে, তাহাই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষণে এইরূপ কোন মীমাংসার শর্তাবলী নির্ধারণ করা অসম্ভব। কিন্তু অন্তরের যদি পরিবর্তন ঘটে, ও উভয় পক্ষে শান্তি, ঐক্য ও পরস্পরের বিশ্বাসের আলোচনা অগ্রসর হয় তবে এইরূপ শর্তাবলীর যথার্থ সংজ্ঞা নিরূপণ করা চলে।

দেশবন্ধুর শেষবাণী

পক্ষান্তরে যদি আমাদের মীমাংসার আবেদনের কোনও সাড়া না পাওয়া যায় তাহা হইলে আমাদের জাতীয় কার্য গত দুই বৎসরের মতই চলিতে থাকিবে, যেন সরকারের পক্ষে অতিরিক্ত ক্ষমতার প্রয়োগ ব্যতীত শাসন পরিচালনা করা অসম্ভব হয়। কেহ কেহ হয়ত এই কার্যক্রম চালনার বিপক্ষে। তাহারা বলেন,—আমরা যতক্ষণ না গ্রামাঞ্চলে গিয়া প্রজাদের ট্যাক্স দিতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রস্তুত হই, ততক্ষণ যোগান দিতে অস্বীকার করিবার অধিকার আমাদের নাই। ইহার উত্তরে আমি বলিব,—আমি জাতীয় আইন অমান্য করিবার পরিবেশ সৃষ্টি করিতে চাই। স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রামী মানুষের হাতে ইহাই অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র। ঐতিহাসিক নজির উপস্থাপিত করিবার প্রয়োজন আমার নাই কিন্তু বর্তমান সংগ্রামে যদি ইংলণ্ডের ইতিহাসের উল্লেখ করা হয়, আমি বলিতে পারি যে, ইংলণ্ডে

স্টুয়ার্টদের রাজত্বকালে, ট্যাক্স বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, পার্লামেণ্টে যোগান বন্ধ করিবার সিদ্ধান্তের অনেক বৎসর পরে। অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগে অর্থসংগ্রহ করিবার জন্য সরকারকে বাধ্য করার পর আইন অমান্যের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়। যখন সময় আসিবে, অতিরিক্ত আইন বলে সরকার ট্যাক্স আদায় করিতে উদ্যোগী হইলে আমরা দেশবাসীগণকে ট্যাক্স বন্ধ করিবার জন্য উপদেশ দিতে দ্বিধা করিব না।

আমি আশা করি সে সময় কখনও আসিবে না, বস্তুতঃ আমি সর্বত্র হৃদয়ের যথার্থ পরিবর্তনের লক্ষণ দেখিতেছি। কিন্তু আসুন—আমরা আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হই। মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে আমাদের এই প্রস্তুতি কাজে আসিবে। আমাদের আরও মনে রাখিতে হইবে যে, আইন অমান্যের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু নিয়মানুবর্তিতা, আত্মত্যাগের জন্য অসীম ধৈর্য, জাতির স্বার্থে ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত স্বার্থ বিসর্জন। ভারতের আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতি গড়িয়া উঠিবে বলিয়া আমি আশা করি না যতক্ষণ না ভারত মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কার্যে পূর্ণমাত্রায় আত্মনিয়োগ করে। কিন্তু লক্ষ্যে অটল থাকিতে হইবে, কারণ স্বাধীনতা আমাদের লাভ করা চাই।

আমি মীমাংসার লক্ষণ সর্বত্র লক্ষ্য করিতেছি। পৃথিবী যুদ্ধ ক্লান্ত, পুনর্গঠনের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সর্বত্র একটা আকুতি। আমার বিশ্বাস, ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে পৃথিবীর ইতিহাসে। তাহার একটি বাণী আছে, পৃথিবীর সাধারণতন্ত্রের আইন-সভায় সে-বাণী ঘোষণা করিবার জন্য সে উন্মুখ।

বৃটিশ রাজনীতিবিদগণ কি সময়োপযোগী কার্য করিতে অগ্রসর হইয়া আসিবেন? আমি তাহাদের বলি, আপনাদের ও আমাদের পক্ষে সম্মানজনক শর্তে শান্তি সম্ভবপর। ভারতে অধিবাসী ইংরাজ সম্প্রদায়কে আমি বলি, আপনারা স্বাধীনতার ঐতিহ্য লইয়া এখানে আসিয়াছেন, আমাদের জাতীয় সংগ্রামে সহযোগিতা করিতে আপনারা অস্বীকার করিতে পারেন, না, যদি আমরা শেষ মীমাংসার স্তরে আপনাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করিবার অধিকারকে স্বীকৃতি দেই। বাঙ্গালীদের আমি বলি—রাজনৈতিক অধিকার লাভের নিমিত্ত আপনারা অসীম ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন তাই আপনারা সরকারের বিরাগভাজন। রাজনৈতিক অস্ত্র পরিত্যাগ করিবার সময় এখনও

আসে নাই। সংগ্রাম হইবে কঠোর কিন্তু তাহা ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া চাই। যখন মীমাংসার সময় উপস্থিত হইবে, তাহা অবশ্যই হইবে, গর্বে উদ্ধত না হইয়া ভদ্রোচিতভাবে শান্তি সভায় যোগদান করুন যাহাতে আপনাদের সম্বন্ধে এই উক্তিই শ্রুত হয় যে বিপদে আপনারা মহৎ কিন্তু লক্ষ্যে পৌছিবার পর আপনারা আরও মহত্তর।

আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশের জন্য জাতীয়তাবোধ একটি পদ্ধতি মাত্র। এখানেই ইহার সমাপ্তি নয়। জাতীয়তাবোধের বৃদ্ধি ও বিকাশ আবশ্যক যাহাতে মনুষ্যত্বের উপলব্ধি সম্ভবপর হয়। আমার আবেদন, আপনারা যখন মীমাংসার আলোচনা করিবেন,—তখন আপনাদের জাতীয়তার গর্বে আপনারা যেন বিশ্বমানবের বৃহত্তর দাবী বিস্মৃত না হন।

আমার সম্বন্ধে বলিতে পারি,—আমার কি চাহিদা—এই সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত স্বচ্ছ। আমি চাই ভারতের রাজ্য সমূহের এক সংহত সঙ্ঘ—প্রত্যেকটি নিজস্ব আদর্শে তার সংস্কৃতি ও পরম্পরাগত জীবন-দর্শন অনুসরণ করিবে, একটি অপরটির সঙ্গে একযোগে সেবাব্রতে দীক্ষিত হইবে। একটি বৃহত্তর সাধারণতন্ত্রে অপর একটি বৃহৎ সাধারণতন্ত্র। সকল স্বাধীন জাতির সমন্বয়ে গড়িয়া উঠিবে একটি বিরাট সাধারণতন্ত্র। তাহার স্বাধীনতার পরিমিতি দিয়া সেবার পরিমাপ হইবে—তাহাদের ঐক্যানুভূতি হইবে বিশ্বের জাতি-পুঞ্জের আশা, উদ্দীপনার উৎস।

উপরে উদ্ধৃত দেশবন্ধুর বক্তৃতা হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে দেশবন্ধু স্বাধীনতা এবং স্বরাজকে পরস্পর বিরোধী না বলিলেও তিনি স্বাধীনতার চাইতে স্বরাজকে কাম্য মনে করিয়াছেন। ভারতবাসী যদি নিজেদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানের সর্ব ক্ষমতা ইংরাজের নিকট হইতে লাভ করে—অর্থাৎ ইংরাজ সরকার যদি তাহাদের শাসনযন্ত্রের পরিবর্তন করিয়া ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেন তবে সাম্রাজ্যের অধীনে থাকিয়া স্বরাজলাভে আপত্তির কোন কারণ নাই। ইংরাজ চলিয়া গেলে আমরা স্বাধীনতা পাইতে পারি কিন্তু বর্ণে-বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, ধনী দরিদ্রে, উচ্চে-নীচে যদি কলহে প্রবৃত্ত হইয়া অশান্তির সৃষ্টি হইতে থাকে তবে তাহা কেমন স্বরাজ লাভ? দেশবন্ধুর এ কথার নিগূঢ় অর্থ সেদিন অনেকেই বুঝিতে পারেন নাই তাই তাঁহার এই মতামত লইয়া সেই পরিবেশে অনেকেই বাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি

করিয়াছিল।

হিংসা সম্বন্ধে দেশবন্ধুর অভিমত হইতেছে এই যে ধর্মের পথই ভারতের চিরন্তন পথ এবং ভারতের আধ্যাত্মিক মুক্তি ও জাতীয় মুক্তি এই ধর্মের পথেই লাভ করিতে হইবে,—হিংসার পথে নহে। হিংসার বলকে তিনি পশুবলের তুল্য মনে করিয়াছেন। কিন্তু দেশবন্ধুর এই মতবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে বলিবার মত উদাহরণ ভারতের পৌরাণিক ধর্মকাহিনী ও ইতিহাসে রহিয়াছে। ভারতের আদর্শ যে অহিংসা ইহা বহু মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন, বুদ্ধদেব বলিয়া গিয়াছেন, বৈষ্ণব সম্প্রদায় আজও এই মহামন্ত্রই পৃথিবীময় প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। আবার হিরণ্যকশিপুর পশুবল প্রহ্লাদের ধর্মও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট পরাজিত হইয়াছে। আবার আমাদের জাতীয় ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবৎ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এমন উপদেশ রহিয়াছে যে প্রয়োজন মত এবং অবস্থা বিবেচনায় যুদ্ধ করিতে হইবে সেখানে যুদ্ধ না করাই ক্লীবের লক্ষণ—আর যুদ্ধ মানেই তো হিংসানীতি গ্রহণ করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই হিংসা অহিংসার উদাহরণ আর পাল্টা উদাহরণ উপস্থাপিত না করিয়া দেশবন্ধু যাহা আন্তরিকভাবে বলিতে চাহিয়াছেন তাহা ভারত আত্মার শাশ্বত অহিংসার পথের কথাই।

কিন্তু বিপ্লবী, বিপ্লবধর্মে বিশ্বাসীগণ দেশবন্ধুর অভিমতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাহা ছাড়া ফরিদপুর সম্মিলনীর এই অভিভাষণকে তাঁহার বহু সহকর্মী পছন্দ করেন নাই। অনেকে ইহার নিন্দা করিয়াছেন। কেহ কেহ মুখে নিন্দা না করিলেও মনে মনে ইহাতে খুশী হইতে পারেন নাই। ইহাদের মধ্যে তাঁহার দক্ষিণহস্ত এবং একান্ত প্রিয় পাত্র সুভাষচন্দ্র তাঁহার 'The Indian Struggle' পুস্তকে বলিয়াছেন : Desh Bandhu made a speech which was regarded as rather tame for a Bengal audience. He spoke in condemnation of terrorism. The speech as a whole appeared to be an appeal to the Government and to the more extreme elements among Indians to adopt a compromising attitude so that the ground could be prepared for a sttlement. It was not welcomed by the youthful section of the anelience.

দেশবন্ধুর অভিভাষণটির মধ্যে তাঁহার মন যে সরকারের সঙ্গে একটা

আপস মীমাংসা করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাঁহার হৃদয় যতখানি প্রশস্ত ছিল সরকারের হৃদয় কি ততখানি প্রশস্ত ছিল? মীমাংসার জন্য তিনি যতখানি অগ্রসর হইয়াছিলেন সরকার কি ততখানি অগ্রসর হইয়াছিলেন? পরবর্তী কার্যকলাপে প্রমাণিত হয় যে সরকারের সদিচ্ছার অভাব ছিল-ই। তাহার কারণ, যে লর্ড বার্কেনহেডের উপর দেশবন্ধু মনে মনে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন সেই বার্কেনহেডের উক্তিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অবশ্য তর্ক হিসাবে একটি প্রশ্ন তুলিতে পারা যায় যে, দেশবন্ধু যদি জীবিত থাকিতেন তবে লর্ড বার্কেনহেড তেমন কথা বলিতেন কি না অথবা যদি বলিতেনও তবে দেশবন্ধু কি করিতেন? মীমাংসার জন্য যতখানি খোলামন লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন তিনি কি সেখানেই থাকিতেন না ব্যর্থ মনোরথ হইয়া তাঁহার নীতির পরিবর্তন করিয়া সাহায্যের দক্ষিণহস্ত খানি গুটাইয়া আনিতেন। কিন্তু সে-কথা আলোচনা করিয়া লাভ নাই। যাহা বাস্তবে হইয়াছে তাহাই বিবেচ্য। সুভাষচন্দ্র তাঁহার 'ভারতের মুক্তি সংগ্রামে' লিখিয়াছেন: লর্ড রেডিং ভারত হইতে লণ্ডনে গেলেন, কারণ রক্ষণশীল মন্ত্রীসভা ও ভারতসচিব বার্কেনহেড তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে চাহিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে এরূপ গুজব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, দেশবন্ধু দাশ ও গভর্ণমেণ্টের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে, যদিও বিস্তারিতভাবে কেহই কিছু জানিতেন না। বলা হইয়াছিল যে, লর্ড রেডিং-এর সহিত পরামর্শ করিবার পর লর্ড বার্কেনহেড ভারত সম্বন্ধে গুরুত্বপুর্ণ এক ঘোষণা প্রচার করিবেন। ভারতে প্রত্যেকেই গভীরতম আগ্রহ ও ঔৎসুক্য লইয়া তাঁহার ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। অতঃপর বিনামেঘে বজ্রপাত হইল"—অর্থাৎ ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন দেশবন্ধু পরলোক গমন করেন।

রাজনীতির চাকা বিচিত্র পথেই ঘুরিয়া চলে। ৩০শে জুন তারিখে, বলা যায় পক্ষকালের মধ্যেই লণ্ডনের একটি ভোজসভায় লর্ড বার্কেনহেড বলিয়াছিলেন, "তলোয়ারের সনদেই আমরা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া আছি, —তলোয়ারের দ্বারাই আমরা চিরকাল রাজত্ব করিব।"

এই 'তলোয়ারের প্রভুত্ব' সম্বন্ধে দেশবন্ধু তাঁহার প্রথম জীবনে একবার জবাব দিয়াছিলেন, জীবিত থাকিলে বার্কেনহেডের এ-কথারও জবাব তিনি

নিশ্চয়ই দিতেন কিন্তু ইহা জাতির দুর্ভাগ্য যে দেশবন্ধুর অভাবে এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা আর আস্ফালনের সমুচিত জবাব লর্ড বার্কেনহেডের কানে গিয়া পৌছায় নাই। না পৌছিবার কারণ অতি সহজ,—দেশবন্ধু ইহলোকে নাই। যদিও রাজনীতির সঙ্গে তিনি সারা জীবনই জড়িত ছিলেন তবুও প্রগাঢ়ভাবে তিনি ভারতবর্ষের রাজনীতির সঙ্গে পাঁচ বৎসর জড়িত ছিলেন। এই স্বল্পকাল সময়ের মধ্যেই তিনি গৌরবের উচ্চ শিখরে পৌছিয়া এমন ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে সরকারের নিকট তিনি ভয়ের কারণ হইয়াছিলেন। সেই মহাশক্তিশালী পুরুষ-সিংহের তিরোধানে ভারতবর্ষের হইল বিরাট ক্ষতি আর সরকারের হইল অপরিমেয় লাভ।

দেশবন্ধুর তিরোধানের পরে স্বরাজ্য দলের পরবর্তী নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু; দেশবন্ধুর সঙ্গে সরকারের যে আলোচনা চলিতেছিল সেই সম্বন্ধে আলোচনার জন্য অগ্রসর হইলেন। গভর্ণর জেনারেল লর্ড রেডিং তখন পর্যন্ত ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। বাংলার গভর্ণর লর্ড লিটন তখন সাময়িকভাবে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল রূপে কাজ-কর্ম চালাইয়া যাইতেছিলেন। মতিলাল নেহরু দেশবন্ধুর আলোচনার সূত্র ধরিয়া আলোচনা করিবেন বলিয়া মনস্থির করিলেন কিন্তু দেশবন্ধুর অবর্তমানে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যাবেক্ষণের জন্য সরকার তখন সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন। সুতরাং মতিলাল নেহরুর চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ফরিদপুরের সম্মিলন শেষ করিয়া দেশবন্ধু কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু উঠিবেন কোথায়? নিজের রসা-রোডের বাড়িখানা ইতিপূর্বেই দেশের কল্যাণে দান করিয়া গিয়াছেন সুতরাং সে-বাড়িখানা তখন আর তাঁহার নয়। তিনি তখন প্রমথনাথ কর মহাশয়ের বিশপ লেফ্রয় লেনের বাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। মাত্র কয়েক দিন। তখন তাঁহার শরীরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, খুব, দুর্বল, শীর্ণদেহ, মুখখানি পাণ্ডুর। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব অনেকেই তাঁহার খোঁজ-খবর লইতে আসিত। কাজ-কর্মের কথা কেহ তুলিলে বলিতেন, "কোন রকমে কয়েকটি দিন চালিয়ে দিন, আমি দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে সব করব"। নিশীথচন্দ্র সেন ছিলেন তাঁহার জুনিয়র। তিনি বলিলেন, "সারা জীবন তো অনেক খাটলেন, এবার একটু বিশ্রাম করুন"।

দেশবন্ধু উত্তর করিলেন, "নিশীথ খাটছি বটে, কিন্তু দেহ তো আর বয়

না। আর পারি না।"

আইনজীবী জীবনের পরিশ্রম, রাজনৈতিক জীবনের পরিশ্রম এবং আরো বহু রকম মানসিক পরিশ্রমে দেশবন্ধু তখন অত্যন্ত ক্লান্ত। দেহ বিশ্রাম চায়, মন চঞ্চল, মনময় ভারতের কোটি কোটি মানুষের মুক্তির চিন্তা—তাঁহার সে চিন্তার ভার কে লাঘব করিবে? সাতকড়িপতি রায় ছিলেন বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক, শুধু তাহাই নহে—তিনি দেশবন্ধুর খুব বিশ্বাসী এবং প্রিয় সহকর্মী ছিলেন। তাহার কাছে দেশবন্ধু জীবন শেষে যে ইচ্ছার কথা প্রকাশ করিলেন তাহাতে তাঁহার মনের আর একটি দিক উন্মুক্ত হইয়া উঠিল। রাজ-ঐশ্বর্য যাঁহার হস্তগত ছিল, যিনি ছিলেন ধনকুবের, যেমন ইচ্ছা তেমন তেমন ভোগ-বিলাসে যিনি নিমগ্ন থাকিতে পারিতেন সেই রাজাধিরাজ সাতকড়িপতি বাবুর নিকট বলিয়াছিলেন, "তোমরা গঙ্গার ধাবে আমার জন্য একটা কুঁড়েঘর তৈরী করে দিও, জীবনের শেষ কয়টা দিন আমি সেখানেই থাকব।" যৌবনে পদ্মার জল দেখিয়া যাঁহার মনে গৈরিক রং ধরিয়াছিল জীবন-সায়াহ্নে পবিত্র গঙ্গার ধারে একখানি পর্ণকুটিরে বাস করিবার বাসনার মধ্যে সেই মনেরই পরিপূর্ণ বৈষ্ণবরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পর্ণকুটিরে বাস করিবার বাসনা যে কতখানি সত্য দেশবন্ধুর অন্য কথার মধ্যেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার মন তখন সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত, মন উন্মুক্ত। একদিন সকলে বসিয়া আছে। রুগ্নদেহে পাণ্ডুর মুখখানি দেশবন্ধুর। তিনি বলিয়া উঠিলেন, দেখ, "মহাত্মার কোন শত্রু নাই, আমার এত শত্রু কেন? এখন বুঝিতেছি মহাত্মার মনে কোন হিংসা নাই, আমার মনে নিশ্চয়ই হিংসা আছে, তাই আমার এত শত্রু।" অসুস্থ শরীরে নীরবে, নিভৃতে তিনি আত্ম সমালোচনা করিয়া চলিয়াছিলেন,—উপরোক্ত কথাগুলি তাহারই প্রমাণ।

দীর্ঘদিন 'ফরোয়ার্ড' কাগজের সম্পাদক এবং রাজবন্দী সত্যরঞ্জন বক্সী মহাশয় তাঁহার সহিত ফরোয়ার্ড কাগজ সম্বন্ধে পরামর্শের জন্য একদিন তাঁহার নিকট আসিলেন। কথা প্রসঙ্গে বক্সী মহাশয় ফরিদপুর সম্মিলনীতে দেশবন্ধুর অভিভাষণের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে ঐ অধিবেশনে যাহা দাবীরূপে উত্থাপিত করা হইয়াছে তাহা যদি ইংরাজ রাজ অগ্রাহ্য করে তবে কি করণীয় হইবে?

দেশবন্ধু যাহা উত্তর দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সূচিত হইয়াছিল। তিনি জানাইলেন যে, তিনি তাহা হইলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন না এবং কংগ্রেসের প্রোগ্রাম পরিবর্তন করিয়া কার্যে অবতীর্ণ হইবেন। আরও জানাইলেন যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিয়া Civil Disobedience এর জন্য দেশকে প্রস্তুত করিতে হইবে।

আবার আর একদিনের কথা। সকলে মিলিয়া কিছু আলাপ আলোচনা করিবার পর দেশবন্ধু উঠিয়া উপরে চলিয়া যান। কাহাকেও কিছু বলিয়া গেলেন না। একটু পরেই আবার নীচে নামিয়া আসিলেন। কোন্ একটি অস্থির মন যেন তাঁহাকে তাড়না করিয়া চলিয়াছে। সত্যরঞ্জন বক্সী মহাশয়কেই তিনি ডাকিয়া, কেমন যেন নিস্পৃহভাবে, উদাস স্বরে বলিলেন, "This hurry and bustle of life জীবনের এই সব খেলা, এই গণ্ডগোল, এত লোকজন, এত সম্মান popularity এই সবের পরিণাম কি?—ভাবিতে ভাবিতে আবার বলিলেন, পরিণাম কি? পরিণাম কি?

১১ই মে, দেশবন্ধু বিশ্রাম লাভের জন্য দার্জিলিং রওনা হইলেন। পথে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের হিমায়েৎপুর আশ্রম। এক বৎসর পূর্বে সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সম্মিলনী হইতে ফিরিবার পর কলিকাতায় তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট 'দীক্ষা' গ্রহণ করিয়াছিলেন সুতরাং দার্জিলিং যাইবার সময় তিনি হিমায়েৎপুরে 'সৎ-সঙ্গ' আশ্রমেও কয়েক দিন অবস্থান করিয়া যান।

কিন্তু সৎসঙ্গের শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নিকট তিনি দীক্ষা নিয়াছিলেন কি-না এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা নাই তবে দেশবন্ধুর মন যে নামের জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিল তাহার প্রমাণ তাঁহার লেখায়ও পাওয়া যায়। তাঁহার সাগর সঙ্গীতে তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন:

হে পূজারী! আজি তুমি কোন পূজা কর?
পরাণ প্রদীপ মোর উর্দ্ধে তুলি ধর,
কার পানে, কোন্ মন্ত্র করি উচ্চারণ?
কোন্ পূজা লাগি বল এত আয়োজন?
দীক্ষা দাও ওগো গুরু? মন্ত্র দাও মোরে,
পূজার সঙ্গীতে তব প্রাণ দাও ভ'রে।

দার্জিলিং এ ফরোয়ার্ড কাগজের সম্পাদক প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। অর্ধ-শোয়া অবস্থায় দেশবন্ধু অতি ক্ষীণকণ্ঠে তাহার সঙ্গে কথা-বার্তা বলার পর বলিলেন, "এখন এসো প্রফুল্ল। আমি একটু নাম করব।"

যাহা হউক সপরিবারে দেশবন্ধু হিমায়েৎপুরে পদ্মার তীরে কয়েক দিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন। আঁধারেরও রূপ আছে, সংহার যে করে তাহারও রূপ আছে। দেশবন্ধু কূলভাঙ্গা পদ্মার অপূব শোভা দেখিয়া চোখ জুড়াইয়াছেন। প্রশস্ত বুকের বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করিয়া মনে আনন্দ লাভ কারয়াছেন। প্রশস্ত পদ্মার বুকে, দূরের পানে চোখ ছাড়িয়া পদ্মার অকথিত সৌন্দয দেখিযাছেন—দেখিয়াছেন বড় বড স্টীমার, নানা রংয়ের পাল তোলা বড় বড় নৌকা। বিলাত যাওয়ার সময় শুনিয়াছিলেন, সাগরের সঙ্গীত। তখন শুনিলেন, পদ্মার সঙ্গীত। সে-সঙ্গীত কখনও গুরু, কখনও লঘু। সবক্ষণ অন্তরময় এক গুম্ গুম্ ধ্বনি লইয়া পদ্মা যেন কাহার উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে। দেশবন্ধু দেখিলেন সে-যাওয়া; শুনিলেন সে-ধ্বনি। এক কথায় বলিয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার জীবনটিও ঠিক পদ্মার মত। বিষ্ণুর দেওয়া ভাঙ্গনের গদা হাতে করিয়া তিনি জীবন-ব্যাপী কত কি ভাঙ্গিলেন আবার বিশ্বকর্মার বরপুত্ররূপে সে-ধ্বংস স্তূপের মধ্য হইতে আবার নূতন সৃষ্টির উন্মাদনায় নূতনের পর নূতন সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন—ঠিকই যেন পদ্মার খেলা, কূলভাঙ্গা আর গড়া।

বিখ্যাত আইনজীবী স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের 'স্টেপ-এসাইড' নামে একখানি বাড়ী ছিল। দেশবন্ধু সেই বাড়ীতেই গিয়া উঠিলেন। প্রথম প্রথম কয়েক দিন সরকার মহাশয় দেশবন্ধুকে তাঁহার অতিথিরূপে রাখিয়া যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করিয়াছিলেন কিন্তু কয়েক দিন পরে দেশবন্ধু নিজেই সে-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করিলেন।

হিমায়েৎপুরে কয়েক দিন বিশ্রামের পর দার্জিলিংয়ে গিয়া তিনি একটু ভালো বোধ করিলেন। প্রত্যেক দিন সকালে বিকালে দুই বেলা বেড়াইতেন অবশ্য সংগে একখানি 'রিক্শ' থাকিত। পায়জামার উপর কাশ্মিরী আলখাল্লা আর মাথায় কাশ্মিরী পশমের গান্ধীটুপি পরিয়া তিনি বেড়াইতেন। পথের লোক তাঁহাকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিত,—ঐ যে দেশবন্ধু! জনসাধারণের এই দেখা, দেশবন্ধুকে তাহারা যে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে তাহারই

লক্ষণ। ইহার চাইতেও ভক্তি ও শ্রদ্ধার আর একখানি সুন্দর চিত্র পূর্বে দেখা গিয়েছে। দেশবন্ধু তখন জেলে ছিলেন। কয়েকজন লোক তখন বাহির হইতে জেলের পাঁচিলের গায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিতেছিল। তাহাদের এই অদ্ভুত কার্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা জানাইল, "আমাদের দেশবন্ধু এই জেলের মধ্যে, তাঁহাকে চোখে দেখিবার যো-নাই আমরা তাই জেলের পাঁচিলে তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি।"

মানুষের প্রতি মানুষের কতখানি ভালোবাসা, কতখানি শ্রদ্ধা আর কত গভীর ভক্তি থাকিলে মানুষ এমন করিয়া প্রণাম জানায়।

দেশবন্ধু একদিন চৌরাস্তায় বেড়াইতেছিলেন। এমন সময় সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বীরবলের [প্রমথনাথ চৌধুরী] সংগে দেখা। বীরবল জিজ্ঞাসা করিলেন, কতদিন এখানে থাকা হবে ?

দেশবন্ধু উত্তর করিলেন, যদি থাকতে দেয় তা'হলে নভেম্বর পর্যন্ত দার্জিলিং কাটাব মনে করছি।

থাকতে দিচ্ছে না কে ?

যারা চিরদিন দেয় না। কর্তারা যদি কাউন্সিল ডাকেন, তা'হলে হয়ত একবার নেমে যেতে হবে।

আবার দেশবন্ধু নিজেও কাহারো সংগে দেখা করিতে যাইতেন। তাঁহার বন্ধু পৃথ্বীশচন্দ্র রায় দার্জিলিংয়ের অপরেক প্রান্তে ছিলেন। দেশবন্ধু একদিন রিকশতে সকাল বেলা বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার বাড়ী গিয়াছিলেন। দুই বন্ধুর মধ্যে রাজনৈতিক অনেক বিষয় আলোচনা হইয়াছিল। উহা উল্লেখ করিয়া তাঁহার Life and Times of C. R. Das গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন : In course of a conversation Chitta Ranjan frankly confided to me his anticipations. He ve me the impression that, given the gesture he was looking for, he would even be prepared to accept the task of forming a Ministry and administer the transferred departments from a constructive point of view. On terms of honourable Co-operation he was even prepared to work the Montagu Act, provided only that the Minister-in-charge of transferrd departments were

made masters in their own houses, with independent powers of purse and without the risk of interference from the head of the administration.

প্রকৃতপক্ষে দার্জিলিংয়ে যাওয়ার পর হইতে দেশবন্ধুর মানসিক একটা পরিবর্তন বেশ লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে এবং আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায়ও। স্বরাজের জন্য তিনি তখন উন্মুখ। বিশেষতঃ সেই সময় লণ্ডনে Secretary of State for India এবং গভর্ণর জেনারেল, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন: সে-সংবাদ সংবাদপত্রে পড়িয়া দেশবন্ধু মনে মনে আরও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তাহাদের ঐ আলোচনার দরুন ভারতের ভাগ্যে কিছু সুফল ফলিবেই। তিনি বলিয়াও ছিলেন যে, ভারতসচিব এবং বড়লাটের আলোচনান্তে উহারা একটা প্রস্তাব পাঠাইবেনই এবং সে প্রস্তাব যদি ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় তবে সুখের কথা। আর তাহা না হইলে নূতন পথের কথা কংগ্রেসকে চিন্তা করিতে হইবে।

আর আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে বলা যায়, তিনি যেন তাঁহার মনের খাতায় জীবনের হিসাব-নিকাশ করিয়া চলিতেছিলেন। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যেমন যে কোন কাজ করিবার সময় উপরের দিকে তাকাইয়া মানব-জীবনের শেষ বিচারালয়ের কথা চিন্তা করে, দেশবন্ধুও যেন তখন সেদিক পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিলেন। তখন তিনি মানসিক এমন পর্যায়ে গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন যে তাঁহাকে পরম বৈষ্ণব ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

একদিন এক জায়গায় সংকীর্তনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী কীর্তন শুনিতে গিয়াছিলেন, দেশবন্ধু যাইতে চাহিলেন না। না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি অতি বিনয়ের সঙ্গে জানাইলেন, "দেখ, কীর্তন আমার এত ভালো লাগে যে আমি যদি যাই ৫।৭ দিন আমার ঘুম হবে না, আমার মস্তিষ্ক অত্যন্ত উত্তেজিত হবে, সামলাতে পারব না, সবে শরীর সুস্থ হচ্ছে, এখন যাওয়া বোধহয় সঙ্গত হবে না।"

এই সময় দুইজন ভদ্রমহিলা Miss Rolland এবং Miss Berry দেশবন্ধুর নিকট প্রায়ই আসিয়া বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করিতেন। রাজনীতিও বাদ যাইত না। আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে

কথা উঠিলে দেশবন্ধু তাঁহার রাজনৈতিক জীবন-দর্শনের মূল কথাটি তাহাদের নিকট বলিতে গিয়া :জানাইলেন, তিনি একজন বৈষ্ণব এবং তাঁহার যে রাজ নৈতিক জীবন তাহা বৈষ্ণব ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বৈষ্ণবের চোখে সবই সুন্দর, সবই পবিত্র। সে কখনও কাহারো দোষ-ত্রুটীর সমালোচনা করে না, সকলকে ভালোবাসিয়া প্রেমে আলিঙ্গন করে। দার্জিলিংয়ের এই দিনগুলিতে দেশবন্ধুর মধ্যেও সে-ভাবের বন্যা প্রবাহিত হইতে থাকে। সকলেই তাঁহার কাছে সমান, সকলেই ভাল। তিনি তখন যাহাদের ভাল মনে করিতেছিলেন, জীবনের দীর্ঘদিন তাহাদিগকেই প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, দেশবন্ধু বিগত দিনের সে-সব কাহিনী মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া তখন এমন কথা বলিয়াছেন যে, তাহাদের বিরুদ্ধে তাঁহার যেন আর কোন নালিশ নাই, তাহারা যেন তাঁহার কত আপন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্যার সুরেন্দ্রনাথের কথাই উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে দুই বিরুদ্ধ দলের দুই প্রধান। উভয়ের মধ্যে কত বাদ-প্রতিবাদ, কত সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সুরেন্দ্রনাথের "A Nation in Making" পুস্তকখানির সমালোচনা করিয়া উহা ফরোয়ার্ড কাগজে প্রকাশ করিবার সময় দেশবন্ধু তাঁহার অন্যতম বন্ধু পৃথ্বীশচন্দ্র রায়কে পূর্বেই বলিয়া দিলেন যাহাতে সমালোচনাটি কঠিন না হয়। পৃথ্বীশ রায় মহাশয়কে তিনি আরও একটি অনুরোধ জানান। পুর্বে রবীন্দ্রনাথের উপর দেশবন্ধুর একটু বিদ্বেষ ভাব ছিল। তখন দেশবন্ধু তাঁহার এশিয়াটিক ফেডারেশনের কথা গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছিলেন। কি করিয়া যে তিনি তাঁহার ঐ মনের ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করিবেন তাহা ভাবিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের কথাই তাহার প্রথম মনে হইল। মনে করিলেন, রবীন্দ্রনাথই যোগ্যতম ব্যক্তি। পৃথ্বীশবাবুকে অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন কলিকাতা গিয়া ঐ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলেন এবং এশিয়াটিক ফেডারেশনের জন্য যে ব্যবস্থা করিবার প্রয়েজেন হয় তাহার ব্যবস্থাপনায় হাত দেন।

আবার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সঙ্গী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী সম্বন্ধে তিনি তখন যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও অন্তরস্পর্শী। পশ্চাতে ফেলিয়া আসা দিনের দিকে চাহিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়ের

সংগে তাঁহার ব্যবহার কোন কোন সময় মধুর ছিল না। সে-কথা মনে উঠিতেই তাঁহার মন বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। তিনি তখন ডাঃ হেমেন্দ্র-নাথ দাশগুপ্তকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন যাহাতে তিনি কলিকাতা পৌছিয়াই শ্যামসুন্দর বাবুর সঙ্গে দেখা করেন এবং শ্যামসুন্দর বাবু যেন কিছু মনে না করিয়া থাকেন, সে-অনুরোধ জানান। চিত্তরঞ্জনের এই অনুশোচনার কথা শুনিয়া শ্যামসুন্দর বাবুর চিত্তও চঞ্চল হইয়া উঠিল। এক তটের ঢেউ আসিয়া লাগিল আরেক তটে। শ্যামসুন্দর বাবুর চোখেও তখন জল। জলভরা চোখে জানাইলেন, "আমি কি কখনও চিত্তর উপর রাগ করতে পারি? তাকে যে আমি প্রাণের চেয়ে ভালবাসি"। চিত্তরঞ্জনের অন্তর মথিত অনুশোচনার প্লাবন শ্যামসুন্দরের মনোবেদনার কালো মেঘখানিকে ভাসাইয়া লইয়া গেল কোথায়!

ফলটি ভেতরে পাকিলে বাহিরে তাহার রংটি ফুটিয়া বাহির হয়। দেশবন্ধুর তখনকার মুখখানি দেখিয়াও তেমন অনুমান করা যায়। দার্জিলিং গিয়া তিনি কিছুটা সুস্থ বোধ করিতেছিলেন। কিন্তু তাহার চাইতেও যাহা সুন্দর তাহা হইতেছে তাঁহার সারা মুখখানির এক অপূর্ব ঔজ্জ্বল্য। শিশুর মত তাঁহার মুখখানি সরল, ফুলের মত পবিত্র। সে-মুখে সকলের প্রশংসা, সকলের সুখ্যাতি। এ সম্বন্ধে মহাত্মাজীও বলিয়াছেন যে, তিনি যে কয়েক দিন দার্জিলিংযে দেশবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন তখন কোন সময়ই তাঁহার মুখে কাহারও নিন্দা শোনেন নাই।

ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যোগদান করিবার পর মহাত্মাজী পূর্ববঙ্গের জিলায় জিলায় পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। পরিভ্রমণ শেষে, মাসের শেষ দিকে তিনি কলিকাতা আসিয়া পৌছান কারণ ২৭শে মে, কলিকাতায় কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সভা আহ্বান করা হইয়াছিল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দেশবন্ধু। তিনি তখন দার্জিলিং। গান্ধীজীকে তাই তিনি দার্জিলিং যাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রের কথা উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, দেখুন, দেশবন্ধু পেন্সিলে চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "আপনি ভুলে যাবেন না, আপনি আমার এলাকায় আছেন, আমি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি,

আপনাকে আমার এখানে দার্জিলিং-এ আসতেই হবে"।

গান্ধীজী তখন যাইতে পারিবেন না বলিয়া জানাইলেন কারণ ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং এবং অন্য অন্য কর্মতালিকাও প্রস্তুত হইয়াছিল। দেশবন্ধু গান্ধীজীর ঐ কৈফিয়ত শুনিতে চাহিলেন না। গান্ধীজীর পত্রের উত্তরে দেশবন্ধু, গান্ধীজীকে ও ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যগণকে লইয়াই দার্জিলিং যাইবার জন্য আহ্বান জানাইলেন এবং সে-জন্য যে টাকা খরচ হইবে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য সাতকড়িপতি রায়কে লিখিলেন বলিয়াও জানাইয়া দিলেন।

এবারে আর গান্ধীজী দেশবন্ধুর আহ্বানকে এড়াইতে পারিলেন না। তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে দার্জিলিং যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আর ওদিকে গান্ধীজীকে সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য দেশবন্ধুও প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কলিকাতা থাকিতে পূর্বে অনেকবার তিনি অন্য অন্য কাজে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় মহাত্মাজীর অভ্যর্থনার ভার শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর উপরই ন্যস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু দার্জিলিংয়ে তিনি সেই অন্য অন্য কাজ হইতে মুক্ত ছিলেন। শরীরও কিছুটা সুস্থ বোধ করিতেছিলেন। তাই মহাত্মাজীর অভ্যর্থনার সব কিছু আয়োজন নিজের হাতেই করিতেছিলেন। তিনি যেন একটা মহান কাজ পাইয়াছিলেন। ছাগলের দুধ মহাত্মাজীর প্রিয় এবং উহাই তাঁহার প্রধান খাদ্য এবং পানীয়। সুতরাং দেশবন্ধু জলপাইগুড়ি হইতে পাচটি ছাগল আনাইয়াও রাখিয়াছিলেন। মহাত্মাজীর আদর যত্নের এতটুকু ক্রটী না হয় উহাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।

মহাত্মাজী যাওয়ার পূর্বে রাজা মণিলাল সিংহ একদিন দেশবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। দেশবন্ধুর " "া সম্বন্ধে খোঁজ খবর লওয়ার পর তিনি দেশবন্ধুর খাওয়া সম্বন্ধে নিয়মানুবর্তিতা অবলম্বন করিবার কথা বলিলেন। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে মহাত্মাজী যে অত্যন্ত নিয়ম মানিয়া চলেন সে-কথাও উঠিল। শুনিয়া দেশবন্ধু বলিলেন, "মহাত্মার কথা ছেড়ে দিন, তিনি যোগী পুরুষ, সুসংযত নিয়মাচারেই ওঁর শরীর বেশ ভাল আছে।"

গান্ধীজীর প্রতি দেশবন্ধুর আন্তরিক কত গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল 'যোগী পুরুষ' বিশেষণটির মধ্যেই তাহার পরিচয় রহিয়াছে। দেশবন্ধুর সেই শ্রদ্ধার পাত্র মহাত্মাজী তাঁহারই সাদর আমন্ত্রণে ৪ঠা জুন দার্জিলিং গিয়া

পৌছিলেন এবং জানাইলেন যে তিনি মাত্র দুই তিন দিন সেখানে থাকিবেন। কিন্তু দেশবন্ধুর ইচ্ছায় মহাত্মাজী সেখানে চার পাঁচ দিনই ছিলেন।

হিম-আলয় দার্জিলিংয়ে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতের পদ-তলে পৃথিবীরই আর দুইজন মহাপুরুষের এই সাক্ষাৎ ইতিহাসের পাতায় চিরকালের জন্য স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে এবং থাকিবে। এই শেষ সাক্ষাৎ কিন্তু কে জানিত যে উহাই শেষ, সব শেষের শেষ। মুক্তি পিপাসু কোটি কোটি ভারতবাসী তাকাইয়া রহিয়াছিল ঐ হিমালয়ের কোলে, ঐ মহামিলনের দিকে। মহা মহাযোগী ঐ হিমালয়ের কোলে, গুহা-গহ্বরে, যুগ যুগ তপস্যায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। তপস্যা-বলে বলীয়ান তাঁহাদের একটু ইঙ্গিতে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে অঘটন ঘটাইতে পারেন, প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন তাঁহারা। এক কালে সমগ্র ভারতবর্ষের সামাজিক আর আধ্যাত্মিক জীবন ওখান হইতেই নিয়ন্ত্রিত হইত।—আর গুহা-গহ্বরের বাইরে, সেই হিমালয়ের পদতলে বসিয়া ভারত নিয়ন্তা দুই যোগী-পুরুষ একালেও ভারতবর্ষকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য পরামর্শে ব্যস্ত ছিলেন। লোকের তাই কত আশা, আকাঙ্ক্ষা! পবিত্র হিমালয় হইতে কি পুণ্যধারা প্রবাহিত হইয়া আসে তাহার জন্য উন্মুখ!

উভয়ের মধ্যে কত রকম কথা, কত হাসি ঠাট্টা, কত রাজনৈতিক আলোচনা। রাজনৈতিক আলোচনা প্রসঙ্গে দেশবন্ধু গান্ধীজীকে জানাইলেন, "Lord Birkenhead is a strong man and I believe he will do something for India."

আলোচনা হইল চরকা সম্বন্ধে। গান্ধীজী দেশবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখন চরকায় সূতা কাটতে শিখেছেন?"

হ্যাঁ, কিছু কিছু পারি,—জানাইলেন দেশবন্ধু।

তা' হলে প্রচার করে দিতে পারি যে আপনি খুব উৎসাহের সঙ্গে চরকা কাটছেন?

দেশবন্ধু তাঁহার "বাংলার কথা"-য় যাহা বলিয়াছিলেন তাঁহার স্মৃতিপটে তখন সেই কথা। পল্লীগ্রামেই ভারতবর্ষ ঘুমাইয়া রহিয়াছে। সেই পল্লীকে জাগাইতে হইবে, সংগঠন করিতে হইবে। মহাত্মাজীকেও জানাইলেন, "পল্লীগঠন এবং চরকাই এখন আমার কাছে ভাল কাজ বলিয়া মনে হইতেছে।"

আবার যথেষ্ট হইয়াছে হাসি-ঠাট্টা। একদিন মহাত্মাজী একখানি চেয়ারে পা দুলাইয়া বসিয়াছিলেন। দেশবন্ধু ছিলেন বিছানায় অর্ধশায়িত অবস্থায়। উভয়ের মধ্যে কথা-বার্তা হইতেছিল। সাধারণতঃ মহাত্মাজী পা দুলাইয়া বসিতেন না এবং ঐরূপ পা দুলাইয়া বসিতে তাঁহার অসুবিধা হইতেছে মনে পড়ায় দেশবন্ধু তাড়াতাড়ি নিজের একটি বালিশের উপর একখানি কম্বল ভাঁজ করিয়া, গদির মত করিয়া মহাত্মাজীকে বসাইলেন। দুইজনে তখন মুখোমুখি। গান্ধীজী হঠাৎ হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার তখন দীর্ঘদিন পূর্বের একটি দৃশ্যের কথা মনের পটে ভাসিয়া উঠিল। সে-দৃশ্যটি হইল,—তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী বিবাহ-বাসরে এমন করিয়া মুখোমুখি বসিয়াছিলেন। বলিলেন, "ঠিক এমনিভাবে আমি ও আমার স্ত্রী বিবাহের সময় মুখোমুখি হয়ে বসেছিলাম। এখানে কেবল তফাত দেখছি পানি বন্ধনের। ভাবছি (বাসন্তী দেবীর দিকে তাকাইয়া) উনি কি মনে করেন।"

আরেক দিন। মহাত্মাজীর জন্য দুধের সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিক আছে কি-না তাহা খোঁজ লইবার জন্য ডাঃ দাশগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছাগল দুধ দিচ্ছে তো?"

উত্তরে ডাঃ দাশগুপ্ত জানাইলেন যে পাঁচটি ছাগলের মধ্যে দুইটি ঠিক মত দুধ দেয় বাকী তিনটি দুধ দেয় না তাহারা একেবারে শুইয়া পড়িয়াছে।

শুনিয়া মহাত্মাজী হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "I am very glad they have got self-respect in them." অর্থাৎ ইহাদের আত্ম সম্মান বোধ আছে দেখিয়া আমি খুব আনন্দিত।

শুনিয়া দেশবন্ধুও হাসিলেন। রহস্য করিয়া বলিলেন যে, ছাগলেরাও দেখিতেছি Non-Co-operation করিয়াছে। যে দুইটি একান্ত বাধ্য থাকিয়া দুধ দিতে কার্পণ্য করিতেছে না তাহাদের অবশ্যই উপাধিতে ভূষিত করিতে হইবে আর বাকী তিনটিকে জেলে দেওয়া দরকার।

গান্ধীজী ও দেশবন্ধুর মুখে তখন উচ্চ হাসি। হাসির রোল।

এইরূপে হাসি-আনন্দে কয়েক দিন দেশবন্ধুর সঙ্গে থাকিয়া মহাত্মাজী ৯ই জুন দার্জিলিং হইতে রওনা হইয়া জলপাইগুড়ি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ তারিখেই দেশবন্ধু হেমেন্দ্রনাথকে লিখিলেন:

Step Aside,
Darjeeling,
9.6.25.

Dear Hemendra,

............I am in great difficulty. The Swarajya Party owes me a large amount which it is unable to repay now. The result is that having given to the Swarajya Party practically I had, I cannot meet my expenses and may have to return before I have recovered my health. It would be a pity not so much for my sake, as my life is practically finished, but for the Country which requires all my energy in 1926. I feel since 1926 is the most critical year in our national history" অর্থাৎ আমি খুব অসুবিধায় আছি। স্বরাজ্য দলকে আমি বহু টাকা ধার দিয়াছি যাহা ঐ দল এখন আমাকে পরিশোধ করিতে সক্ষম নহে। আমার যাহা ছিল বস্তুতঃ তাহা সবই স্বরাজ্য দলকে দেওয়ায় অবস্থা এই হইয়াছে যে আমার নিজের জন্য খরচ করিতে পারিতেছি না এবং স্বাস্থ্যোদ্ধারের পূর্বেই ফিরিয়া যাইতে হইতে পারে। আমার নিজের জন্য দুঃখ করি না কারণ আমার জীবন প্রায় শেষ, দুঃখ দেশের জন্য কারণ ১৯২৬ সালে দেশের জন্য আমার সমস্ত কর্মোদ্যমের প্রয়োজন রহিয়াছে। আমার মনে হয়, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে ১৯২৬ সাল একটি অতীব সঙ্কটময় বৎসর।

ইহার পর দেশবন্ধু যে কয়েক দিন জীবিত ছিলেন তাহার মধ্যেও বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। ডাঃ ডি. এন. রায়ের বাড়ীতে গিয়া গল্প করিয়াছেন। ফেরার পথে একদিন রাজা মন্মথ র সঙ্গে দেখা হইল। তিনি দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজ করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন ভাল আছেন তো ?"

"Yes, better,"—জানাইলেন দেশবন্ধু।

কিন্তু তাঁহার ঐ better যে better নয় তাহাই প্রমাণিত হইতে চলিল ১৪ই জুন রবিবার রাত্রে। সেদিনও খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি রাণী ভবানীর কথা, দয়ারামের কথা আলোচনা করিয়া শেষে কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীকে 'কাব্যের কথা' বইখানি আনিতে বলিলেন। তখন আরম্ভ হইল তাঁহার

পড়া। এক অপূর্ব ভাবাবেশে চণ্ডিদাস আর বিদ্যাপতি পড়িতে লাগিলেন। রাত অনেক হইয়াছিল তাই শ্রোতা ছিলেন সকলেই বাড়ীর লোক।—ছিলেন ছোট জামাতা ভাস্কর বাবু, ছোট কন্যা কল্যাণী দেবী, বাসন্তী দেবী ইত্যাদি। কখনও পড়িলেন বিদ্যাপতি আবার পড়িলেন চণ্ডিদাস।—যেন বহুবারের পড়া সেই সব কবিতায় তিনি নূতন করিয়া আবার অর্থ খুঁজিয়া পাইতেছিলেন, রস পাইতেছিলেন নূতন নূতন।

কিন্তু রাত গভীর হইয়াছিল। বাসন্তী দেবী বলিলেন, "রাত বারটা বেজে গেছে, এখন শুতে চল।"

"তাতে কি হয়েছে?" বলিলেন দেশবন্ধু। "আমার আর জ্বর হবে না, জ্বরের বাসা ভেঙ্গে গেছে।"

দুঃখের বিষয় জ্বরের বাসা ভাঙ্গিযাছিল না। নূতন করিয়া প্রবলভাবে আক্রমণ করিবার জন্যই বোধ হয় জ্বর কয়েক দিন চুপ করিয়াছিল, সে-কথা তখন কে জানিত। ১৪ই জুনের রাত। রাত তিনটার সময় প্রবল জ্বর আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। এমন জ্বর যে দুইখানা লেপ-কম্বল দিয়া তাঁহাকে চাপা দিতে হইযাছিল। ১০৫° ডিগ্রি জ্বর। পা দুইখানি বেশ ফুলিয়া দিয়াছে। ১৫ই জুনও সেই অবস্থায় চলিল। ডাঃ ডি. এন রায় আসিয়াছিলেন। ডাঃ চ্যাটার্জী আসিয়াও রক্ত পরীক্ষা করিলেন কিন্তু পা ফুলার কারণ ফাইলেরিয়া কি-না তাহার কোন প্রমাণ পাইলেন না। ভ্রাতুষ্পুত্রী মায়া বসুকে তিনি কিছুক্ষণ পূর্বে কাছে ডাকাইয়া বসাইয়াছিলেন, তাহাকে তখনও বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "তুই এখনও বসে আছিস, সন্ধ্যে হয়ে এলো ঠাণ্ডা লাগবে।—দেখ. তোদের শ্মশানের জন্য দিঘাপাতিয়াকে বলেছিলাম, তিনি সাহায্য কর্বেন, আমি ভাল হয়ে উঠে শ্মশানটাকে চমৎকার করে তুলব।"•

রাত আটটায় দেশবন্ধুর ১০৪° ডিগ্রি জ্বর। তিনি জ্বরে কাঁপিতেছেন। পা দু'খানি ফুলা,—তাহাতে যন্ত্রণা। ইহার উপরে আবার ঘন ঘন বাহ্যের উদ্রেক হইতেছে। শয্যা পার্শ্বে বাসন্তী দেবী বসিয়া দেশবন্ধুর পদ সেবা করিতেছেন। কখনও তাঁহার একটু তন্দ্রার মত আসিতেছে, কখনও তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। তাহারই মধ্যে ভুল বলিয়া চলিয়াছেন। সে ভুল বলার মধ্যেও তাঁহার সুন্দর মনের পরিচয় ফুটিয়া উঠিতেছে। একবার

বলিয়া উঠিলেন, "দেখ তো রোয়াকের উপর কে বসে আছে? কি চায়?"

আবার বলিলেন, "ভোলা আমায় ডাক্‌ছে, আমি অতুপের কাঁধেই যাব।"

১৬ই জুন। জ্বর ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল। কিন্তু পা ফুলা যেমন ছিল তেমনিই রহিয়া গেল। সকালের দিকে জ্বর কমিয়া ৯৭° ডিগ্রিতে নামিয়া আসিল। ডাঃ ডি. এন. রায় দেশবন্ধুকে দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং একজন এলোপ্যাথি ডাক্তার দেখাইবার জন্য বাসন্তী দেবীকে বলিলেন।

কথাটি দেশবন্ধুর কানে গিয়াছিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না, না ওদের হাতে আর দেবেন না, আপনিই করুন। আমার তো জ্বরটা গিয়াছেই, পা ফুলাটা কমিলেই হয়।"

সকাল হইতেই Oxygen দেওয়া হইতেছিল। বেলা বারোটার পর হইতে অবস্থা খুবই খারাপের দিকে চলিল। তথাপি নাতি-নাত্নীদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর লইলেন। ভোম্বলকে টাকা পাঠান হইয়াছে কি-না তাহাও বার বার জিজ্ঞাসা করেন। শেষ পর্যন্ত টাকা পাঠানোর রসিদখানি তাঁহাকে দেখান হয় তখন নিশ্চিন্ত হইলেন।

বেলা তিনটার পর হইতে অবস্থা আরও খারাপের দিকে চলিল। কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তখন তাঁহার কোন কথাই বুঝিতে পারা যায় নাই! ক্রমে কথা বলিতে পারিলেন না এবং চোখ মেলিয়া রাখিবার শক্তিও হারাইলেন।—তাহার পর সব শেষ। প্রাণ বায়ুটুকুও আর তিনি ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না, জীর্ণদেহের আবরণ ভেদ করিয়া কোথায় উড়িয়া গেল! শত যুদ্ধের জয়ী যোদ্ধা তখন পরাজিত। বৈকাল পাঁচটায় অস্তাচল-গামী সূর্যের সঙ্গে দেশবন্ধুর মুক্ত আত্মা শৈলেশ্বরের চরণপ্রান্তে নূতন করিয়া আবার তপস্যায় বসিলেন; আর পশ্চাতে পড়িয়া রহিল অন্তিম শয়নে শায়িত রণবীরের প্রাণহীন দেহখানি; শিবের শব-দেহ!

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এই হৃদয় বিদারক দুঃসংবাদ মুহূর্তের মধ্যে দেশের সারা বুকে ছড়াইয়া পড়িল। বাংলা দেশে পূর্বেও অনেক মহাপুরুষ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গবাসী অনেক কাঁদিয়াছে কিন্তু দেশবন্ধুর জন্য কাঁদা যেন তাহা হইতে অনেক পার্থক্য। এ-কান্নায় যেন শোকের গভীরতা বেশী, এ কান্নার অশ্রু যেন বেশী তপ্ত! বলা যায়,—নিজের আপন

জন, একান্ত প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় মানুষ যেমন কান্না প্রকাশের ভাষা হারাইয়া, অব্যক্ত বেদনায় বুকের জ্বালা লইয়া গুম্‌রাইয়া কাঁদিয়া ওঠে,—এ ঠিক তেমন কান্না। কাঁদিল বঙ্গজননী, কাঁদিল ভারত জননী। সন্তান হারার বেদনায় দেশ জননীর বুক ফাটিয়া যে শোকের অনল সেদিন জ্বলিয়া উঠিল, হিমালয়ের সব বরফ গলিয়া জলধারা হইয়া প্রবাহিত হইলেও সে-শোকানল নির্বাপিত হইতে পারে না। তাই দেশবন্ধুর জন্য জাতির শোক, দেশের শোক চিরদিনই প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

শোকে মানুষ মানুষকে সান্ত্বনা দেয়। দেশবন্ধুর জন্য এই শোকের মধ্যে দেশবন্ধুরই একান্ত প্রিয় অনুচর কাজী নজরুল ইস্‌লাম নিজের চোখের কান্নার তপ্ত অশ্রু লইয়া দেশবাসীকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। আশাবাদী নজরুল। গুরুর মহাপ্রয়াণের পর শোকে মূহ্যমান হইয়া তিনি দেশবন্ধু সম্বন্ধে অনেক কবিতা-অঞ্জলি তুলিয়া ধরিয়াছেন। সেই সঙ্গে তাঁহার আশার কথা বাণীবদ্ধ করিয়া দেশের কানে, দশের কানেও শুনাইয়া রাখিয়াছেন :

আজ্‌কে রাতে যে ঘুমুলো, কালকে প্রাতে জাগবে সে।
এই বিদায়ের অস্ত-আঁধার উদয়-উষায় রাঙ্‌বে রে।
শোকের নিশির শিশির ঝ'রে
ফলবে ফসল ঘরে ঘরে,
আবার শীতের রিক্ত শাখায় লাগবে ফুলেল রাগ এসে।
যে মা সাঁঝে ঘুম পাড়াল চুম দিয়ে ঘুম ভাঙবে সে।

সাহিত্য প্রাঙ্গণে

চিত্তরঞ্জন বলিতেন, "সমগ্র জীবনেব অনুভূতিই সাহিত্য"। ধর্মে তিনি যে মতাবলম্বীই হউন না কেন তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী। বাংলার জল বায়ুতে তাঁহার দেহ গঠিত, বাংলার সৎশ্রেণীর মানুষের সহজ, সরল জীবন-যাপনের পদ্ধতিতে তাঁহার মন গঠিত, বাংলার পদাবলী কীর্তন আর বাউল, মুসাফিরের গান তাঁহার মনের-কানে সর্বক্ষণ ধ্বনিত হইয়া তাঁহাকে ভক্তি-রসে নিমজ্জিত করিয়াছে। তদুপরি তাঁহার অনুভূতি ছিল স্বতন্ত্র, অসাধারণ; তাঁহার দৃষ্টি ছিল সুদূর প্রসারী, তাঁহার ছিল অন্তর্দৃষ্টি! প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্য সাধারণ লোকে যাহা দেখিতে পারে না, প্রকৃতির অন্তরে অনন্তকাল ধরিয়া যে সুরধ্বনি ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে, যাহা সাধারণ লোকে শুনিতে পায়

না তিনি তাহা শুনিতে পাইয়াছিলেন। বিভিন্নরূপ আর সৌন্দর্য খচিত একখানি অবগুণ্ঠন টানিয়া এই নিখিলের বুকে এক চিরন্তন ক্রন্দসী সৃষ্টির প্রথম প্রভাত হইতে যে কান্না কাঁদিয়া চলিয়াছে, সাধারণের কাছে সে অশ্রুত কান্না কি, কেন, কি তাহার সুর, কি তাহার ভাব তাহা আবিষ্কার করাই কবির কাজ। চিরন্তন ক্রন্দসীর সেই অবগুণ্ঠন খুলিয়া প্রকাশের যবনিকাখানি তুলিতে কবিগণ অনন্তকাল ধরিয়া চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন। সেই ফল্গু-কান্নার অর্থ যে যতখানি অনুভব করিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনি তত বড় কবি।

কমলার আশীর্বাদপ্রাপ্ত চিত্তরঞ্জন। ব্যবসায়ী জীবনে ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়ক্ষেত্রেই তিনি সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন। কমলার আশীর্বাদপ্রাপ্ত এই চিত্তরঞ্জন বাণীর বর-পুত্রও। সাহিত্যে এবং কাব্যে উভয় ক্ষেত্রেই তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন।

বৈচিত্র্যভরা চিত্তরঞ্জনের জীবন, বিরাট তাঁহার জীবনের ব্যাপ্তি। তাঁহার অনুভূতিও তো কম নহে, তাই তাঁহার সাহিত্য এবং কাব্য সৃষ্টিও কম নহে।

"যথার্থ কবিতা কখনও চেষ্টা প্রসূত নহে,"—অর্থাৎ ভাবিয়া চিন্তিয়া, একটির পর একটি শব্দ বসাইয়া অনেক পরিশ্রমে একটি কবিতা লেখা যাইতে পারে কিন্তু তাহা হইলেই লেখককে কবি আখ্যায় ভূষিত করা যায় না। প্রকৃত কবিতা আপন গতিতে, স্বচ্ছধারায় কবির কলম হইতে প্রবাহিত হইতে থাকে। তাহার যদি ভাবিবার থাকে তাহা তিনি পূর্বাহ্নেই ভাবিয়া রাখেন। লিখিবার সময় আর ভাবিতে হয় না। সেখানে ঈশ্বরের আশীর্বাদ-রূপ কবিত্বশক্তি বা সাহিত্য সৃষ্টির দক্ষতা তাহাকে অন্তর হইতে প্রেরণা দিয়া সাহায্য করিয়া থাকে। অবশ্য ইহাও ঠিক যে, যাহারা এমন আশীর্বাদ প্রাপ্ত তাহারাও ছোটবেলা হইতে কাব্য-সাহিত্যের চর্চা করিয়া থাকেন। সমগোত্রীগণ একত্রিত হইয়া আলাপ-আলোচনা করেন, সাহিত্য সেবার জন্য পথ খুঁজিয়া বাহির করেন।—ক্লাব গঠন করেন। রবীন্দ্রনাথের "খাম-খেয়ালী ক্লাব" নামে একটি ক্লাব ছিল। চিত্তরঞ্জন এই ক্লাবের একজন সভ্য ছিলেন। অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত নাট্যকার এবং গীতকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গীতকার অতুলপ্রসাদ সেন এবং সুরেশ সমাজপতি।

চিত্তরঞ্জন প্রায়ই উহাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাড়ী যাইতেন এবং যেহেতু ক্লাবের নাম 'খামখেয়ালী' তাই পোশাকেও উহার অর্থ বহন করিবার জন্য বিচিত্র পোশাকেই সেখানে যাইতেন।

চিত্তরঞ্জনের বন্ধু জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মেট্রোপলিটান কলেজে পড়িতেন আর চিত্তরঞ্জন পড়িতেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। উভয়ের মধ্যে প্রায়ই দেখা হইত এবং আলাপ-আলোচনা হইত। তিনি বলিয়াছেন, "চিত্তের সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং সাহিত্য সম্বন্ধেই কথাবার্তা বলিতে খুব ভালবাসিত।"

চিত্তরঞ্জন যখন বি. এ পাশ করিয়া বিলাত যান তখন এই জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ই এম. এ পাশ করিয়া একই জাহাজে বিলাত গিয়াছিলেন। তাঁহারা সাহিত্য আলোচনা করিয়াই অনেক সময় কাটাইতেন। আলোচনা করিতেন শেলী, কিট্‌স্ এবং ব্রাউনিং। রবীন্দ্রনাথের কবিতাও তাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিণত বয়সে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতি তেমন আকৃষ্ট ছিলেন না। উহার কারণ চিত্তরঞ্জনের খাঁটি বাঙালীয়ানা। সাহিত্য ও কবিতায়ও বাঙালীর মন-প্রাণ, বাংলার জল-বায়ু বাঙলার আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হইয়া থাকিবে ইহাই চিত্তরঞ্জনের কাম্য ছিল। সেই দিক হইতে তিনি রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করিয়াছেন। কখনও কখনও তিনি খোলাখুলি ভাবেই রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ইউরোপীয় সাহিত্য ও দর্শন কথা মুখস্ত করিয়া সেই গুলিকে রসান দিয়া বাংলায় বলিলেই বাঙালীর জীবন হঠাৎ বিচিত্র হইয়া ওঠে না। পাশ্চাত্যের এই ভাব মোহ, এই বিশ্বমোহই যাহা আমাদের সমস্ত স্নায়ুকে নাড়ীচক্রকে ব্যাধি পীড়িত মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত করিয়াছে তাহা হইতে আমাদের উদ্ধার হইতেই হবে।"

সাহিত্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা পরিত্যাগ করিয়া চিত্তরঞ্জন বঙ্কিমচন্দ্রকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্কিম সাহিত্য ছিল তাঁহার জীবনে উৎসাহ দাতা। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব, ভাষা সর্বোপরি তাঁহার মাতৃমূর্তি তাঁহার সারা জীবনকে নূতন উৎসাহ আর উদ্দীপনায় অনুপ্রাণীত করিয়াছে সন্দেহ নাই। আবার গিরীশচন্দ্রের নাটকও তাঁহার অত্যন্ত ভাল লাগিত। তিনি নাটক দেখিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার ভাগিনেয়ী সাহানা দেবী প্রভৃতি বাড়ীতে নাটক করিতেন, চিত্তরঞ্জন প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সে-নাটক দেখিতেন

এবং পুরস্কারও দিতেন। তাহা ছাড়া তিনি নিজেও যখন বিলাতে ছিলেন তখন ইংরাজী নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দুইটি অঙ্ক লেখা শেষ করিয়া উহা তখন তিনি ইংলণ্ডের তখনকার শ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্পী স্যার হেন্‌রী আরভিং-কে উহা পাঠ করিবার জন্য দিয়াছিলেন। নাট্য-সাহিত্য রসেরই ধারা বাহক। অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পড়িয়াই হেন্‌রী আরভিং অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি নাটকখানিকে সম্পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য চিত্তরঞ্জনকে অনুরোধ জানাইয়া উহার জন্য অনেক পারিশ্রমিক দিবেন বলিয়াও চিত্তরঞ্জকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের তখন দেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তনের সমস্ত ব্যবস্থা পাকাপাকি হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বিলাতে থাকিয়া নাটক খানিকে সম্পূর্ণ করিয়া দিবার মত সময় তাঁহার হাতে ছিল না। তবে স্যার আরভিংকে তিনি বলিয়াছিলেন, নাটকখানি সম্পূর্ণ করিয়া তিনি উহা তাহাকে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু দেশের বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিরা নানা প্রকার কাজের চাপে তিনি উহাতে আর হাত দিতে পারেন নাই অথবা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। নাটকখানি তাঁহার আর লেখা হয় নাই। তবে গিরীশচন্দ্রের নাটক তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। তাই বলা যায়, সাহিত্যে তিনি যে প্রেরণা ও রস সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা অধিকাংশই বঙ্কিমচন্দ্র এবং গিরীশচন্দ্র হইতে। তাঁহার আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র শুধু একজন ব্যক্তিই নয়,—যদিও তিনি প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষই ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র একটা যুগ। বঙ্কিম সাহিত্য একটা যুগের সাহিত্য এবং ইতিহাস দুই-ই। আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী বাঙালীর বৈশিষ্ট্য পরিপুর্ণ, ভারতের অন্য কোন প্রদেশের নাম গন্ধ ইহাতে নাই। ইহাতে comte এর positivism থাকিতে পারে Europe এর Nation Idea থাকিতে পারে। Middle age এর সন্ন্যাস থাকিতে পারে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা চিত্রণে অসঙ্গতি থাকিতে পারে, বিলাতী Romanticism থাকিতে পারে, আর্টের মাপকাঠিতে একটা উদ্দেশ্য লইয়া উপন্যাস রচনায় অপরিহার্য ক্রুটী থাকিতে পারে—পারে কি, হয়ত আছে। এমন বাঙালী আছে যে অনুশীলন করিলে প্রাদেশিক আদর্শে এমন কি ভারতীয় আদর্শেও কাহার নিকট মাথা নত না করিয়া দাঁড়াইতে পারে। আমি আবার বলি—বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীকে বাঙালী হইতে বলিয়াছেন—অন্য কিছু

হইতে বলেন নাই। আমি বঙ্কিম সাহিত্যকে একটা যুগ সাহিত্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি কিন্তু যুগ সাহিত্যের নানা দিক্ আছে। সেই নানা দিক্ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রূপে যুগ সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে এবং সেই পূর্ণাবয়ব দেহের ভিতর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে জীবন্ত ও প্রাণময় করে।

বঙ্কিম সাহিত্যের উপর Europe এর সাহিত্য দর্শন ও ধর্মের প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। তথাপি বঙ্কিম সাহিত্য আত্মস্থ, সমাহিত, তেজপূর্ণ অথচ প্রশান্ত ও গভীর। ইহা সমুদ্র বিশেষ, সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষতঃ ব্যক্তিগত মত ও সিদ্ধান্তে বঙ্কিম ও গিরীশচন্দ্রে যত পার্থক্য থাকুক, বঙ্কিম ও গিরীশ যুগের মধ্যে একটি সেতু নির্মাণ বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, কারণ প্রতিভার বরপুত্র এই দুই মহাকবিই য়ুরোপের সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াও সাহিত্যের দুইটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় একই সময় দণ্ডায়মান হইয়া সব্যসাচীর মত বাঙালীর যুগ-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, ইঁহারা উভয়েই স্রষ্টা ও কবি। বাংলার, এমন কি জগতের সাহিত্যের ইতিহাসেও ইহারা উভয়েই অত্যন্ত উঁচু স্তরের কবি। ইঁহারা সুবিধামত পাশ্চাত্যকে হুবহু নকল করেন নাই, যেমন ইঁহাদের পরবর্তী নাটক নভেল অন্যান্য ঔপন্যাসিক ও নাটক রচয়িতাগণ করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং মহাদুঃখের বিষয় যে তাহা করিয়াও তাঁহারা বাহবা পাইতেছেন।

বঙ্কিম সাহিত্য বাঙালীর জাতীয় জীবন গঠন করিয়াছে। যতই অপপ্রয়োগ হউক স্বদেশী যুগে বঙ্কিম-সাহিত্য বাংলায় তাহাই করিয়াছে—যাহা ফরাসী দেশে Voltaire, Rousseau সাহিত্য করিয়াছিল। এই দিক হইতে বঙ্কিম সাহিত্যের আলোচনা এখন আরম্ভ হয় নাই। আমার বিবেচনায় আর অধিক বিলম্ব না করিয়া তাহা আরম্ভ করা উচিত। আমি অনুরোধ করি যে, বাংলায় বঙ্কিম-সাহিত্যের সহিত ফ্রান্সের Voltaire ও Rousseau সাহিত্যের একটা তুলনামূলক সমালোচনা গ্রন্থ আপনাদের মধ্যে শীঘ্রই কেহ লিখিতে প্রবৃত্ত হউন; কেন না আমার মনে হয়, কোন কোন দিকে বঙ্কিম বাংলায় Voltaire-Rousseau."

সাহিত্য রসে রসিক ও সাহিত্য প্রতিভায় ভাস্বর না হইলে কেহ এমন কথা বলিতে পারেন না। সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জন তাই ঋষি বঙ্কিমের সাহিত্য

হইতে সারাজীবন উৎসাহ, উদ্দীপনা পাইয়াছেন। বঙ্কিমের সৃষ্টি কমলাকান্তের মূর্তি তিনি নিজের মনের মন্দিরে বসাইয়া অবিরত ধ্যান করিয়া চলিয়াছেন; বঙ্কিম-সাহিত্যের সন্তানের মত তিনি মাতৃমন্ত্রে-দীক্ষিত হইয়া জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

১৯৩১ সালের আষাঢ় মাসে কাঁঠালপাড়ায় একবার সাহিত্য সম্মিলন হয়। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবার জন্য চিত্তরঞ্জনকে অনুরোধ করা হয়। তখন তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ আন্দোলন পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছিল, চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত ব্যস্ত। তথাপি যখন কাঁঠালপাড়ার নাম শুনিলেন তখন তিনি সম্মত হইলেন।—কাঁঠালপাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ি, সে স্থান তো তাঁহার কাছে তীর্থভূমি!—

চিত্তরঞ্জন ঐ সম্মিলনীতে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং একটি অভিভাষণ পাঠ করেন। এখানেও তিনি মাতৃমূর্তির উদ্ধারের জন্য কমলাকান্তের কথাগুলি পাঠ করিলেন: "ওঠ মা, একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা। ওঠ, ওঠ মা বঙ্গ জননী!

মা উঠিলেন না, উঠিবেন না কি?

এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ মূর্তি তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। চল, চল। অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণ প্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"

চিত্তরঞ্জন যখন শেষের এই কথাগুলি উচ্চারণ করিতেছিলেন তখন তাঁহার চোখে জল আসিয়া গলা ধরিয়াছিল—যেন কমলাকান্তের কথা নহে, উহা তাঁহার নিজের আবেদনই নূতন করিয়া সমগ্র বঙ্গবাসীদের কাছে জানাইতেছেন। প্রকৃত পক্ষেও উহা তাঁহার অন্তরের কথা। চিত্তরঞ্জনকে যখন 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয় তখন কেহ কেহ বলিয়াছিলেন 'দেশবন্ধু' শব্দের অর্থ তো চণ্ডাল। শুনিয়া চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, পরাধীন আবার চণ্ডাল ছাড়া কি? তাহা ছাড়া তিনি অনেক বার বলিয়াছেন, বাঙালীকে হইতে হইবে খাঁটি বাঙালী, মানুষ যদি স্বাধীন না হয় তবে সে-জীবনের মূল্য কি? জীবন সম্বন্ধে এই অনুভূতিই তো চিত্তরঞ্জনের সাহিত্য!

"নারায়ণ" পত্রিকা চিত্তরঞ্জনের সাহিত্য সেবার প্রধান বাহক। তিনি যে সময় হইতে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত করেন তখন হইতে উহার জীবিতকাল পর্যন্ত "নারায়ণ যুগ" বলা যায়। তখনকার দিনে যাঁহারা প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবী ছিলেন এবং যাহাদের কাব্য প্রতিভায় বাংলার কাব্যজগৎ উদ্ভাসিত ছিল তাহাদের সকলের রচনা সম্ভারে নারায়ণের কলেবর যেমন শ্রীবৃদ্ধি পাইয়াছে তেমন অলঙ্কতও হইয়াছে। ইহার প্রথম সংখ্যাটি যখন প্রকাশিত হয় সেই সংখ্যায় যাহাদের রচনাবলী ছিল তাহাদের মধ্যে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিপিন পাল, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রায় বাহাদুর জলধর সেন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী, সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যদিও ইহাতে নিয়মিত লেখেন নাই তবুও তাঁহার বিখ্যাত "স্বামী" গল্পটি নারায়ণে প্রকাশিত হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জনের লেখা যে ইহাতে প্রকাশিত হইত ইহা বলিবার আর অপেক্ষা রাখে না। ১৯২১ সালে তিনি এই পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার নিজেই গ্রহণ করেন। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে আইন ব্যবসা এবং সাহিত্যসেবা এই দুই সাধনাই তাঁহার যুগপৎ চলিতে থাকে। আইন ব্যবসায় যখন তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, নূতন নূতন ব্রিফ্ দেখিয়া যখন তিনি আর সময় পাইতেন না, মনের মধ্যে বিভিন্ন ফৌজদারী আর দেওয়ানী মোকদ্দমায় মক্কেলগণকে জয়ী করাইবার জন্য সমস্ত পয়েন্ট সেই সময়ও আর একটি মনের সাধনায় সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি বলিয়াছেন সব্যসাচী, প্রকৃত পক্ষে সব্যসাচী ছিলেন তিনি নিজেও।

১৯২১ সালে পৌষ মাসে "নারায়ণ" পত্রিকায় তাঁহার "ডালিম" নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়। কি আঙ্গিকে, . . বিষয়-বস্তুতে গল্পটি অতি মনোরম হইয়াছিল এবং পাঠক বর্গ ইহার খুব প্রশংসা করিয়াছিল। ইহার পর ১৯২২ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা "নারায়ণ"-এ তাঁহার "প্রাণ প্রতিষ্ঠান" নামক আর একটি গল্প প্রকাশিত হয়। ভাষার দিক হইতে এবং গল্পটির বিষয়-বস্তুতে যে আদর্শ ছিল সেই দিক হইতেও গল্পটি যথেষ্ট প্রশংসা পাইয়াছিল। এ প্রশংসা শুধু পাঠক বর্গের নিকট হইতেই আসে নাই, বিখ্যাত ঔপন্যাসিকও ইহার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন বেলুড় উৎসবে গিয়াছিলেন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নারায়ণে প্রকাশিত "ডালিম"

গল্পটি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র চিত্তরঞ্জনের নিকট জানিতে চাহিয়াছিলেন, ডালিমের লেখক কে?

চিত্তরঞ্জন জানাইলেন, আমার।

শরৎচন্দ্র: আপনি তাহলে ছোটগল্পও লেখেন? হাসিয়া চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন, আমার দুঃসাহসের সীমা নাই।

কিন্তু চিত্তরঞ্জনের সাহিত্য সেবার প্রকাশ ভঙ্গী শুধু সাহিত্য পত্রিকার মারফত-ই নহে উহা প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার জীবনের বিভিন্ন ধারায়। আইনজীবী হইয়া তিনি সাহিত্য সম্মেলনীর সভাপতি হইয়াছেন। এই সব সাহিত্য সম্মেলনীতে অভিভাষণ দিবার জন্য বিভিন্ন জায়গা হইতে তাঁহার আমন্ত্রণ আসিয়াছে—এই আমন্ত্রণ তাঁহার সাহিত্য জীবনের স্বীকৃতি এবং সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহাকে উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করা ছাড়া আর কিছুই নহে। এ পর্যায়ে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য বিহার প্রদেশের পাটনা এবং বাংলাদেশের বগুড়ার সাহিত্য সম্মেলনীতে তাহার অভিভাষণ। সাহিত্যিক জীবনে বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস এবং রামপ্রসাদের কাব্য-সাগরে তিনি নিজে যে সুধা-পারাবারের সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহারই কিছু অমৃতধারা শ্রোতাদের কানের ভিতর দিয়া তাহাদের মর্মে পৌছাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য পিপাসু মনের আর একটি পরিচয় হইল, তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন সেইখানেই সাহিত্য চক্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাগলপুরে তিনি যাহাদের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনায় মগ্ন থাকিতেন তাহারা হইতেছেন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত। কলিকাতাতে তাঁহার সাহিত্য বাসর ছিল, তাহাতে যোগদান করিতেন প্রসিদ্ধ কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, গিরিজাশঙ্কর মজুমদার, সুধীন্দ্র ঠাকুর প্রভৃতি। ইহারা কবি, সাহিত্যিক, তাই চিত্তরঞ্জন ইহাদের সহিত দিনের পর দিন সাহিত্য-বাসর জাগাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন।

"নারায়ণ" পত্রিকার সম্পাদনার ব্যাপারে অনেকেই তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন। বাল্যের গৃহ শিক্ষক পূর্ণ হালদার মহাশয়কেও কিছু দিনের জন্য তিনি নারায়ণ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়াছিলেন। তিনি নিজেও ১৯২১ সালে পত্রিকাটির সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করিয়া উহার সম্পাদক হইয়া কাজ করেন। তাঁহাকে গিরিজা বাবু এবং প্রকাশ দত্ত মহাশয়

এ বিষয় অনেক সহায়তা করিয়াছেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন নিজেই নিজেকে সাহায্য করিয়াছেন বেশী।

অনেকে বলেন জীবনের সঙ্গে যাহা সত্য হইয়া চলে তাহাই সাহিত্য। চিত্তরঞ্জনও বলিয়াছেন (পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে) 'সমগ্র জীবনের অনুভূতিই সাহিত্য'। কথা দুইটির অর্থ প্রায় একই। জীবনের যাহা সত্য তাহাই তো মানুষ অনুভব করিয়া থাকে অথবা জীবন দিয়া যাহা মানুষ অনুভব করে সেইটাই তো সত্য। চিত্তরঞ্জনের সমগ্র জীবনের অনুভূতি কি? অথবা সমগ্র জীবনে কি তাঁহার নিকট সত্য হইয়া উঠিয়াছে? চিত্তরঞ্জন নিজেই বলিয়াছেন, "জীবনে যে সাধনা সে তো স্বপ্ন নয়। এই বিশ্ব যে অনুপম বিশ্বনাথের বিরাট শিল্প, এ মহাকাব্যে সকলেরই স্থান আছে, আলোও আছে, আঁধারও আছে। আদর্শ জগৎই এই প্রত্যক্ষ জগৎ। বেদান্তের মায়াবাদ ভুল। এ প্রাণ সত্য, এ শ্রবণ সত্য, এ চক্ষু সত্য, এ রূপ সত্য প্রতি অণুরেণু ধূলিকণা হইতে এই মহাবিশ্ব এক জাগ্রত প্রাণময় সত্য।"

প্রাণময় এই সত্য লইয়াই চিত্তরঞ্জনের সাহিত্য সাধনা। মাটির বুক চিরিয়া তৃণগুচ্ছ যেমন তাহার শ্যাম-সুন্দর কোমলতা বিস্তার করিয়া দেয় ঠিক তেমনি মহাবিশ্ব, দেশ এবং গ্রাম তাঁহার নিকট রূপ-রস-স্পর্শ-গন্ধ লইয়া অন্তর ভরিয়া প্রকাশিত। তিনিও তাহা সব তাঁহার সকল অন্তর দিয়াই গ্রহণ করিয়া সাহিত্যসেবী হইয়াছেন এবং যাহারা সাহিত্য সেবা করেন এমন সকলকেও সর্ব প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। এ-প্রসঙ্গে 'মানসী' পত্রিকার প্রাথমিক অবস্থার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কয়েকজন সাহিত্যসেবীর মিলিত চেষ্টায় মানসী প্রকাশিত হয়। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া উহার ব্যয়ভার বহন করিতেন। কিন্তু তাহাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না বলিয়া চিত্তরঞ্জন মানসীর প্রকাশার্থে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করিয়া সাহিত্যের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রতি মাসে তিনি ঐ কাগজটিকে ৫০ টাকা সাহায্য করিতেন, ইহা ছাড়া ঐ কাগজটির জন্য এক কালীন দুই হাজার টাকা তাঁহার নিকট হইতে লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ঋণের সেই দুই হাজার টাকা চিত্তরঞ্জনকে আর পরিশোধ করা হয় নাই। ঋণের টাকাকে চিত্তরঞ্জন সাহিত্যিক হিসাবে দানের টাকায় পরিণত করিলেন।

রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সম্পাদনায় মনোহরপুকুর রোড হইতে 'নির্মাল্য' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। চিত্তরঞ্জনের 'মালঞ্চ' ও 'মালা'-র অনেক কবিতা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'নারায়ণে' প্রকাশিত কবিতার জন্য তিনি কবিদের পারিশ্রমিক দিতেন আর তাঁহার কবিতা যে পত্রিকায় প্রকাশিত হইত সেখান হইতে তাঁহার পারিশ্রমিক পাওয়ার প্রশ্ন নহে, তিনি উহার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতেন।

মাসিক পত্রিকার কথা ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার এমন সাহায্যের তালিকায় দৈনিক সংবাদপত্রও বাদ পড়ে নাই। একখানি দৈনিকপত্র ছিল। উহার মালিক অর্থের অভাবে কাগজটির পরিচালনা ব্যাপারে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন। উপায়ান্তর না দেখিয়া সংবাদপত্রের মালিকটি চিত্তরঞ্জনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। চিত্তরঞ্জন তখন অন্য একজন ভদ্রলোকের নিকট হইতে বিশ হাজার টাকা ঋণ করিয়া কাজটির মালিককে দিবেন বলিয়া স্থির করেন। বলা বাহুল্য যে তিনি ঐ মোটা অঙ্কটির জন্য জামিনদার হইবেন। চিত্তরঞ্জন যাহাতে জামিনদার না হন সেই জন্য তাঁহার দুই একজন বন্ধু উপদেশ দিলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন যে তাহাকে টাকা দিবেনই অপরে তাহাকে নিষেধ করিয়া নিবৃত্ত করিতে পারিবে কেন? বন্ধুদিগকে বলিলেন, "টাকাটা পাবো না তা আমি বুঝতে পাচ্ছি তবু আমার দেবার ইচ্ছা হয়েছে আমি দেব।" সাহিত্যিক হিসাবেই তাঁহার এই অর্থব্যয়, তাঁহার এই অর্থব্যয়ের মধ্যে তাঁহার খাটি সাহিত্যিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

এমন আর্থিক সাহায্য তিনি কাজী নজরুল ইসলামকেও করিয়াছিলেন তাঁহার 'ধূমকেতু' পত্রিকা চালাইবার জন্য। এখানে 'ধূমকেতু'র একটু ইতিহাস উল্লেখ করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধিজী তখন হঠাৎ অসহযোগ আন্দোলন পরিত্যাগ করিলেন। সমগ্র দেশের বুক তখন নিস্তরঙ্গ, উত্তাপহীন। সেই উত্তাপহীন পরিবেশকে উত্তপ্ত করিবার জন্য নজরুল ১৯২২ সালের আগস্ট মাসে তাঁহার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ধূমকেতু' প্রকাশিত করেন। সাহিত্যের গগনে প্রথম সংখ্যা হইতেই 'ধূমকেতু' চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছিল অর্থাৎ যেমন নামে তেমন কার্যেও। এই ধূমকেতু আরও একটু কারণে উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদের জয়-তিলক কপালে আঁকিয়া ইহার প্রথম প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ নজরুলের ধূমকেতু-

কে সাদর আহ্বান জানাইয়া বলিয়াছিলেন :

আয় চলে আয়রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু।......
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্দ্ধচেতন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, চৌরঙ্গীর প্রকাশ্য দিবালোকে ডে সাহেবকে গোপীনাথ সাহা হত্যা করিয়াছিলেন। শোনা গিয়াছে যে, ঐ গোপীনাথকেই নজরুল বলিয়াছিলেন, "সমগ্র ইংরাজ-সমাজই আমাদের শত্রু। তাদের ভাসিয়ে দিতে হলে চাই প্রাণ বন্যা, তারই আবাদ করছি আমি 'ধূমকেতুর' পৃষ্ঠায়।"

নজরুলের 'ধূমকেতু' ধূমকেতুই। এই কাগজটির মাধ্যমে তৎকালীন সময়ে নজরুল সত্য সত্যই বাংলার যুবক-যুবতীগণকে দেশের মুক্তিযুদ্ধে বীর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য অগ্নিমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছিলেন। নজরুলের মতবাদ বা পথকে চিত্তরঞ্জন সমর্থন না করিলেও তাঁহার দেশপ্রেমের মূল্য চিত্তরঞ্জন দিয়াছেন। আবার পথের কথা ছাড়িয়া দিলেও লক্ষ্যবস্তু বা উদ্দেশ্য যে ভারতের মুক্তি, সেখানেও তো চিত্তরঞ্জনের সার্থক সহচর নজরুল। সুতরাং দেশপ্রেমের পবিত্রতম সাধনায়, দেশপ্রেমের শুচি-শুদ্ধ পূজায় নজরুলকে তাঁহার ধূমকেতু পরিচালনায় সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য চিত্তরঞ্জন তাঁহারই এক অনুগত সহকর্মী অধ্যাপক হেমন্ত সরকারের হাতে নজরুলকে দিবার জন্য কিছু টাকা দিয়াছিলেন। হেমন্ত বাবু যখন চিত্তরঞ্জনের দানের টাকা নজরুলের হাতে দেন তখন নজরুল বলিয়াছিলেন, "ফকিরের দান মাথায় করে নিলাম।"

এই দানের মধ্যে চিত্তরঞ্জনের দেশ-প্রেমের যেমন উজ্জ্বল স্বাক্ষর রহিয়াছে তেমন তাঁহার সাহিত্যিক মনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।—পাওয়া যায় তাহার কারণ সাহিত্য যাহারা সৃষ্টি করেন তাহারা সাহিত্যিক কিন্তু এক হাতে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া অন্য হাতে দেশের সাহিত্যিকগণকে সাহায্য করায় ও সাহিত্য সৃষ্টির ধারাকে দেশের বুকে অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিবার মধ্যে চিত্তরঞ্জনের প্রকৃত সাহিত্যিক মনের পূর্ণ প্রকাশ। সুতরাং সাহিত্য সাধনা

করিয়াও চিত্তরঞ্জন সাহিত্যিক এবং সাহিত্যিকগকে সাহায্য করিয়াও তিনি সাহিত্যের স্রষ্টা।

চিত্তরঞ্জনের কাব্যজীবন আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই যে কথাটি মনে হইতেছে তাহা এই: গীতার অমৃতময় বাণী শুনাইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত তাঁহার শ্রীচরণেই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিবার জন্ত উপদেশ দিয়াছেন। গীতার উত্তরে গীতাঞ্জলিতে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন:

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলির তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

· ভগবানের উপদেশে ভক্ত সাড়া দিয়েছেন। আবার এমন সাড়া দিয়াছেন পরম বৈষ্ণব এবং ভক্তকবি চিত্তরঞ্জনও। তখন চিত্তরঞ্জনের মাত্র পনের বৎসর বয়স। সেই সময়ই তিনি পরমশক্তির শ্রীচরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া বলিয়াছেন:

ভক্তিপুষ্প দিয়ে মাগো। গাঁথিয়াছি হৃদিহার
বড় সাধ দিব তুলে—ঐ চরণে তোমার।

বিলাতে ছাত্র অবস্থাতেই তাঁহার রচিত:

তুমি যে রেখেছ মোরে, তাইত রয়েছি বাঁচি
ডাকিবে যখন তুমি, তখন মুদিবে আঁখি!
জনমের সাধগুলি, তব হাতে দিনু তুলি
পুরালে পুরাবে তুমি—না পুরালে রবে পড়ি!
তোমারি আদেশ লয়ে, ভ্রমেছি এ দেশে ওহে
সম্পদে বিপদে তবে—আমার ভরসা তুমি!

চিত্তরঞ্জন তখনও ছাত্র। সংসারে প্রবেশ করেন নাই, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, সংসারের ঝড়-ঝঞ্ঝার আবর্তে পড়িয়া অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পূর্ণ করেন নাই তখনই তাঁহার অন্তর মথিত করিয়া এমন ঐকান্তিক প্রার্থনা চিত্তরঞ্জনের সমগ্র জীবনের পরিচয় ঘোষণা করিয়া দেয়। এই পটভূমিকাতেও চিত্তরঞ্জনকে বিচার করা যাইতে পারে।

কবি তাঁহার কবিত্বশক্তির উপর নির্ভর করিয়াই চলেন। সৃষ্টির সময়

ভাবেরও প্রয়োজন হয়। হাত থাকিলে এবং লিখিতে জানিলে লেখা যায় কিন্তু কাব্যশক্তি ও 'মুড্' না থাকিলে কাব্য সৃষ্টি করা যায় না। যিনি কবি নহেন তিনি জ্যোৎস্না বিধৌত রাত্রিতে চাঁদের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া যদি মাথা ব্যথা করিয়াও ফেলে তথাপি চাঁদকে চাঁদ ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারিবে না, ভাবিতে না পারার কারণ তাহার কবিত্ব শক্তি নাই; ফুল তাহার নিকট ফুলই,—কোন অলকাপুরীর বার্তা বহন করিয়া আনে না, কোন স্বপ্ন রাজ্যের মদিরাময় সংবাদও বহন করিয়া আনে না।

পটভূমিকার কথা ছাড়িয়া এইবার মূল আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। ইংরাজ কবিদের মধ্যে চিত্তরঞ্জনের প্রিয় ছিলেন P. B. Shelly. তাঁহার বিখ্যাত "To A Skylark" কবিতায় তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন, "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought" অর্থাৎ সেইগুলি আমাদের সুমধুর সঙ্গীত যাহাতে ব্যথার কথা ব্যক্ত হইয়াছে। এ-ব্যথা অনেক কারণেই সৃষ্টি হয়। জীবনের মদিরাময় পাত্র পরিপূর্ণ পান না করায় এ-ব্যথার সৃষ্টি হইতে পারে, যৌবনের অতৃপ্ত বাসনায় এ-ব্যথার সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয় ব্যর্থ প্রেমিকের বুক-ভাঙ্গা হা-হুতাশে। আবার সমাজ জীবনের নির্মম কশাঘাতে বা দুঃখ-দারিদ্র্যের হাতে প্রপীড়িত হইয়াও মানুষের বুকে ব্যথার পাহাড় সৃষ্টি হয়। কিন্তু চিত্তরঞ্জন যে সুন্দর কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা তবে কোন্ ব্যথা হইতে?

চিত্তরঞ্জনের কাব্য জীবনে এই 'saddest thought' এর প্রেরণা অথবা ব্যথার প্রেরণা যাহা ছিল তাহা আলেচেনার পূর্বে আর একটি বিষয়েও একটু আলোকসম্পাত করা দরকার। তিনি লিখিয়াছেন:

কেমনে উঠিবে ফুটি শুধু একদিনে?
আরে! আরে! ফুল যবে হেসে ফুটে ওঠে
শ্যাম পল্লবের বুকে, সুখ-সূর্য করে,
একটি প্রভাত লাগি, এক নিমেষের
মাঝে, সেকি শুধু সেই মুহূর্তের
লীলা? তার তরে করেনি কি আয়োজন
সমগ্র জীবন-লীলা যুগ যুগান্তের,
জন্ম জন্মান্তর ধরে? অনন্তকালের

শুভ সঙ্গীতের মাঝে ওঠে সে ফুটিয়া !
ফুটে না ফুটে না ফুল শুধু এক দিনে !

প্রভাতের সোনালী রোদে কানন ভরা প্রস্ফুটিত ফুল দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু পাপড়ি মেলিয়া প্রস্ফুটিত হইতে তাহার যে কত দিনের সাধনা লোক-লোচনের অন্তরালে চলিতে থাকে তাহা কাহার দৃষ্টিগোচর হয় না। চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন, উহা মুহূর্তের লীলা নহে, উহা যুগ-যুগান্তের সাধনা। তাহার ফুটনের মধ্যে অনেক আয়োজন, তাহার ডাঁটায় অনেক সাধনার চিহ্ন। চিত্তরঞ্জনের মধ্যে যে কাব্য প্রতিভা উহা ঈশ্বরের আশীর্বাদ উপরন্তু ঐ কাব্যের ধারা সাধনার ধারার মত তাঁহার পিতৃপুরুষ হইতেও প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে দেখা যায়। পিতা ভুবনমোহনের মধ্যেও কবিত্ব শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। কন্যা প্রমীলার দ্বিতীয় বাৎসরিক উপলক্ষে তিনি লিখিয়াছিলেন :···

তব দত্ত ধন কেড়ে নিলে স্বামী
আমার আমার বলে কেঁদে মরি আমি
ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝাও অন্তর্যামী
দিব্যতত্ত্বজ্ঞান দানে।

পুত্র বসন্তরঞ্জনের মৃত্যুতে ভুবনমোহন লিখিয়াছিলেন :

মাগো তোমারি রতন তোমারি সদন
যাইতে বারণ করিতে পারিনি
তুমি চাইলে পরে, তুমি ডাকিলে পরে
যাইতে বারণ করিতে পারিনি।

ইহা ছাড়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদ-এর উপরও তিনি লিখিয়াছিলেন :

তোমায় আমায় কি সম্বন্ধ
জানতে চায়রে মন।
তুমি আমি একই হই
অদ্বৈত বচন।
পিতা-পুত্র ধন জন,
পত্নী ভাই ভগ্নিগণ
কেহ নহে স্বজন,
সব মায়ার গঠন।

১৮৯৩ সালে চিত্তরঞ্জন ব্যারিস্টার হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেই সময়ই তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। ভুবনমোহন ঋণের দায়ে দেউলিয়া হইয়াছেন। পুত্র হিসাবে পিতার গলার ফাঁস তিনি তখন নিজের গলায় পড়িলেন। বিরাট পরিবারের সমগ্র ভার তখন একা চিত্তরঞ্জনের উপর। সেই পরিবারের চাকাকে পরিচালিত করিতে যে অর্থের প্রয়োজন তাহার তখন একান্ত অভাব। ব্যবসায়ে অর্থের সমাগম হয় না, হাইকোর্টে তিনি নূতন। কিন্তু সংসার তো চালাইতেই হইবে, দৈনিক আয় না হইলেও দৈনিক ব্যয় ছিলই। তখন ট্রামের ভাড়া বাঁচাইবার জন্য ইডেন গার্ডেনের পাশ দিয়া তিনি পায়ে হাঁটিয়া চলিতেন। ফেরার সময় দেখিতেন, পশ্চিম আকাশের কোলে সূর্য তখন অস্তাচলগামী। বিদায়ী সূর্যের আবীর রংয়ের প্রলেপে হাইকোর্টের উচ্চ চূড়া সোনার রংয়ে লিপ্ত। চিত্তরঞ্জন ঐ স্বর্ণবর্ণের চূড়ার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতেন আর ভাবিতেন নিজের দারিদ্র্যের কথা, ভাবিতেন ঐ স্বর্ণচূড়ার অন্তরালেই লুক্কায়িত রহিয়াছে তাঁহার ভাগ্যদেবী। ঐ ভাগ্যদেবী যদি স্বেচ্ছায় তাঁহার কণ্ঠে জয়ের মালা দুলাইয়া না দেন তবে জোর করিয়া উহা তাঁহার জয় করিতেই হইবে। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াই তাঁহার সেই জয়ের সাধনা—জীবনের জয়লাভ। চিত্ত-রঞ্জনের প্রিয় অনুচর নজরুল বলিয়াছিলেন, "হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান"।

এই দারিদ্র্যের নিপীড়ন আর কশাঘাতেই তাঁহার "Saddest thought" কাব্যের ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে।—কাব্য ধারা প্রবাহিত হইয়া যে অমূল্য ফসল ফলিয়া উঠিয়াছে উহা পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশিত হয় 'মালঞ্চ'। যৌবনে কবি চিত্তরঞ্জনের মনের বনে যে সমস্ত কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া উহার গন্ধে চা.দিক আমোদিত করিয়া তুলিয়াছিল সেই কবিতাগুলিই একসূত্রে গাঁথিয়া ১৮৯৬ সালে 'মালঞ্চ' প্রকাশিত হয়। ইহার পরেও সাহিত্য প্রেস হইতে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ১৯০৫ সালে পুনরায় 'মালঞ্চ' প্রকাশিত করেন। এই মালঞ্চের যে যে পথে কবি চিত্তরঞ্জন বিচরণ করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবের পথ। বাস্তবের কশাঘাতে তাঁহার মনের গভীরে যখন যে ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে তখনই তিনি তাহা ধরিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার জীবন আরম্ভ সংসারের বাস্তব অনটনের মধ্য দিয়াই।

এই অভাব-অনটনের সময়ই হঠাৎ বসন্ত দিনের দক্ষিণা সমীরণের মত তাঁহার স্মৃতির পটে এই সময় জাগিয়া ওঠে শৈশবের সুখের দিনগুলির চিত্র :

শৈশবে আছিনু শুভ্র শিশিরের মত ;
কখন দেখিনি দেব ! ঘোর কৃষ্ণ ছায়া
সৌন্দর্যে তোমার।

শৈশবের দিনে তিনি অর্থের অভাব কখনই বোধ করেন নাই। তাঁহার সেদিনগুলি ছিল হাসিভরা, আলোভরা। কিন্তু যখন ব্যারিস্টার হইয়া সংসারে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার সংসার দেউলিয়া, শৈশবের আর ছাত্র জীবনের সুখের স্বপ্নগুলি বাস্তবের কশাঘাতে শূন্যে মিলাইয়া গেল। হাসির ঝলকে মুখখানি আর উদ্ভাসিত নহে, চোখের সম্মুখের আলো আলেয়ার মত কোন্ দূরে সরিয়া গিয়া রাশি রাশি ঘন অন্ধকার ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছে। তাঁহার আশার আলো তখন নিরাশার অন্ধকারের অতলে নিমজ্জিত। তখন চলিতে গিয়া যে নিষ্ঠুর বাস্তবের সম্মুখীন হইয়াছেন তাহারই ছবি আঁকিযাছেন :

সম্মুখে পশ্চাতে মোর জীবন ব্যাপিয়া,
ঘনায়ে আসিছে ধীরে অন্ধ—অন্ধকার !
নিষ্প্রভ নয়ন হ'তে যেতেছে হারায়ে
জীবনের লক্ষ্যগুলি ; ভাঙ্গিয়া পড়িছে
প্রাণের আবাস !

চিত্তরঞ্জনের ইহা আন্তরিক আক্ষেপ। জীবনের লক্ষ্যে না পৌছাইতে পারিলে, জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না করিতে পারিলে মানুষ তাহার মানসিক ধৈর্য হারাইয়া ফেলে। কবি যখন তাঁহার স্থিরতা হারাইয়া ফেলিলেন তখন তিনি অস্থির ; তিনি তখন বিদ্রোহী। পারিবারিক জীবনে পিতার কাছে নালিশ জানাইবার জায়গা ; মানুষ-জীবনের নালিশ জানাইবার জায়গাও তেমনি এই বিশ্বসংসারের যিনি অধীশ্বর তাহার কাছেই। চিত্তরঞ্জন তাহার কাছেই বিনীত প্রার্থনা করিলেন :

ওহে দেব ! তুমি কর অভয় প্রদান,
আমার হৃদয়-পুষ্প সাদরে চুম্বিয়া
সুরঞ্জিত কর প্রভু ! স্বর্ণ-করে তব।

সংসারের পথে চলিতে গিয়া ভীত কবি ঈশ্বরের নিকট অভয়-বর চাহি-

তেছেন। তাঁহার হৃদয়-কুসুমকে তাহার স্বর্ণ-করে ধারণ করিয়া সাদর চুম্বনে সুরঞ্জিত করিয়া তুলুক ইহাই তাঁহার প্রার্থনা। প্রার্থনা করিয়াছেন:

বল দেব ! পারিব কি লয়ে যেতে শেষে
সাঁতারিয়া, স্বপ্নভরা নবীন হৃদয়
নন্দনের পথে ?

সংসারের বিপর্যয়ের মাঝেও কবির নবীন হৃদয় ভরিয়া যে আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে সেই স্বপ্নভরা নবীন হৃদয় কি কৃতকার্য হইয়া নন্দনের পথে পৌছিতে পারিবে না ? কবি তাঁহার জীবন দেবতার নিকট জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসাই করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু এমন আকুল অন্তরের করুণ আকুতির প্রতি-উত্তরে জীবন দেবতা নীরব। এই নীরবতার ব্যথায় কবি অভিমানের সুরে কাঁদিয়া উঠিয়াছেন:

তুমি সুখের সম্রাট !
স্বর্গের রাজন্ ! তোমার নন্দন মাঝে
সে ক্রন্দন পশিবে কেমনে ? বুঝিয়াছি
আজ, তুমি শুধু কনককিরণ-ব্যপ্ত
চির সুখ চির গর্ব আনন্দ উজ্জ্বল !
ছায়াহীন মায়াহীন রুদ্র রৌদ্র সম
করুণা বিহীন তুমি অনন্ত নিষ্ঠুর।

সুখে, দুঃখে যে সাথী সেই তো সখা, জীবনের সেই সাথীই তো জীবন-দেবতা। কবি-চিত্তে যে করুণ কান্না জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার মাঝেও তিনি যে নাস্তিক নহেন, ঈশ্বরে যে তাঁহার বিশ্বাস আছে সে প্রমাণই নিহিত। তুমি সুখের সম্রাট, চিরসুখী হইয়া কখনও ব্যথিতের বেদনা বুঝিতে পারিতেছ না, আর্তের কান্নার করুণ ধ্বনি তোমার কানে পৌছিতেছে না। সুতরাং তুমি নির্দয়, তুমি নিষ্ঠুর। কবি তাই বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার তূণে যে তীর ছিল উহাই সেই অদৃশ্য অধীশ্বরের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিলেন:

তবে সেই ভাল ; জীবনের
ভেঙ্গেছে আবাস, যদি ভেসেছে বিশ্বাস,—
তুমি থাকিও না আর জীবন জুড়িয়া
অতীতের ভীতি-ভরা প্রেতের মতন !

এখানে কবি তাঁহার মনের মন্দির-দ্বার খুলিয়া রাখিতে চাহিয়াছেন। কারণ ভক্তের কান্না যাহার অন্তর স্পর্শ করে না, নন্দনের মাঝেই যাহার বিরাজ, যিনি শুধু সুখেরই সম্রাট,—অন্তরময় তাহারই জন্য আসন পাতিয়া রাখিয়া লাভ কি? জীবন জুড়িয়া তাহার সে-থাকার কি অর্থ? ব্যথার দিনে যে সান্ত্বনার প্রলেপ দেয় না, দয়াময়, প্রেমময় হইযাও যে দয়া দেখায় না, প্রেম দেয় না, জীবনে তাহার প্রয়োজন কি? সুতরাং তাহার চলিয়া যাওয়াই ভাল। মনের দুয়ার খোলা,—তুমি চলিযা যাও, কবি জীবন লইযা একাই থাকিবে। ক্ষোভে কবি বলিয়াছেন:

আকুল পরাণ লয়ে, ব্যাকুল নয়নে
তোমার চরণ তলে আসিব না আর।

তুমি আমার জীবন জুড়িয়া প্রেতের মত থাকিও না, আমিও আর তোমার চরণতলে আসিব না। চিত্তরঞ্জন এখানে বিদ্রোহী। বিদ্রোহী হইয়া, ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইয়া তিনি নূতন কথা বলিতে লাগিলেন:

ঊর্দ্ধমুখে পূজা কর দেবতা গড়িয়া,
প্রাণ পুষ্প অযতনে শুকাইয়া যাক্।
রক্তহীন রিক্ত হস্ত কঙ্কাল জীবন,
সব রক্ত করে পান ঈশ্বর তোমার।

কবি এখানে পরিপূর্ণ একখানি অবিশ্বাসের মন লইযা ঈশ্বরকে রক্ত শোষক হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং দয়াময় ঈশ্বর নাই। যদি কেহ থাকে সেই বিশ্বের রাজা, নামেই বিশ্বের রাজা কার্যতঃ বিশ্বের কাহারও অন্তরের ব্যথা বা চোখের জল তাহার অন্তর স্পর্শ করে না। এই বিশ্বাস বিশ্বাসী কবি তবুও আবার তাহার বিদ্রোহী মন লইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন:

শুনেছ কি বিশ্বরাজ বসি স্বর্ণ-সিংহাসনে
চিরানন্দ মাঝে?
অতি দূর ধরণীর কোন্ চোখে অশ্রুজল
কার ব্যথা বাজে?

চিত্তরঞ্জন এখানে তাঁহার একার কথাই বলেন নাই। বিশ্বের কোণে কোণে কত ব্যথায় কত মানুষের চোখে জল আসে বিশ্বরাজের কি উচিত নয় সে-চোখের জলের খোঁজ লওয়া। লাইন কয়েকটির মধ্যে চিত্তরঞ্জনের 'বিশ্ব-

প্রেমিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। নির্দয়, নিষ্ঠুর এই ঈশ্বরের প্রতি অভিযোগ জানাইয়া তিনি যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তিনি সেই দুঃখকেই বলিয়াছেন :

তোমারে চিনেছি দুঃখ! তুমি রাখ মোরে
আবরিয়া কি অপূর্ব প্রেয়সীর মত
সংসারের সর্ব সুখ হ'তে!

মালঞ্চের কবিতাগুলিতে কবির বৈচিত্র্য রহিয়াছে, সুন্দর ছন্দের পারিপাট্য রহিয়াছে, বাসনার চঞ্চলতা আছে কিন্তু তাহা সবই বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে। বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে বলিয়াই উহা কখনও উত্তেজনাময় এবং কখনও উদ্দীপনাপূর্ণ। কখনও ভাষার অন্তরালে রাষ্ট্রনীতির প্রকাশ, কখনও সকল মানুষের জন্য একক প্রতিনিধি হইয়া ঈশ্বরের নিকট অভিযোগ। সর্বোপরি মালঞ্চে কবি-চিত্তের যে ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা ঈশ্বরকে অস্বীকার। অনেক খোঁজা এবং হাজার জিজ্ঞাসার উত্তরেও ঈশ্বরের উত্তর না পাইয়া তিনি বিদ্রোহী কিন্তু নাস্তিক নহেন।

'মালঞ্চের পর ১৯০২ সালে চিত্তরঞ্জনের 'মালা' প্রকাশিত হয়।

'মালা' কাব্যগ্রন্থে দেবতাকে প্রিয় এবং প্রিয়কে দেবতা করিবার সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেতু যেমন দুই দিকের দুই প্রান্তকে যুক্ত করিয়া যোগসূত্রে বাঁধিয়া একত্রিত করিয়া দেয় মালাও সেই কাজ করিয়াছে। ইহা পার্থিব প্রেম ও ঈশ্বরীয় প্রেমের বন্ধন সূত্র। ইহা যেমন মানুষের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে বলা যায় আবার যদি বলা যায় দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া রচিত হইয়াছে তাহাও ঠিক। মালঞ্চে কবি-চিত্তে যে চঞ্চলতা প্রকাশ পাইয়াছিল এখানে সেই চিত্ত স্থির। যে-চিত্ত সংসারের বাস্তব কশাঘাতে ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করিয়াছে, জীবনের পথ অন্ধকারময় দেখিয়াছে সে-চিত্ত যেন কোন্ এক নূতন আলোর পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই আলোর পথই সত্যের পথ মনে করিয়া কবি একদিন যে ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করিয়াছিলেন,—ঈশ্বর নাই বলিয়া মনে করিয়াছিলেন সেই মনকে দূরীভূত করিয়া ঈশ্বরের পানে একমুখী করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন। মালায় কবি বলিয়াছেন :

অন্ধকার ঘেরা এই সন্ধ্যার মাঝারে
কেন গো জ্বালিলে দীপ, খুলিলে দুয়ার—

কেন গো এমন ক'রে ডাকিছ আমারে
সমস্ত পরাণ ভ'রে—পরাণ মাঝারে !

প্রশ্ন জাগে, সন্ধ্যার আঁধারে কে দুয়ার খুলিল, কে প্রদীপ জ্বালিল ? সে যেই হউক, চিত্তরঞ্জনের কবি-চিত্ত তাহাকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন :

তোমারে খুঁজেছি আমি আলোক আঁধারে
সারাটি জীবন ধরি , মরণ মাঝারে—
সকল স্থখের মাঝে সর্ব সাধনায় !

প্রেমিক প্রেমিকাকে সারাজীবন খোঁজে! ভক্ত খোঁজে ভগবানকে। খোঁজার ফল এক বারেই পাওয়া যায় না। প্রার্থিত বস্তু লাভের পূর্বে, প্রার্থিত বস্তু যে লাভ হইবে তাহা অনেক সময় অনুমান করা যায়। বাস্তবে প্রিয়া না আসিলেও প্রেমিক তাহার স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। ভক্ত তাহার সারা মনের শুদ্ধভাব লইয়া যাহাকে আরাধনা করেন নিশিথের ঘুমঘোরে তাহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া থাকে। চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন :

প্রিয়া আসে নাই
পাঠায়ে দিয়াছে শুধু প্রিয়ার স্বপন !

আবার বলিয়াছেন :

কোন শব্দ নাহি হায় ! প্রিয়া আসে নাই—
প্রিয়ার কুন্তল-স্বপ্ন এসেছে রজনী !

রজনী তখন আর কবির নিকট শুধু ঘন আঁধারে সমাচ্ছন্ন নহে,—উহা প্রিয়ার কুন্তল স্বপ্ন। তাই তাঁহার চোখে স্বপ্নের আলোক। বলিয়াছেন :

চন্দ্রালোকে আলোকিত সকল ভুবন,
স্বপ্নালোকে আলোকিত আমার এ মন !—
অর্ধ নিমীলিত নেত্রে মনে হোল মোর
স্বর্গ হতে নেমে এলে !

কবির তখন কি অবস্থা ? সে তখন :

অবাক অন্তর তোমা করিল বরণ ,—
ভাল ক'রে দেখে নাই করেনি জিজ্ঞাসা
প্রেমাতুরা প্রাণ, দিয়া সর্ব ভালবাসা,
সেই দিন, সর্ব কাজে চিত্ত আনমনা,
করেছে করেছে শুধু তোমারি অর্চনা !

কবি তখন তাঁহার সারা মন নিয়া তাহারই অর্চনায় ব্যস্ত। অর্চনার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, প্রাণের উপচার সাজাইয়া ধরিয়াছেন। এমন আয়োজনের পরও নিজেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন :

কী গীত রয়েছে বাকী ;—কি নব বাজনা ?
উচ্চারিত হয় নাই কি প্রেম-মন্তর,
কোন পূজা লাগি তব আকুল অন্তর ?

কবি জানিতে চাহিয়াছেন, সে-অর্চনায় হৃদয়-মন্দিরে আর কি নব বাজনা বাজাইতে বাকী আছে, আর কি মন্ত্র অনুচ্চারিত রহিয়াছে ? তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিযাছেন :

আরো যে চাহিছ তুমি ! কি দিব গো আনি,
চাও যদি লযে যাও শূন্য প্রাণখানি।
তবে কি মিটিবে 'াশ, চাহিবে না আর ?

পূজা করিতে বসিয়া সাধক-কবি অথবা কবি-সাধক অন্তরের যাহা কিছু ভক্তি-অর্ঘ্য, শ্রদ্ধা-প্রীতি সবই উজাড় করিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনদেবতাকে বলিয়াছি৻.ন :

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম ?
দুঃখ সুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষাসম।

চিত্তরঞ্জনও বলিয়াছেন, তুমি যে ৼ৲ ? চাহিতেছ আমি আর কি দিব ;—আমার আর কি আছে ? পূজক হইয়া, সাধক হইয়া আমি তো সবই দিয়াছি ; প্রেমিক হইয়া অন্তর উজাড় করিয়া প্রেম নিবেদন করিয়াছি সুতরাং দেওয়ার মতো আমার তো আর কিছুই নাই ! আছে শুধু আমার শূন্য অন্তরখানি। তাহা যদি দেই তবে কি তোমার আশা মিটিবে ? কবি তখন আবার প্রার্থনা জানাইলেন :

নিও পাপ নিও পুণ্য—
হৃদয় করিও শূন্য

ভরি দিও শূন্য প্রাণ তব পূর্ণতায়।
মহান করিয়া দিও তব মহিমায়।

চিত্তরঞ্জন তাঁহার শূন্যপ্রাণ পূর্ণতায় ভরিয়া দিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন। শূন্যস্থানে কিছুই থাকে না, শূন্য প্রাণেও কিছু থাকে না—থাকে না মালিন্য, থাকে না পাপ। সেই অন্তরই তো দেবতার বেদীমূল হওয়ার পবিত্র স্থান, সেই অন্তরই তো জীবন-দেবতার চরণ রাখার যোগ্য আসন। কবি-চিত্ত তাই ব্যাকুল হইয়া আকুল প্রাণে যাহাকে অনুভব করিয়াছেন,—মন-মন্দিরের বাতায়ন খুলিয়া, আসন পাতিয়া তাহারই বোধনের জন্য মন্ত্র পাঠ করিয়াছেন :

খুলিয়া হৃদয় দ্বার আমি বিছাইব
যত না সৌন্দর্য আছে, যত না স্বপন,
সর্ব কোমলতা মোর আমি পেতে দিব
তুমি ক'র ওগো ক'র আমার জীবন
তোমার চরণভূমি।

'মালা' কাব্য গ্রন্থের পর চিত্তরঞ্জনের 'সাগর সঙ্গীত' ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়। 'সাগর সঙ্গীত' তিনি ১৯১০ সালে রচনা করিয়াছিলেন। 'সাগর সঙ্গীতে' দুই অন্তরের মিলন। দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল নীল জলরাশি, অনন্ত বিস্তৃত নীল আকাশের সঙ্গে মিলিত হইয়া যে উচ্ছল নৃত্য সঙ্গীত রচনা করিয়াছে কবি-চিত্ত সেই নৃত্য আর সঙ্গীতকে কাব্যের ছন্দে বাঁধিয়া 'সাগর সঙ্গীত' রচনা করিয়াছেন। এই সঙ্গীত গাহিয়া গাহিয়া 'মালায়' তাঁহার যে ঈশ্বর সম্বন্ধে অনুভূতি হইয়াছে সেই অনুভূত ঈশ্বরের সন্ধানে অতলে ডুব দিয়াছেন।

পদ্মাপারের মানুষ চিত্তরঞ্জন। বিস্তৃত পদ্মার সীমাহীন শোভারাশি তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। দিগন্ত বিস্তৃত মহাসাগরের নীলাম্বুরাশি তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে আরও। জাহাজে বিলাত যাইবার পথে তিনি দিনের আলোতে নীল জলের তরঙ্গমালা দেখিয়াছেন, একটি তরঙ্গ আর একটি তরঙ্গের উপর আসিয়া, হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহাও দেখিয়াছেন।—দেখিয়াছেন দূরে, আরও দূরে, তাহার চাইতেও দূরে এক নীলের বুকে নীল মহাকাশ আসিয়া মিলিত হইয়া এক বিরাট শিল্পীর শিল্প নৈপুণ্যে অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি

করিয়াছে। কবি সেই সুদূরের পানে চোখ মেলিয়া সে-সৌন্দর্য দেখিয়াছেন আর ভাবিয়াছেন এই অপূর্ব সৌন্দর্যের স্রষ্টা সেই বিশ্বস্রষ্টা আরও কত সুন্দর; কত তাঁহার লীলা,—কত তাঁহার মহিমা! মনময় এই বিশ্বস্রষ্টার অনুভূতি লইয়া তাহার কথাই ভাবিয়া চলিয়াছেন, চোখে দেখিয়াছেন, দুই নীলের মহামিলন আর কানে শুনিয়াছেন সেই মিলনানন্দের মহাসঙ্গীত! আবার রাতের সৌন্দর্যও তাঁহার চোখে নূতন রূপে, নূতন লাবণ্যে ধরা পড়িয়াছে। রাতের অন্ধকারেও, বিস্তৃত স্থানে যেমন অন্ধকারের রাজত্ব না হইয়া জ্যোৎস্নার ছোঁয়া থাকে, সেই আধ অন্ধকার আধ জ্যোৎস্নায় সমুদ্রের বুকে এক অবর্ণনীয় রূপের সৃষ্টি করে, ঢেউ ওঠে পড়ে যেন সমুদ্রের বুকের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস,—উপরে নীল আকাশে কোটি কোটি অগণিত তারার ঝিকিমিকি, মিটিমিটি হাসি! কবি এ-সব সৌন্দর্য সুধা পান করিয়াছেন। চঞ্চল সমুদ্র বুক, যৌবন চাঞ্চল্যে চঞ্চল কবি। গভীর রাতে বিশ্বচরাচর যখন নিদ্রায় মগ্ন তখনও ঘুম নাই শুধু এই দুই চঞ্চলের আঁখি তারায়। নিরালা নির্জনে কবি তাঁহার কান পাতিয়া সাগরের বুকের সঙ্গীত লহরী একমনে শুনিয়া চলিয়াছেন, উত্তর দিয়াছেন চুপি চুপি,—সে কথা কত সুন্দর! কত রাগ, কত রাগিণী, কতই না মনোহারী ভাষা! তরঙ্গে তরঙ্গে নূতন গান গীত হইয়া চলিয়াছে, কবি সে-গানের ভাবে ভাবিত হইয়া, নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়া ঐ অসীমের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া একাত্ম হইয়া গিয়াছেন। মহাসাগরের ঐ মহাসঙ্গীত তাঁহাকে সোনার স্বপ্ন মাখাইয়া দিয়াছে, সকল অঙ্গে জাগাইয়া দিয়াছে নূতন শিহরণ। অনন্তকাল ধরিয়া এই সুমধুর সঙ্গীতের অঞ্জলি কাহার পায়ে ডালি দিবার জন্য সে নিরবধি বহিয়া চলিয়াছে সে-কথা ভাবিয়াও কবির জীবনে এক অপূর্ব ভাবান্তর ঘটে গেল। তাঁহার নিজের মনে যেন ফুটিয়া উঠিল নূতন নেত্র, যেন পাইলেন নূতন কান, সারা দেহের অণুতে অণুতে জাগিয়া উঠিল অপূর্ব রোমাঞ্চনা! কবি তখন সত্তা হারা, সাগরের সঙ্গে একাত্ম। অসীমের সঙ্গে সসীমের এই মহামিলনে কবির মনের সব সুখ-কণা কুসুম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; সব দুঃখ রূপান্তরিত হইয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে এক সুমধুর গীতধারায়,—সে গীতধারা ছুটিয়াছে সাগর যাহার উদ্দেশ্যে ছুটিয়াছে তাহার উদ্দেশ্যেই।

অসীমের সঙ্গে সসীমের এই হৃদয় জানাজানি, মন দেওয়া-নেওয়ার কথাই

'সাগর সঙ্গীত।' একদিন যাহা ছিল সসীম, সাগর যাত্রীর অন্তর গুহার নিজস্ব অনুভূতি তাহাই পরবর্তী সময়ে অসীমের সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করিবার জন্য প্রকাশ্য দিবালোকে প্রকাশিত করিয়া দিলেন।

সাগরের সঙ্গীত শুনিয়া কবির চিত্ত আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। তিনি কান পাতিয়া তাহা শুনিয়া বলিয়াছেন: সাড়া পাই তারি আম সঙ্গীতে ;তোমার।

সাগরের সঙ্গীত শুনিয়া কবির চিত্ত আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। তিনি কান পাতিয়া তাহা শুনিয়া জানিতে চাহিয়াছেন, "হে গায়ক অনন্তের? কোথা গীত বাজে?"

আবার বলিয়াছেন, "সাড়া পাই তারি আমি সঙ্গীতে তোমার।"

কোথায় মহান গায়কের সঙ্গীত বাজে কবি তাহা জানিতে চাহিয়া সঙ্গীতের মাঝেই সাড়া পান তাহাও বলিয়াছেন। বাঁশী শোনা যায় কিন্তু সেই বংশীওয়ালাকে দেখা যায় না,– ইহা এক অসহনীয় অবস্থা। প্রথমবার বিলাত যাত্রার সময় সাগর তাঁহাকে লইয়া খেলা করিয়াছে। বার বৎসর পর দ্বিতীয়বার যখন বিলাত যান তখনও তাঁহার মন লইয়া সাগরের সেই একই খেলা। কবি বলিলেন:

আমার জীবন লয়ে কি খেলা খেলিলে!
আমার মনের আঁখি কেমনে খুলিলে!
আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন
তোমার সঙ্গীতে তারে ফুটালে কেমন।

লাইন কয়েকটির মধ্যে কবি-মনের অনুভূতির প্রকাশ পাইয়াছে। অসীমের সঙ্গীত তাহার মনের আঁখি খুলিয়া দিয়াছে, যে প্রাণ ছিল কুঁড়ির মত তাহাকে প্রস্ফুটিত করিয়াছে। ইহা তো তাহার খেলাই। কিন্তু এত খেলা কেন? কবি-মন তখন খেলা ছাড়িয়া, খেলা যে খেলায় সেই খেলুড়েকেই আকুল প্রাণে চাহিতেছেন। কবি জানিতে চাহিয়াছেন:

কবে পাব পরিচয় হে বন্ধু আমার!
কখন জাগিবে তুমি?

পরক্ষণেই বলিয়াছেন:

এখনো জাগেনি কেহ, আমি জাগিয়াছি

নীরবে নিভৃতে হবে দেখা দুজনায়,—

জীবন দেবতার সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় কবি-মন উন্মুখ। এত উন্মুখ হওয়ার কারণ কবে, কোথায় যেন কবি তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তখন তাহাকে হাতে স্পর্শ করিয়াছেন কি-না বা কোন কথা বলিয়াছিলেন কি-না তাহা তাঁহার মনে নাই। তিনি বলিয়াছেন:

কবে দেখেছিনু তোমা,—হাতে ধরেছিনু,
চেয়েছিনু চোখে? কোন্ কালে কোন্ দেশে
সে দিন কি তব সাথে কথা কয়েছিনু—
তুমি গেয়েছিলে গান?

যদিও সে-সব কিছু তাঁহার মনে নাই কিন্তু তাঁহাকে যে দেখিয়াছিলেন সে-কথা তাহার স্মৃতি পটে জাগিয়া রহিয়াছে:

ওগো সব মনে নাই। শুধু মনে হয়
তোমারে দেখেছি বঁধু কবে কোন্ দেশে।—

কবি মনে করেন তাঁহার মনের এ অসহনীয় ভাবের ব্যথা লইয়া, তাঁহার মনের এই তৃষ্ণা লইয়াই মহাসাগর যেন অনিবার ব্যথায় কাঁদিয়া চলিয়াছে। সে-কান্না কবির কান্নার মতই জন্ম জন্মান্তরের, যুগ-যুগান্তের:

কাঁদিতেছে একি ক্ষুধা এ কি তৃষ্ণা অনিবার!
একি ব্যথা গরজিছে শ্রান্তিহীন দুর্নিবার?
কত জন্ম জন্মান্তর
কত যুগ যুগান্তর

তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানীয় পান করিয়া তাহার তৃষ্ণা নিবারণ করে। কবি তৃষ্ণার্ত হইয়াছেন পরমার্থের জন্য। চাতক যেমন বর্ষার বারি-ধারা ভিন্ন অন্য পানীয় গ্রহণ করে না কবির পক্ষেও তাহার জীবন-দেবতার দর্শন না পাইলে তৃষ্ণা মিটিতে পারে না। তাই তিনি মহাসাগরের নিকট তাহার স্রোতের সঙ্গে তাঁহাকে ভাসাইয়া ও-পারে লইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছেন। ও-পারে পৌছিতে পারিলে হয়তো তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সঙ্গে মিলন হইতে পারে; তাঁহার কাঙাল প্রাণ রাজার ধনে ধনী হইতে পারে:

আমারে ডুবায়ে দাও, ওগো মহাপ্রাণ।
আমারে ভাসায়ে লও, তোমার ওপারে,

তবে কি মিলিবে মোর আশার স্বপন ?
কাঙাল পরাণ হবে রাজার মতন ?

সাগরের নিকট এই প্রার্থনা জানাইয়া কবি সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন। কারণ আত্মসমর্পণ করাই আশীর্বাদ পাওয়ার সহজ এবং পবিত্রতম উপায়। কবি সেই সহজ পথই ধরিলেন:

আমি যে হ'য়েছি তব হাতেব বিষাণ।
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী। বাজাও আমারে
দিবস রজনী ভরি আলোকে আঁধারে,
বাজাও নির্জন তীরে, বিজন আকাশে।
সকল তিমির ঘেরা আকুল বাতাসে,
মাযালোকে, ছাযালোকে, তরুণ উষায়—
বাজাও বাসনাহীন, উদাসী সন্ধ্যায়।
ওগো যন্ত্রী।

বৈষ্ণব সাহিত্যেব উৎস রাধা-কৃষ্ণের প্রেম। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা, পাগলিনী শ্রীবাধিকা শ্যামের হাতে বাঁশরী হইবার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করিযাছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিযাছেন:

"আমাকে কর তোমার বীণা
লহ গো তুলে লহ"

ইংরাজ কবি P. B. shelly তাঁহার বিখ্যাত কবিতা, "Ode to the west wind"-এ লিখিয়াছেন,—"Make me thy Lyre". পরম বৈষ্ণব চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন, "আমি যে হ'য়েছি তব হাতের বিষাণ।" আমাকে তুমি যেমন খুশী বাজাও।

অরূপ রতনের আশায় রূপ সাগরে ডুব দেওয়ার পর চিত্তরঞ্জনের 'অন্তর্যামী' ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়। মন্দিরের পূজারী ফুল-চন্দন, আম্র পল্লব আর বিল্বপত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দেবতাকে পূজা-আরতি করিবার জন্য যেমন মনকে প্রস্তুত করিয়া নিজের মনেই আনন্দে আন্দোলিত হইতে থাকে অন্তর্যামীতে চিত্তরঞ্জনকে সেই পবিত্ররূপে দেখা যায়। এখানে কবি আর তাঁহার জীবন-দেবতা লক্ষ লোকের মাঝেও যেন একা একা।

পদ্মার গৈরিক জল দেখিয়া শৈশব আর কৈশোরের দিনে কবির মনের

পরাতে যে গৈরিক রংয়ের ছোঁয়া লাগিয়া ছিল অন্তর্যামীতে পরিণত বয়সের পরিণত মনেও সেই রংয়ের দাগই গভীর হইয়া পড়িয়াছে দেখা যায়। মালঞ্চের বুক ভরিয়া যে পবিত্র কুসুম একদিন হাসিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই ফুলরাশিকে মনের মাধুরী মিশাইয়া, রংয়ের পর রং সাজাইয়া, কবি বাতাস পাগল-করা এক অপূর্ব গন্ধবহ মালা রচনা করিয়াছেন। সেই মালা তো আর কারোর জন্যই নহে,—উহা তাঁহার দেবতার জন্য। মনে তাঁহার আশা, হয়তো তাহার দেখা পাইবেন, দেখা পাইবেন যেখানে নীল আকাশ, নীল মহাসাগরের বুকে মিশিয়া এক মহামিলনের বাসর সৃষ্টি করিয়াছে; যেখানে দিগ্বলয়ে পড়িয়াছে অরুণ-লেখা। গঙ্গাজল পান করিয়া অঙ্গ শুচি করিবার মত, উহা বুকে করিয়াই জীবন-দেবতার উদ্দেশ্যে সাগরে ডুব দিলেন। যিনি সীমাহীন, যিনি অতল তাই তো সীমাহীন, পারাপারহীন আর এক অতলে তাহাকেই খুঁজিয়াছেন। সেই মালাই কবি তাঁহার জীবন-দেবতাকে 'অন্তর্যামী'তে নিবেদন করিয়া উল্লসিত।

বৈষ্ণবের পরিধানে থাকে গৈরিক রংয়ের বস্ত্র। চিত্তরঞ্জন পরম বৈষ্ণব ছিলেন কিন্তু তিনি গৈরিকবস্ত্র পরিধান করেন নাই। প্রয়োজনও ছিল না কারণ তাঁহার মনই ছিল প্রেমের রংয়ে রঙীন।—তাই কাপড় রাঙাইবার প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহার অন্তর দুয়ার ছিল খোলা। বৈষ্ণবের প্রধান ধর্মই আত্মনিবেদন। সাংসারিক ভোগ-বিলাসের চাইতেও আরাধ্যের উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদন করিয়া, নিশ্চিন্তে নির্ভর করিয়া পরম শান্তি পাওয়াই তাহার চরম কাম্য। কবি তাঁহার ভক্তি শ্রদ্ধা আর প্রেম-ভালবাসা লইয়াই সেই আশায় অন্তর্যামীতে প্রকাশিত। তাহার সান্নিধ্য লাভ করিবার আশায় ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইলেন; পথকে করিলেন মত আর মতকে করিলেন পথ। কিন্তু সেই পথ তো কাছের পথ নয়; সুদূরের পথ। সে-পথ কাঁটায় কণ্টকিত। তবুও ভয় পাইলে চলিবে না। পথে বাহির হইয়া, মাঝ পথে না থাকিয়া পথের শেষে পৌঁছাইতেই হইবে। নজরুল বলিয়াছেন:

আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন
খুঁজি তারে আমি আপনার,
আমি শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি
আমারি তিয়াষী বাসনায়॥

কবি চিত্তরঞ্জনও তাঁহার সমস্ত অর্থ বিলাইয়া পরমার্থ লাভের 'তিয়াষী বাসনায়,' পথের কাঁটার ক্ষতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া আকাঙ্ক্ষিতের সান্নিধ্য লাভ করিলেন।

এই পরমার্থ লাভের পথ শুধু কণ্টকিতই নহে, উহা অন্ধকারময়ও। অন্ধকারে মন পথ খুঁজিয়া মরে। তখনই অন্তর্যামী কোথা হইতে দীপ জ্বালাইয়া পথ আলোকিত করিয়া তোলে, পথিক আবার সেই আলোকময় পথে, চোখে দৃষ্টি লইয়া পথ চলিতে শুরু করিয়া দেয়:

যখনি চলিতে নারি, অন্ধকার আসে,
পথ খুঁজে মরে প্রাণ, তারি চারি পাশে!
কোথা হ'তে জ্বলে দীপ, সম্মুখে তাহার?
নয়নে দরশ আসে, চলে সে আবার!

ভক্ত যখন পথের মাঝে অন্ধকারে নিমজ্জিত, ভগবান তখন আলো জ্বালাইয়া পথকে আলোকিত করিয়া দেন। তাহা হইলে ভগবান তাহার পাশেই থাকেন তাহা না হইলে প্রয়োজনের চরম মুহূর্তেই আলো জ্বালাইয়া দিতে পারেন কি করিয়া? কবিও অনুভব করিলেন, তাঁহার জীবন দেবতা তো তাঁহার পাশেই। তাই পথ আলোকিত হইয়া চোখে আলো পড়িলেও আর এক ব্যথায় কবির সেই চোখে জল ভরিয়া আসে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন:

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না।

চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন:

কেমন ক'রে লুকিয়ে থাক এত কাছে মোর।
বুকের মাঝে কেমন করে! চোখে বহে লোর!

কবি অনুভব করেন কিন্তু দর্শন পান না,—কবি যে দর্শন ভিখারী—তাঁহার প্রার্থনা 'দরশন দাও ভগবান' এ ব্যথাতেই বুকের মাঝে কেমন করে; কথাটি বড় করুণ, অসহায়ের উক্তি। কেমন যে করে তাহা তিনি মুখে বলিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন না। সেই না-বলিতে পারা 'কেমন-করা' কিন্তু হৃদয় মথিত করিয়া, বুক ফাটাইয়া চোখের পাতায় ভর করিয়া নীরব ভাষায় বাহির হইয়া পড়ে।

কাঁদিব না মুখে বলি, আঁখি নাহি মানে,
পরাণে কেমন করে, পরাণি তা' জানে !
রাগ করিও না বঁধূ ! আঁখি যদি ঝরে,
তুমি জান সেই অশ্রু তোমারই তরে !

কিন্তু এই অশ্রু-বন্যার মাঝেও কবির মনে আবার আর এক সান্ত্বনা আছে,—তিনি দর্শন পাইতেছেন না বটে কিন্তু বুঝিয়াছেন, জানিয়াছেন এবং অনুভব করিয়াছেন যে 'তিনি আছেন'। এক দিকে দর্শন আকাঙ্ক্ষায় অশ্রু-সিক্ত লোচন অন্য দিকে অনুভূতির আনন্দে উদ্বেলিত কবি বলিয়াছেন :

আছ তুমি আছ তুমি !
সকল পরাণ মোর তোমার চরণ ভূমি
ভাবনা ছাড়িনু তবে ; এই দাঁড়াইনু আমি !
যে পথে লইতে চাও ল'য়ে যাও অন্তর্যামী !

ভক্তের পরম প্রার্থনা "তোমাকেই চাই," "দেহি পদপল্লব মুদারম"। এ প্রার্থনা সৃষ্টির প্রথম প্রভাত হইতে মানুষ যুগে যুগে, জন্মে জন্মে জানাইয়া আসিয়াছে। পরম বৈষ্ণব চিত্ত-কবিও বুকের বীণায় এই প্রার্থনা মন্ত্রের ঝঙ্কার লইয়াই যাত্রা করিলেন :

শুভলগ্নে আজ তবে, যাত্রা করিলাম !
মনো-পথের পথিক হয়ে, পথে ভাসিলাম।

কিন্তু পথ কোথায় ?—না হয় পথেই বাহির হইয়াছেন কিন্তু কোন্ পথ ধরিয়া চলিবেন ? কবি তাই বলিতেছেন :

এদিকে ওদিকে চাই পাগলের মত
কোথা পথ ? কোথা পথ ? খুঁজিছি সতত।

কোন্ পথে কবি যাইবেন ? সব দিকেই পথ। সে-পথ আবার কণ্টক-ময় ; সাধনার পথ যে সহজ নয়। বলিয়া উঠিলেন :

পথের মাঝে এত কাঁটা ! আগে নাহি জানি !
কাঁটাবনের ভিতর দিয়া গেছে পথখানি !
কাঁটায় কাঁটায় ফালাফালা,
কাঁটার ডাল কাঁটার পালা,
কাঁটার জ্বালা বুকে করে, গেছে পথখানি !

কণ্টকময় পথ। পথে কাঁটার গাছ, কাঁটার ডাল,—দুই বাহু বাড়াইয়া পথচারীকে কণ্টকিত করিয়া তোলে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে,—যাহাকে যাইতেই হইবে পথের কাঁটা তাহাকে বাধা দিয়া আটকাইয়া রাখিতে পারিবে কেন? কলঙ্ক নিন্দার ভয় কি শ্রীরাধা করিয়াছিল? বৃন্দাবনের বনে বনে বনমালীর যখন-তখন বাঁশীর সুরে কুলবধূ রাধিকা কি ঘরে থাকিতে পারিয়াছিল? পারে নাই। টান এমনই। বাঁশীর সুরের মোহিনী শক্তি শ্রীরাধিকাকে আকৃষ্ট করিতই, করিত ঘরছাড়া। কবিও ঘরছাড়া, পথের পথিক। তিনিও বাঁশী শুনিয়া পথের পথিক,—তাঁহাকেই বা আটকাইয়া রাখে কে? মন যে তাঁহার ছুটিয়া চলিয়াছে সেই পথের দিকে। নজরুল বলিয়াছেন:

কোন্ সুদূরের চেনা বাঁশীর ডাক শুনেছিস ওরে চখা?
ওরে আমার পলাতকা!
তোর মনে পড়ল কোন্ হারা ঘর,
স্বপন-পারের কোন্ অলকা?
ওরে আমার পলাতকা!

বাঁশীর সুরে যে স্বপন-পারের অলকার কথা মনে করাইয়া দেয় কবি-চিত্ত তো সেইখানেই পৌছাইতে চাহিয়াছেন,—শুভলগ্নে যাত্রা করিয়া পথে বাহির হইয়াছেন,—পথে বাহির হইয়া শেষ পর্যন্ত পথ চেনার ভারও নিজের উপর না রাখিয়া যাহাকে চাহিতেছেন তাহার উপরই ছাড়িয়া দিয়া বলিয়াছেন, যে পথে লইয়া যাইবে তিনি সে-পথেই যাইবেন।—এখানে পথই কবির প্রধান, নয়, প্রধান "তোমারেই চাই"—যে-পথে ইচ্ছা সে-পথেই তুমি আমাকে টানিয়া লও আমার তাহাতে অনিচ্ছা নাই কিন্তু একমাত্র ইচ্ছা, তোমাকেই চাই।" কবি বলিয়াছেন:

যে পথেই ল'য়ে যাও, যে পথেই যাই;
মনে রেখ আমি শুধু, তোমারেই চাই!
প্রথম প্রভাতে সেই বাহিরিনু যবে,
তোমার মোহন ওই বাঁশরীর রবে,
সেদিন হইতে বঁধু!

একমুখী মন কবির। শুধু এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক সাধনা,—চোখের

সম্মুখে শুধু সেই ব্রজধাম যেখানে অন্তর্যামী বিরাজমান, কানে সেই নীপবনের নীপশাখায় যে বাঁশী বাজে সেই বাঁশীর সুর।

কবির মন তাহাতে উতলা। নিজেকে সব শূন্য করিয়া আত্মনিবেদন করিয়া পরম ভরসায় বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি যেন এই ভব-অর্ণবে কেহই নহেন, যেন হাল হারান নৌকা। বলিয়াছেন :

হাল হারান তরীর মতন ভাসছি অবিরত !
আমি আর কি করতে পারি,
আমি যে গো চলতে নারি,
সুর হারান গানের মত ভাসছি অবিরত !

হাল হারান নৌকা কাণ্ডারী চাহে। কবি চিত্তের তৃষ্ণা এই ভব-অর্ণবের মহা কাণ্ডারীর জন্য। সুর খোঁজে ছন্দকে। কবি চিত্তের হারান সুরের ছন্দ তাহার অন্তর্যামী—তাহারই জন্য তাঁহার অন্তরে আসন পাতিয়া তাঁহার আঁধার বুক আলো করিতে, তাঁহার দুঃখের মাঝে দুঃখ হরণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন।

কবি আর তাঁহার অন্তর্যামী যেন তখন কত কাছাকাছি। অন্তর্যামী তাহার পানেই চাহিয়া রহিয়াছেন। তাহারই চোখের ছায়ায় কবির প্রাণ ছাইয়া রহিয়াছে,—ইহাতে কবি-মন আনন্দে উদ্ভাসিত। উদ্ভাসিত প্রাণের অভিব্যক্তি :

প্রাণের এত কাছাকাছি আছ তুমি চেয়ে !
তোমার ঐ চোখের ছায়া আছে প্রাণ ছেয়ে !

পথ চলা শেষ করিয়া কবি তাঁহার জীবন দেবতার কাছাকাছি আসিয়া পৌছিয়াছেন, এত কাছে যে তাহার চোখের চাওয়ার ছায়া পড়ে তাঁহার অন্তর মুকুরে! কবি তাই তখন সেই অবিনাশী মৃত্যুঞ্জয়কে তাহার অন্তর মন্দিরে অভয়-বাঁশী বাজাইতে আহ্বান জানাইয়াছেন। প্রকাশ করিয়াছেন, পরমপ্রাপ্তিতে মানুষের যে মনোভাব ফুটিয়া ওঠে সেই ভাব। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর···

রবীন্দ্রনাথের কথা,—তোমারে জানিলে 'ডর' নাই। চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন ;

তাঁহার ভয় ত্রাস ঘুচিয়া গিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন :

এস আমার মৃত্যুঞ্জয়! এস অবিনাশি!
বুকের মাঝে বাজিয়ে দাও অভয় তোমার বাঁশী!
ভয় ত্রাস ঘুচে গেছে, চিরদিনের তরে!
নাইক' আর আঁধার কোন, আমার আঁখির 'পরে!
প্রাণের মাঝে আঁকে বাঁকে বিভীষিকা যত
পালিয়ে গেছে তারা সব চিরদিনের মত!
থাক আমার প্রাণের প্রাণে, থাক অনুক্ষণ!
মনের মাঝে সাড়া দিও ডাকিব যখন!

কবির সঙ্গে কবির আরাধ্য জীবন-দেবতার এই মিলন অপূর্ব। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এই লীলা, এই খেলা আজকের নয়—এই যুগেরই নয়, এই নাটক বিশ্বপ্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া অভিনীত হইয়া আসিয়াছে। এই অভিনয়ে কখনও বিচ্ছেদের সুর ধ্বনিত হইয়া ওঠে, আবার কখনও উহা মিলনের রসোল্লাসে মুখরিত। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'মিলনের পাত্রটি বিচ্ছেদের বেদনায় পরিপুর্ণ।' চিত্তরঞ্জনও বলিয়াছেন :

তোমারেই পাই ওগো, বারে বারে বারে
তরঙ্গের মত মোর মরম-বেলায়,
মিলনে বিরহে কত! আর তারি সনে
যেন বেজে ওঠে অনাদি কালের বীণা।

অন্তর্যামীর পর চিত্তরঞ্জনের কিশোর-কিশোরী ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়। ইহা প্রথম তাঁহার নিজেরই সম্পাদিত 'নারায়ণ' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরে কাব্য-গ্রন্থের আকারে আত্মপ্রকাশ করে।

কিশোর-কিশোরীতে চিত্তরঞ্জনের কাব্য বীণায় এক নূতন সুরের ঝঙ্কার শোনা যায়। জন্ম তাঁহার ব্রাহ্মপরিবারে কিন্তু সারা মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের তীর্থক্ষেত্র বৃন্দাবন। সেই মহাতীর্থ বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধিকার লীলা-খেলার রহস্য তিনি অনুভব করিয়াছেন। কিশোর-কিশোরীকে আর একদিকে বলা যায়, চির পুরাতনকে নূতনরূপে, নূতন রসে সিক্ত করিয়া চিত্তরঞ্জন সেই রস কাব্য-পিপাসুদের পরিবেশন করিয়াছেন। কাব্য-বীণায় এই নূতন সুর বাজাইয়াই তিনি তাঁহার তৃষিত বস্তু লাভের পর নূতন পথে

যাত্রা করিয়াছেন।—আবার নূতন পথে যাত্রা করিবার সময় মানুষের মনে সেই অজানা পথ সম্বন্ধে যেমন একটু শঙ্কার ভাব জাগিয়া ওঠে তেমন পরিচয়ও পাওয়া যায়। আর একটি কারণে কিশোর-কিশোরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহা হইতেছে,—এ কাব্যের কবিতায় প্রেমের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে কিন্তু সে-প্রেম মানবীয় প্রেমে ধূলি-মলিন নহে, উহাতে অনন্তকালের প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের পবিত্রতা রহিয়াছে, দেহগত প্রেমের স্থান সেখানে নাই।

চিত্তরঞ্জন সারাজীবনেই তাঁহার প্রেম ও ভালোবাসার পরিচয় দিয়াছেন। কখনও উহা মানবপ্রেম আবার কখনও অন্য পথ ধরিয়া ঊর্দ্ধমুখী। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীর প্রভাব এই সময় তাঁহার জীবনে প্রতিফলিত হয়। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তিনি অতীন্দ্রিয়কে খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তাঁহার ধারণা ইন্দ্রিয়ের যে লালসা তাহার মধ্য দিয়াও ভগবানকে অনুভব করা যায় এবং এই অনুভূতি যাহার হয় না, তাহাকে ভাগ্যহীন বলা যায়। কারণ এই ইন্দ্রিয়ের খেলাও ভগবানেরই ডাক। এই মতবাদে বিশ্বাসী প্রেমিক, সাধক চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণব পদ-কর্তা চণ্ডীদাসকেই তাঁহার মনের মন্দিরে বসাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার মতে চণ্ডীদাসই হইতেছেন বাংলা-মায়ের খাঁটি কবি-সন্তান; তাঁহার কবিতায় বাংলার মাটির গন্ধ, বাংলার কাননের ফুলের সৌরভ, বাংলার প্রকৃতির রূপ সব অকৃত্রিমভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিশোর-কিশোরীতে তাই চণ্ডীদাসের পরিপূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এইখানে তাঁহার প্রেম ঊর্দ্ধমুখী।

কিশোর-কিশোরী চিত্তরঞ্জনের একখানি গীতিকাব্য। গীতিকাব্য সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন: "বাংলার জল, বাংলার মাটির মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য যুগে যুগে আপনাকে নব নবরূপে, নব নব ভাবে প্রকাশিত করিয়াছে। শত সহস্র পরিবর্তন, আবর্তন ও বিবর্তনের সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, যুদ্ধে বিপ্লবে, ধর্মে, কর্মে, অজ্ঞানে, অধর্মে, স্বাধীনতায়, পরাধীনতায়, সেই সত্য আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে, এখনও করিতেছে। সে যে বাংলার প্রাণ, বাংলার মাটি, বাংলার জল সেই প্রাণেরই বহিরাবরণ। বাংলার ঢেউ খেলান শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মধুগন্ধ বহ মুকুলিত আম্রকানন, মন্দিরে মন্দিরে ধূপ-ধূনা জ্বালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মত কুটির প্রাঙ্গণ, বাংলার

নদ-নদী, খাল-বিল, বাংলার মাঠ, বাংলার ঘাট, তালগাছ ঘেরা বাংলার পুষ্করিণী, পূজার ফুল ভরা গৃহস্থের ফুলবাগান, বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস, বাংলার তুলসীপত্র, বাংলার গঙ্গাজল, বাংলার নবদ্বীপ, বাংলার সেই সাগর তরঙ্গে চরণ-বিধৌত জগন্নাথের শ্রীমন্দির, বাংলার সাগর-সঙ্গম, ত্রিবেণী সঙ্গম, বাংলার কাশী, বাংলার মথুরা-বৃন্দাবন, বাঙালীর জীবন, আচার-ব্যবহার, বাংলার সমগ্র ইতিহাসের ধারা যে, সেই চিরন্তন সত্য সেই অখণ্ড অনন্ত প্রাণেরই পবিত্র বিগ্রহ। এই সবই যে সেই প্রাণ ধারায় ফুটিয়া ভাসিতেছে, দুলিতেছে।

সেই প্রাণ-তরঙ্গে একদিন অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিল, এক অপূর্ব অসংখ্যদল পদ্মের মত বাংলার গীতিকাব্য। কিন্তু ফুল তো একদিনে ফুটে না। তাহার ফুটনের জন্য যে অতীতের অনেক আয়োজন আবশ্যক। তাহার প্রত্যেক দলের মধ্যে যে অনেক গান, অনেক কথা, অনেক কাহিনী। তাহার গন্ধের মধ্যে যে অনেক কালের অনেক স্মৃতি, অনেক মধু জড়াইয়া থাকে। তাহার ডাঁটায় যে জন্ম-জন্মান্তরের চিহ্ন লুকান থাকে। ফুল যে অনন্তকাল ধরিয়া ফুটিতে ফুটিতে ফুটিয়া ওঠে।"

আয়ান ঘোষের স্ত্রী, পরকুলবধূ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া অভিসারে বাহির হইয়াছিলেন। সে-প্রেম ঈশ্বরীয়, সে অভিসার পরমার্থের জন্য আলোর পথে তীর্থযাত্রা, অভিসার নয়। তাই তো শ্রীরাধিকা আরাধ্যা,—কলঙ্কিনী নহে। জীবনের ভোগ লালসাও যদি ঈশ্বর প্রেমে রূপান্তরিত না হইয়া শুধু মানবীয় প্রেমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তবেই তাহা পঙ্কিল। মানবীয় এই প্রেমই ঈশ্বর প্রেমে রূপান্তরিত করা বৈষ্ণব ধর্ম। কিশোর-কিশোরীতে এই বৈষ্ণব প্রেম এবং বৈষ্ণব সাহিত্যই পরিস্ফুট। এখানে কবি তাঁহার নিপুণ কলমে মনের মাধুরী মিশাইয়া যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা ঈশ্বরীয় প্রেমের আলোয় আলোকিত, মানবীয় প্রেমের পঙ্কিলতায় মলিন নহে। ইহা পবিত্র।

ফুলকে কে না ভালোবাসে? ইহার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া, সৌরভে আবিষ্ট হইয়া কেহ কেহ ইহাকে বৃন্তচ্যুত করিয়া কর-স্পর্শে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দেয়—এ ভালোবাসায় কোমলতা নাই, পবিত্রতা নাই। আবার কেহ কেহ শাখায় শাখায় শোভিত ফুলরাশিকে একটু দূরে থাকিয়া, আদর করিয়া প্রকৃত

শিল্পীর মত সৌন্দর্য লিপ্সা চরিতার্থ করিয়া থাকে—ইহা পবিত্র ভাব। ফুল আর তাহার মাঝে পার্থক্য থাকিলেও ফুলের প্রতি তাহার ভালোবাসা কম নহে—উহা ঈশ্বরীয়, পবিত্র। চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন :

কাছে কাছে নাই বা এলে—তফাত থেকে বাসব ভাল ;
দুটি প্রাণের আঁধার মাঝে প্রাণে প্রাণে পিদিম জাল।
এপার থেকে গাইব গান—ওপার থেকে শুনবে বলে ;
মাঝের যত গণ্ডগোল ডুবিয়ে দেব গানের রোলে !

কবি সারাজীবন যাহাকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া খুঁজিয়াছেন তাঁহাকে বলিয়াছেন, তুমি কাছে কাছে না আসিলেও তোমাকে আমি দূর হইতেই ভালোবাসিব।—তাহা হইলে যাহাকে খুঁজিয়াছেন তাহাকে পাইয়াছেন—আর না পাইলে এমন কথা বলিতেছেন কাহার কাছে? ইহার আরও প্রমাণ দিবার জন্য কবি জানাইয়াছেন,—এমন একদিন ছিল যখন তিনি শুধু ভালোই বাসিয়াছেন কিন্তু কাহাকে ভালোবাসিতেন তাহা জানিতেন না।—কবির তখন সে দিন নাই। যাহার জন্য তাঁহার অন্তর মথিত করিয়া ভালোবাসা জাগিয়াছিল তিনি তাহাকে জানিয়াছেন,—এ জানা আগে জানেন নাই :

সেদিন নাহি গো আর যবে ভালবাসিতাম
শুধু মোর হৃদয়ের ভালবাসারে !
ভালবাসি, ভালবাসি, মনে মনে কহিতাম !
কারে ভালবাসি আমি নিজে নাহি জানিতাম !

'নিজে নাহি জানিতাম' কথাটির মধ্যেই আগে জানিতেন না, তখন জানিয়াছেন এই অর্থ নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু কোথায় তাঁহার সঙ্গে কবির দেখা ?

সেই সে প্রথম দেখা, সাঁঝের আঁধারে !
ধূসর গগন তলে
নব-শ্যাম দুর্বাদলে,
ক্লান্ত দেহে ছুটে গে'নু তোমা দেখিবারে !
সেই সে প্রথমবার দেখিনু তোমারে !

সারাজীবন খুঁজিয়া খুঁজিয়া কবি ক্লান্ত। ক্লান্ত দেহেই ছুটিয়া গেলেন,—আর ছুটিয়া না গিয়াও তো উপায় নাই। কবির তখন পরিপূর্ণ রাধাভাব।

নদী ছুটিবেই সাগরের জন্য, কবির মনেও তেমন টান পড়িয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, কেন ছুটিয়া গিয়াছেন তাহা তিনি জানেন না কিন্তু যখনই তাহাকে দেখিলেন তখনই ছুটিলেন :

আমি কেন ছুটে এ'নু ? জানি না আপনি,
যখনই দেখিনু তোমা, আসিনু তখনি !

কবির মনময় তখন তাঁহার চিরসুন্দর। সারা দিন-রাত তাঁহার মনের কানে কি যে অমৃত ঢালিয়া কথা বলিয়া চলিয়াছেন :

সকল পরাণে মোর সারা দেহময়
এই যে দিবস নিশি কি যে কথা কয়,

কবির চির-সুন্দর কখনও গম্ভীর, কখন সহজ, কখনও কঠিন কখনও দয়ালু, তাহার সুন্দর তাহাকে কোন সময় কাঁদায় আবার কোন সময় হাসায় –একি খেলা! অন্তর-দেবতাকে লাভ করিয়াও কবির মন, কেন এই খেলা, তাহা ভাবিয়া আবার দুলিতেছে :

কভুবা গভীর কভু মধুর সরল,
কভুবা কঠিন কভু করুণা তরল।
নিমেষে নিমেষে মোরে হাসায় কাঁদায়
নিমেষে নিমেষে মোরে মরায় বাঁচায় !

তাহা হইলে সেই মোহন শ্যামদূর্বাদল, সত্য-রূপী সেই মূর্তি কি মিথ্যা ? কবিও কি মিথ্যা ?—সবই মিথ্যা ? এ-জগৎ সংসার কি তবে শুধু মায়ার ছলনা? কোন্ প্রবঞ্চক দৈত্য তবে এ-জগৎ সংসার রচনা করিয়াছেন? কবি বলিয়াছেন :

মিথ্যা সেই সত্য-রূপী মূরতি তোমার,
আমি মিথ্যা, তুমি মিথ্যা, সবই মিথ্যাকার !
জগৎ সংসার মিথ্যা মায়ার ছলনা !
বল কোন্ প্রবঞ্চক দৈত্যের রচনা ?

কিন্তু এ-জগৎ সংসার যে শুধু এক প্রবঞ্চক দৈত্যের রচনা তাহাই বা তিনি কেমন করিয়া বলেন ? তিনি যে তাঁহার অন্তর্যামীর, তাঁহার জীবন-দেবতার প্রস্ফুটিত হাসিমুখ দেখিয়াছেন ! জীবন-দেবতার সে-হাসি আর তাঁহার দেখা— ইহা কি মিথ্যা ? জীবন-দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া, তিল তিল করিয়া বাসনার

সোনা গলাইয়া তিনি যে স্বপ্ন রচনা করিয়াছিলেন তাহাও কি তবে মিথ্যা ?—তাহা তো হইতে পারে না। হইতে পারে না তাহার কারণ তাহারই মধু-নামে তাঁহার নিজের অন্তর কাঁপিয়া ওঠে, পরাণের কুঞ্জে কুঞ্জে, পুঞ্জে পুঞ্জে ফুল ফুটিয়া ওঠে। মনোবনের এ-ফুল তবে কাহার জন্য ?—কেনই বা ফোটে ? তিনি বলিয়াছেন :

কেন হাস ? মিথ্যা একি ? অলীক ঘটনা ?
আমি কি করেছি শুধু স্বপন রচনা ?
তবে কেন চিত্ত মাঝে আজো কেঁপে ওঠে ?
পরাণের কুঞ্জে কুঞ্জে কেন পুষ্প ফোটে ?

সন্দেহের দোলায় কবির মন দোদুল্যমান। সহসা এক চরম মুহূর্তের কথা তাঁহার স্মৃতির দুয়ার খুলিয়া মনে পড়িয়া যায়। সে যে বহু আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত, পবিত্র মুহূর্ত, শুভলগ্ন। সে-মুহূর্ত তো মিথ্যা নয় ? সেই দিন-শেষের সাঁঝের আঁধারে, ধূলায় ধূসর গগনতল,—সে-মুহূর্ত সত্য, সুন্দর ! দোদুল্যমান মনের গভীর হইতে সন্দেহের অণুকণাকে দূরে নিক্ষেপ করিতে, নিজেই সব মিথ্যাকে কাটাইয়া সত্যের প্রকাশ এবং প্রচার করিতে বলিয়া উঠিয়াছেন :

সেই যে মুহূর্ত মোর তুমি মূর্তি তার।
নহ মিথ্যা ! সত্য তুমি ! সত্য রূপাধার।

আত্মবিশ্বাসী কবি। তাঁহার বিশ্বাসের গভীরতা অসীম। তাহাতে ভর করিয়াই সেই পরম মুহূর্তকে তিনি মুহূর্ত বলিয়া মনে করিতে পারেন না। সে-মিলন অকারণেও নহে। যদিও সে-মিলন এক মুহূর্তের তবুও উহা মুহূর্তেই কি শেষ ? কবির এ-জিজ্ঞাসার উত্তর,—সে মিলনের আদিও নাই, অন্তও নাই। তিনি বলিয়াছেন :

সেই যে মিলিনু দোঁহে সন্ধ্যাকাশতলে
সে কি শুধু মুহূর্তের মিলন উৎসব ?
অকস্মাৎ অকারণ সামান্য ঘটনা ?
মুহূর্তে আরম্ভ আর মুহূর্তেই শেষ ?
সেই যে দরশ তব, আঁখি অনিমেষ,
সে যে মোর শুভ-দৃষ্টি জনমে জনমে
চিরপরিচিত ! সে যে অনন্তকালের !

রবীন্দ্রনাথ 'মরণ'কে বলিয়াছেন :

মিলন হবে তোমার সাথে
একটি শুভ দৃষ্টিপাতে
জীবন বধূ হবে তোমার নিত্য অনুগতা
মরণ! আমার মরণ তুমি কও আমারে কথা।

চিত্তরঞ্জন বলিযাছেন, জীবন-দেবতার সঙ্গে তাঁহার শুভ দৃষ্টি হইয়াছে। তিনি তাঁহার অন্তর্যামীর, জীবন-দেবতার অনুগত। তাঁহার এই আনুগত্য, তাঁহার এই পরিচয,—তিনি মনে মনে জানেন শুধু এক জন্মেরই নহে উহা জন্ম জন্মের!

মানুষের জীবনে, যুগে যুগে এই সত্যই মূর্তি ধরিয়া জাগিযা উঠিয়াছে। জীবন-দেবতার সঙ্গে এই পাওয়া-না-পাওযার খেলাতেই ভক্তের জীবন সার্থক হইয়া পূর্ণ হইয়া ওঠে। কবির চিত্ত এই খেলার জন্যই লালাযিত ছিল, এ খেলাতেই পরিপূর্ণ :

যুগে যুগে পাওয়া পাওয়া না-পাওয়া মিলন
যেন রে সার্থক হল! পুরিল জীবন!

'কিশোর-কিশোরী'র পর চিত্তরঞ্জনের আর কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। এই পাঁচখানি কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে পবিত্র একটি যোগসূত্র স্থাপিত আছে দেখা যায়—উহা বৈষ্ণব চিত্তরঞ্জনের আধ্যাত্মিক মনের। আকুল প্রার্থনায় নিরুত্তর ঈশ্বরের প্রতি প্রথম বিদ্রোহ, পরবর্তী সময়ে ঈশ্বরের অনুভূতি, অনুভূতির পরে ঈশ্বরের সন্ধানে সাগরের অতলে ডুব দিলেন, পরে অন্তরে অন্তর্যামীর সান্নিধ্যলাভ এবং তৎপরে উহারই মিলনানন্দে তিনি উল্লসিত।—ঠিক যেন এক পূজারীর পূজক-জীবন।

কাব্য-মন্ত্র উচ্চারিত এই পূজকের জীবন ছাড়াও কবি চিত্তরঞ্জনের কাব্য-জীবন যৌবনের মধুর রচনার মধ্যে সত্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির আঁচল ভরিয়া কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত হওয়ার মত যৌবনেও মানুষের মনোবনে প্রেমরূপে কুসুম ফুটিয়া ওঠে। যৌবনের প্রকাশই উদ্দাম প্রেমে, সে-প্রেম, নদী যেমন সাগরের সহিত মিলিত হইয়া একাত্ম হইয়া যায় তেমন প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হইয়া পরিতৃপ্ত। কিন্তু প্রেমিক যখন তাহার অন্তর ভরা প্রেম লইয়া প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হইতে না পারে তখনই সেই অতৃপ্ত প্রেম জীবনের পথে কণ্টক ছড়াইয়া দেয়। বিফল মনোরথ কবি

তাই প্রিয়ার প্রেমকে হৃদয়ের রক্তপান করে যে শাণিত কৃপাণ তাহার সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার "তোমার প্রেম" কবিতায় বলিয়াছেন :

তোমার ও প্রেম সখি ! শাণিত কৃপাণ !
দিবানিশি করিতেছে হৃদিরক্ত পান ।

সখির প্রেম শুধু শাণিত কৃপাণের মতই নহে উহা বিষধর ভুজঙ্গের মত তাঁহার জীবনকে জড়াইয়াও রহিয়াছে :

তোমার ও প্রেম সখি ! ভুজঙ্গের মত,
জীবন জড়ায়ে মোর আছে অবিরত !

কবি-চিত্ত তাঁহার সখির প্রেমকে আরও অনেকরূপে বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, উহা স্বপ্নের মত রাত্রির অন্ধকারে ফুলের গন্ধ আনিয়া দেয়, অনলের মত হৃদয়ের ফুল বাগান দগ্ধ করিয়া দেয়। আবার মৃদু-মধু আলোর মত জীবন জুড়ায়, কখনও প্রবাসীর মনময় দূরবাসী প্রিয়ার জন্য অনন্ত কল্পনা রূপে দেখা দেয়। এই প্রেমকে কবি আবার অদৃষ্টের সমপর্যায়ে আনিয়া উহাকে নিষ্ঠুরশক্তি, অনন্ত এবং মহান বলিয়াছেন। তাহাতেও বর্ণনা শেষ করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন, প্রেম জীবন-মন্দিরে প্রভুর আসনে বসিয়া কখনও হাসায় কখনও কাঁদায় তবুও মন ও রাজ চরণে লুটাইয়া পড়ে। কবি বলিয়াছেন :

তোমার ও প্রেম, সখি ! অদৃষ্ট সমান,
নিষ্ঠুর শকতি-পূর্ণ, অনন্ত, মহান !
হ'য়ে জীবনের প্রভু,
হাসায় কাঁদায় কভু ;
ও রাজ-চরণে তবু লুটায় পরাণ,
তোমার ও প্রেম মোর অদৃষ্ট সমান !

"ও রাজ-চরণে তবু লুটায় পরাণ" লাইনটি কাজী নজরুল ইস্‌লামের 'বিজয়িনী' কবিতায় 'হে মোর রাণি ! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে' লাইনটির কথা মনে করাইয়া দেয়।

চিত্তরঞ্জন নিজেও একস্থানে বলিয়াছেন :

রাণী হ'য়ে করিয়াছ রাজত্ব স্থাপন,—
আমারি হৃদয়ে তার পদ-পদ্মাসন !

কিন্তু রাণী হইয়া যে তাহার হৃদয়ে রাজত্ব বিস্তার করিয়াছে সেই রাণী কোথায়? কবি-চিত্তের পিপাসিত মনের আকাঙ্ক্ষিত আশা তাহার সেই হৃদয় রাণীর জন্যই; তাহারই জন্য তাহার অন্তরভরা করুণ ক্রন্দনের অশ্রুজল। তাহার সেই তৃষিত প্রাণে প্রিয়া দর্শনের বারিবর্ষণ চাহিয়া "তৃষ্ণা" কবিতায় বলিয়াছেন:

ওগো তুমি দেখা দাও বারেক আসিয়া,
ক্ষুধিত তৃষিত চিত্ত চির-অপেক্ষায়:

চির অপেক্ষায় তৃষিত হৃদয় আবার দূরে-থাকা, না-আসা প্রিয়াকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, তুমি কোথায়?—কাছে আসিয়া পৃথিবীর ম্লান বুকে নন্দন কাননের সৃষ্টি কর। পৃথিবীর ম্লান বুক তো তাহারই তৃষিত বুক—ঊষর মরুভূমি। ওমর খৈয়াম প্রিয়াকে পার্শ্বে বসাইয়া মরুর মাঝে স্বপ্ন স্বর্গ রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন, প্রিয়ার সান্নিধ্যলাভ করিয়া গহন কাননকে নন্দন-বনে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন:

মরুর মাঝে স্বপ্ন স্বরগ করব বিরচন
গহন কানন হবে লো সই নন্দনেরি বন'।

চিত্তরঞ্জনও তাঁহার "আকাঙ্ক্ষা" কবিতায় বলিলেন:

কোথা তুমি? কাছে এসো, করহ সৃজন
ধরণীর ম্লান বক্ষে নন্দন-কানন!

শুধু কাছে আসিয়া ম্লান বক্ষে নন্দন-কানন সৃষ্টি করিলেই কবি-চিত্ত তৃপ্ত হইবে এমন নহে। এত দিন যাহার স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তখন স্বপ্ন ছাড়িয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবকে কেন্দ্র করিয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছে। কবি তাঁহার সে-বাসনার কথা মনের দুয়ারে কবাট লাগাইয়া আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই—মনের বাতায়ন খুলিয়া পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করিয়াছেন:

আমার আকাঙ্ক্ষা তবু অসীম অধীর,
তোমার স্বপন ছাড়ি, তোমারে চাহিছে,
মধু দেহে সুখ স্পর্শে রহস্য গভীর,
অপূর্ব অধরে তব চুম্বন মাগিছে:

কবির প্রমত্ত হৃদয়। প্রিয়ার দেহ-লতা মদিরার মোহের মত তাহাকে আবিষ্ট করিয়াছে। একবার বলিয়া উঠিলেন: কত কি মাধুরী তব লাজ বাস-বন্ধ! আবার বলিয়া উঠিলেন: আজ তুমি খোল তব চির আবরণ;

যে চির আবরণে প্রিয়া আবৃত কবি তাহা খুলিয়া ফেলিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। নজরুলও এমনই বলিয়াছিলেন, 'খুলে দাও রং-মহলের তিমির দুয়ার।' প্রিয়া রহস্যময়ী! প্রিয়া রংমহল!!

প্রেমিক কবি তাঁহার প্রেমের গান গাহিয়া চলিয়াছেন। বীণার তারে তারে যেমন রাগ-রাগিণীতে গীত ভরা থাকে, তাঁহার অন্তরের পরাতে পরাতেও তেমনি প্রিয়ার জন্য প্রেমের ডালি সাজান। অন্তর বীণায় প্রেমিকাকে আহ্বানের সুর তুলিয়া "জোছনা" কবিতায় বলিয়াছেন:

এস প্রিয়ে স্বপ্নময়ী!
প্রেমময়ী সুধাময়ী!
কাছে এসে একবার দাঁড়াও হাসিয়া!—

কবির ব্যাকুল হৃদয়ের এই সাদর আহ্বান কেন? কেন—তাহার কারণ ঐ 'জোছনা' কবিতাতেই বলিয়াছেন:

তোমার পরশ স্বপ্ন,
চুম্বন অমিয়,

আহ্বান করিতেছেন কারণ তাহার দেহ মুকুল বসন্ত চাহিতেছে—বসন্ত না আসিলে মুকুল প্রস্ফুটিত হইবে কিরূপে? বলিতেছেন:

ও সুখ পরশ ভিন্ন
বসন্ত কোথায়?

কবি তাঁহার জীবন-মালঞ্চে প্রেম-কুসুমের এত রূপ বর্ণনা করিয়াও কিন্তু তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তিনি শেষ পর্যন্ত প্রেমকে চির শান্তিময় রূপেও বর্ণনা করিয়াছেন। মৃত্যুর শীতল হাত যাহাকে স্পর্শ করে জাগতিক সুখ-দুঃখ সব কিছু হইতেই সে তখন ঊর্ধ্বে। কবি-চিত্ত প্রেমকে সে পর্যায়েও নিয়া গিয়াছেন: তোমার ও প্রেম সখি! মরণ সমান—

বিশ্বকবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন:

'মরণ-রে! তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।' রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে তাঁহার শ্যামের সমান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন আর চিত্তরঞ্জন প্রেমকে বলিয়াছেন, মরণ সমান!

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বলিতে দেশবাসী তাঁহাকে দেশকর্মী এবং দেশ-প্রেমিক বলিয়াই জানিয়াছেন কিন্তু কবি হিসাবেও তিনি যে কাব্য-জগতে

সম্মানিত আসন লাভ করিয়াছেন তাহার প্রমাণ তাঁহার পাঁচখানি কাব্য-গ্রন্থের মধ্যেই পাওয়া যায়। তিনি প্রেমিক কবি, তিনি ঈশ্বর ভক্ত কবি, তিনি মানুষের কবি। যৌবনের প্রেম এবং তাহারই আবেগ লইয়া তিনি মালঞ্চ রচনা করিয়াছেন—তাহারই কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া প্রেমিক কবি চিত্তরঞ্জনের আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি যে মানবদরদী ছিলেন তাহাও তাঁহার 'অভিশাপ' কবিতায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। জগতের জনগণ অবহেলিত, তাহারা অসহায় অথচ স্বর্গে বসিয়া সুধা-হস্তে সৌন্দর্য বেষ্টিত হইয়া দেবেন্দ্র নৃত্যগীতে অভ্যস্ত। শান্তিহীন জনগণের কান্নার রোল কবির চিত্ত স্পর্শ করিয়াছিল। 'অভিশাপ' কবিতায় এই অসহায়ের মর্ম-ব্যথাই দেবেন্দ্রর আনন্দময় জীবনকে বিঘ্নিত করিয়া তুলিয়াছে :

কত যুগ যুগান্তর দিবস রজনী ধরে বিশ্বের প্রার্থনা
চির দীর্ঘশ্বাস-ভরা অশ্রুজল পরিপূর্ণ অবোধ বাসনা
ছুটেছে নন্দন পানে, নন্দনের স্বর্গদ্বারে হইয়া প্রহত
ফিরেছে ধরণী-বক্ষে ব্যর্থ ব্যাকুলতা-ভরা মস্তক আনত !

সুরেন্দ্র তখন কি করেন ? তিনি :

বসি স্বর্ণ সিংহাসনে, সুধা হস্তে স্বর্গপতি সৌন্দর্যবেষ্টিত—
কিন্নরীর নৃত্যতালে, অপ্সরার গীতজালে নিতান্ত জড়িত !

ঠিক সেই সময় জগতের শত শত দুঃখের হুতাশ্বাস ঝড়ের বেগে ক্রন্দনের মত উপস্থিত হইয়া নৃত্যগীত থামাইয়া দিল। সুরেন্দ্র তখন লজ্জিত। স্বর্গে যখন আনন্দের জোয়ার মর্তে তখন বেদনার হাহাকারে লজ্জিত দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাদের ডাকিয়া বলিলেন :

আনন্দে বধির হয়ে শুনি নাই এতদিন ক্রন্দন ধরার,
বাজেনি হৃদয়ে কভু মর্মাহত ধরণীর চির মর্মভার।

বলিয়াছেন :

কাঁদ কাঁদ ধরাবাসী ! তব তীব্র আর্তনাদ বজ্রশেল সম,
সহস্র সম্ভোগ কম্পিত এ স্বর্গধামে বাজে মর্মে মম।

এত দিনের বধিরতায় অনুতপ্ত, মর্মাহত দেবরাজ তখন প্রতিজ্ঞাই করিয়া বসিলেন :

স্বর্গ সহচরগণ ! আজি হতে আমি হ'ব ধরণীর প্রাণ,
বাজিবে আমারি মর্মে জগতের দীর্ঘশ্বাস শত দুঃখ তান !

কবিতাটিতে নিঃসন্দেহে চিত্তরঞ্জনের মানবপ্রেমিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের জন্য এই দুঃখ-বোধ এবং দেশবাসীর এই দুঃখের অবসান ঘটাইবার জন্যই তিনি ভারতের মুক্তি আকাঙ্ক্ষায় প্রকাশ্য রাজনীতিতে যোগদান করিয়াছিলেন বলা যায়।

মানব-প্রেমিক কবি চিত্তরঞ্জনের "ঈশ্বর" কবিতাটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্ম চিত্তরঞ্জনের কলমে এই কবিতা? ব্রাহ্মদের মধ্যে ইহা লইয়া এক তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়,—কেহ কেহ চিত্তরঞ্জনকে নাস্তিক বলিয়াও অভিহিত করেন এবং অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়া পৌছিয়াছিল যে চিত্তরঞ্জনের পিতা এবং শ্বশুর মহাশয় উভয়েই ব্রাহ্ম সমাজের মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও অনেকে তাহার বিবাহের সময় ইহা লইয়া গোলযোগের সৃষ্টি করেন এবং বিবাহ উৎসবে যোগদান করিতেও অস্বীকার করেন। ঈশ্বর কবিতায় চিত্তরঞ্জন যাহা বলিতে চাহিয়াছিলেন তাহারা তাহা না বুঝিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বৃথাই চিত্তরঞ্জনকে গালি দিয়া নাস্তিক বলিয়াছিলেন। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তিনি যে নাস্তিক নহেন বরং ঈশ্বরেরই পরম ভক্ত, ঈশ্বরে বিশ্বাসী—ইহা তাহারা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন:

জীবন-যাতনা ভরে সজল নয়ন,
জুড়াইতে চাই হৃদে ঈশ্বর সৃজিয়া
আপনার হৃদয়ের ধূম্ররাশি দিয়া,
সত্য বলে' পূজা করি অলীক স্বপন!
হায়! হায়! মিথ্যা কথা; ঈশ্বর! ঈশ্বর!
করুণ ক্রন্দন ওঠে অনন্ত গগনে:
ঠেলে' ফেলি জীবনের বিনীত নির্ভর,
ধরণীর আর্তনাদ শুনি না শ্রবণে।
উর্ধ্বমুখে চেয়ে থাকি, ডাকি নিরন্তর
শতবার প্রতারিত কাঁদি, মনে মনে।

যে একবার প্রতারিত হয় সে আর দ্বিতীয়বার প্রতারিত হইতে চাহে না—কবি চিত্তরঞ্জন বারবার শতবার প্রতারিত হইয়া মনে মনে কাঁদিতেছেন—ইহা কি নাস্তিকের লক্ষণ? নিশ্চয়ই নহে—ইহা ঈশ্বর বিশ্বাসী, ঈশ্বরপ্রেমিক মনেরই লক্ষণ।

আবার মালঞ্চের রোমান্টিক কাব্য-জীবনের পর 'মালা'য় দেশপ্রেমিক কবির, মানুষের জন্য অপরিমেয় প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়, মানুষের জন্য সেখানে তাঁহার বুক-ভরা ভালোবাসা। ফুলে ফুলে যুক্ত হইয়া যেমন মালা তেমনি দেশকর্মী কবি-চিত্তের দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের মিলনে 'মালা'। ইহার পরিচয় মালার অনেক কবিতায় রহিয়াছে—তাহা সব উল্লেখ না করিয়া শুধু তাহার একটি বিখ্যাত কবিতা 'মোছ আঁখি' উল্লেখ করা যাইতেছে। কবিতাটিতে তিনি বলেন যে, এ জগতে মানুষ শুধু আত্মকেন্দ্রিক হইয়া, নিজেকে লইয়া বিব্রত থাকিতে আসে নাই। পশুগণ আত্মসর্বস্ব, মানুষ যদি তেমন আত্মসর্বস্ব হয় তবে পশুদের সঙ্গে পার্থক্য কোথায়? এ পৃথিবী কর্ম-যজ্ঞের পবিত্রস্থান—কাঁদিবার স্থান নহে। শুধু নিজের জন্য হা-হুতাশ করিবার স্থান নহে। মনকে দৃঢ় করিয়া বুকের সেই দুঃখ জ্বালাকে সহ্য কবিতে হইবে, নিজের চোখের জল মুছিয়া মুখে হাসি আনিয়া অপর আর একখানি ব্যথিত মনের মনোবেদনা দূর করিতে হইবে—তবেই তো মানুষ জীবনের সাফল্য। কবি মনে করেন, নিজের বুক-ভরা ভালোবাসা দিয়া আর একটি জীবনকে আলোকিত করা, প্রস্ফুটিত করাই তো কাজ, পরার্থে এই কাজের জন্যই তো এই জগতে আসা। মনে রাখিতে হইবে, এ জগতে আসা তাহার নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থের জন্য নহে, সহানুভূতির সূর্য-কিরণে অপরের দুঃখিত মন-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য। চিত্তরঞ্জনের এই 'মোছ আঁখি' কবিতাটি পড়িলে বাংলার মহিলা কবিদের অন্যতমা কামিনী রায়ের 'সুখ' কবিতাটির কথা মনে পড়ে। কামিনী রায় লিখিয়াছেন:

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন:

মোছ আঁখি, মনে কর এ বিশ্বসংসার
কাঁদিবার নহে শুধু বিশাল প্রাঙ্গণ
রাবণের চিতাসম যদিও আমার
জ্বলিছে জ্বলুক প্রাণ, কেন গো ক্রন্দন?

বলিয়াছেন :

হায় হায় জনমিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুম কলি নয়ন কিরণে
একটি জীবন-ব্যথা যদি না জুড়ালে
বুক-ভরা প্রেম ঢেলে—বিফল জীবনে।
আপনা রাখিলে, ব্যর্থ জীবন সাধনা ;
জনম বিশ্বের তরে—পরার্থে কামনা।

কবি-চিত্তের আর একটি বিখ্যাত কবিতা "প্রেম ও প্রদীপ"। বাংলার একশ্রেণীর ভক্ত ও বিশ্বাসীমন সারা কার্তিক মাস ভরিয়া আকাশে প্রদীপ হইয়া সারা রাত জলিতে থাকে। কবি-চিত্তের রোমান্টিক মনের মানবীয় প্রেম ঈশ্বরীয় প্রেমে রূপান্তরিত হইয়া প্রদীপ, হইয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। 'প্রেম ও প্রদীপ-এ তিনি বলিয়াছেন :

হে মোর নিষ্ঠুরা! কি যে বেদনা বন্ধনে
টানিতেছে সর্ব হৃদি তব সন্নিধানে!
কি ব্যাকুল বাসনার আকুল ক্রন্দনে
ভরিয়া গিয়াছে চিত্ত তোমারি সন্ধানে!

আবার বলিয়াছেন :

কি জানি কেমন ক'রে জালায়ে রেখেছ ওই—
অপূর্ব প্রদীপখানি?
আমি মুগ্ধ বাক্যহীন, আমি শুধু চেয়ে রই!
কি দিয়ে কেমন করে জালায়ে রেখেছ ওই
অপূর্ব প্রদীপখানি?

চিত্তরঞ্জনের আর একটি বিখ্যাত কবিতা হইতেছে "বারবিলাসিনী"। কবিতাটি আদিরসের হইলেও কবিতাটির মধ্যে চিত্তরঞ্জনের সুন্দর এবং সহানুভূতিপূর্ণ মনের পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে। কবিতাটিতে বারবিলাসিনী বা পতিতা যে কত নিরুপায়, অসহায়, কত যে লাঞ্ছনা এবং সামাজিক গঞ্জনা সে সহ্য করিয়া চলে তাহারই দুঃখে কবির মনোদুঃখ ও মনোবেদনা প্রকাশিত হইয়াছে। মানবতার বেদীমূলে দাঁড়াইয়া, সহানুভূতির পূর্ণ অন্তর লইয়া কবি পতিতাকে দেখিয়াছেন। কিন্তু এই কবিতাটি লইয়াও সমাজে বেশ

আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছিল। তখনকার সমাজে যাহারা নিজদিগকে রুচিশীল বলিয়া মনে করিতেন তাহারা চিত্তরঞ্জনের বারবিলাসিনীর সমালোচনায় অত্যন্ত মুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাহারা কবির প্রথম বয়সের এই কবিতা-টিকে অশ্লীল এবং অশ্রাব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সমালোচক সমালোচনা করিবেনই। তবে যাহারা সত্যি শিল্পী, কলার অনুগ্রাহী, প্রকৃত কবি তাহারা এই কবিতাটির মধ্যে চিত্তরঞ্জনের মানবিকতা, সহানুভূতিতে পূর্ব মনের পরিচয় পাইবেন। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উহা পাঠ করিলে মনের কোণে কামনার ভাব জাগরিত না হইয়া বরং বারবিলাসিনীর আন্তরিক বিলাপে এবং তাহার জীবনের যে সর্বনাশ হইয়াছে সেই করুণ আর মর্মন্তুদ কাহিনীতে পাঠকের অন্তরও বেদনায় ভরাইয়া তুলিবে। কবিতাটি পড়িলে বিখ্যাত ইংরেজ কবি Thomas Hood এর "The Bridge of Sighs" কবিতাটির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সাহিত্য আলোচনার সময় চিত্তরঞ্জন Hood-এর এই কবিতাটি উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "পতিতাগণের দুর্দশার জন্য পুরুষও কম দায়ী নয় এবং তাহাদিগকে ঘৃণা করিবার অধিকার তো কাহারও নাই-ই বরং যে উঠবে উঠতে না দিলে আমাদের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত নাই।" Bridge of Sighs-এর মৃত অভাগিনীর জন্য সহানুভূতি জানাইয়া বলিয়াছেন :

> Death has left on her
> Only the beautiful"

কিন্তু মৃত্যু ছাড়া কি অভাগীর আর কোন পথ ছিল না? দুঃখ করিয়া Hood বলিয়াছেন :

> "O ! it was pitiful !
> Near a whole city full,
> Home she had none."

"বারবিলাসিনী" কবিতায় বারবিলাসিনী বলিয়াছে,

> রজনীর রাজ্যে আমি রানী—
> ওগো অন্ধ রজনীর রাজ্যে আমি রানী !

রানী তো অতুল সম্পদের অধিকারিণী। নিজের সেই সম্পদ বিলাইবার জন্য ডাকিয়া বলিতেছে :

এস পান্থ! ভ্রমিয়া ধরণী!
চরণে লেগেছে পঙ্ক,
প্রাণে কাঁপিছে কলঙ্ক:
এস পান্থ! আঁধার রজনী—
অবগাহ প্রেমে মোর আজি এ রজনী!

রজনীর রানী তাহার সব সম্পদ কলঙ্কিত পুরুষকে তুলিয়া দিয়াছে, সেখানে কি করিয়া সে পুরুষের পিপসার্ত মনকে তৃষ্ণা-বারি দিয়া খুশী করিবে তাহাই যেন তাহার একমাত্র কাজ। কিন্তু তাহার অন্তর-মনে কি আক্ষেপ নাই? কলঙ্কিত পুরুষেরও কত কত সুখ, নব নব আনন্দ! কিন্তু তাহার সুখ কোথায়? তৃপ্তি কোথায়? সে বলিয়াছে:

যাহা আছে, সব লও তুলে!
রেখে যেও রক্ত জ্বালা,
তুলে নিও পুষ্পমালা;
রজনী প্রভাতে যেও ভুলে—

বারবিলাসিনী আবার বলিয়াছে:

কিবা ভয়? রজনী আঁধার!
কলঙ্ক কম্পি᠎ দেহে,
অধীর প্রমত্ত গেহে
কাটিবে গো রজনী তোমার!
দুরন্ত আনন্দে যাবে রজনী তোমার:
কোথা ভয়? সকলি আঁধার।

এ-আহ্বান সবই কলঙ্কিত পুরুষের জন্য কিন্তু সেই পুরুষ বারবিলাসিনীর সঙ্গে মধু-যামিনী যাপন করিয়া, নির্মম নিষ্ঠুরের মত ভুলিয়া চলিয়া যায়। বারবিলাসিনী কিন্তু তাহার ঐ যাওয়াকে কেন্দ্র করিয়া যাহা বলিয়াছে তাহাতে তাহার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার, হৃদয়-বেদনার উদ্বেলিত অভিমানের সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে। বলিয়াছে:

তুমি যেও এলে উষারাণী
পুণ্যদেহে শুভ্র হাসে
পশিও পবিত্র বাসে:

রজনীর কলঙ্কের বাণী—
ভুলে যেও রজনীর কলঙ্ক কাহিনী
শুধু আমি-র'ব কলঙ্কিনী !

পুরুষের কলঙ্ক কোথায়? প্রভাত হইলে সে তাহার পুণ্য দেহ লইয়া, শুভ্র হাসি হাসিয়া, পবিত্র গৃহে প্রবেশ করিবে আর সব পাপ ও কলঙ্কের বোঝা লইয়া বিলাসিনী সমাজের এক কোণে কলঙ্কিনী হইয়াই থাকিয়া যায়। কিন্তু কেন? সে এমন কি, এমন কত ঋণ করিয়া আসিয়াছে যে তাহার অপার ঐশ্বর্য বিলাইয়া বিলাইয়াও সে-ঋণের বোঝা লাঘব করিতে পারিতেছে না? বারবিলাসিনী তাই বেদনা-ভরা মনের আক্ষেপ জানাইয়াছে :

আমি যেন চিরদিন ঋণী !
অপার ঐশ্বর্য লয়ে,
বিলাই ভিখারী হ'য়ে,
বাসনাবিহীন উদাসিনী !—
লালসা উল্লাসহীন, পূর্ণ উদাসিনী !
কে করেছে মোরে চির ঋণী।

সবারে বিলাসে তাই সে বারবিলাসিনী কিন্তু নিজের বিলাস, নিজের বাসনা তাহার চরিতার্থ হয় না, হয় না বলিযাই বারবিলাসিনী লালসা বিহীন, পূর্ণ উদাসিনী! তাহার জীবন আছে, কোন বাসনা নাই। তাহার যৌবন আছে কিন্তু যৌবনোচিত লালসা না থাকায় বারবিলাসিনীর বোধনের পূর্বেই বিজয়া; যৌবনেই যোগিনী। পুরুষের পরিতৃপ্তির জন্য কলঙ্কের বোঝা তাহাকে বহন করিতে হইতেছে কিন্তু তাহাকে হইতে হইতেছে উদাসিনী। বারবিলাসিনীর জীবনে ইহা আর এক দুর্ভাগ্য। সমাজ লাঞ্ছিতার এই অসহায়, করুণ মর্ম-বেদনার আঘাতেই সে বলিয়াছে :

ওগো আমি যৌবনে যোগিনী !
এ বিশ্ব লালসা ছাই,
সর্বাঙ্গে মাখিয়া তাই
চলিয়াছি কলঙ্ক বাহিনী !
মর্মহীন, কর্মহীন, কলঙ্ক-বাহিনী !

নিজের জীবন ভরিয়া এই অসহায়ের কান্না কাঁদিয়া কাঁদিয়া বারবিলাসিনীর

মন শেষ পর্যন্ত জানিতে চাহিয়াছে, আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভরা একটি পরিপূর্ণ জীবনের কেন এমন কলঙ্ক-ভরা জীবন হইল? কেন সে এমন দুরবস্থার পঙ্কিল আবর্তে পড়িয়া সমাজে লাঞ্ছিতা? এ কলঙ্কের জন্য দোষ কি তাহার? কাহার অভিশাপে তাহার এই দুরবস্থা?—তবে কি সে কোন মহাপ্রাণে ব্যথা দিয়া আসিযাছে যাহার অভিশাপে সবারে বিলাসিযা সে বারবিলাসিনী:

কার অভিশাপে নাহি জানি!
কোন মহাপ্রাণে ব্যথা
দিয়াছিনু, তাই হেথা,
প্রাণহীন প্রেম-বিলাসিনী!
সবারে বিলাসি তাই বারবিলাসিনী!
তারি শাপে চির-কলঙ্কিনী।

কবি চিত্তরঞ্জনের কাব্য সমালোচনা শেষ করিবার মুখে এ-কথাই বলা যায়, যাহা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "শাজাহান" কবিতায় বলিয়াছেন:

তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারম্বার!

চিত্তরঞ্জনও তাঁহার কাব্য কীর্তিকে পশ্চাতে রাখিয়া জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে আরও বৃহত্তর কীর্তির জন্য অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে কাব্য-চর্চা তিনি করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার জীবনের যে আদর্শ তাহা হইতে এতটুকুও বিচলিত হন নাই, আবার সাহিত্য সেবাতেও দেখা গিয়াছে যে তাঁহার সে আদর্শ হইতে তিনি অন্য পথ ধরিয়া চলেন নাই। তিনি মনে করিতেন, বাংলার একটি বৈশিষ্ট্য আছে, কাব্য এবং সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রে ঐ স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করিয়া চলাই কর্তব্য। তাঁহার সে আদর্শ আর স্বাতন্ত্র্য,—বাঙালীকে খাঁটি বাঙালী হইতে হইবে কাব্যে, সাহিত্যে, সমাজে এবং দর্শনে। বাংলার যাহা প্রাণ, সেই প্রাণ-সম্পদে মনকে সম্পদশালী রাখিতে হইবে। উহা হইতে বিচ্যুতিকে তিনি নিজের ধর্ম ত্যাগের সমান মনে করিতেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের এমন স্বাতন্ত্র্যবোধ তাই তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। শিক্ষা বিষয়ে স্যার আশুতোষের এই জাতীয়ভাব, শিল্পী হিসাবে অবনীন্দ্রনাথের এই

জাতীয়ভাবের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেন, বাংলার সমাজ-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এমন জাতীয়ভাবের বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন রহিয়াছে।

চিত্তরঞ্জনের জীবনের রথ তাঁহার কীর্তিকে 'পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সাহিত্য ও কাব্য ক্ষেত্রে তাঁহার কীর্তি আরও কত বিরাট হইতে পারিত সে-কথা বলিতে পারা যায় না। কারণ কাব্য-সাগরে মগ্ন থাকিয়া তিনি নিজে যে অমৃত ধারা পান করিতে পারিতেন তাহা তুচ্ছ করিয়া তিনি জাতির মুক্তি কামনায়, লক্ষ কোটি মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন। বৈষ্ণব কবি ব্রজধামের নীপ-বনের বাঁশী ভুলিয়া বৃন্দাবনের পবিত্র ভূমিকে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইলেন ভারতের মহামানবের তীর্থ-ক্ষেত্র।

কিন্তু কাব্য-চর্চা পরিত্যাগ করিলেও কাব্যজগৎকে তিনি তাঁহার মনের বাসর হইতে কখনও দূরে রাখিতে পারেন নাই। সাহিত্যিক হিসাবে তিনি অনেক সাহিত্য পত্রিকা এবং সাহিত্যিককে সাহায্য দান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে,—
নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।

কবি চিত্তরঞ্জনও কাব্য-চর্চা ছাড়িয়া, কাব্যজগৎ আলোকিত হইয়া উঠুক এই বাসনায় অনেক কবিকে সাহায্য করিয়াছেন। একজন বিখ্যাত কবি তখন আর্থিক দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। তাহাকে সাহায্য করিতে চিত্তরঞ্জন তাহার একটি কবিতার জন্য তাহাকে এক শত টাকা পাঠাইয়া দিয়া অতি বিনীতভাবে জানাইয়াছিলেন, "আপনার যাহা গুণ সে গুণানুসারে এ টাকা কিছুই নহে তথাপি আপনি এ টাকা গ্রহণ করিতে দ্বিমত করিবেন না।"

আর একজন ছিলেন সেদিনের বিখ্যাত কবি গোবিন্দ দাস। তিনি একবার অসুস্থ হইয়া ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে অস্ত্র চিকিৎসার জন্য ভর্তি হইয়াছিলেন। সংবাদটি চিত্তরঞ্জনের নিকট পৌছিয়াছিল। তিনি তখন ভাগলপুরে ছিলেন। তথাপি কবির প্রতি তাঁহার কর্তব্য রহিয়াছে মনে করিয়া ভাগলপুর হইতেই তিনি ঢাকার একজন ব্যারিস্টার শ্রীপ্রাণকিশোর

বসু মহাশয়কে টেলিগ্রাম করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন যাহাতে কবি গোবিন্দ দাসের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয়। চিত্তরঞ্জনের টেলিগ্রামের ভাষা : Kindly see to treatment of poet Gobinda Das. am responsible for expenses. Write to me here.

চিত্তরঞ্জনের কাব্য-চর্চার সময়কে রবীন্দ্রযুগ বলিতে হয়। সেই সময়ও কবিবর দেবেন্দ্রনাথ তাহার নিজস্ব ধারা বজায় রাখিয়া কাব্য চর্চা করিয়াছেন বলিয়া চিত্তরঞ্জন তাহার প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাহার কবিতাও তাঁহার খুব ভাল লাগিত। দেবেন্দ্রনাথও চিত্তরঞ্জনের কবিতা খুবই পছন্দ করিতেন এবং এই কারণেই চিত্তরঞ্জনের 'মালঞ্চ' যখন বাজারে ছিল না তখন দেবেন্দ্রনাথ ১৯১২ সালে যখন তাহার সমগ্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত করিতেছিলেন সেই সময় 'মালঞ্চে'র একটি সংস্করণ প্রকাশিত করেন। এই কার্যের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নহে, অন্তরের ভালবাসার নিদর্শন হিসাবেই চিত্তরঞ্জন তাঁহার প্রথম বয়সেই "কবি ভ্রাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রতি" নামক একটি সনেট রচনা করিয়াছিলেন। সনেটটি এই :

এ নহে রবির লেখা সুন্দরী সনেট,
শারদ প্রভাত সিক্ত শুভ্র শেফালিকা :—
কিম্বা কবি ! বাতায়নে মুগ্ধ জুলিয়েট !
এ মোর হৃদয়জাত মলিন মালিকা—
পড়িয়া চরণে তব তুলে দেখ কবি !
তোমার কবিতা আমি বড় ভালবাসি,
সুখভরা শান্তিভরা স্বপ্নভরা সবি,
ব্যঙ্গভরা বাক্য আর রঙ্গভরা হাসি !
আরো ভালবাসি আমি প্রিয়ারে তোমার
কত না কবিতা তার অধরে লাগিয়া,
অস্তপানে রাঙামুখ হইতে যাহার
তোমার অধর কবি লইতে রাঙিয়া।
তব যোগ্য নহে তবু পাঠাইনু ভেট
আমার আগ্রহ ভরা ভিখারী সনেট।

দেবেন্দ্রনাথ সেন একবার অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তখন

সিমলায় বিখ্যাত মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর বাড়ীতে ছিলেন। চিত্তরঞ্জন তখন প্রায়ই গিরীন্দ্রমোহিনীর বাড়ীতে দেবেন্দ্রনাথকে দেখিতে যাইতেন এবং ঐ সাক্ষাৎকারের সময়ও কাব্য আর সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক আলাপ-আলোচনা করিতেন। উল্লেখযোগ্য যে, ঐ বিখ্যাত মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কবিতাও চিত্তরঞ্জন পছন্দ করিতেন এবং তাহার কবিতাও "নারায়ণে" প্রকাশ করিতেন। এতদ্ব্যতীত পুরাতন দিনের কবিদের মধ্যে তিনি অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতাও পছন্দ করিতেন এবং তৎপরবর্তী কালের কবিদের মধ্যে ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী ও কবিশেখর কালিদাস রায়ের কবিতাও তিনি পছন্দ করিতেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কবির যাহা ধর্ম সেই কাব্য-চর্চা তাঁহার শেষ জীবন পর্যন্ত না চলিলেও তাঁহার কবি-মন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জীবন্ত ছিল। ইহার নিখুঁত ও সুষ্ঠু পরিচয় দেওয়ার জন্য অন্য কোন কিছুর উল্লেখ না করিয়া অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের একটু লেখা উদ্ধৃত করিয়া এ-অধ্যায় শেষ করা যাইবে : তখন তাঁহারা উভয়ে বরিশালের পথে। ষ্টীমারের ডেকে দেশবন্ধু ও শরৎচন্দ্র। অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে তারা দেখা যায়। ষ্টীমারের সার্চলাইটের আলো কখনও তরু-শিরে কখনও নৌকার ছাতে, কখনও কুটীরের চূড়ায়। ষ্টীমার নদীর আঁকা-বাঁকা পথ ধরিয়া চলিযাছে। বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া চিত্তরঞ্জন বলিয়া উঠি-লেন, শরৎবাবু, নদীমাতৃক কথাটির সত্যকার অর্থ যে কি, এদেশে যারা না জন্মায় তারা জানেই না।

বহুক্ষণ স্তব্ধ ছিলেন কে? দেশকর্মী চিত্তরঞ্জন নহেন। বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া কবি চিত্তরঞ্জন দেখিতেছিলেন আঁধারের রূপ,—দিগন্ত বিস্তৃত নিশীথ রাতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য,—যে সৌন্দর্য তিনি বার বার সাগরযাত্রী হইয়াও পূর্বে সাগরের বুকে চোখ ভরিয়া দেখিয়াছিলেন,—দেখিয়াছিলেন আর কবিতা পাঠা-ইয়াছিলেন এডেন হইতে, সুয়েজ হইতে। কিন্তু বরিশাল যাত্রার পথের এ-সৌন্দর্যে তিনি কবিতা লেখেন নাই বটে কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত মনের খাতায় কি সেই দিগন্ত বিস্তৃত আঁধারের রূপ কবিতার পর কবিতা হইয়া ফুলের মত ফুটিয়া থাকে নাই?

মানুষ চিত্তরঞ্জন

খ্যাতনামা কবি কামিনী রায় তাহার 'ধরায় দেবতা চাহি' কবিতায় লিখিয়াছেন, "মানব সবাই নহে গো মানব,

কেহ বা দৈত্য, কেহ বা দানব"

সত্য সত্যই এ ধরায় মানবের আকৃতিতে অনেক দৈত্য দানব দেখা যায় অর্থাৎ মানুষের আকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই তাহারা মানুষরূপে পরিগণিত হয় না। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে চিত্তরঞ্জনকে মানুষরূপে পূজা করিতে হয় কারণ আচার বিনয়-বিদ্যা আর দয়া-মায়া-সহৃদয়তায় তাঁহার মনুষ্যত্ব শতদলের মত প্রস্ফুটিত। তাই তিনি প্রকৃতই মানুষ।

দেশ বলিতে চিত্তরঞ্জন তাঁহার আরাধ্য দেবতাকেই বুঝিতেন ; মানুষের সেবা করিয়া তিনি তাঁহার সেই আরাধ্য নারায়ণের সেবা করিয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'জীবে দয়া করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' চিত্তরঞ্জন বিবেকানন্দের বাণীর প্রতিমূর্তি, একান্ত অনুগামী। সারাজীবনই তিনি বিবেকানন্দের ঐ বাণীকে ম রূপে জপ করিয়া মানুষের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই মানব-বন্দনা সত্যিকারের নারায়ণপূজা, নিষ্কলুষ সে-প্রেম। সুতরাং বলা যায় যে আইনজীবী চিত্তরঞ্জন বা রাজনৈতিক চিত্তরঞ্জনের চাইতেও মানুষ চিত্তরঞ্জন ছিলেন অনেক বড়, অনেক উর্ধ্বে। মনুষ্যত্ববোধ এবং মহানুভবতার পরিচয়েই তাঁহার জীবন পরিপূর্ণ—তাই তো তিনি শুধু দেশবন্ধুই ছিলেন না, ছিলেন মানবজাতির পরম বন্ধু।

জমি উপযুক্তরূপে কর্ষিত না হইলে আশানুরূপ ফসল লাভ করা যায় না। যে জমিতে চিত্তরঞ্জন মানুষরূপে পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করিয়াছেন সে-জমির ইতিহাসও এখানে উল্লেখ করা দরকার। চিত্তরঞ্জন নিজেই বলিয়াছেন, 'ফুটে না ফুটে না ফুল শুধু একদিনে!' চিত্তরঞ্জন ও তেমনি একদিনেই ফুটিয়া ওঠেন নাই। তাঁহার ফুটিবার পূর্বে যে-সাধনার প্রয়োজন ছিল সে-সাধনা তাঁহার পূর্ব পুরুষ হইতেই চলিয়া আসিয়াছে।

চিত্তরঞ্জনের প্রপিতামহ চন্দ্রনাথ দাশ অত্যন্ত দয়ালু এবং অতিথিবৎসল

ছিলেন। দিনে-রাতের যে কোন সময়ই অতিথি আসিলে তাহাকে সেবা করা ছিল ঐ বাড়ীর বৈশিষ্ট্য এবং ধর্ম। অসময়ে অতিথি আসিলে সে কিরূপে অভ্যর্থিত হয় তাহা নিজেই জানিবার জন্য একবার তিনি কয়েক দিনের জন্য বাড়ী হইতে কোথাও গিয়াছিলেন। সেই সময়ে একদিন একটু বেশী রাতে এক অতিথি আসিল। অতিথিকে আলুভাতে আর ডাল দিয়া আপ্যায়িত করা হইল। খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া বিদায়ের সময় অতিথি বলিলেন, এ বাড়ীর এত বড নাম-ডাক আর অতিথিকে খাওয়াল শুধু আলু সিদ্ধ আর ডাল।

যথাসময়ে চন্দ্রনাথ বাড়ীতে আসিলেন। খাইতে বসিয়া তিনি আর সব কিছু খাইলেন কিন্তু জিওল কই মাছের বাটী তিনি স্পর্শও করিলেন না। তাহা দেখিয়া সকলে অবাক। ভয়ে কেউ কিছু জিজ্ঞাসাও করিতে পারিল না। কিন্তু বাড়ীর সকলের অবাক চোখের নির্বাক জিজ্ঞাসার উত্তরে চন্দ্রনাথ নিজেই বলিলেন, 'সুস্বাদু জিনিস নিজের মুখে দিলে উহা মলে পরিণত হয় আর যদি অপরের মুখে দেওয়া যায় তাহা হয় সোনা। যে-বাড়ীতে অতিথিকে জিওল মাছের ঝোল করিয়া না দিয়া আলু সিদ্ধ আর ডাল খাওয়ান হয় সে-বাড়ীর কর্তা মাছ খায় কি করিয়া? বাড়ীর সকলে তখন বুঝিলেন, সেদিন রাতে যে অতিথি আসিয়াছিলেন তিনি অতিথিরূপী চন্দ্রনাথ!

চিত্তরঞ্জনের পিতামহ কাশীশ্বর। একদিন তিনি পাল্কীতে করিয়া দূরের এক গ্রামে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। বাহিরে উন্মুক্ত আকাশ, খাঁ-খাঁ রোদ। ধূ-ধূ করা এক মাঠের মধ্য দিয়া তিনি যাওয়ার সময় দেখিলেন, নগ্নপদে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাথায় রোদ করিয়া হাঁটিতেছেন। কাশীশ্বরের হুকুমে পাল্কী সেই ব্রাহ্মণের নিকট পৌঁছিল। কাশীশ্বর পাল্কী হইতে নামিয়া ব্রাহ্মণের নিকট হাতজোড় করিয়া নিবেদন করিলেন, 'আপনি দয়া করিয়া এই পাল্কীতে উঠুন।'

ব্রাহ্মণ তো অবাক! হতবাক হইয়া কাশীশ্বরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলে, কাশীশ্বর বলিলেন, 'আপনি হাঁটিতে অনেকটা অসমর্থ তদুপরি এই প্রখর রোদ, আপনি পাল্কীতে উঠুন—আমি হাঁটিয়া যাইতেছি।'

পিতা ভুবনমোহন। তাঁহার জীবনও এমন অনেক ঘটনায় পরিপূর্ণ।—বিশেষ উল্লেখযোগ্য আত্মীয় অনাত্মীয়কে সাহায্য দান। অনেককে তিনি

প্রতি মাসে সাহায্য করিতেন। নিকট এবং দূর সম্পর্কীয় অনেক আত্মীয় তাঁহার বাড়ীতেই পোষ্যরূপে থাকিত। যখন তিনি দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন তখনও কাহাকেও যাইতে বলিয়া এই আত্মীয়-অনাত্মীয়সহ বৃহৎ পরিবারের কলেবর ছোট করেন নাই।

চিত্তরঞ্জন তখন বিলাত হইতে ফিরিয়াছেন। পিতার দুরবস্থা এবং বাড়ীতে সদা-সর্বদা ঐ বৃহৎ পরিবারের হৈ-হৈ দেখিয়া ভুবনমোহনকে বলিয়াছিলেন, 'যাহারা দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় রহিয়াছেন তাহাদিগকে অন্য কোথাও রাখিয়া খরচ দিলেও তো চলিতে পারে!'

ভুবনমোহন আপত্তি করিয়া বলিলেন, সব সময় টাকা তুলিয়া দেওয়া যায় না। এক জ্ঞাতিকে তিনি প্রতি মাসে ১৫টাকা করিয়া সাহায্য পাঠাইতেন। দুরবস্থার জন্য কয়েক মাস তিনি তাহাকে সাহায্য পাঠাইতে পারেন নাই, ফলে না-খাইয়া সে অসুস্থ হইয়া পড়ে। পরে যখন ভুবনমোহন তাহাকে টাকা পাঠাইতে পারিয়াছিলেন, সে-টাকা ভুবনমোহনের নিকট ফেরত হইয়া আসিল, ক্ষুধার জালাকে জয় করিয়া সে তখন পরলোকে।

ঘটনাটি শুনিয়া চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত বেদনাহত হইয়াছিলেন। সংসারের প্রবেশের মুখে এই মর্মান্তিক কাহিনী তাঁহার অন্তরের খাতায় অক্ষয় অক্ষরে লিখিত রহিয়াছিল তেমনি অক্ষয় অক্ষরে লিখিত রহিয়াছিল তাঁহার পিতার সহৃদয় অন্তরখানির কথা! সুতরাং এই বংশের, এই পবিত্র ধারায় প্রবাহিত হইয়া যিনি আসিয়াছেন তিনি যে সহৃদয়, দয়ালু এবং সত্যিকারের মানুষ হইবেন ইহা আশা করা যায়। কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম আছেই। চিত্তরঞ্জন সেই ব্যতিক্রমও হইতে পারিতেন। কিন্তু না,—চিত্তরঞ্জন তাঁহার মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ করিয়া পূর্ণ পরিচয় দি। দেশ ও দেশবাসীর চিত্তকেও রঞ্জিত করিয়া গিয়াছেন।—ঐ প্রাণের ধারায় সঞ্জীবনী শক্তিতেই চিত্তের চিত্ত বাংলার পলিমাটির মতই পেলব, শ্যামলা বাংলার ছয়টি ঋতু বৈচিত্র্যের মতই তাঁহার প্রাণ-মন বৈচিত্র্যময়, সৌন্দর্যময় হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রে আছে, পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম পিতাহি পরমংতপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব দেবতাঃ। এই মন্ত্র চিত্তরঞ্জন মনে-প্রাণেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মন্ত্র পাঠ করিয়াই তিনি তাঁহার পারিবারিক জীবনের প্রথমেই মানুষের পরিচয় দেন, পরিচয় দেন উপযুক্ত পুত্রের। ভুবনমোহনের

পুত্র সত্য সত্যই পুত্র চিত্তরঞ্জন।

বিরাট সংসার ভুবনমোহনের। দান এবং মাসিক সাহায্য করা তো ছিলই। কিছুই তিনি বন্ধ করিতে না পারিয়া নিজের ঋণের অঙ্ক ক্রমেই বাড়াইতে লাগিলেন। ঋণের টাকা দাঁড়াইল মোটা অঙ্কে। শেষ পর্যন্ত ভুবনমোহন ঋণের দায়ে দেউলিয়া হইয়াছিলেন। পিতৃঋণের কিছু অংশের জন্য তিনি নিজেও ইন্‌সলভেন্সি লইয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের সংসার তখন প্রায় অচল। ব্যবসায়ে তেমন পসার হয় নাই। অনেক মক্কেল আবার ইন্‌সলভেন্সি গ্রহণ-করা ব্যারিস্টারের নিকট আসিতেও চাহিত না। সুতরাং চরম এক দুঃসময়ের মধ্যে তখন চিত্তরঞ্জনকে দিন কাটাইতে হয়। ইহার কিছু পরে তাঁহার ভাগ্যদেবী তাঁহার প্রতি একটু সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন। আলীপুর বোম্ কেসের আপীলের মোকদ্দমার পর স্যার লরেন্স চিত্তরঞ্জনকে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু সে পথেও তাঁহার ইন্‌সলভেন্সি বাধা হইয়া দাঁড়াইল। অবশ্য সেদিনের সে বাধা না থাকিলে দেশবাসী চিত্তরঞ্জনকে দেশবন্ধুরূপে পাইত কি-না কে জানে, উহার আলোচনা এখানে অবান্তর।

চিত্তরঞ্জনের তখন একমাত্র চিন্তা কিরূপে পিতাকে ঋণমুক্ত করিবেন। অবশ্য পিতার সে-ঋণ পরিশোধ করিতে তিনি আইনতও বাধ্য ছিলেন না কিন্তু মানুষের জীবনে আইন আদালতই সব নহে, হাইকোর্টের চাইতেও বড় আদালত অন্তর। সেখানে জবাবদিহির জন্যই চিত্তরঞ্জন চিন্তিত। তিনি শান্তি পাইতেছিলেন না, কোথাও যাইতে ভাল লাগিত না।—মনের মাঝে শুধু ভাবনা, যাহারা তাঁহাদের প্রয়োজনের সময় ঋণদান করিয়া সাহায্য করিয়াছেন তাহাদের সেই ঋণের টাকা তাহাদের হাতে ফিরাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলেন কি করিয়া? তাহার পর যখন সময় আসিল সেই ঋণ পরিশোধের ইতিহাসটুকুও অতি মধুর। ইতিহাসটুকু এই: চিত্তরঞ্জন সমস্ত টাকাটা তাঁহার এক বন্ধুর হাতে দিয়া ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। পাওনাদারগণ অনেকেই ঐ টাকার আশা পরিত্যাগ করিয়াছিল, কেহ-বা মরিয়াও গিয়াছিল। অনেকের অবস্থা তখন অস্বচ্ছল হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তাহারা টাকা প্রতি ছয় আনা, আট আনা যাহা পায় তাহাই লাভ মনে করিল। বন্ধুটি চিত্তরঞ্জনকে ঐরূপ ব্যবস্থার কথা জানাইলে তিনি

খুব অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "দেখো! আমি তোমাকে কোনরূপ ব্যবস্থা বন্দোবস্ত-র কথা বলিনি। ওভাবে টাকা পরিশোধ করিলে আমার দেউলিয়া নাম দূরীভূত হবে বটে কিন্তু আমার অন্তরের ঋণ পরিশোধ হবে না। তুমি লিষ্ট করিয়া সকলের সব টাকা পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা কর।"

বন্ধুটি তাহাই করিল। দীর্ঘদিন পরিশ্রম করিয়া উত্তমর্ণগণের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া যাহার যত পাওনা ছিল সবই হিসাব করিয়া পরিশোধ করিয়া দিল। এই ঋণ পরিশোধ করিবার প্রতিজ্ঞা লইয়া চিত্তরঞ্জন দুই এক বৎসর নহে, দীর্ঘ ১৬ বৎসর জীবন-সংগ্রামে কঠোর পরিশ্রম করেন এবং ১৯১৩ সালের মে মাসে সমস্ত পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া উপযুক্ত পুত্রের কার্য সম্পন্ন করেন। পাওনাদারগণ আনন্দিত, উল্লসিত। নিজের টাকা নিজেরা ফেরত পাইয়া তাহারা যেন কৃতজ্ঞ, দুই হাত তুলিয়া তাহারা তখন আশীর্বাদ করিল চিত্তরঞ্জনকে। এই ঋণ পরিশোধের মধ্যে যাহা সব চাইতে বেশী আনন্দের বিষয় তাহা হইতেছে, ভুবনমোহন জীবিত অবস্থায় পুত্র কর্তৃক ঋণমুক্ত হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়াছিলেন। এই স্বস্তির নিঃশ্বাসটি চিত্তরঞ্জনের নিকটও যে পরম তৃপ্তির!

এই ঋণ পরিশোধের মধ্যে পাওনাদারগণের আশীর্বাদের চাইতেও চিত্তরঞ্জনের এক বন্ধুর উক্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ ঋণের টাকা ফেরত পাইবার ১৮ বৎসর পর বন্ধুটি এ উক্তি করিয়াছিলেন। এত দীর্ঘদিন পরেও কথাটি বলার কারণ নিশ্চয়ই এই যে, ঘটনাটি তাহার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছিল। চিত্তরঞ্জনের বাল্যবন্ধু সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক; আবার সুরেন্দ্রনাথের পিতাও ছিলেন চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবনমোহনের বন্ধু। ভুবনমোহন তাহার নিকট হইতে কিছু টাকা ঋণ করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন যখন ঐ ঋণের কথা শুনিলেন তখন ভুবনমোহন এবং সুরেন্দ্রনাথের পিতা উভয়েই পরলোকগত। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের নিকট ছিল অন্য হিসাব। পিতার ঋণ যেমন তিনি পরিশোধ করিতেছেন, পিতার পাওনা ও পুত্র গ্রহণ করিবে। পিতার সে ঋণের টাকা পরিশোধের সময় চিত্তরঞ্জন সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের নিকট একখানি পত্রও লিখিয়াছিলেন। টাকা ও চিঠিখানি হাতে করিয়া সুরেন্দ্রনাথ অবাক্ বিস্ময়ে অভিভূত। বিস্মিত সুরেন্দ্রনাথের মুখ দিয়া তখন বাহির হইয়া আসিয়াছিল কয়েকটি কথা, "একসঙ্গে মানুষ হলুম,

চিত্ত দেবতা হ'য়ে গেল! আমি মানুষও হতে পারলুম না।"

এমন আলোড়ন শুধু সুরেন্দ্রনাথের অন্তরেই নহে, হাইকোর্টের বিচারপতির অন্তরেও আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। লর্ড সিংহ [তখন লর্ড হন নাই] যখন এই ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে হাইকোর্টে মিঃ জাষ্টিস্ ফ্লেচারের নিকট দরখাস্ত উত্থাপিত করেন তখন তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, এইরূপ দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখা যায় না ; এইরূপ ব্যাপার বিলাতেও শোনা যায় নাই।

কবি কামিনী রায়ের 'ধরায় দেবতা চাহি' কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে :

সেকালে দেবতা গোলোক তেয়াগি'
মাটির ধরায় মরের গেহে
লইত জনম নর শিশুরূপে
বাড়িয়া উঠিত নারীর স্নেহে।

এই মাটির ধরায় মরের গৃহেই চিত্তরঞ্জন নারীর স্নেহে বাড়িয়া উঠিয়াছেন, —সেই চিত্তরঞ্জনকেই সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, দেবতা—তিনি মানুষ!

প্রায় ৬৮০০০ হাজার টাকা পরিশোধ করিয়া চিত্তরঞ্জন পিতাকে ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন। আবার মাতা যে মৌখিক ঋণ করিয়াছিলেন তাহাও তিনি পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গেই পরিশোধ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি জানিতেন, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী"। মৌখিক ঋণ কথাটি নূতন তাই ঘটনাটি উল্লেখ করিলেই কথাটির ব্যাখ্যা করা হইবে। মায়ের আদেশমত চিত্তরঞ্জন তাঁহাদের কুলগুরুকে সাহায্য করিতেন। গুরুদেবের মেয়েটি বড় হইয়াছে। টাকার কথা চিন্তা করিয়া গুরুদেব নিস্তারিণী দেবীকে বলিলেন, দুই হাজার টাকা হইলে মেয়েটির ভাল বিবাহ দিতে পারি। কথাটি নিস্তারিণী দেবী সময়মত চিত্তরঞ্জনকে জানাইলেন। এই জানানই তাঁহার প্রতি তাঁহার মায়ের আদেশ বলিয়া চিত্তরঞ্জন মনে করিয়া রাখিলেন। তৎপরে নিস্তারিণী দেবীর মৃত্যু হয়। কিন্তু মায়ের সেই কথা তিনি ভুলিয়া যান নাই। গুরুদেব তখন কাশীতে ছিলেন। চিত্তরঞ্জন কাশী হইতে গুরুদেবকে আনাইয়া ঐ টাকা তাহার হাতে তুলিয়া দেন।

চিত্তরঞ্জনের দ্বিতীয়া ভগ্নী ছিলেন অমলা দেবী। তিনি আজীবন কুমারী ছিলেন এবং দয়ামায়ায় তাঁহার মনখানি পরিপূর্ণ ছিল। তিনি এবং প্রমদা

দেবী উভয়ে পুরুলিয়ায় একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া অনাথা বালিকা-গণকে সেবার মনোবৃত্তি লইয়া, বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিয়া জীবনের পথে দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন পুরুলিয়ার এই মহান প্রতিষ্ঠানটিকে মাসে মাসে ৩০০ শত টাকা করিয়া সাহায্য করিতেন। একবার ঐ আশ্রমেরই নন্দরাণী নামে একটি বালিকার বিবাহ দিবেন বলিয়া অমলা দেবী ঠিক করেন। চিত্তরঞ্জনও ঐ বালিকাটিকে খুব স্নেহ করিতেন। তিনি ঐ সংবাদটি শুনিয়া অত্যন্ত খুশী হইলেন এবং নন্দরাণীকে বলিলেন, "তুই আমার সঙ্গে গাড়ী করে যাবি। তোকে নিয়ে গয়নার দোকানে যাব। যে যে গয়না দরকার হয় আমি তোকে কিনে দেব।" শুধু এই গয়নাই নহে, চিত্তরঞ্জন ৪০০০ টাকা ব্যয় করিয়া নন্দরাণীর বিবাহ দিয়াছিলেন।

আবার এই এক অনাথ আশ্রম ছাড়িয়া যেখানে হাজার হাজার লোক দুরবস্থায় পড়িয়াছে চিত্তরঞ্জন তাঁহার সমবেদনার মনখানি লইয়া সেখানে ছুটিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে চাঁদপুরে কুলী-ধর্মঘটের সময় তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া যখন তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন উহা মানবিকতার পরিচয় নিঃসন্দেহ, তাও কেহ কেহ উহাকে একটু রাজনৈতিক রং লাগাইলেও লাগাইতে পারে কিন্তু ১৯১৯ সালে পূর্ববঙ্গে যে সেবাকার্য করিয়াছিলেন তাহাতে আর রাজনীতির ছোঁয়া লা' 'ন সম্ভব নহে। ১৯১৯ সালে পূর্ব-বঙ্গের সেই প্রলয়ঙ্কর ঝড়। ঝড়ের তাণ্ডবে ফরিদপুর, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি জিলায় যেমন জীবনহানি হইয়াছিল, তেমন হইয়াছিল সম্পত্তির বিনাশ। গৃহহারা হইয়া খাদ্যের অভাবে হাজার হাজার লোকের অদৃষ্টে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট দেখিয়া চিত্তরঞ্জনের মন কাঁদিয়া উঠিল। চিত্তরঞ্জন তখন অন্য সব কাজ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গের সেই অসহায় লোকদের জন্য টাকা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, দৈনিক দশ হাজার টাকা সাহায্যের তহবিলে তাঁহার সংগ্রহ করা চাই-ই। প্রকৃত-পক্ষেও তখন দৈনিক দশ হাজার টাকা তিনি সংগ্রহ করিতেছিলেন। ঠিক সেই সময় পাবনা হইতে একটি দায়রার মোকদ্দমার জন্য তাঁহার নিকট অনুরোধ আসিল। দৈনিক ফি ৫০০০ টাকা। চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "সাহায্যের জন্য আমার দৈনিক দশ হাজার টাকা চাই। উহার কম হলে চলবে না।"

পাবনার সে মক্কেলটি দৈনিক দশ হাজার টাকা দিতে চাহিলে চিত্তরঞ্জন মোকদ্দমাটির জন্য পাবনা যাইতেন। তাঁহ'র হইত শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম আর পারিশ্রমিকের ফি-র টাকা সবই তিনি দান করিতেন সাহায্যের তহবিলে।

আবার বিনা ফি-তে রাজনৈতিক মোকদ্দমা ছাড়াও তিনি অনেক মোকদ্দমা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। ঘটনাটি মৃণীন্দ্র দেব রায় "বসুমতীতে" প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ঘটনাটি এই: মৃণীন্দ্র দেব রায়ের কোন এক আত্মীয়ার একটি মোকদ্দমা দীর্ঘ বারো বৎসর যাবৎ চলিতেছিল। অবশেষে হতাশ হইয়া চিত্তরঞ্জনকে তিনি ব্যারিস্টার নিযুক্ত করেন। চিত্তরঞ্জন তখন শীর্ষস্থানীয় আইনজীবী, প্রচুর পসার। মোকদ্দমা সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনার পর তাঁহাকে ফি দিতে উদ্যত হইলে চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "এখন থাক্। ব্রিফ্ রেখে যান। কাল যখন হাইকোর্টে মোকদ্দমা উঠবে আমাকে ডেকে নিয়ে যাবেন।" পরের দিন চিত্তরঞ্জনকে যখন ডাকিতে গেলেন তখন মৃণীন্দ্র দেব রায় দেখিলেন, চিত্তরঞ্জন তাহাদের ব্রিফ্ লইয়াই মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। অন্য মক্কেলগণ চারদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ডাকাডাকি করিতেছে। চিত্তরঞ্জন এক একজনের ডাকে ব্রিফের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়া দিতেছেন, তারিখ নিন, সময় নিন। মৃণীন্দ্র দেব রায়ের আত্মীয়ার বারো বৎসরের মোকদ্দমাটি চিত্তরঞ্জন অতি অল্প কথায় প্রাঞ্জল ভাষায় এমন যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, বিচারপতি তাঁহার মতই গ্রহণ করিয়া রায় দিলেন। জয় চিত্তরঞ্জনের। তখন ব্যারিস্টারের ফি-র কথা উঠিলে চিত্তরঞ্জন এক পয়সাও গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, "ঘটনাটি শুনে আমি নিজে থেকেই মোকদ্দমাটি হাতে নিয়েছি সুতরাং ফি-র প্রশ্ন ওঠে না।" কিন্তু তাঁহার 'নিজ থেকে' মোকদ্দমাটি হাতে নেওয়ার কারণ ভদ্রমহিলার দুঃখের কাহিনী।

শুনিতেও ভাল লাগে যে আইনজীবী দুঃখের কাহিনী শুনিয়া বিনা ফি-তে মোকদ্দমা করেন। এমন দৃষ্টান্ত বিরল। কারণ আইনজীবিগণ সম্বন্ধে দেশে যে কথাটি প্রচলিত আছে তাহা শ্রুতিমধুর নহে; জোঁকের মত তাহারা নাকি মক্কেলের রক্ত চোষে। বাল্যকালে এমন ধারণা চিত্তরঞ্জনেরও ছিল। তখন তাঁহার জ্যাঠামহাশয় দুর্গামোহন একদিন জিজ্ঞাসা করিয়া-

ছিলেন, 'চিত্ত তুমি কি হইবে? চিত্তরঞ্জন জানাইয়াছিলেন, "আইনজীবিগণ সব জুয়াচোর, আমি আইনজীবী হব না।" কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে তাঁহাকে আইনজীবীই হইতে হইয়াছে। হয়তো সে কারণেই যাহার উপর তাঁহার হাত ছিল তাহাকে তিনি শক্ত হাতে ধরিয়াই আইনজীবী সম্বন্ধে যে দুর্নাম তাহা দূর করিবার জন্য আইনজীবী জীবনের ধাপে ধাপে মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন যে আইনজীবীর মন আছে, ধর্ম আছে, মনুষ্যত্ব আছে। এ প্রসঙ্গে আর একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতেছে।

চিত্তরঞ্জন তখন কলিকাতা হাইকোর্টের শীর্ষতম আইন ব্যবসায়ী। কি ফৌজদারী, কি দেওয়ানী—উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতবর্ষে আর কেহ ছিল না। সেই সময় বিখ্যাত এ্যাটর্নী শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত তাহার এক মাড়োয়ারী মক্কেলের পক্ষ অবলম্বনের জন্য চিত্তরঞ্জনকে ব্যারিস্টার নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বিচারপতি মিঃ ফ্লেচারের নিজের কক্ষে এই মোকদ্দমাটি ছিল এবং ইহা একটি আবেদনের মোকদ্দমা। অপরপক্ষে আইনজীবী ছিলেন স্যার বিনোদচন্দ্র মিত্র। স্যার বিনোদ মিত্র অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেশী এবং বিদেশী কয়েকটি আদালতের বিভিন্ন রায়ের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বিচারপতিকে তাহার বক্তব্য বুঝাইয়া দিলেন। বলিতে গেলে বলিতে হয়, চিত্তরঞ্জনকে কিছু বলিবার মত সুযোগও দেওয়া হয় নাই। বিচারপতিও কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহার 'রায়' দিয়া দিলেন। 'রায়' প্রকাশিত হইলে জানা গেল যে, স্যার বিনোদচন্দ্র জয়লাভ করিয়াছেন।

জয়লাভের আশাতেই মাড়োয়ারী মক্কেলটি শীর্ষতম আইনজীবী চিত্তরঞ্জনকে নিযুক্ত করিয়াছিল। মোকদ্দমায় পরাজিত হইয়া সে এ্যাটর্নী শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয়কে দোষারোপ করিল। মক্কেলের যে ক্ষোভের কারণ আছে এ্যাটর্নী তাহা বুঝিতে পারিলেন; তাহারও বলিবার কিছু ছিল না। এ্যাটর্নী দত্ত মহাশয়ের অবস্থা চিত্তরঞ্জন বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয়কে ডাকিয়া নিজের ত্রুটির কথাস্বীকার করিয়া বলিলেন, "আমারই গাফিলতির জন্য তোমার মাড়োয়ারী মক্কেলের পরাজয় হয়েছে। অপরাধ আমারই। সত্যিই আমি ব্রিফ্‌টি খুব মন দিয়ে দেখিনি।"

কোন ব্যবহারজীবীই নিজের এমন ত্রুটির কথা স্বীকার করে না, চিত্তরঞ্জন

স্বীকার করিলেন। তবুও ঘটনাটি এখানেই শেষ হইলে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য হইত না কিন্তু উল্লেখযোগ্য হওয়ার কারণ, চিত্তরঞ্জন শৈলেন্দ্র দত্ত মহাশয়কে মিঃ জাস্টিস ফ্লেচারের প্রদত্ত ঐ রায়ের বিরুদ্ধে পুনরায় আপীল করিবার জন্য উপদেশ দিলেন এবং নিজেই ঐ আপীলের মুসাবিদা করিয়া দিলেন। আরও বলিলেন যে, আপীলের সময় তিনিই দাঁড়াইবেন কিন্তু ঐ মক্কেলের নিকট হইতে তিনি আর কোনরূপ ফি গ্রহণ করিবেন না। মোকদ্দমার তারিখ পড়িল। কিন্তু এমনই অবস্থা দাঁড়াইল যে, ঐ আপীল মোকদ্দমার তারিখেই ডুমরাওন মামলার দিন ধার্য হয়। সুতরাং চিত্তরঞ্জনের পক্ষে ঐ তারিখে কলিকাতা থাকা কিছুতেই সম্ভব হইবে না। কিন্তু চিত্তরঞ্জন তো শুধু আইনজীবীই নহেন, কালো কোটের অন্তরালে তাঁহার যে শুভ্র সমুজ্জল মন ছিল সে-মনের হিসাব ছিল অন্য। তাঁহার মনে ঐ মক্কেল ছিলই। তিনি আবার এ্যাটর্নী শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন যে ডুমরাওন মোকদ্দমার জন্য তাঁহার পক্ষে ঐ দিন কলিকাতায় থাকা সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং ব্যারিস্টার সিনিয়র এস. আর. দাসকে যেন ঐ আপীল মোকদ্দমার ব্যাপারে নিযুক্ত করা হয়। উহার জন্য তাহার ফি হিসাবে যত টাকার প্রয়োজন হইবে সে-টাকা ঐ মাড়োয়ারী মক্কেলকে দিতে হইবে না; চিত্তরঞ্জন নিজেই সে-টাকা দিবেন। এখানে আইনজীবী চিত্তরঞ্জন যে মানুষ চিত্তরঞ্জন; তাঁহার কাছে টাকার চাইতেও মনুষ্যত্ব যে অনেক বড়।

আবার আইনজীবী জীবনে আরও ঘটনা রহিয়াছে যাহা বৈচিত্র্যের দিক হইতে অভিনব। ডুমরাওন মোকদ্দমার সময় কেশোপ্রসাদের এক সময় অর্থের অভাবে অত্যন্ত দুরবস্থা হয়। কেশোপ্রসাদের নিকট হইতে নিয়মিত ফি না পাইয়া চিত্তরঞ্জনও অর্থাভাবের মধ্যেই পতিত হন। তখন তাঁহারও টাকার একান্ত প্রয়োজন। ঠিক সেই সময় কেশোপ্রসাদ অত্যন্ত চড়া সুদে তিন লক্ষ টাকা ঋণ করিতে চাহিল কিন্তু টাকা ফেরত পাইবে না আশঙ্কায় বেশী সুদের লোভেও কেহ ঋণ দিতে চাহিল না। এক ভদ্রলোকের লাখ তিনেক টাকাই ছিল। সুদে-আসলে ২ বৎসরে ছয় লক্ষ টাকা পাইবে এই লোভে সে কেশোপ্রসাদকে ঋণ দান করিবে বলিয়া মনে মনে ঠিক করে। চিত্তরঞ্জন ছিলেন এই ভদ্রলোকের প্রতিবেশী। এই ঋণ দান করিবে কি করিবে না এই সমস্যার সমাধানের জন্য সে একদিন চিত্তরঞ্জনের নিকট আসিলে চিত্ত-

রঞ্জন বলিলেন, "মোকদ্দমায় কেশোপ্রসাদের জয়লাভের সম্ভাবনা আছে কিন্তু যাহার তিন লক্ষ টাকাই সম্বল আমি তাহাকে সেই তিন লক্ষ টাকাই ঋণ দিতে উপদেশ দিতে পারি না।"

অন্য এক ভদ্রলোকও সেখানে উপস্থিত ছিল। সে চিত্তরঞ্জনকে বলিল, "বেশ মশায় খুব সস্তায় নামটা কিনে নিলেন।"

চিত্তরঞ্জন বিরক্ত হইয়া তাহাকে জানাইলেন, "এমন কথা বলা তোমার অন্যায়। যাহার খুব বেশী আছে সে অনায়াসে এই টাকা ঋণ দিতে পারে, কিন্তু যার তিন লক্ষ টাকাই সম্বল, তার পক্ষে তো দেওয়া সঙ্গতই নয়।"

চিত্তরঞ্জন নিজের কিন্তু তখন অসচ্ছল অবস্থা। কেশোপ্রসাদ ঐ ঋণ পাইলে, বকেয়া ফি-য়ের টাকা হিসাবে চিত্তরঞ্জনও কেশোপ্রসাদের নিকট হইতে টাকা পাইতেন তবুও নিজের সেই স্বার্থের কথা ভাবিয়াও চিত্তরঞ্জন স্বার্থান্ধের মত সেই ভদ্রলোককে অসঙ্গত উপদেশ দিতে পারিলেন না।

• এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন হইতেও দুই একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেশবন্ধু তখন সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী জীবন যাপন করিতেছিলেন। সেই সময় ঐ জেলেই মথুর নামে একজন দাগী আসামীও সেখানে ছিল; সে ছিল সাধারণ কয়েদী। মথুর বাহিরে ছিল অত্যন্ত দুর্দান্ত; সে চুরি করিয়াছে, অনেক রাহাজানি করিয়াছে। কিন্তু জেলের ভিতরে তাহার সেই দুর্দান্ত স্বভাব কঠোর পরিশ্রমে পরিণত হইয়াছিল। সে মন ঢালিয়া নিজের হাতে দেশবন্ধুর সেবা করিয়াছে। জেলে দেশবন্ধুর অসুস্থ অবস্থায় মথুর যে ভাবে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছে তাহাতে মনে হইয়াছে যে তখন মথুরের মতই একজন সেবকের দেশবন্ধুর একান্ত প্রয়োজন ছিল। মথুর তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া দিত, খাওয়ার সময় কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত। বিছানা ঝাড়িয়া, বিছানা পাতিয়া দিত। স্নানের জল তুলিয়া রাখার পরেও দেরি দেখিলে মথুর বলিত, "বাবা। আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে, জল দিয়েছি অনেকক্ষণ।" মথুরের এই কথাগুলি ছিল একান্তই আপনজনের মত। এক-জন দাগী কয়েদী আর দেশপ্রেমিক মহান নেতা; সামাজিক মর্যাদায় দুইজনের মধ্যে আকাশ জমি পার্থক্য। কিন্তু দেখা গেল, সে ব্যবধান বিদূরিত হইয়াছে। কারণ, অন্তরের সঙ্গে অন্তরের সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে প্রয়োজন মনুষ্যত্বের। মথুরের সেবা আর যত্নে দুই দিনেই চিত্তরঞ্জনের চিত্ত পরিতৃপ্তিতে ভরিয়া

উঠিয়াছিল। মথুরের মনেও বহু বাসনার এক আবেদন, সে চিত্তরঞ্জনকেই বাকী জীবন ধরিয়া থাকিবে। এক দিন তাহার গোপন ইচ্ছা পাখা মেলিয়া মনের দুয়ার খুলিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িল, "বাবা! আমি বাহির হইয়া আপনার বাড়ীতেই থাকিব।" মথুরের ঐ ঐকান্তিক ইচ্ছা যে অপর প্রান্তের আর এক-খানি মমতাময় অন্তরেরই একান্ত ইচ্ছার প্রতি উত্তর ইহা মথুর জানিবে কি করিয়া? যিনি জানিতেন, তিনি বাহিরেও মথুরের আবেদনে নীরব না থাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা। বাইরে গিয়ে আমার কাছে থাকবি।"

বাহিরে আসিয়া মথুর চিত্তরঞ্জনের বাড়ীতেই তাঁহার খাস ভৃত্য হইয়াছিল। যেমন জেলে তেমনি বাড়ীতেও দেশবন্ধুর সব কাজ তাহার হাতে। বেলা এগারটার পরে কেহ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে মথুর রাগান্বিত হইয়া উঠিত। স্নানের দেরি হইলে বারবার মনে করাইয়া দিত, বাবা! জল ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

সেই সময় ভবানীপুর থানায় নূতন ইন্‌স্‌পেক্টর আসিয়া এলাকার সমস্ত দাগী আসামীদের জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য একদিন থানায় লইয়া গেল। মথুর বাড়ীর দাওয়ায় বসিয়াছিল। সেখান হইতেই তাহাকে থানায় লইয়া গিয়াছিল। শুনিয়া চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন এবং বিরক্ত হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করেন। দেশবন্ধুর এই মানসিক অবস্থার কথা ক্রমে পুলিশ কমিশনারের কানে গিয়া পৌছিল। পুলিশ কমিশনার তখন মার্জনা চাইবার জন্য দক্ষিণ কলিকাতার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনারকে দেশবন্ধুর নিকট পাঠাইয়াছিল। দেশবন্ধু তাহাকে আক্রমণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনারা আমাকে না বলে আমার লোককে কেন নিয়ে গেলেন?"

এসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার: ইন্‌স্‌পেক্টর মনে করেছে যে পুরাতন দাগীদের ডেকে বলে দিলে চুরি রাহাজানি কম হবে।

দেশবন্ধু: কেন, পুরাতন দাগী কি কখনও ভাল হয় না?

মথুরের প্রতি যে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল দেশবন্ধুর ঐ কথাটির মধ্যে তাহারই প্রমাণ এবং মথুর সত্য সত্যই ভাল থাক এবং সৎভাবে জীবন যাপন করুক ইহাই যে চিত্তরঞ্জন চাহিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একদিন ভোম্বল আসিয়া বলিল, বাবা! মথুর আর থাকিতে চাহে না।

দেশবন্ধু এক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করিলেন। ভোম্বলকে বলিলেন, "ব্যাটা

অন্ত কোন জায়গায় গেলেই ধরা পড়বে। ওকে বলে দে, একবার এখান থেকে চলে গেলে কিন্তু পরে আমি আর ওকে জায়গা দেব না।"

চিত্তরঞ্জনের এই কথাগুলি শাসন আর স্নেহমিশ্রিত। 'স্নেহ অতি বিষম বস্তু'।—চিত্তরঞ্জনের অন্তর যমুনার যে পবিত্র স্নেহ ধারায় মথুর সিক্ত হইয়াছে, সেই স্নেহের কথা, সেই শান্ত নীড়ের শীতলতা ছাড়িয়া মথুর কিন্তু তখন আর যাইতে চাহিল না, যাইতেও পারিল না।

বেশ ছিল মথুর। পুলিশ জমাদারগণ তাহাকে দেখিলে বলিত, 'তুই বেটা মানুষ হ'য়ে গেলি।' কিন্তু নীচ মনোবৃত্তির মরণ সহজে হয় না। তাহারই আবার নূতন করিয়া প্রমাণ পাওয়া গেল মথুরের জীবনেই। জানা গিয়াছে যে, দেশবন্ধুর দার্জিলিং অবস্থানের সময় রসারোডের বাড়ী হইতে মথুর অনেক রূপার বাসন চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এই মথুর প্রসঙ্গে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন, "আমার খুব ভরসা ছিল মথুরের আর পতন হইবে না। কিন্তু দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পর পত্রদ্বারা যখন মথুরের খবর লইলাম তখন শুনিলাম সে ইতিপূর্বে তাঁহার দার্জিলিংবাসের সময় রসারোডের বাড়ী হইতে অনেকগুলি রূপার জিনিসপত্র লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এ অদ্ভুত কথা শুনিয়া আমার Les miserebles-এর গল্পের কথা মনে পড়িল। আমার এখনও বিশ্বাস যে মথুর তাঁর সঙ্গে থাকিলে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবের দরুন লোভের বশীভূত হইত না। ক্ষণিক দুর্বলতার বশে সে চুরি করিয়াছিল সন্দেহ নাই, তবে আমার বিশ্বাস যে তিনি জীবিত থাকিলে সে কোন দিন কাঁদিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িত।"

পায়ে যে পড়িত তাহার চাইতে এত অপরাধের পরেও পায়ে যিনি স্থান দিতেন, মহত্ত্ব আর মনুষ্যত্ব তো তাঁহারই বেশী। সুভাষচন্দ্র তাঁহার লেখার মধ্যে সেই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন।

জীবনের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিবেশে চিত্তরঞ্জনের এমন মমতাময় মনের পরিচয়ের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হইল। কিন্তু তাঁহার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে এমন মানবিকতার পরিচয় পরিপূর্ণ। চিত্তরঞ্জন যেমন রাজবন্দীদের জন্য রাজদ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন, কয়েদী মথুরের প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি সাধারণ একটি স্বেচ্ছাসেবকের শবানুগমন করিয়া 'রাজদ্বারে শ্মশানে চ' কথাটিরও সত্যতা প্রমাণিত করিয়া দিয়াছেন।

তখন ১৯২০ সাল। নাগপুরে ভারতীয় কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে যোগদানের জন্য চিত্তরঞ্জন সেখানে গিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে রাজনৈতিক মতবাদ লইয়া গান্ধীজীর সঙ্গে দেশবন্ধুর যে মনের অনৈক্য চলিতেছিল নাগপুর অধিবেশনে তাহা বিদূরিত করিয়া এই দুই মহান জননায়ক তখন পাশাপাশি বসিলেন। ভারতের রাজনৈতিকক্ষেত্রে এই মিলন বড়ই আকাঙ্ক্ষিত ছিল এবং উহা অত্যন্ত আনন্দেরও। রাজনৈতিক দুই শিবিরের মিলনে, সে এক মিলনোৎসব! এই আনন্দময় পরিবেশকে ম্লান করিয়া দিতে হঠাৎ কোথা হইতে একখানি বিষাদের কালোছায়া অতর্কিতে নামিয়া আসিল। একজন স্বেচ্ছাসেবক সর্দি-গর্মিতে হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন; তাহার নাম সতীশচন্দ্র দাস। দুঃসংবাদটি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। শুনিল ছোট বড় অনেক নায়ক, মহানায়ক। এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদে কাহার অন্তরে কতটুকু বেদনা জাগিয়াছিল তাহা কে জানে—কিন্তু তাহা বুঝিতে পারা গেল বেদনা প্রকাশে।—শুনিয়া চিত্তরঞ্জনের দুই চোখে জল ভরিয়া উঠিল। কিন্তু বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, চিত্তরঞ্জন শুধু সেখানে বসিয়া অশ্রুপাত করেন নাই, তিনি স্বেচ্ছাসেবকটির মৃত আত্মার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য শবানুগমন করিয়াছিলেন; তাহাও দুই এক মাইল পথ নহে,—দীর্ঘ চার মাইল নগ্নপদে চিত্তরঞ্জন হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। কোথাও তপ্ত বালুকারাশির পথ, কোথাও গভীর কাঁটাবনের মাঝ দিয়া আল পথের মত একটু পথ; আবার কোথাও উঁচু নীচু। চিত্তরঞ্জনের তখন এক নূতন চেহারা! যুদ্ধের জন্য তিনি নাগপুরে গিয়াছিলেন যোদ্ধবেশে। যুদ্ধজয়ের পর তাঁহার এই ম্লানমুখখানি কিন্তু মানবিকতার দিক হইতে অনেক মূল্যবান! ছাত্রাবস্থায় বিলাতের মাটিতে দাঁড়াইয়া লর্ড সেলসবারীর বিরুদ্ধে তিনি যখন সিংহের মত গর্জন করিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার সেই গর্জন-মুখর মুখখানি দেখা গিয়াছে, আদালতের প্রাঙ্গণে কত দিন, কত ব্যাপারে তাঁহার পৌরুষ-দীপ্ত চেহারা দেখা গিয়াছে। সেই চেহারার পার্শ্বে চিত্তরঞ্জনের এই ব্যথা ম্লান নীরব মূর্তির মূল্য কি কম ?—না বেশী ?

আবার সামাজিক একটি বিশেষ দিকেও তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। দয়ার অবতার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মানব-মনে যে ব্যথার জন্য বিধবা বিবাহ প্রচলন করিয়াছিলেন, চিত্তরঞ্জনও সেই ব্যথায় ব্যথিত হইয়া বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার অভিমত ছিল যে, মনের উপর কাহারো

জোর করা চলে না,—উচিতও নয়। যাহার ইচ্ছা নাই অথচ সমাজের চাপে ফেলিয়া তাহাকে দিয়াই ব্রহ্মচর্য পালন করাইতে হইবে ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না—তাহার চাইতে যাহার ইচ্ছা আছে তেমন বিধবাকে বিবাহ দেওয়াই উচিত। তিনি বলিয়াছেন, ব্রহ্মচর্য পালন করিতে পারে খুব ভাল! আমি জানি ভারতে চরিত্রবতী কার্যক্ষমা মহিলাদ্বারা অসাধ্য সাধন হইতে পারে, কিন্তু সংযম রক্ষা করিতে না পারিলে, একজনের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই বিশেষ বাঞ্ছনীয়।" রসিক বিশ্বাস নামক জনৈক নমঃশূদ্র ভদ্রলোক বিধবা বিবাহ করিয়াছিল। ইহা শুনিয়া তিনি খুব প্রীত হইয়াছিলেন, এবং তাহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

আত্মীয়-অনাত্মীয়, আপন-পর, রাজনৈতিক সহকর্মী, আইনজীবী জীবনের মক্কেল এবং সমাজের এই ভাগ্যহীনা বিধবাদের জন্য তাঁহার মন প্রাণ কাঁদিত —বলা যায় সমগ্র মানব জাতির জন্যই তাঁহার মন কাঁদিত। তাহার প্রমাণ নিম্নোক্ত বিবরণ হইতেই পাওয়া যাইবে।

চিত্তরঞ্জন তখন তাঁহার ব্যবসায়ী জীবনের শীর্ষস্থানে উঠিয়াছেন। সেই সময় একদিন সকালের দিকে তিনি ব্রীফ্ দেখিতেছিলেন। এমন সময় গিরিজা শঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে জানাইলেন যে রাস্তায় একটি নবজাত শিশুকে মৃত অবস্থায় তিনি তখন দেখিয়া আসিয়াছেন। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়—মৃত্যু ঘটান হইয়াছে। শিশুটির চক্ষু দিয়া তখনও রক্ত ঝড়িয়া পড়িতেছে। শিশুটির কোন পাপ নাই, কোন অপরাধও নাই তাহার—সেই নিষ্পাপ, নিরপরাধ শিশুকে এমন করিয়া হত্যা!—বেদনায় চিত্তরঞ্জন কাঁপিয়া উঠিলেন। ব্রীফ্ হইতে চোখ তুলিয়া, বিষাদ-করুণ চোখ দুইটিকে জানালার বাহিরে নীল আকাশের দিকে কিছুক্ষণ নিক্ষেপ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। করুণার কণা তাঁহার চোখে তখন অশ্রুবিন্দু হইয়া আসিয়াছে। বলিলেন, "একি নৃশংশতা! এরূপ শিশু যাহাতে রক্ষা পায় তজ্জন্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠা কল্পে আমি এক লক্ষ টাকা ধার করিয়া ব্যয় করিব।"

সুন্দর, কুৎসিত যে কোন মুখ নিয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইলে যেমন সেই মুখ-ছবিই আয়নায় ভাসিয়া উঠিবেই, চিত্তরঞ্জনের সংবেদনশীল মনে সব জায়গার সকলের সব রকম ব্যথা বেদনাও তেমনি বাজিয়া উঠিত। বৈধব্যের উপর বিধবার কোন হাত নাই, এই জগতে আসার জন্য এই শিশুরও হাত নাই

—তবে কেন তাহারা অবাঞ্ছিত? চিত্তরঞ্জনের এই ব্যথিত মনই ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের অনুষ্ঠানে অনেক সাহায্য করিয়াছে। নবদ্বীপের এমন সেবা-কর্মে ব্রতী একটি অনুষ্ঠানকেও চিত্তরঞ্জন আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন। পরবর্তী সময়ে যখন ইহার নূতন নামকরণ হইল 'মাতৃ-মন্দির' তখন কতিপয় ন্যায়-শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ ঐরূপ নামকরণের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। পণ্ডিত-মহাশয়গণের ঐরূপ ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া সেই নৈয়ায়িকগণের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, "কেন, ওখানে দেবতা নাই কেন? দেবতা কি কেবল নবদ্বীপের পণ্ডিত মশায়দের আর শাস্ত্রীমশায়দের বগলেই।" তিনি নবদ্বীপের এই মাতৃ-মন্দিরকে সাহায্য করিবার জন্য দুই লক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটি কোন কারণ বশতঃ দেশ-বন্ধুর নিকট হইতে ঐ সাহায্য পাইতে বঞ্চিত হয়।"

দেশবন্ধু সম্বন্ধে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন, "আমি দেখিয়াছি তিনি সর্বদা মানুষের দোষগুণ বিচার না করিয়া তাহাকে ভালোবাসিতে পারিতেন।"

এ পর্যায়েও দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। উহাতে দেখা যাইবে যে তাঁহার মনের দুয়ার কতখানি অবারিত ছিল,—সে-সিংহদুয়ার দিয়া সকল শ্রেণীর, সকল স্তরের মানুষেরই প্রবেশ অধিকার ছিল। তাঁহার একটি বাল্যবন্ধু ছিল। তাহার মাতা একবার মৃত্যুশয্যায়, তাহার পুত্র অর্থাৎ দেশবন্ধুর বাল্যবন্ধুটি তখন মাতার শয্যাপার্শ্বে ছিল না। সে বিদেশে ছিল। জানা গিয়াছে যে পূর্বে ঐ মহিলাটির পদস্খলন হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হউক, চিত্তরঞ্জন তাহা কিছু মনেই করিতেন না। বাল্যবন্ধুর মা; বাল্যবন্ধু বিদেশে সুতরাং নিজের মনের প্রেরণায় প্রায়ই তাহাকে দেখিতে যাওয়া তিনি পবিত্র কর্তব্য মনে করিতেন। একদিন দৈনিকের কাজ-কর্ম সমাপনান্তে অনেক রাত্রে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমুকের মা কেমন আছে গো?"

একজন বলিয়া উঠিলেন "তাকে আর দেখিতে যাওয়া কেন? তাহার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

তাহার নিকট হইতে এমন কথা শুনিবেন বলিয়া চিত্তরঞ্জন আশা করেন নাই। শুনিয়া তিনি খুব বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে তাহাকে বলিলেন "কেন, তুমি আমি মরতে পারি না? পদস্খলন হওয়া

আশ্চর্য নয় তাই বলে মরবার সময়েও তাঁকে ঠেলে ফেলতে হবে ?"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মানুষের জন্য তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ছিল—গুণাগুণ বিচারে তাঁহার মন কখনও আগ্রহী ছিল না। এই কারণেই সকল জাতির, সকল ধর্মের, সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষই তাঁহার মনের মন্দিরে স্থান পাইত। বাল্যবন্ধুর মায়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও এ প্রসঙ্গে আরও একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতেছে।

কবি চিত্তরঞ্জন। কবি বলিলে সাধারণতঃ স্বপ্নলোকে বিচরণকারী একজন ভাবুক মানুষের মূর্তি ভাসিয়া ওঠে। চিত্তরঞ্জনের বড় বড় চোখ দুইটিতেই, চোখের তারায় তারায়, পল্লবে পল্লবে রাশি রাশি স্বপ্ন মাখা থাকিলেও তাঁহার চোখে ছিল বাস্তব দৃষ্টি। তাই বাস্তবের আঙ্গিনায় বসিয়াই তাঁহার কাব্য সাধনা।—আবার এই বাস্তবের আঙ্গিনায় বসিয়া যাহা তিনি রচনা করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার মূল পরিচয় নয়—মূল পরিচয় ঐ কবিতা রচনার উৎসে। সেই উৎসের সন্ধান করিতে গিয়াই আবার 'বারবিলাসিনী' কবিতাটির কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে।

চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত সংগীতপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে যেমন সাহিত্যের বাসর বসিত তেমনি বসিত গানের আসর। গানের আসরে আসিত বিখ্যাত গায়ক-গায়িকা। তখনকার দিনের বিখ্যাত বাঈজীরাও তাঁহাকে অনেক গান শুনাইত। বাঈজীগণ চিত্তরঞ্জনের বাড়ী আসিত। চিত্তরঞ্জন তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন, তাহাদের সঙ্গে গল্প করিতেন। বাসন্তী দেবীও তাহাদের অনেক যত্ন-আদর করিতেন এবং সুস্বাদু খাবার দিয়া আপ্যায়িত করিতেন।

এখানে নিঃসন্দেহে এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যায় যে এই বাঈজীদের গান শুনিয়া তাহাদের সঙ্গে গল্পের মাধ্যমে কথা বলিয়া যে ব্যথায় তাঁহার মনখানি বেদনাতুর হইয়া সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল উহাই তাঁহার 'বারবিলাসিনী' কবিতার উৎস। এখানে কবিতার আঙ্গিনায় তাঁহার সহানুভূতিপুর্ণ অন্তরের পরিচয়।

কবি চিত্তরঞ্জন পর্যায়ে এই কবিতাটির আলোচনা করা হইয়াছে। বলাও হইয়াছে যে সমাজের বুকে বিশেষতঃ গোড়া হিন্দু, ব্রাহ্ম এবং পণ্ডিতগণ চিত্তরঞ্জনকে দুশ্চরিত্র, মাতাল ইত্যাদি বলিতে ছাড়ে নাই।

কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিচয় দিতে এবং নিজের মনুষ্যত্বে অটল থাকিতে যে দৃঢ় মনের জোর থাকার দরকার, সমাজের বুকে দাঁড়াইয়া চিত্তরঞ্জন তাহা বার বার প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। বারবিলাসিনীর দুঃখ বুঝিতে হইলে যে দুশ্চরিত্র হইতে হয় না, মানুষ হইতে হয় এ বোধটাই তখনকার সমালোচকদের ছিল না। এ প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জনের জ্যেষ্ঠাকন্যা অপর্ণা দেবী যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে, "বাবাকে লোকে ওদের সঙ্গে মেলামেশা নিয়ে কত নিন্দে করেছে, অপবাদ রটিয়েছে। ঐ সব অপবাদ যদি বাবার সম্পর্কে সত্যি হ'ত আমার তো মনে হয় না মা তাদের সঙ্গে এত সহজ ও সুন্দর ব্যবহার করতে পারতেন।"

বাঈজীরূপে গান গাহিতে আসিয়া তাহারা মানুষ চিত্তরঞ্জনের নিকট হইতে যে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির পরিচয় পাইয়া গিয়াছেন, প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রতিদানে তাহারাও কিন্তু অকৃতজ্ঞ হইয়া থাকে নাই। তখন তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারের জন্য অর্থ ভিক্ষা করা হইতেছে। চিত্তরঞ্জনের মেয়েরাও স্বরাজ ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কলিকাতা শহরের রাস্তায় নামিয়াছেন। কথাটি রাষ্ট্র হইয়া গেল শহরময়। অপর্ণা দেবী প্রভৃতি ঐ সব সমাজ বহির্ভূত মেয়েদের মহল্লা দিয়া যাওয়ার সময় কোন বাড়ীর নীচে দাঁড়াইলেই উপর হইতে অনেক সোনার গহনা এবং টাকা-পয়সা বৃষ্টির মত পতিত হইয়াছে। একবার উপর হইতে এমন একটি ভারী সোনার গহনা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে অপর্ণা দেবীর পা গভীরভাবে কাটিয়া যায়। বুঝিতে হইবে, গহনাটি তবে অনেক ভারী সোনার। এ দান অপর্ণা দেবী প্রভৃতির মাধ্যমে চিত্তরঞ্জনকে নহে, উহা ভারতের মুক্তির জন্য তিলক স্বরাজ-ভাণ্ডারে। কিন্তু তাহাদের এই দানের প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিয়াছে কে? জাগাইয়া দিয়াছে একটি মানুষ; একটি মানুষ চিত্তরঞ্জন, অনন্ত আকাশের মত উদার তাঁহার মানব-মনের ভালোবাসা।

আবার সমাজে যাহারা মদ খাইয়া উহার নেশায় চেতনা হারাইয়া রাস্তায় মাতলামি করে তাহারাও এক শ্রেণীর স্খলিত মানুষ বলা যায়। তাহাদের পাশেও দেখা গিয়াছে শান্ত, সৌম্য ক্ষমাসুন্দর চিত্তরঞ্জনকে।

তখন অসহযোগ আন্দোলনের সময়। কলিকাতা শহর উত্তপ্ত। মনের এবং দেহের পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হইয়া চিত্তরঞ্জন অনেক রাতে বাড়ী ফিরিয়া

আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। সেই গভীর রাতে বাইরে গোলমাল আর চীৎকারে বাড়ীর সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

পুলিশ একটি মাতালকে হাত কড়া দিয়া বাঁধিয়া থানায় লইয়া যাইতেছে। সেই মাতালটি চীৎকার করিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া বলিয়া চলিয়াছে, "দোহাই বাবা চিত্তরঞ্জন! তুমি গরীবের মা-বাপ, তোমার ফটকের কাছ থেকে আমায় পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে। আমি কোন দোষ করিনি বাবা, খালি ক্ষিদের জ্বালায় খাবার যোগাড় করতে না পেরে আমার বন্ধু হারুর কাছ থেকে ভিক্ষে করে একটু তাড়ি খেয়েছি। তাতেই খালি পেটে নেশা ধরে গিয়েছে, তুমি দয়াবান, আমাকে দয়া কর বাবা।"

আইনজীবী জীবনে মক্কেলের হইয়া বিচারপতির নিকট অনেক আর্জি তিনি করিয়াছেন, এবার তাঁহার নিকটই ঐ আর্জির বাণী মূর্ত হইয়া উঠিল। তিনি খাট হইতে নামিলেন,—নীচে যাইবেন।

ছোট কন্যা কল্যাণী দেবী বলিলেন, "বাবা! তুমি এত রাত্রে শ্রান্ত শরীর নিয়ে আবার নীচে যাবে একটা মাতালের জন্য? তুমি ওদের ঘৃণা কর না?"

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া চিত্তরঞ্জন মেয়েকে জানাইলেন, "না-রে কাউকেই আমি ঘৃণা করি না, ওরাও তো তোর আমার মতই মানুষ। তবে ওরা বড়ই দুর্বল ও অসুস্থ, তাই তো দয়া, দরদ দিয়ে আমাদের কর্তব্য ওদের মনের চিকিৎসা করা।"

চিত্তরঞ্জন নীচে নামিয়া গেলেন। পুলিশটিকে বলিলেন, "ভাইয়া ছেড়ে দাও বেচারীকে। ওর এখন কোন জ্ঞান নেই। যথেষ্ট মারধোর করেছ, আর কেন? দুঃখী গরীব বলেই ওকে থানায় নিয়ে যাচ্ছ, ধনীর ঘরের ভদ্র-লোকের শিক্ষিত ছেলে হয়ে তারা যখন নেশায় ভার হয়ে থাকে, তখন তাদের কে ধরে? আমি বলছি ছেড়ে দাও, এতে তোমাদের ওপর যাতে দোষারোপ না হয় আমি দেখবো।"

চিত্তরঞ্জন তখন হতভাগাকে হাত ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে নিয়া গিয়া ফটক বন্ধ করিয়া দিলেন। উপরে গিয়া বাসন্তী দেবীকে বলিলেন, "দেখো এদের মন অসুস্থ, পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, গৃহে আনন্দ নেই, সৎ শিক্ষাও কিছু নেই, এদের ওপর বিরক্ত হতে নেই, এদের তোমরা ঘৃণা করো না। আমি হতভাগাকে আজ অতিথি বলে ঘরে স্থান দিয়েছি। জানো তো

তুমি অতিথি হলেন নারায়ণ? সকালে ওকে কিছু খাইয়ে একখানা কাপড় দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিও।"

রাস্তার একটি মাতাল, তাহারই জন্য দেশবন্ধুর এই মমতা—এই মানবতা-বোধ। সকালে নেশা কাটিয়া গেলে তাহাকে খাওয়াইয়া যেন একটি নূতন কাপড় দিয়া বাড়ী পৌছাইয়া দেওয়া হয় সেই নির্দেশও বাসন্তী দেবীকে দিয়া দিলেন—নেশায় মত্ত মানুষটি তাঁহার নিকট অতিথি—অতিথি নারায়ণ!

প্রদীপ্ত সূর্যের রশ্মি জগতের দিক্-দিক্ বিচ্ছুরিত হইয়া নানা দিক আলোকিত করে। মানুষ চিত্তরঞ্জনের মনুষ্যত্বের পরিচয়ও তেমনি দেশের, সমাজের সকল স্তরের মানুষই লাভ করিয়াছে। সকলের জন্যই তিনি ভাবিয়াছেন, সেই ভাবনা শুধু মনেই নহে, কার্যতঃও উহার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন।

চিত্তরঞ্জনের মেয়েরা লরেটোতে পড়িতেন। সেখানে কারোর হাতে সোনার চুড়ি, কারোর হাতে সোনার বালা, হাত কাহারোরই খালি নয়। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের মেয়েদের হাতে কোনো সোনার গহনা নাই। অপর্ণা দেবীর বয়স তখন প্রায় এগার হইয়াছে। সমবয়স্কা বন্ধুরা অপর্ণাকে বলে, "তোর বাবা বড়লোক, কিন্তু তোদের হাতে সোনার চুড়ি নেই কেন?"

শুনিয়া ভাবিলেন অপর্ণা দেবী। একদিন স্কুল হইতে ফিরিয়া বাসন্তী দেবীকে বলিলেন, "মা, আমার বাবা বড়লোক, কিন্তু আমাদের সোনার চুড়ি নাই কেন?"

বাসন্তী দেবী মেয়েকে আদর করিয়া বলিলেন, "এমন কথা বলতে নেই। টাকা পয়সা দিয়ে বড় ছোট বিচার হয় না মা।—তোমার বাবাকে গিয়ে বল।"

অপর্ণা দেবী চলিয়া গেলেন চিত্তরঞ্জনের নিকট। অভিমানের সুরে চিত্তরঞ্জনকে নিজের আব্দারের কথা জানাইলেন।

মেয়ের মনের ভাব চিত্তরঞ্জন বুঝিলেন। যিনি মানুষ তিনি তো স্নেহশীল পিতাও। আদর করিয়া মেয়েকে কোলে টানিয়া আনিয়া সস্নেহে বলিলেন, "মা, তোমাকে আমি সোনার চুড়ি গড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু এত মেয়ের হাত খালি! সবাইকে তো সোনার চুড়ি গড়িয়ে দিতে পারব না মা। একা একা পেলে কি কোন জিনিস ভালো লাগে? সবাই মিলে পেলে যে আনন্দ হয় সেই তো আনন্দ!"

অর্থাৎ যে সোনার গহনা দেশের অধিকাংশ মেয়ের হাতে নাই ধন-কুবের

দেশবন্ধুর পবিত্র মানবতাবোধ নিজের মেয়েদের সেই সোনার চুড়ি গড়াইয়া দিতে বাধা দান করিয়াছে। নিজের মেয়েদের এই গহনা না দেওয়ায় তাঁহার যে-মন তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার সেই মনই আবার অপর মেয়েদের সোনার গহনা নিজের হাতে আসিয়া পৌছাইলে তৃপ্তিতে দুই চোখের জল ফেলিয়াছেন—এ শুধু তাঁহার মনের বিভিন্ন চিত্র!

চিত্তরঞ্জন তখন জেলে ছিলেন। অপর্ণা দেবী এবং আরও অনেকে তখন দান সংগ্রহ করিতে দৈনিক বাড়ী বাড়ী ঘুরিতেন। যাহা দান হিসাবে পাইতেন তাহা সবই জেলে নিয়া চিত্তরঞ্জনকে দেখাইতেন। তাহার মধ্যে ছিল কত দরিদ্রের দান, দিন মজুরের দান। রোজ যে সোনার গহনা দান হিসাবে পাইতেন, অপর্ণা দেবী ও কল্যাণী দেবী দুই বোন তাহা পরিয়া জেলে দেশবন্ধুকে দেখাইবার জন্য যাইতেন। চিত্তরঞ্জন উহা দেখিতেন, দেখিতেন, আর বুঝিতেন,—দেশের মুক্তিযুদ্ধে মেয়েদের এই সোনার গহনা দান মানেই তাহাদের অন্তর দান; এই সোনার গহনার মধ্যে দেশবাসী রমণীগণের অন্তর দেখিয়া আনন্দ আর তৃপ্তিতে উৎফুল্ল চিত্তরঞ্জনের দুই চোখ আনন্দ অশ্রুতে ভরিয়া উঠিত।

আবার দেশবাসীর অতি ক্ষুদ্র দানও দেশবন্ধুর প্রাণে এমন অপার আনন্দ দান করিয়াছে। এখানে দাতার চাই ত গৃহীতার মনের প্রসারতাই বিবেচ্য। আবার সে ক্ষুদ্র দান যদি আন্তরিক না হইয়া অত্যন্ত বিরক্তি ও ঘৃণাভরে হইত তবে তাহা হাসি মুখে গ্রহণ করা বিশেষভাবেই বিবেচ্য নয় কি?

ঘটনাটি ঘটিয়াছিল উত্তর কলিকাতায়। অর্পণা দেবী প্রভৃতি দান সংগ্রহ করিবার জন্য একজন নাম-করা ধনীলোকের বাড়ী গিয়াছিলেন। সময়টি অবশ্য অসময় ছিল। কিন্তু দেশের জন্য যাহারা দান গ্রহণ করিতে যান তাহাদের আবার সময় অসময় কি? বাড়ীর গৃহিণী তখন দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া সবেমাত্র মধ্যদিনের বিশ্রাম লাভের আশায় বিছানায় আশ্রয় লইয়াছেন। উঁহাদের উপস্থিতি এবং উপস্থিতির কারণ জানিয়া গৃহিণী বেশ বিরক্ত হইলেন। ঐ সংগৃহীত টাকা দিয়া কি হইবে সে সম্বন্ধে তাহার মনে সন্দেহ জাগিল। বলিয়াও ফেলিলেন, "এই টাকাগুলো দিয়ে কি হবে বাছা? বলছ, বাবা জেলে রয়েছেন—তা' এই টাকাগুলো দিয়ে কি তাকে খালাস করে আনবে? সে টাকা তো গাড়ীটা বেচলেও যোগাড় হ'য়ে যায়।

তার জন্যে আবার লোকের কাছে হাত পাতা কেন?”

বলা শেষ হইলে উক্ত ধনী গৃহিণী দান হিসাবে একটি টাকা ছুঁড়িয়া দিয়াছিলেন। অর্পণা দেবী ইহাতে দুঃখিত হইয়াছিলেন, রাগও হইয়াছিল তাঁহার। কিন্তু তাঁহার পিতাকে তিনি চিনিতেন। তাই বিরক্ত আর ঘৃণা-ভরে ঐ দানের টাকাটি শ্রদ্ধার সঙ্গে কুড়াইয়া লইয়া পৃথক করিয়া রাখিয়া দিলেন। জেলের ভিতর অপর্ণা দেবী ঐ টাকাটি চিত্তরঞ্জনের হাতে তুলিয়া দিয়া ঐ টাকাটির ইতিহাসটুকুও তাঁহার নিকট বিবৃত করিলেন।

দানবীর চিত্তরঞ্জন, দান গ্রহণ করিবার সময়ও তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম ভিখারী। এত বড় দাতা এতটুকু ক্ষুদ্র দান গ্রহণ করিতেও কত তৃপ্তি বোধ করিলেন। বলিলেন, “হোক সামান্য তবু দেশের জন্য এতটুকু দানও তো আমরা পায়ে ঠেলতে পারি না। দেশকে কিছু দেবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে কেন না দেশ যে এদের সকলকে নিয়েই।”

দেশের জন্য ক্ষুদ্র দান গ্রহণ করিতে দেশবন্ধু যেমন এতটুকু কুণ্ঠিত হন নাই, আবার ক্ষুদ্র দানের মধ্যে তাঁহার মানবপূজার পরিচয় দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার ‘স্মৃতিকথা’য় যে ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতে দুই একটি এখানে সংক্ষেপ করিয়া উল্লেখ করা হইতেছে: ডাণ্ডি করিয়া চিত্তরঞ্জন যাইতেছিলেন। রামগড় হইতে কিছু দূর গিয়াছেন পর, ছোট ছোট পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা ফার্ণ ও পাহাড়ী ফুল দিয়া তৈয়ারী ফুলের গুচ্ছ উপহার দিবার জন্য চিত্তরঞ্জনের ডাণ্ডির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দিল উপহার। উপহার দেওয়ার পর তাহারা হাত পাতিয়া ডাণ্ডির সঙ্গে চলিল। চিত্তরঞ্জন বুঝিলেন উহারা কিছু চাহিতেছে।

চিত্তরঞ্জনের ক্যাশিয়ার ললিতবাবু পেছনের ডাণ্ডিতে ছিলেন। চিত্ত-রঞ্জনের হয়তো ইচ্ছা ছিল ললিতবাবুর নিকট খুচরা পয়সা থাকিলে উহা হইতে দিয়া দিবেন। পেছনে তাকাইয়া দেখিলেন, তাহাদের ডাণ্ডি অনেক দূরে রহিয়াছে। চিত্তরঞ্জন তখন নিজের এ্যাটাচি কেস্ হইতে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে একটি করিয়া রৌপ্যমুদ্রা বখশিশ দিলেন।

এই পাহাড়ী-পথে যে সমস্ত ধনী ব্যক্তিরা যাতায়াত করে ঐ ছেলেমেয়েরা তাহাদের হাতে ফুল উপহার দিয়া বখশিশ পাইয়া থাকে। কিন্তু সেই বখশিশ ধনী ব্যক্তিদের হাত হইতেও সাধারণতঃ এক পয়সা, কখন কখনও যে বেশী দেয়

—দুই পয়সা। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের নিকট হইতে একটি করিয়া রৌপ্যমুদ্রা পাইয়া তাহারা বিস্মিত! প্রথম তাহারা বিশ্বাসই করিতে পারিল না কারণ তেমন বখশিশ তাহারা যে জীবনেও পায় নাই। তারপর যখন বুঝিল যে সত্য সত্যই একটি করিয়া রৌপ্যমুদ্রা বখশিশ পাইয়াছে তখন তাহারা আনন্দে আত্মহারা, সকলেই আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া সারা পাহাড়ী এলাকায় চীৎকার করিয়া রাষ্ট্র করিয়া দিল, 'কলকাত্তাকা রাজা আয় হ্যায়।'

তারপর ছুটিয়া আসিল আরও কত ছেলেমেয়ে। সকলেরই হাতে ঐ কোন রকমে লতা-পাতায় জড়ান কয়েকটি পাহাড়ী ফুলের গুচ্ছ। সেই স্রোতের মধ্যে কে একবার আসিল, কে দুইবার আসিল তাহা বিচার করিবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি দেশবন্ধুর ছিল না। তিনি প্রত্যেককেই তাঁহার এ্যাটাচি কেসরূপ রাজকোষ হইতে একটি করিয়া রৌপ্যমুদ্রা দিয়া যাইতে লাগিলেন। এমন করিয়া মিনিট কুড়ির মধ্যেই তিনি পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন টাকা দিয়া দিলেন।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আর একটি ঘটনারও উল্লেখ করিয়াছেন: সেবারে দেশবন্ধু উত্তর হিমালয়ে বেড়াইতে গিয়াছেন। রামগড় হইতে মোরনালা পর্যন্ত যে পথ তাহা দুর্গম বলিয়া পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হইবে। ঠিক হইল, একান্ত প্রয়োজনীয় মাল-পত্র বহন করিবার জন্য কয়েক জন কুলী সঙ্গে যাইবে। কুলীদের সর্দারের সাহায্যে কুলী ঠিক হইল। রামগড় হইতে মোরনালা পর্যন্ত যাইবার জন্য যে কয়েকজন কুলী নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাহাদের খোরাকির জন্য আড়াই টাকা দেওয়ার কথা। ললিত বাবু তখন কোন্ কোন্ জিনিস সঙ্গে যাইবে এবং কি যাইবে না তাহা গুছাইবার কাজে বিশেষ ব্যস্ত। সুতরাং তাহাকে ডাকা ঠিক নয় মনে করিয়া চিত্তরঞ্জন নিজের ব্যাগ হইতে দশ টাকার একখানি নোট পাটোয়ারীর হাতে দিলেন।

পাটোয়ারী কুলীদের খোরাকির আড়াই টাকা তাহাদের বুঝাইয়া দিয়া বাকী সাড়ে সাত টাকা চিত্তরঞ্জনের হাতে ফেরত দিবার জন্য অগ্রসর হইল। চিত্তরঞ্জন ঐ টাকা ফেরত না লইয়া পাটোয়ারীকে বলিলেন, "উয়হ তুমকো বখশিশ দিয়া।"

পাটোয়ারী অবাক! কানে যাহা শুনিল তাহার পক্ষে তাহা বিশ্বাস করা কোন রকমেই সম্ভব হইল না। শুনিয়াছিল সে ঠিকই, তবুও নিজের কানকে অবিশ্বাস করিয়া পাটোয়ারী বলিল, "হুজুর সম্‌ঝা নেহি।"

চিত্তরঞ্জন মনে করিলেন যে কুলী হয়তো ঠিক শুনিতে পায় নাই তাই তিনি একটু জোরেই আবার বলিলেন, "উয়হ তুমকো বখশিশ দিয়া।"

পাটোয়ারীর তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব। যাহা কানে শুনিয়াছে, শুনিয়াছে ঠিকই, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। কি করিয়াই বা সে বিশ্বাস করিবে? বখশিশ! তাহা কি এত টাকা? সে-পথে তো কত সময় কত ধনীব্যক্তি যাতায়াত করিয়াছে কিন্তু কাহারো নিকট হইতে এত টাকা বখশিশ কোন দিনই পায় নাই। তাই তাহার বিশ্বাসই হইতেছিল না। তখন তাহার অবস্থা অতি করুণ! না পারিতেছিল টাকাটা নিজের পকেটে রাখিতে, না পারিতেছিল বারবার চিত্তরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিতে—তাহার মনে শুধু একটি বিস্ময়ের জিজ্ঞাসা—বখশিশ—তাহা তো আট আনার পয়সা হইলেই সে যথেষ্ট মনে করিত। নিরুপায় হইয়া পাটোয়ারী বিনীতভাবে তাই চিত্তরঞ্জনকে আবারও জানাইল, "মাফ্ কিয়া যায় হুজুর সমঝা নেহি।"

বারবার তিনবার। একই জিজ্ঞাসা একই উত্তর। চিত্তরঞ্জন খুব জোরে বলিয়া উঠিলেন, "উয়হ তুম্ রখ্ লেও। তুমকো বখশিশ দিয়া।"

এতক্ষণ পর্যন্ত যে অবস্থার মধ্যে পাটোয়ারী ছিল তখন তাহার সে-অবস্থা দূর হইল। এতক্ষণ যাহা ছিল তাহার নিকট রহস্য তখন তাহা হইল তাহার নিকট স্পষ্ট। তৃপ্তিতে আর আনন্দে পাটোয়ারী তখন অধীর। আনন্দ আর কৃতজ্ঞতায় তাহার চক্ষু দুইটিতে নূতন দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। কৃতজ্ঞতাতেই সে তাহার দুই বাহু মাটি পর্যন্ত নত করিয়া চিত্তরঞ্জনকে অভিবাদন করিতে লাগিল।

দানবীর চিত্তরঞ্জন। তাঁহার পক্ষে এই পাটোয়ারীকে সাড়ে সাত টাকা দান অতি সামান্য, অতি তুচ্ছ কিন্তু পাটোয়ারীর পক্ষে বখশিশ হিসাবে সাড়ে সাত টাকা পাওয়া যে অনেক পাওয়া; তাহার কাছে ঐ সাড়ে সাত টাকা যে অনেক বেশী টাকা। এই হইল দেশবন্ধুর মানবিকতা। স্থান, কাল আর পাত্র হিসাবে তাঁহার দরদী মনের কি সুন্দর চিত্রটিই না এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সুতরাং দেখা যায় যে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যই যাহার শ্রদ্ধা ও সমবেদনা রহিয়াছে তাঁহার পক্ষে বড় হইয়াও তাঁহার নিজের বাল্যের শিক্ষককে ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। তিনি ভুলিয়া যানও নাই বরং পরবর্তী জীবনে তাহার

প্রতি গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন দেখাইয়াছেন।

চিত্তরঞ্জন তখন ষষ্ঠশ্রেণীতে পড়িতেন। তাঁহার গৃহশিক্ষক ছিলেন কালীঘাটের হালদার বংশের পূর্ণ হালদার মহাশয়। তিনি তাঁহার স্কুলেরও শিক্ষক ছিলেন। বাল্যের গৃহশিক্ষককে জীবন স্মৃতিতে অনেকেই ধরিয়া রাখে না। কিন্তু চিত্তরঞ্জন তাহাকে ভুলিয়া যান নাই। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাল্যের সেই গৃহশিক্ষককে তিনি ১০০০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া গৃহ নির্মাণ করিয়া দেন। গৃহশিক্ষককে গৃহনির্মাণ করিয়া দিয়াই তিনি তাহার কর্তব্য শেষ করেন নাই উপরন্তু কালীঘাটের মা কালীর পূজা ব্যাপারে পূজার পালা লইয়া যে গোলমাল ছিল তিনি তাহাও মিটমাট করিয়া দিয়াছিলেন। এখানে শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধার যে বিশুদ্ধচিত্তের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। আবার বৈষ্ণব চিত্তরঞ্জনের ভক্ত মনেরও যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাও প্রণিধানযোগ্য।

চিত্তরঞ্জন কীর্তন গান শুনিতে খুব ভালোবাসিতেন। যখনই কোন ভাল কীর্তনীয়ার খোঁজ পাইতেন তখন তিনি তাহাকে আমন্ত্রণ জানাইয়া নিজের বাড়ীতে কীর্তনের ব্যবস্থা করিতেন। একদিন দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার বাড়ীতে কীর্তন গান গাহিতেছিলেন। চিত্তরঞ্জন একখানি চেয়ারে বসিয়া একমনে ঐ কীর্তন গান শুনিতেছিলেন। তিনি তখন ধূমপানে অভ্যস্ত। একমনে কীর্তন গান শুনিলেও মাঝে মাঝে তাঁহার মুখ হইতে সিগারের ধোঁয়া বাহির হইতেছিল। ইহাতে কীর্তনীয়া ভট্টাচার্য মহাশয় খুশী হইতে পারিলেন না বরং একটু বিরক্ত-ই হইয়াছিলেন। কীর্তন যখন শেষ হইল শ্রোতাদের মধ্য হইতে জনৈক ভদ্রলোক ভট্টাচার্য মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আগামী কালও আপনি আবার কীর্তন গান করিতে আসিবেন তো?"

সরল ভাবেই ভট্টাচার্য মহাশয় জবাব দিলেন, "মহাপ্রভুর অপমান আমি করিতে পারি না। যেখানে শ্রদ্ধা নাই সেখানে কীর্তন গান করিতে নাই।"

কথাটি চিত্তরঞ্জনের কানে গিয়া পৌছিল। মুহূর্তের মধ্যেই চিত্তরঞ্জন সব বুঝিয়া নিজেকে অপরাধী মনে করিলেন। নিজের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইয়া অত্যন্ত বিনয় সহকারে তিনি ভট্টাচার্য মহাশয়কে অনুরোধ জানাইলেন "আপনি কাল অনুগ্রহ করে আসবেন; আমার অপরাধ নেবেন না।"

পরের দিন খাঁটি বাংলার প্রকৃত কীর্তনের আসর বসিল। সমস্ত চেয়ারগুলি

সেখান হতে অন্যত্র সরাইয়া নেওয়া হইল। সেখানে পাতা হইল ফরাস। দীনবেশে চিত্তরঞ্জন আসরে বসিয়া সেদিন কীর্তনানন্দ উপভোগ করিলেন। সে আনন্দ উপভোগ তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া দরদর ধারায় জল আনিয়া দিয়াছিল। এ-চোখের জল তো ভক্ত ছাড়া আর কাহারো চোখে আসে না। আর চিত্তরঞ্জন প্রকৃত মানুষ বলিয়াই তিনি প্রকৃত ভক্ত!

এ-প্রসঙ্গে আর একটি গীতকারের কথাও এখানে বলা হইতেছে। ইহাতেও বুঝিতে পারা যাইবে যে মানুষ হিসাবে তাঁহার মনটি কত ভক্ত ছিল।

একবার কলিকাতার এক পথে সুসাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একটি বৈষ্ণব ভিখারীকে দেখিতে পান। ভিখারীটি ভিক্ষার আশায় কোন এক বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া তাহার সুললিত কণ্ঠে গান গাহিতেছিল 'পরাণ বধূকে স্বপনে দেখিনু।' গানখানি ও গায়কের সুর ও কণ্ঠ তাঁহার খুব ভালো লাগিয়াছিল। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ভিখারীটিকে তাঁহার বাড়ী লইয়া গেলেন, গান শুনিলেন এবং তাহার নাম ও ঠিকানা জনিয়া রাখিলেন। যথাসময়ে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় চিত্তরঞ্জনের নিকট ভিখারী ষষ্ঠীর ঐ চণ্ডীদাসের পদাবলী কীর্তনের কথা বলিলে চিত্তরঞ্জন ঐ ভিখারীর গান শুনিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। এখানে গান শুধু গানই নহে, চিত্তরঞ্জনের সাধক জীবনের বৈষ্ণব মনটি তৃষ্ণার্ত হইয়া উঠিল। চিত্তরঞ্জন সেখানে আইনজীবী নহেন, নহেন কোন রাজনৈতিক মহান নেতা, তিনি তখন পরমভক্ত মানুষ।

চিত্তরঞ্জনের আগ্রহে পরের দিন ষষ্ঠীচরণকে চিত্তরঞ্জনের বাড়ীতে আনা হইল। চিত্তরঞ্জন নিজেই বলিলেন, "এবার তা হলে গান হোক।"

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ষষ্ঠীচরণকে বলিলেন, "প্রথমে না হয় সেই গানটাই গাও,—পরাণ বধূকে স্বপনে দেখিনু।"

খুশী আর হাসিতে চিত্তরঞ্জনের চোখ দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, সেই গানটাই প্রথম হোক।"

একতারার সঙ্গে ষষ্ঠীচরণের সুললিত কণ্ঠ গাহিয়া উঠিল,—

পরাণ বধূকে স্বপনে দেখিনু
বসিয়া শিয়র পাশে।

রাধার কেশর পরশ করিয়া
ঈষৎ ঈষৎ হাসে ॥

ঘরময় তখন একতারার তান, সুর, সুরের মূর্চ্ছনা আর ষষ্ঠীচরণের ভাব মিলিয়া মিশিয়া এক মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। সেই কীর্তনের আনন্দ-মুখর পরিবেশে চিত্তরঞ্জন যেন ধ্যানস্থ। কানে চণ্ডীদাসের পদাবলীর রস গ্রহণ করিয়া, দুই চক্ষু বুজিয়া তিনি যেন ওখানে থাকিয়াও অনুপস্থিত.; তাঁহার দেহ-ই যেন পড়িয়াছিল সেখানে মন নিয়া তিনি যেন কোন্ এক ভাব-রসে পূর্ণ সঙ্গীত সাগরে ডুব দিয়াছিলেন।

প্রায় ঘণ্টাদেড়েক ষষ্ঠীচরণ গান গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ঐ সঙ্গীতাগুলির কোনটি চণ্ডীদাসের কোনটি গোবিন্দ দাসের আবার কোনটি জ্ঞানদাসের। সব পদাবলীর রস পান করিয়া চিত্তরঞ্জন বাড়ীর ক্যাশিয়ার ললিত বাবুর কানে কানে কি যেন বলিয়া দিলেন। কি যে বলিলেন উপস্থিত কেহই তাহা শুনিতে পাইলেন না কিন্তু একটু পরেই দেখিতে পাইলেন, ললিতবাবু দুইখানা দশ টাকার নোট আনিয়া গায়ক ষষ্ঠীচরণের হাতে তুলিয়া দিলেন। আব চিত্তরঞ্জন বলিলেন, 'এ হল তোমার প্রথম দিনের পারি-শ্রমিক। সপ্তাহে একদিন ক'রে তুমি আমাকে গান শুনিয়ে যেও। তার জন্ত তুমি পাবে প্রতিমাসে কুড়ি টাকা।"

এই হইল মানুষ চিত্তবঞ্জনের স্বভাব। খ্যাতিমান সাংবাদিক ও সাহিত্যিক কিরণকুমার রায় মহাশয় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের পর ৩০-১১-'৬৬ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় উহা প্রকাশিত করিয়া-ছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে বাসন্তী দেবী চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "তিনি দেবতা ছিলেন না। ছিলেন পরিপূর্ণ মানুষ।"

প্রকৃতপক্ষেও তিনি ছিলেন মানবতার পুজারী। তিনি ছিলেন মহামানব। যে কোন মানুষই ছিল তাঁহার নিকট শ্রদ্ধার পাত্র, যে কোন জাতি বা ধর্মকেও তিনি শ্রদ্ধা করিতেন সমভাবেই। তদুপরি ব্যক্তিগত কেহ যদি বিশেষ কোন গুণের অধিকারী হইতেন, শিক্ষায়-দীক্ষায় আর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইতেন তবে তো কথাই নাই। এ পর্যায়ে তাঁহার পারিবারিক জীবনের একটি ঘটনা দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতেছে। ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ বলিয়াই চিত্তরঞ্জনের মনুষ্যত্বের বিরাট পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্যারিস্টার বসন্তরঞ্জন দাশ মহাশয় ছিলেন চিত্তরঞ্জনের ছোট ভাই। তিনি ভারতবিখ্যাত দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের একমাত্র কন্যা সরযূবালাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া পরিবারের মধ্যে এক তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়, আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেও ইহাকে মুখরোচক করিয়া এক আলোচনা চক্র গড়িয়া ওঠে। ইহার কারণ চিত্তরঞ্জনের মাতাঠাকুরাণী নিস্তারিণী দেবীর এই বিবাহে মত ছিল না।

বর্ণবৈষম্যকে চিত্তরঞ্জন চিরদিনই ঘৃণা করিতেন, হিন্দুদের মধ্যে কোন প্রকার অহেতুক সংস্কার তিনি পছন্দ করিতেন না। তিনি তাই তাঁহার মাকে বুঝাইলেন, "মা, আমি যখন বামুনের মেয়েকে বিয়ে করলুম, তখন তো আপত্তি করোনি? তবে ভোলার [বসন্তরঞ্জনের ডাক নাম] সময় আপত্তি করছো কেন?"

দেশবন্ধুর জননী নিস্তারিণী দেবী বলিলেন, "তুই বৈদ্য বিয়ে না করলেও আমাদের চেয়ে নীচু ঘরে তো বিয়ে করিস নি—এ যে শীলের মেয়ে।"

চিত্তরঞ্জনের বিচার ছিল অন্য রকম। কোন বংশে জন্মগ্রহণ করার উপর কাহারোর হাত নাই সুতরাং উহা তাহার অপরাধ নহে, তাহাকে বিচার করিতে হইবে তাহার কর্মদ্বারা। কর্মের মাধ্যমেই তাহার পরিচয় ফুটিয়া উঠিবে। পঙ্কজেরও জন্ম পাঁকে কিন্তু সেই পঙ্কজ পাইলে তো মানব এবং দেবতা উভয় কুলই খুশী। চিত্তরঞ্জনেরও বিচার ছিল তাহাই। ব্রজেন্দ্র-নাথ জাতিতে যদিও ব্রাহ্মণ ছিলেন না কিন্তু ব্রাহ্মণের যে গুণ তিনি সেই গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন শাস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, বাণীর বরপুত্র এবং বিদ্যামন্দিরের এক শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী। তাহার মত সজ্জন, বিদ্বান এবং পণ্ডিত সন্তান দেশ মাতার আর ক'জন আছে? ব্রজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের এই অভিমতই তিনি তাঁহার মাকে বুঝাইয়া বলিলেন।

পুত্রের কথা শুনিয়া নিস্তারিণী দেবী তখন বলিলেন, "তোর মতে তবে ব্রজেন্দ্রবাবু ব্রাহ্মণ?"

চিত্তরঞ্জন জানাইলেন যে এত বড় একজন ব্রাহ্মণের মেয়ে যে তাহাদের ঘরে আসিবে ইহা তাহাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা। ইহা শুনিয়া নিস্তারিণী দেবীও খুশী। চিত্তরঞ্জনের কথা বেদবাক্য মনে করিয়া তিনিও তখন আত্মীয় স্বজন সকলের নিকট বলিতে লাগিলেন, "চিত্ত যখন বলেছে ব্রজেন্দ্র শীল

যথার্থ ব্রাহ্মণ তখন আমার আর কোন আপত্তি নাই।"

মানুষ চিত্তরঞ্জনের মনের উদারতায় পারিবারিক এবং সামাজিক ঐ পরিস্থিতিকে কেমন সহজ ও সরল করিয়া দিল ইহা সত্যই ভাবিবার বিষয়। আবার ভাবিবার বিষয় তাঁহার পূত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আর মহানুভবতার কথা। তাঁহার সে যে কি মন তাহা বিচার করিয়া বুঝিতে পারা যায় না, যায় না বুদ্ধিতেও ব্যাখ্যা করা। ঘটনাটি, দেব দেউলে অলক্ষ্যে রাখা ধূপকাঠির সুমধুর গন্ধের মত চিত্তরঞ্জনের মনের মহানুভবতার একটি স্নিগ্ধ দিকে আলোক সম্পাত করিয়া রাখিয়াছে। ঘটনাটি কাহারো কাহারো কাছে হয়ত 'এমন আর কি' বলিয়া মনে হইতে পারে বা মনে করিতে পারে যে ইহা এত বড় একজন ত্যাগী দানবীরের কাছে অতি ছোট ঘটনা কিন্তু ছোটর মধ্যেই যে বিরাট নিহিত হইয়া রহিয়াছে, নিহিত থাকেও। মহাভারতের মহা কাহিনীর মধ্যে বিদুর যে শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষুদ দিয়া সেবা করিয়াছিলেন তাহা ঘটনা হিসাবে ছোট হইলেও ছোট ঘটনা নয়।

কথাটি চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণ' পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া। চিত্তরঞ্জন একদা তাঁহার পত্রিকার জন্য অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট একটি গল্প চাহিয়া লে' ' পাঠাইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রও চিত্তরঞ্জনের অনুরোধ রক্ষা করিয়া 'নারায়ণে' প্রকাশ করিবার জন্য একটি গল্প লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

গল্পটি পড়িয়া চিত্তরঞ্জন খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন। সেই সঙ্গে একটু অসুবিধায়ও পড়িয়াছিলেন তিনি। লেখককে পারিশ্রমিক দেওয়া তিনি পবিত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন কিন্তু এমন চমৎকার গল্পের মূল্যায়ণ তিনি কেমন করিয়া করিবেন, কি দিয়া করিবেন? টাকার অঙ্ক? কত টাকা দিবেন? তিনি তখন যাহ করিলেন তাহা অতি চমৎকার। শরৎ-চন্দ্রের নিকট একখানি চেক সহি করিয়া টাকার অঙ্কের জায়গায় ফাঁকা রাখিয়া দিলেন। এই সঙ্গে তিনি শরৎচন্দ্রকে একখানি চিঠি দিয়া জানাইয়াছিলেন, "অসামান্য শিল্পীর রচনা একবার 'নারায়ণ' বক্ষে ধারণ করার সৌভাগ্য লাভ করলে তার মূল্য নির্ধারণের স্পর্ধা আমার নেই। ব্লাঙ্ক চেক পাঠালুম, আপনি ইচ্ছামত এতে অঙ্ক বসিয়ে নেবেন। সেজন্য কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা সংকোচ বোধ করবেন না।"

চিত্তরঞ্জনের তখন সচ্ছল অবস্থা। আইন ব্যবসায়ে শীর্ষস্থানের অধিকারী।

সুতরাং ব্যাঙ্কে যে প্রচুর পরিমাণে টাকা তাঁহার নামের হিসাবে গচ্ছিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। যত টাকা ইচ্ছা ততটাকা শরৎচন্দ্র লিখিয়া লইতে পারিবেন ইহা তো তিনি জানিতেনই তবুও শরৎচন্দ্রকে তিনি ব্লাঙ্ক চেক দিলেন,—তাঁহার এই মনের হিসাব কে করিবে?

আর শরৎচন্দ্র! এই মহামানবের মহানুভবতায় তিনিও মুগ্ধ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি ব্লাঙ্ক চেকের সুযোগ গ্রহণ না করিয়া মাত্র এক শতটি টাকা উহাতে বসাইয়া নিয়াছিলেন। এক মহানুভবতার সঙ্গে আর এক মহানুভবতার এই মিলন সাহিত্য ক্ষেত্রে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

কুসুমের মত কোমল হৃদয় এই মহানুভব ব্যক্তিই আবার আত্মসম্মান সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এমন অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

দেশবন্ধুর শরীর তখন অসুস্থ। স্বাস্থ্য লাভের উদ্দেশ্যে তিনি কাশ্মীর যাত্রা করিলেন। পথে তিনি মারী পৌছিলেন এবং সেখানে ডাকবাংলায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। সঙ্গে অনেক লোকজন, বাসন্তী দেবী, অপর্ণা দেবী ও শ্রীযুক্ত সুধীরবাবু, মনীন্দ্র হালদার এবং সস্ত্রীক প্রফুল্লরঞ্জন দাশ। কিছুক্ষণের মধ্যে কাশ্মীর রাজ্যের পুলিশ বিভাগের ডেপুটি সুপারিনটেনডেণ্ট দেশবন্ধুর নিকট এক প্রতিশ্রুতি-পত্র আদায় করিতে আসিয়াছে যে, কাশ্মীরে থাকা কালে দেশবন্ধু কোনপ্রকার রাজনৈতিক ক্রিয়া-কর্মে অংশ গ্রহণ করিবেন না। দেশবন্ধু ঐরূপ কোন প্রতিশ্রুতি-পত্র লিখিয়া দিতে রাজী হইলেন না এবং মুখে জানাইলেন যে, "আমি এখানে স্বাস্থ্যের জন্য আসিয়াছি, রাজনৈতিক কাজের জন্য নয়, তবে আমি কোন প্রতিশ্রুতি-পত্র দিব না।"

পুলিশ অফিসার আর কোন বাদানুবাদ করিল না। সে চলিয়া গেল তাহার গন্তব্যস্থানে। দেশবন্ধুও মারী হইতে মোটর গাড়ীতে আবার কাশ্মীরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পথ অতি দুর্গম, কোথাও উঁচু কোথাও নীচু। পথ চলিতে গাড়ী কাঁপিয়া ওঠে, অসুস্থ শরীরে দেশবন্ধুর ইহাতে খুবই কষ্ট হইতেছিল। তেমন দুর্গম পথের কষ্ট সহ্য করিয়াই তিনি যখন প্রায় ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বরমুলায় গিয়া পৌছিলেন তখন আর একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ অফিসার পথের বাধা হইয়া দাঁড়াইল। শ্বেতাঙ্গ পুলিশ অফিসার জানাইল, "মহারাজার

আদেশ, আপনি যে রাজনৈতিক সংস্রবে লিপ্ত হইবেন না, এরূপ প্রতিশ্রুতি-পত্র না দিলে, আপনার কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ নিষেধ। তবে এইভাবে স্বাক্ষর করিলে, আপনি মহারাজার রাজপ্রাসাদে অবস্থান কবিতে পারিবেন।"

শ্বেতাঙ্গ পুলিশ অফিসারের কথা শুনিয়া সকলেই নীরব। কাশ্মীরের মহারাজা তাঁহাকে তাহার রাজপ্রাসাদে থাকিবার জন্য প্রলোভন দেখাইয়াছেন কিন্তু লোভ দেখান কাকে? সর্বস্বত্যাগীকে? এক মুহূর্তে চিত্তরঞ্জন নিজের কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। গাড়ীর চালককে নির্দেশ দিলেন, "গাড়ী লইয়া আবার এই পথ বাহিয়াই নীচে চল। কিছুতেই undertaking দিব না।"

চিত্তরঞ্জন আবার মারীতেই ফিরিয়া আসিলেন এবং মাসাধিক কাল ঐ সৌন্দর্যময় পাহাড়ী স্থান মারীতেই অবস্থান করেন। বেশ ছিলেন সেখানে। মারীর সৌন্দর্য দেখিয়া বলিতেন, "This appears to be the best of all Hill stations of India."

ঐ সময় অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির এসিণ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী রাজারাম দেশবন্ধুর নিকট গিয়াছিলেন। দেশবন্ধু তাহার সহিত অনেক বিষয় আলোচনা করিতেন। আলোচনা প্র ঙ্গ রামকৃষ্ণদেব এবং সারদা আশ্রম সম্বন্ধে কথা উঠিলে তিনি এত আনন্দিত হইয়া উঠিতেন যে তাঁহার মুখমণ্ডল হাসিতে ফুটিয়া উঠিত। রাজারাম বলিয়াছিলেন, এত দিন তো আপনি কলিকাতায় এখনও সারদা আশ্রম দেখেন নি?

দেশবন্ধু জানাইয়াছিলেন, আমরা কি এত দিন মানুষ ছিলাম?

কথাটি সত্য সত্যই মানুষ দেশবন্ধুর উপযুক্ত কথাই।

হৃদয় থাকিলেই হৃদয়বান হয় না। হৃদ তো সকলেরই আছে তাই বলিয়া সকলেই কি হৃদয়বান মানুষ? মানুষ চিত্তরঞ্জনের দিকে দৃকপাত করিলে দেখা যাইবে, সারা জীবন তিনি মানুষের প্রতি দয়া-মায়া দেখাইয়াছেন; মানুষের জন্য ছিল তাঁহার অন্তর ভরা সহানুভূতি। এই দয়া-মায়া আর সহানুভূতিই তো হৃদয়ের পরিচয়।

কিন্তু কথা হইতেছে, হৃদয়বান চিত্তরঞ্জনের কতটুকু পরিচয় আমরা জানি। সারা জীবন যিনি হৃদয়-দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই উন্মুক্ত হৃদয়-দুয়ার পথে কত সময় কত লোক যে আসিয়া তাঁহার অন্তরের স্পর্শ পাইয়া

গিয়াছে সে হিসাব কে রাখিয়াছে? রাখা সম্ভব নয়, রাখা সম্ভব হয়-ও নাই। তিনি নিজেও তো তাহা সাক্ষী রাখিবার জন্য কাহারো কাছে প্রচার করেন নাই। সুতরাং তাঁহার হৃদয়বত্তার সব পরিচয় মানুষের অজানা-ই থাকিয়া যাইবে। তবুও সূর্য উঠিলে তাহাকে যেমন কেহ আবৃত করিয়া রাখিতে পারে না, সহৃদয় চিত্তরঞ্জনের হৃদয়বত্তার কাহিনীও তেমন আপন গতিতেই দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

তাঁহার সহৃদয়তার পরিচয় তাঁহার পরিবারস্থ সকলে যে পাইয়াছেন তাহা উল্লেখ করিবার অপেক্ষা রাখে না। পরিবারের ঝি-চাকর, দাস-দাসীকে তিনি অবশ্য পরিবারের লোক বলিয়াই মনে করিতেন। নিজের পুত্র-কন্যা এবং ভ্রাতা-ভগ্নীদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি যেমন কোন দিনই ত্রুটি করেন নাই, তাঁহার আশ্রয় প্রার্থীদের জন্যও তিনি তাহা করিতে কোন দিনই কুণ্ঠিত হন নাই। আবার এই মহামানবের মহান হৃদয় পরিবারের গণ্ডি ছাড়াইয়া সমগ্র দেশকে নিজের পরিবার মনে করিয়া অন্তরে স্থান দিয়াছেন।—তাঁহার সেই সহৃদয় মনই তো কোটি কোটি নির্যাতিত মানুষের পরাধীনতার শৃঙ্খল-মোচনের জন্য কাঁদিয়া উঠিয়াছিল—তাই তো তিনি ঘরকে করিতে পারিয়াছিলেন বাহির, আর বাহিরকে করিতে পারিয়াছিলেন ঘর। রাজনীতির মধ্যেও তাঁহার খাঁটি বৈষ্ণবের সহৃদয় মনটি "বসুধৈব কুটুম্বকম।"

এ কথা অনস্বীকার্য যে হৃদয়বান না হইলে দেশের মানুষের জন্য কেহ কাঁদে না, সে কথা তাঁহার আইন ব্যবসা পরিত্যাগের মধ্যেই রহিয়াছে, রহিয়াছে সমগ্র আইনজীবী জীবনের দৈনন্দিনের ঘটনায়। ১৯২৪ সালে কালা-কানুনে যখন বাংলার সুভাষচন্দ্র, অনিল রায় এবং সত্যেন্দ্র মিত্র সহ ৮০ জন তরুণকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তখন অসুস্থ চিত্তরঞ্জন নিজের স্বাস্থ্যোদ্ধারের কথা না ভাবিয়া সেই অসুস্থ শরীরেই সিমলা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কলিকাতার টাউন হলের এক জনাকীর্ণ সভায় বলিয়াছিলেন, "বাংলার যুবক, তোমাদের হৃদয়ে জলে উঠুক স্বাধীনতার আগুন। ছুটে এসো মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে। এই জরাকীর্ণ দেহ নিয়ে আমি এগিয়ে যাবো। তোমরা এসো আমার পিছনে। মা, একবার সংহার মূর্তিতে প্রকাশিত হও, মা। তোমাকে সামনে রেখে আমরা আত্মদান করি, স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করি, মা।"

উপরোক্ত এই কথাগুলি যে-বুক ও মুখ হইতে বহির্গত হইয়া আসিয়াছে

সে-বুকে আছে তেজ, বীর্য আছে জলন্ত আগুন আর আছে স্বদেশপ্রেম; এক কথায় একখানি জ্বলন্ত হৃদয়!

আবার এই কালা-কানুনে বন্দী তরুণ প্রাণদের জন্য তাঁহার হৃদয় যে শ্রাবণ-ধারার মত অজস্র ধারায় কাঁদিয়া চলিয়াছে সে প্রমাণও দেশবাসী পাইয়াছে। তখনও দেশবন্ধু অসুস্থ। অসুস্থ শরীর নিয়া ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে বেলগাঁওতে কংগ্রেসের ৩৯তম অধিবেশনে যোগদান করিতে গিয়া আরও বেশী অসুস্থ হইয়া ৩১শে ডিসেম্বর কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। কাউন্সিলে Ordinance Bill, যাহাকে দেশবন্ধু, Black Bill নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, পাশ করাইয়া লইবার জন্য সরকার প্রস্তুত হইয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনও প্রস্তুত হইলেন, ঐ Black Bill পাশ করিতে দিবেন না—কাউন্সিলে যাইবেন। আত্মীয়-স্বজনের নিষেধ, ডাক্তারগণেরও প্রবল আপত্তি কিন্তু চিত্তরঞ্জন শুনিলেন না। বলিলেন, "তোমরা বুঝতে পারছ না ওরা আমাকে মারবার জন্যই অর্ডিনান্স জারি করেছিল আর সেই একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে ওরা এই বিল নিয়ে আসছে। আমার ছেলেরা সব বিনা বিচারে আটক রয়েছে, তাদের আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যেমন করে পারি জেল থেকে তাদের বের করে নিয়ে আসব। আমাকে তোমরা নিষেধ করো না।"

কত মমতাময় আন্তরিকতাপূর্ণ দেশবন্ধুর উপরোক্ত কথাগুলি। মানুষের বাহিরের ঐশ্বর্য, সম্পদ মানুষ দেখিতে পারে কিন্তু অন্তরের এই আন্তরিকতা যে কত অমূল্য, ইহার তো মূল্য নিরূপণ করা যায় না, কাহাকে দেখানও যায় না। ইহা শুধু অনুভূতির। হৃদয় ছিল বলিয়াই, জেলে আটক তরুণদের জন্য তাঁহার চোখে ঘুম ছিল না, সে চোখে ছিল জল।

দেশবন্ধু বলিতেন, "ইষ্টদেবতা ব[illegible]তে আমি আমার দেশকে বুঝি।" সুতরাং ইহা তাঁহার নিকট প্রকৃত সত্য ছিল যে দেশের প্রত্যেকেই তাঁহার নিকট ছিল অতি প্রিয়; অতি আপন। তাঁহার প্রাণ সকলের জন্যই কাঁদিয়া উঠিত।

প্রমদা দেবী ছিলেন তাঁহার পিসতুত ভগ্নী। তাহার স্বামী যোগেন্দ্রবাবু কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত, মৃত্যুশয্যায় তিনি। চিত্তরঞ্জন তাহার ঐ কঠিন পীড়ার সময় চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া শুশ্রূষারও সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ভগ্নীপতি ঔষধের সঙ্গে যাহাতে ভাল পথ্য পাইতে পারে সে

ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন উপরন্তু অত্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি সময় করিয়া ভগ্নীপতির শয্যাপার্শ্বে যাইতেনই।

চিত্তরঞ্জনের চরিত্রের এই চিত্রটিকে কেন্দ্র করিয়া একদিন কথা হইতেছিল তাঁহার সহৃদয়তা এবং দানের। উহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, অনন্য-সাধারণ এমন দান-ধ্যানের কথা কোথাও শুনি নাই, দেখিও নাই।

কথা কয়েকটি চিত্তরঞ্জনের কানে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। উহা তাঁহাকে আঘাত করিল। হঠাৎ তিনি গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। পরে স্বর নীচু করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "এ তোমাদের ভুল ধারণা, টাকা কি আমার ?"

শ্রোতাগণ তো শুনিয়া অবাক! বিস্মিত হইয়া তাহারা বলিয়া উঠিল, "টাকা আপনার নয় তবে কার, আপনি রোজগার করেছেন!"

চিত্তরঞ্জন জানাইলেন, ভগবান আমার হাতে এত টাকা দেন কেন জান? —দশজনের জন্যই আমার হাতে দিয়াছেন।

ইহা শুনিয়াও শ্রোতাগণ অবাক! তাহারা নির্বাক।

তাহাদের নির্বাক মুখের দিকে তাকাইয়া দেশবন্ধু আবার বলিলেন, ভগবান এক দিকে আমাকে যেমন প্রচুর দেন আবার অন্য দিকে তিনিই আমার কাছে লোক পাঠাইয়া দেন।

ঈশ্বরের চরণে নিবেদিত প্রাণ চিত্তরঞ্জনের এমন কথা শুনিয়া শ্রোতাগণের আর কিছু বলিবার রহিল না। চিত্তরঞ্জনের এই সুন্দর মনের অনেকবার অনেক পরিচয়ের মধ্যে একবার গোয়ালন্দ স্টেশনে একটি সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

একবার মোকদ্দমার ব্যাপারে চিত্তরঞ্জন ঢাকাতে গিয়াছিলেন। পনের কুড়ি দিন সেখানে থাকার পর কলিকাতা ফিরিতেছিলেন। সঙ্গে লোকজন কিন্তু টাকা মাত্র তিন হাজার। গোয়ালন্দ স্টেশনে ষ্টীমারের প্রথম শ্রেণীতে চিত্তরঞ্জন একখানি ডেক্ চেয়ারে ক্লান্ত দেহখানি এলাইয়া দিয়া দুই চোখ ভরিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিতেছিলেন। সম্মুখে প্রশস্ত পদ্মা; পদ্মাবক্ষে ষ্টীমারের যাতায়াত, রং-বেরংয়ের পাল তোলা বড় বড় নৌকা। যত দূর চোখ যায়, চোখ দুইটিকে ছুটাইয়া দিয়া তন্ময় হইয়াছিলেন কবি চিত্তরঞ্জন ভাবুক চিত্তরঞ্জন।

কিন্তু ধ্যান তাঁহার ভঙ্গ হইল। বহু দিনের, বহু বছরের অদেখা এক

বাল্যবন্ধু গিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। অতি অভাবগ্রস্ত সে, মলিন বেশ তাহার, দীন চেহারা! চিত্তরঞ্জনের চোখ দুইটি তখন আর দূরে প্রকৃতির সৌন্দর্যপানে ব্যস্ত নহে—সে-চোখে তখন কাব্য নয়,—বাস্তব! দূরের চোখ দুইটি গুটাইয়া আনিয়া স্থাপন করিয়াছেন হৃদয়ে। বাল্যবন্ধুকে চিনিলেন। খোঁজ-খবর লইয়া জানিলেন যে বন্ধুটির কন্যার বিবাহের বয়েস হইয়াছে। কিন্তু অর্থের অভাবে বিবাহ দিতে পারিতেছে না।—অর্থের জন্যও বহু জায়গায় গিয়াছে, হাত পাতিয়াছে কিন্তু সব জায়গা হইতেই তাহার সে হাতখানি শূন্য অবস্থাতেই ফিরিয়া আসিয়াছে। তারপর কাহার কাছে যেন শুনিয়াছে যে চিত্তরঞ্জন কলিকাতা যাইতেছেন—ষ্টীমারে রহিয়াছেন। তাই ছুটিয়া আসিয়াছে তাঁহার কাছে।

সব শুনিয়া চিত্তরঞ্জনের মন ব্যথায় ভরিয়া উঠিল, বেদনায় তাঁহার চোখে জল আসিল। বাল্যের সহপাঠীর কন্যা দায়, অভাবে পড়িয়াছে। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের তখন আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। যে পরিমাণে তাঁহার খরচের হাত সে-পরিমাণ টাকা তাঁহার সঙ্গে নাই, ছিল তিন হাজার টাকা। চিত্তরঞ্জন তাহা হইতেই দেড় হাজার টাকা তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া বাল্যবন্ধুকে মেয়ের বিবাহের দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। বন্ধুকে দুশ্চিন্তা মুক্ত করিয়া তাহার প্রাণে শান্তি দিলেন .কিন্তু নিজের মনে আনিলেন চিন্তা,—তাঁহার নিজেরই টাকার তখন দরকার। জানা গিয়াছে যে, কলিকাতা পৌঁছিয়াই তিনি টাকা ধার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দেখা যাইতেছে, অন্তরের পরিচয় দিতে, যাহা ছিল তাঁহার সহজাত, তিনি কখনই নিজের পকেটের একবারও হিসাব করিতেন না। তাঁহার ছিল এক হিসাব,—তাঁহার নিকট আসিয়াছে তাহাকে দেখিতে হইবে, তাহার চোখের জল মুছাইয়া, তাহার মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। সে কোন ব্যক্তিই হউক, অথবা কোন প্রতিষ্ঠানই হউক।

দেশবন্ধুর মাতুলবাড়ী মুলঘর। একবার সে গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোক দেশবন্ধুর নিকট অসিয়া বলিল, "আপনার মামাবাড়ীতে একটি পাঠাগার স্থাপিত করিব। পাঠাগারটি আপনার মাতৃদেবীর নামেই হইবে। পাঠাগার স্থাপনের জন্য এই সাহায্যটা আপনি করুন।"

মাতৃভক্ত চিত্তরঞ্জন। তিনি যে বড় হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার মায়ের

আশীর্বাদে। নিজেও বলিয়াছিলেন, "আমার যাহা কিছু সবই আমার মায়ের জন্য।" কিন্তু তবুও চিত্তরঞ্জন তাহাদের মুখ হইতে ঐ ধরনের কথা শুনিয়া খুশী হইতে পারিলেন না। পাঠাগারের জন্য সাহায্য চাহিতে আসিয়াছে ভাল কথা কিন্তু তাঁহার মায়ের নামে উহার নামকরণ হইবে এমন প্রলোভন দেখাইয়া কেন,—তাহা হইলে তো তাঁহার নিঃস্বার্থ সাহায্য হয় না।—তাই তিনি বলিলেন, "দেখুন আমার মায়ের নামে পাঠাগারটির নামকরণ হউক বা না হউক তাহাতে আমার আসে যায় না। আমাকে যদি দিতে হয় সেজন্য দিব না। কিন্তু এত টাকা এখন আমার হাতে নাই। তবে কিস্তিতে কিস্তিতে আপনারা টাকা পাবেন।—"বলিয়া চিত্তরঞ্জন তখনই তাহাদিগকে এক হাজার টাকার একখানি চেক লিখিয়া দিলেন।

আর একবার দেশবন্ধু তখন ঢাকাতে ছিলেন। তখন তাঁহার সচ্ছল অবস্থা ছিল না। সেই অসচ্ছল অবস্থার সময় একজন ভদ্রলোক তাহার ছেলেকে সঙ্গে লইয়া দেশবন্ধুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দেশবন্ধুকে তার দুঃখের কাহিনী জানাইলে তিনি খুব ব্যথিত হইয়া ওঠেন এবং তখনই দশটি টাকা তাহার হাতে দিয়া দেন। শুধু এইটুকুই নহে, দেশবন্ধু তাহাকে প্রতি মাসে দশ টাকা করিয়া সাহায্য করিবেন বলিয়াও ভদ্রলোককে জানাইয়া দেন এবং তাঁহারই আদেশে অভুক্ত ছেলেটিকে তখন পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দেওয়া হয়।

আর একটি ঘটনা। তখনও দেশবন্ধু ঢাকাতে ছিলেন। সন্ধ্যার সময় তিনি প্রায়ই বেড়াইতে বাহির হইতেন। সেদিনও সন্ধ্যার সময় ভ্রমণ শেষ করিয়া তিনি প্যারীবাবুর বাড়ীতে আসিয়া বসিয়াছেন। একটু পরেই দেখা গেল যে দেশবন্ধু যেন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং সেই ক্লান্তির জন্যই যেন তাঁহার দুই চোখে তন্দ্রা নামিয়া আসিয়াছে। প্যারীবাবু ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বলিলেন, "মিঃ দাশ আপনার শরীর কি আজ অসুস্থ?"

চিত্তরঞ্জন জানাইলেন, অসুস্থ নয় তবে কাল রাতে আমার ভাল ঘুম হয় নাই।

প্যারীবাবু জানিতে চাহিলেন, কেন?

চিত্তরঞ্জন কারণটি জানাইলেন। কারণটি হইল, দেশবন্ধুর দেশ বিক্রমপুর হইতে তাঁহার কয়েকজন দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন।

তাহাদের আদর-আপ্যায়ন, রাত্রের খাওয়া-দাওয়া এবং শোয়ার ব্যবস্থা করিতে করিতে অনেক রাত্রি হইয়াছিল।

ইহাদের আগমন প্যারীবাবু ভাল নজরে দেখিতে পারিলেন না। চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ নিয়া বলিলেন, তারা এখানেও আপনাকে ধাওয়া করেছে। এই হ'ল আমাদের দেশের লোকের একটা দোষ। যদি কেউ বড় হয়ে ওঠে তবে কিছুতেই তাহাকে মাথা ওঠাতে দেবে না।

প্যারীবাবু আর কতটুকু বিরক্ত হইয়াছিলেন! চিত্তরঞ্জন প্যারীবাবুর কথা শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছিলেন আরও বেশী, হইয়াছিলেন দুঃখিত। ঐ দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজনের অভাব-অনটনের কথা শুনিয়া তখন তাঁহার চোখ জলে ভিজিয়া উঠিয়াছে। ধীরে ধীরে বলিলেন, "প্যারীবাবু! কে কাকে সাহায্য করতে পারে? ওরা আজ আমার কাছে এসেছে, আমাকে যে ওদের কাছে যেতে হয়নি এটা তো ভগবানেরই দয়া। কিন্তু আমার দুঃখ বোধ হচ্ছে যে, আমি ওদের বেশী কিছু দিয়ে সাহায্য করতে পারলাম না। আমার হাতে টাকা নেই; মাত্র দুই শত টাকা আমার ছিল, সে টাকাটাই আমি ওদের দিয়ে দিয়েছি।"

দুই শত টাকা চিত্তরঞ্জনের নিকট কিছুই না কিন্তু যাহারা পাইয়াছিলেন তাহারা হয়তো ঐ টাকাকে নিশ্চয়ই অনেক মনে করিয়াছিলেন কারণ ঐ টাকার সঙ্গে বেশী সাহায্য করিতে না পারিয়া চিত্তরঞ্জনের সহৃদয় মনটিও তাহারা পাইয়াছিল।

এমন মনটি চিত্তরঞ্জনের বরাবরই ছিল। তখনও তিনি ঢাকাতেই ছিলেন। ঢাকা হইতে তাঁহার গ্রাম দূরত্ব হিসাব করিলে তেমন কিছুই নহে। কিন্তু তিনি নিজেই সেই দূরত্বকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন। সে দূরত্বটি সৃষ্টি করিয়া রাখিবার প্রকৃত কারণটিও যে তাঁহার নিকট অনেক অশান্তির, অনেক বেদনার। তাঁহার সে বেদনার অংশ গ্রহণ করিয়া কেহ যে উহা লাঘব করিয়া দিবে সে উপায়ও তো নাই—উহা যে তাঁহার একান্ত নিজের, নিজের হৃদয়ের।

কেহ কেহ তাঁহাকে বলিয়াছে, এত কাছে আসিয়াছেন, একবার দেশে গিয়া পৈতৃক বাড়ীখানা দেখিয়া আসিবেন না? এমন অনুরোধ অনেকেই তাঁহাকে অনেকবার করিয়াছে। অনেকের সে অনেকবারের অনুরোধের

উত্তরদাতা একজনই। সে-একজনের একই অন্তরের একই উত্তর—একই ব্যথার কথা। বলিয়াছেন তিনি, "বাড়ী যেতে কি আমার অনিচ্ছা? কিন্তু আমি বাড়ী যাই কি করে?—আমার হাত যে একেবারে খালি। বাড়ী গিয়া দেশের দুর্দশাগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজনদের যদি সাহায্য করতে না পারি ত বে তো আমার দেশে গিয়ে অশ্রুপাতই সার হবে।"

বিলাতে ছাত্রাবস্থায় দেশবন্ধু ইংরাজী নাটকের ২টি অঙ্ক লিখিয়া ইউরোপের নটশ্রেষ্ঠ হেনরী আর্ভিংকে দেখাইলে সে উহা পড়িয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিল। ঐ নাটকখানি লিখিয়া শেষ করিয়া দিবার জন্য সার হেনরী দেশবন্ধুকে যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছিল এবং ঐ জন্য তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিবে বলিয়াও আশা দিয়াছিল।

সেই ছাত্রাবস্থাতেই নাট্যকারের যশ, সুখ্যাতি না চাহিয়া, অর্থে প্রলুব্ধ না হইয়া দেশবন্ধু স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন, আর কিছু দিন বিলাতে থাকিয়া নাটকখানি শেষ করিয়া দিয়া আসিলেন না।—স্বদেশের টান, বাড়ীর টান! বিলাতে যখন ছিলেন তখন তাঁহার দেশ ঢাকা জিলার তেলিরবাগ নয়, নয় বাংলা, দেশ সমগ্র ভারতবর্ষ। আর যখন তিনি ঢাকাতে ছিলেন তখন তেলিরবাগ তাঁহার গ্রাম, তাহার কাশী, গয়া। সে-স্থান তাঁহার মাতা পিতার, পিতামহের প্রপিতামহের পদরজ বক্ষে ধারণ করিয়া পবিত্র তীর্থভূমি। বৈষ্ণব মনের তীব্র তৃষ্ণা তীর্থদর্শনও তিনি থামাইয়া রাখিলেন। স্বদেশের একটানে তিনি টাকাকে পেছনে ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। আবার গ্রামের প্রতি টান থাকা সত্ত্বেও অর্থের জন্য তিনি সেখানে যাইতে পারিলেন না।

দরদী এই চিত্তরঞ্জনের মনের স্পর্শ পাইতে জাতি ধর্মের কোন বিচার ছিল না। তাঁহার ইষ্ট নারায়ণ, তাঁহার স্থাপিত মাসিক পত্রিকা 'নারায়ণ।' দরিদ্র-দেরও তিনি মনে করিতেন নারায়ণ। ইহা মনে করিবার মত মনের অধিকারী জগতে বিরল। এই বিরল সংখ্যার মধ্যেও চিত্তরঞ্জন একজন।

সেবারে ঢাকাতে সাহিত্য সম্মিলনী। চিত্তরঞ্জন সেখানে গিয়াছিলেন যোগদান করিতে। সম্মিলন হইতে ফেরার পথে তিনি ষ্টীমারে কলিকাতার পথে রওনা হইয়াছেন। তখন রাত্রিকাল। একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ মদ্যপান করিয়া হয়তো মাত্রাধিক্যে নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

মত্ত অবস্থায় সে দেশবন্ধুর সঙ্গী গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রভৃতিকে আসিয়া আক্রমণ করিল। তাহারা তো অপ্রস্তুত। কথাটি চিত্তরঞ্জনের কানে গিয়া পৌঁছিল তখনই। তিনিও আর কাল বিলম্ব না করিয়া সোজা সাহেবের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেশ জোরের সঙ্গে সাহেবকে ধরিয়া, তাহাকে ঝাঁকি দিয়া দৃঢ়, গম্ভীর ভাবে কৈফিয়ত তলব করিলেন, "Why did you assult my men ?"

চিত্তরঞ্জনের ঐ মূর্তি দেখিয়া সাহেব তাঁহার নিকট নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু ঘটনাটি তখনই শেষ নহে। এখানেই যদি শেষ হইত তবে আর এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হইত না। উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, কিছুক্ষণ পরেই চিত্তরঞ্জন প্রকৃত ঘটনাও শুনিলেন। শুনিলেন যে, সাহেব যখন গিরিজাবাবু প্রভৃতিকে আক্রমণ করিয়াছিল তখন মদ্যপান হেতু সাহেবের মানসিক স্থিরতা ছিল না—সে যাহা করিয়াছে উহা নেশার জন্যই।

চিত্তরঞ্জনের মন তখন অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল। নেশায় মত্ত মানুষের কাছে তিনিও ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া কৈফিয়ত চাহিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন তখন যাহা করিলেন সেখানেই তাঁহার মন; সেখানেই তাঁহার দরদ। সাহেবকে তখন তিনি আপ্যায়িত করিলেন—তাহাকে দিলেন চা আর দিলেন একটু মদ; করমর্দন করিয়া ক্ষমা চাহিলেন নীরবে।

তাঁহার হৃদয়খানি ছিল নানাবিধ বর্ণময় অতি দামী মণিখণ্ডের মত। তাই এক এক সময় এক এক বর্ণের দ্যুতি প্রকাশিত হইত।

একবার তাঁহার বাড়ীতে একটি চোর ধরা পড়িয়াছে। চোর ধরা পড়িলে যেমন সকলে মিলিয়া তাহাকে প্রহার করিতে থাকে এখানেও তাহা হইতেছিল। এ-সবই হইতেছিল নীচে। চিত্তরঞ্জন তখন দ্বিতলে ছিলেন। ঐ গোলমাল শুনিয়া তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন। দেখিলেন এবং সব বুঝিলেন। চোরটির পোশাক বেশ ভদ্রলোকের মতই। অবশ্য চোরের ভদ্রবেশের জন্যই নহে, পোশাক যদি তাহার না-ও থাকিত তবুও তাঁহার মন যে দ্রবীভূত হইয়াছিল, তাহা হইতই। চোরটিকে আর প্রহার করিতে তিনি বাড়ীর সকলকে নিষেধ করিলেন এবং চোরটির নিকট গিয়া বলিলেন, "আপনি চুরি করিলেন কেন?"

চোরটি উত্তর করিল, "অবস্থা আমার খুবই খারাপ, পরিবার প্রতিপালন করিতে পারি না—নিরুপায় হইয়া……"

চিত্তরঞ্জন—তাই বলিয়া চুরি করিলেন কেন ? আপনি যদি আমার কাছে চাইতেন তবে আমিই আপনাকে দিতাম।

কথা কয়েকটি বলিয়া চিত্তরঞ্জন চোরটির হাতে কুড়িটি টাকা দিয়া দিলেন এবং ঐ দেওয়াই তাহার শেষ নয়, ভবিষ্যতে তাহাকে যে আরও দিবেন তাহাও তাহাকে জানাইয়া রাখিবার জন্য বলিলেন, "আর কোন দিনও চুরি করিবেন না, যদি আবশ্যক হয় তবে আমার কাছে আসিয়া চাহিবেন।"

চোরের প্রতি চিত্তরঞ্জনের এই সদয় ব্যবহার অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত। ঘটনাটি তাঁহার মহান হৃদয়ের পরিচয়ই বহন করে সন্দেহ নাই আবার পক্ষান্তরে সমাজের এমন একটি বিপথগামী লোককে সংশোধিত করিয়া সৎপথে আনিতে চাওয়ার মধ্যে তাঁহার সমাজ সংস্কারক মনেরও পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আবার জুয়াচোর অথবা ঠগ্ প্রতারকও যে তাঁহার মহান হৃদয়ের জন্যই তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া গিয়াছে সে দৃষ্টান্তও রহিয়াছে। প্রতারক হয়তো ভাবিয়াছে, তাঁহাকে বেশ প্রতারিত করিতে পারিয়াছে কিন্তু প্রতারকের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া যে তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন সে-কথা প্রতারক ভাবিতে পারে নাই ; ভাবা সম্ভবও নয়।

কোন একটি ভদ্রমহিলাকে তিনি তিন শত টাকা দিবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন। তাহাকে বলিলেন যে, "একদিন সকালে আপনার লোককে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, টাকা দিয়ে দেব।"

পরের দিন সকালবেলা একটি ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত। পরিচয় দিয়া জানাইল, সেই ভদ্রমহিলার নিকট হইতে টাকা লইবার জন্য আসিয়াছে। চিত্তরঞ্জন তাহার হাতে ভদ্রমহিলাকে দিবার জন্য ৩০০ শত টাকার একখানি চেক দিয়া দিলেন। ভদ্রলোক চেকখানি লইয়া চলিয়া গেল।

ইহার এক ঘণ্টা পরে আর একজন ভদ্রলোক আসিল। সে আসিয়া তাহার পরিচয় জানাইয়া বলিল যে সে ভদ্রমহিলার নিকট হইতে আসিয়াছে।

অবাক কাণ্ড! চিত্তরঞ্জন তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া বুঝিলেন যে এই লোকটিই প্রকৃত লোক, পূর্বে যে আসিয়াছিল সেই লোকটি তাহাকে ঠকাইয়া

গিয়াছে। ইহা লইয়া বাড়ীতে অনেকেই উত্তেজিত। কেহ কেহ বলিল, ব্যাঙ্কে চেক ভাঙ্গাইতে যাইবেই সুতরাং সেখানে গেলেই লোকটি ধরা পড়িবে। এখনও তো চেক ভাঙ্গাইতে পারে নাই।

এই সব আলোচনা চিত্তরঞ্জনের কানে গিয়া পৌছিয়াছিল। তিনি তাহাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, "তোমরা ওসব কিছু করো না, বেচারাকে কষ্ট দিয়ে কাজ নাই। তার ভাগ্যে ছিল সে পেয়েছে।"

এমন ভাগ্যলিপি যেন চিত্তরঞ্জন নিজ হাতেই উহাদের ললাট-পটে জোর করিয়া লিখিয়া দিতেন; অন্যত্র এমন সব ঘটনা ঘটিলে অপরাধী ব্যক্তির নিশ্চিত জেল হইত।

চিত্তরঞ্জন রূপার বাসন-পত্রে খাইতেন। সে-বাসনপত্র চুরি যাইত। আবার বাজার হইতে নূতন বাসন কিনিয়া আনা হইত। বাসন-চোর এই বাসন চুরি করিয়া করিয়াই জীবনে অনেক গুছাইয়া লইয়াছে। কিন্তু এ-বাসন চোর তো বাহিরের চোর ছিল না,—বাড়ীর ঝি-চাকরদের মধ্যেই কেহ ছিল। তবু বারে বারে চুরি যাওয়া সত্ত্বেও সে-চোরকে ধরিবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করা হয় নাই। কিন্তু চেষ্টা করিলেই বা কি হইত? চোর ধরা পড়িত। কিন্তু সহৃদয় চিত্তরঞ্জন সে সে-চোরকে কখনই শাস্তি দিতেন না! এমন দৃষ্টান্তও তো রহিয়াছে। বাড়ীর চাকর মুজাফ্ফর। তাহার কাজ ছিল শুধু চিত্তরঞ্জনকে তামাক সাজিয়া দেওয়া, অন্য কোন কাজ নহে। একদিন দেখা গেল, তাঁহার পকেট হইতে নোটের গোছা চুরি হইয়া গিয়াছে। কে নিল?—কে নিল রব উঠিল বাড়ীতে। চোর ধরা পড়িল। সে চোর আর কেহ নয়, যে তামাক সাজে সেই মুজাফ্ফর।

মুজাফ্ফরের এই চুরির কথা বলা হইল চিত্তরঞ্জনকে। কেহ কেহ বলিল, ওকে পুলিশে দেওয়াই ঠিক। আবার কেহ বলিল, অন্ততঃ ওকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেওয়াই উচিত।

চিত্তরঞ্জন তখন তামাক টানিতেছিলেন। তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "না থাক, বড় ভালো তামাক সাজে।"

ইহা চিত্তরঞ্জনের চোরকে প্রশ্রয় দেওয়া নয় বা নেশার যোগানদারকেও আশ্রয় দেওয়া নয়। কিন্তু যে নেশায় তিনি মুজাফ্ফরকে রাখিয়াছিলেন তাহা হইতেছে তাঁহার ভালোবাসার নেশা। তাঁহার দরদী মনের

সূক্ষ্ম অনুভূতির নেশা!

চিত্তরঞ্জনের এমন সূক্ষ্ম অনুভূতির আরও দুই একটি ঘটনা যাহা তাঁহার মনের দরদ লইয়া ঘটনাগুলিকে সুষমামণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে। ইহা তাঁহার ছোটদের জন্য ভালবাসা, প্রাণ ঢালা দরদ। রাজনৈতিক জীবনে কোন একজন কর্মী সারা দিনেও একবার চিত্তরঞ্জনের নিকট আসিল না। সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে। চিত্তরঞ্জন সকল কর্মীর উপস্থিতি দেখিয়াছেন, আসে নাই শুধু সে। তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাত যত বেশী হইতে লাগিল, তাঁহার মনও তাহাকে না দেখিয়া পীড়িত হইতে লাগিল। কিন্তু রাত যখন গভীর, সেই কর্মীর আর আসিবার সম্ভাবনা নাই তখন চিত্তরঞ্জন নিজেই বাড়ী হইতে পথে বাহির হইলেন। গিয়া উপস্থিত হইলেন সেই কর্মীর বাড়ী,—গভীর রাতে তাহারই জানালায়।

আবার যাহাকে তিনি চিনিতেন না এমন কর্মীও তো ছিল। সেই নাম-না-জানা একজন কর্মী দূর হইতে চিত্তরঞ্জনের নিকট আসিয়াছিল। কথাবার্তার পর সে চলিয়া গেল। কিন্তু পর মুহূর্তেই চিত্তরঞ্জনের খেয়াল হইল, ছেলেটিকে তো কিছু খাওয়ান হয় নাই—হয়তো বাড়ী হইতে খাইয়া আসে নাই। অভুক্ত অবস্থায় চলিয়া গেল!

বেলা তখন দুপুর। রাজনৈতিক কর্মী, রাজনীতির কথা আলোচনা করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে বাড়ী হইতে খাইয়া আসিয়াছে কি-না উহা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের নিকট উহা অপ্রাসঙ্গিক নহে। দুপুর বেলা তাঁহার বাড়ী হইতে অভুক্ত অবস্থায় সে চলিয়া গেল! চিত্তরঞ্জন ঠিক করিলেন, তিনি খাইবেন না, তাঁহার নিজেরও খাওয়ার অধিকার নাই। বাড়ীর সকলে চিন্তিত হইলেন, কোথায় পাবে সেই ছেলেটিকে? তাহাকে না পাইলে চিত্তরঞ্জনও খাইবেন না। চতুর্দিকে লোক বাহির হইল। খুঁজিয়া পাওয়া গেল তাহাকে। তখন তাহাকে শুধু খাওয়ান-ই নহে, চিত্তরঞ্জন সেই ছেলেটিকে পাশে বসাইয়া সেদিনের আহার করিয়াছিলেন। সারা মন-প্রাণ দিয়া চিত্তরঞ্জন বাংলাদেশকে ভালবাসিতেন। এই ছেলেটির জন্য তাঁহার এমন মন তাঁহার বাংলাকে ভালবাসার চরম সার্থকতার মধ্য দিয়া, তাঁহার সহৃদয় মনেরই একখানি সূক্ষ্ম এবং নিখুঁত ছবি!

ঠিক এমন আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল ময়মনসিংহে। সম্মিলনীতে

যোগদানের জন্য দেশবন্ধু তখন ময়মনসিংহে গিয়াছিলেন। নানাকাজে তিনি তখন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার সেই ব্যস্ত তার মধ্যে স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজের একটি ছাত্র একদিন সকালবেলায় তাঁহার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। ছেলেটির প্রার্থনা ছিল, তাহার কলেজের বেতন সম্বন্ধে। সম্মিলনীর ব্যাপারে তিনি ব্যস্ত থাকায় অনেকটা অন্যমনস্কভাবেই ছেলেটিকে বলিয়া দিলেন, "আমি কি এখানে টাকা নিয়ে এসেছি ?"

ছেলেটির মনোবাসনা পূর্ণ হইল না। যে জরুরী কাজে চিত্তরঞ্জন নিমগ্ন-ছিলেন, ঘণ্টা তিনেক পর সেই কাজ হইতে তিনি মুক্তি পাইলেন। তখনই তাঁহার মনে পড়িল সেই ছাত্রটির কথা।—আহা! ছাত্রটিকে কি বলিতে কি বলিয়া দিয়াছেন—মনে মনে ভাবিতে ভাবিতেই তাঁহার বেয়ারা বেণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার কাছে ঐ যে একটি ছেলে এসেছিল তাকে ডাকতো।"

বেণী জানাইল, "খুব দুঃখিত হ'য়ে ছেলেটি তো অনেক আগেই চলে গেছে।"

দুঃখিত মনে ছেলেটি চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া চিত্তরঞ্জন আরও বেশী দুঃখ পাইলেন। সকলকে ডাকিয়া বলিয়াদিলেন, "যেখানে পাও ছেলেটিকে আমার কাছে নিয়ে এসো।—তা'কে কি বলেছি আমার কিছু মনে নেই। তা'কে নিয়ে আসতেই হবে। যে পর্যন্ত সে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি জল গ্রহণও করবো না।"

সকলেই জানিত, তাঁহার কথার এদিক-ওদিক হইবে না। বাধ্য হইয়াই সকলের শহরময় ছুটাছুটি। ঘণ্টা দুই পরে ছাত্রটিকে চিত্তরঞ্জনের নিকট আনিয়া উপস্থিত করান হইল।

চিত্তরঞ্জনের তখন নূতন চেহারা। ছেলেটিকে দেখিয়া তাঁহার আনন্দ হইয়াছিল ঠিকই কিন্তু তাঁহার সেই আনন্দময় চেহারার চাইতে তাঁহার চেহারায় মধ্যে বিনয়ের ভাবই বেশী ফুটিয়া উঠিল। চোখে, মুখে আর চেহারায় কাকুতি-মিনতি লইয়া তিনি ছেলেটির নিকট ক্ষমা চাহিলেন। পরে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া সেদিনের ভোজনপর্ব সমাধা করেন।

যুদ্ধ, দেশ বিভাগ এবং আরও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়িয়া আজকের যুগের মানুষের মন অনেকটা সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই মানসিক

সঙ্কীর্ণতার দিনে চিত্তরঞ্জনের মত মানব প্রেমিক, সহৃদয় ব্যক্তির একান্তই প্রয়োজন রহিয়াছে। সাগর-সঙ্গীত রচয়িতার হৃদয়খানিও ছিল সাগরের মতই গভীর এবং বিস্তৃত। উহার পরিমাপ করা অসম্ভব। তাঁহার ঐ উন্মুক্ত মহান হৃদয়ে কত অসংখ্য মানুষ যে স্থান পাইয়াছে তাহারও ইয়ত্তা নাই! বৃহৎ বৃহৎ ঘটনায় পরিপূর্ণ তাঁহার জীবনপঞ্জী কিন্তু সেই বৃহৎ ঘটনার পাশে পাশে সেই যে নাম-না-জানা কর্মী, আনন্দমোহন কলেজের ছাত্রটি, মুজাফ্ফর বা ভদ্রবেশী চোরটির মত ছোট ছোট ঘটনার মূল্য নিরূপণের দিক হইতে কম মূল্যবান নহে। জীবনব্যাপী তাঁহার সহৃদয়তার পর্যালোচনা প্রসঙ্গে Charles Lamb-এর জীবনের একটি কাহিনীর কথা মনে পড়ে। একটি পুলের গোড়ায় দাঁড়াইয়া প্রত্যেক দিনই একটি খোঁড়া লোক পঙ্গু সাজিয়া ভিক্ষার আশায় হাত বাড়াইয়া থাকিত। Lamb ঐ পঙ্গুটিকে প্রত্যেক দিনই একটি করিয়া Penny দান করিতেন। লোকে বলিত, ভিখারীটি খোঁড়া, শুধু ভিক্ষার জন্যই পঙ্গু সাজিয়া ঠিক এক জায়গায়, একই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। Lamb-এর বন্ধু Leigh Hunt তাই একদিন Lamb-এর ঐ দানে আপত্তি তুলিলেন। Lamb উত্তর দিলেন, "থিয়েটারে টাকা দিয়া টিকেট কিনিয়া তো খোঁড়ার অভিনয় দেখ। আমিও না-হয় শুধু এক Penny দিয়া একটি খোঁড়ার নিখুঁত অভিনয় দেখি।"

কাহিনীর মধ্যে Charles Lamb-এর হৃদয়টিই ফুটিয়া উঠিয়াছে যেমন চিত্তরঞ্জন তাঁহার হৃদয়-কুসুমটিকে ফুটাইয়া রাখিয়াছেন উপরোক্ত ঘটনাপঞ্জীর মাঝে।

অপরাধী এবং অভাবী মানুষের প্রতি তাঁহার এই সহৃদয় ব্যবহার সর্বজন-বিদিত। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে, রাজনৈতিক সহকর্মীর প্রতি তিনি যেমন ব্যবহার করিয়াছেন তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। তিনি ছিলেন যেমন মহান, তাঁহার সেই মহানুভবতা দিয়াই আবার অপরের দোষ-ত্রুটি আড়াল করিয়া রাখিয়াছেন; অপরের দোষ ইচ্ছা করিয়া বরণ করিয়া নিয়াছেন নিজে।

একবার চিত্তরঞ্জনের একজন নেতৃস্থানীয় সহকর্মী সাময়িক দুর্বলতায় এমন একটি কাজ করিয়া বসিলেন যাহা অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইল। উহা জনসাধারণের মধ্যে জানাজানি হইলে সহকর্মীটির

অপদস্থ হইতে হয় এবং একজন নেতা হিসাবে তাহার স্থান অনেক নীচে নামিয়া যায়। চিত্তরঞ্জন উহা বুঝিলেন। সব বুঝিয়া সহকর্মী-নেতা যাহাতে তাহার নেতৃপদ হইতে চ্যুত না হয় সেই জন্য তিনি অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তাহার সব অপরাধ নিজে গ্রহণ করিবার জন্য তিনি বলিলেন, "ঐ সহকর্মীটিকে ঐরূপ কার্য করিবার জন্য তিনিই আদেশ দিয়াছিলেন। যদি অপরাধ হইষা থাকে তবে তাঁহার, সহকর্মীর নহে।"

অপরের অপরাধের বিষ পান করিলেন তিনি। হইলেন নীলকণ্ঠ। এমন হৃদয়পূর্ণ সহৃদয়তার পরিচয় আর কে দিতে পারিয়াছেন ?

অতি পুরাতন কালের কাহিনীতে আমরা দাতা কর্ণের দানের কাহিনী পড়িয়াছি। রাজা হরিশ্চন্দ্রের দানের কাহিনীও পড়িয়াছি। ইদানীং কালের ইতিহাসে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দানেরও অনেক কাহিনী রহিয়াছে। কাহার দানই কাহারোর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। সম্প্রতিকালে চিত্তরঞ্জনের দান সকলের কাছে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, তাই তাঁহাকে লোকে দাতা কর্ণের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকে।

ত্যাগ ছিল চিত্তরঞ্জনের তপস্যা আর দানে ছিল তাঁহার দীক্ষা। দানরূপ তপস্যার হোমানলে তিনি তাঁহার জীবনকে আহুতি দিয়াছেন। সে-দানে পাত্রাপাত্র বিচার ছিল না, জাতি-ধর্ম বিচার ছিল না, ছোট-বড় বিচার ছিল না। আবার দান করিবার পর দাতার যে গর্ব বা অভিমান তাহাও তাঁহার ছিল না। সে-দান দানের জন্যই যেন তিনি আদিষ্ট হইয়া ভগবানের আদেশ পালন করতেন। নিরহঙ্কার তাঁহার দান। শুধু দানরূপ কর্তব্য সাধনে যেটুকু তৃপ্তি, শুধু সেই তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিত তাঁহার মুখে। আর যাহারা তাঁহার এই দান স্বচক্ষে দেখিয়াছে, এমনও হইয়াছে যে আনন্দে তাহাদের চোখে জল আসিয়াছে। তাহাদের সে চোখের জল অপার্থিব আনন্দের।

চিত্তরঞ্জনের দান দেশবিদিত। নিকট আত্মীয়-স্বজন, আত্মীয়-স্বজনের চেনা-পরিচিত, তাঁহার সহানুভূতি ও দান পাইতে কখনই বঞ্চিত হয় নাই। ইহা ছাড়া জানা-চেনার সীমানার বাইরে যে কোন লোক প্রার্থী হইলেই হইল, সে কখনও শূন্য হাতে, হতাশ মনে তাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া যায় নাই। এমন প্রার্থীর হিসাব নাই, তালিকা নাই। মাসিক তিনি যাহাদের বিশ, পঞ্চাশ, একশ' টাকা করিয়া সাহায্য করিতেন তাহাদের যে এক-

খানি তালিকা ছিল তাহাও এত বড় দীর্ঘ ছিল যে, তাহা লইয়াও এক ইতিহাস রচিত হইয়া রহিয়াছে। চিত্তরঞ্জনের বিশ্বস্ত এক আত্মীয় ছিল, তাহার নাম কালিপদ উকিল। কালীঘাট পোস্টঅফিসের তদানীন্তন পোস্ট-মাস্টার মহাশয় উকিল মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "আপনাদের বাড়ীতে একটা Receiving Post office খুলিয়া লউন।" চিত্তরঞ্জনকেও জানান হইয়াছিল যে, যদি তিনি চান তবে তাঁহার বাড়ীতেই একটা স্বতন্ত্র পোস্ট অফিস খুলিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই যে চিত্তরঞ্জনের দান ইহা শুধু লোককে দেখানোর জন্য দান নহে বা দান করিয়া পরে জনসাধারণের অব-গতির জন্য প্রচার করিবার জন্যও নহে উহা ছিল তাঁহার মন যে দান করিতে চাহিত সেই দান। উহা ছিল, দান করিতে না পারিলে যে অব্যক্ত মনোবেদনায় মানুষ কাঁদিয়া ওঠে সেইরূপ দান। দান করিতে না পারিলে তিনি অশান্তি বোধ করিতেন, স্থির থাকিতে পারিতেন না, যেমন তৃষ্ণার সময় জল না পাইলে মানুষ অস্থির হইয়া ওঠে, ক্ষুধার সময় খাদ্য না পাইলে যেমন মানুষ কাতর হইয়া ওঠে তেমন।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি তাঁহার দীর্ঘদিনের নেশা এক মুহূর্তে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, জীবনকে করিয়াছিলেন রূপান্তরিত কিন্তু দানের নেশা—সে যে তাঁহার চিরদিনের সঙ্গী। এ নেশায় তিনি বেশী আসক্ত ছিলেন, ছিলেন তিনি মত্ত। দানের নেশায় আসক্ত এই সন্ন্যাসীর দান সম্বন্ধে কি ভাষায় যে সত্য পরিচয় ফুটাইয়া তোলা যাইবে সে-ভাষা আর ভাবও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবুও হয়তো কিছুটা বলা যায়, শ্রাবণের মেঘভরা আকাশ যেমন ঘনবর্ষণ মুক্ত হইয়া নিজেকে হাল্‌কা করিয়া বাঁচে এ-ও যেন তাহাই—তাঁহার মন যেন তাঁহার পকেট হইতে টাকার ভার কমাইয়া পকেট শূন্য করিতে পারিলেই তৃপ্ত! এ বিষয়ে তাঁহার আত্মীয়-অনাত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে তাঁহার অনেক সময় কথা হইয়াছে কিন্তু ভাষার তারতম্য হইলেও তাঁহার ছিল একই উত্তর, একই অন্তরের পরিচয়।

তাঁহার দান সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়াছে যে দান করা ভালো কথা, কিন্তু কাহাকে দেওয়া হইল, সৎপাত্রে কি অসৎপাত্রে তাহাও একবার খোঁজ করা দরকার।

চিত্তরঞ্জন এই মন্তব্য শুনিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়াছেন। উত্তরে বলিয়া-

ছেন, "আমি কোন Information Bureau খুলে বসতে পারবো না। আমি দিলাম এই আমার সুখ। কে নিল তা' জেনে আমার কি দরকার?"

জীবনে তিনি এমন সুখ কত পাইয়াছেন আর কত পান নাই সে হিসাব মিলান সম্ভব নহে। কারণ দাতাও তো হিসাব রাখেন নাই,—কেহ হিসাব রাখুক তাহাও চাহেন নাই। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দান সম্বন্ধে শোনা গিয়াছে যে, তিনি ডান হাতে যাহা দান করিয়াছেন তাহা তাঁহার বাঁ হাত জানিতে পারিত না। দেশবন্ধু সম্বন্ধেও সে-কথা অনেকটা প্রযোজ্য—তাঁহার দানের কোন হিসাব নাই; কোন তালিকা নাই; অনেক দানের খবর কেহ জানে না, তিনিও রাখেন নাই,—রাখা সম্ভবও হয় নাই। তবুও মহান দাতার মহাদান-মহোৎসব ব্রতের দুই একটি কাহিনী উল্লেখ করা যাইতেছে।

এক কালে অবস্থা খুবই ভাল ছিল, তখন অবস্থা বিপর্যয়ে দুরবস্থায় পড়িয়া এক ভদ্রমহিলা তাহার মেয়ের বিবাহের জন্য চিত্তরঞ্জনের নিকট সাহায্য চাহিতে গিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কত টাকা দরকার?"

ভদ্রমহিলা জানাইলেন "বাবা, এক হাজার টাকা হইলে পারবো।"

—"কাল এগারটার সময় একবার আসবেন,"—চিত্তরঞ্জন তাহাকে বলিয়া দিলেন।

মহিলাটি নির্দিষ্ট সময়ে আসিলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন মহিলাটির কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার এই ভুলিয়া যাওয়ার জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখপ্রকাশ করিয়া পরের দিনই আবার ভদ্রমহিলাটিকে আসিতে বলিলেন। ইহাও বলিয়া দিলেন যে, তিনি যদি না থাকেন তবে যেন শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর সঙ্গে দেখা করেন।

যথাসময়ে ভদ্রমহিলা আসিয়া একখানি চেক পাইলেন। চেকখানি পাইয়া ভদ্রমহিলা যেমন আনন্দিত তেমন বিস্মিত! যাহা সে চাহিয়াছিল ঠিক সেই অঙ্ক, এক হাজার টাকা। ঐ টাকা দিয়া ভদ্রমহিলা তাহার মেয়েকে ভাল ঘরেই বিবাহ দিয়াছিলেন। টাকা পাইয়া ভদ্রমহিলা দেশবন্ধুকে আন্তরিক আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

পাঁচজনের আশীর্বাদ চিত্তরঞ্জনের মস্তকে ফুল-চন্দন হইয়া বর্ষিত হইয়া-

ছিল—তাই তো তিনি বড়—তাই তো তিনি রাজা! এই রাজা হওয়া সম্বন্ধেও একটি ইতিহাস রহিয়াছে।

চিত্তরঞ্জনের তখন ছাত্রজীবন। একদিন কয়েকজন সমবয়স্ক বন্ধুর সঙ্গে কলিকাতারই রাজপথে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। পায়ে-হাঁটা পথের একধারে, কপালে ফোঁটা-তিলক কাটিয়া, এক গণকঠাকুর বসিয়াছিলেন। তাহার সামনে কয়েকখানি জ্যোতিষশাস্ত্র; কাগজের উপর রঙিন পেন্সিলে আঁকা চক্র আর মানুষের হাত।—একখানি কাগজে লেখা বিজ্ঞাপন, মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া বলিয়া দিতে পারেন।

তরুণ দল গণকঠাকুরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। একজন "হাত দেখাইতে চাহিল। অন্য একজন আপত্তি জানাইয়া বলিল, "হাত দেখাইয়া কি হইবে। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা হইবেই।"

অন্য আর একজন বলিল, "উনি যখন ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন তবে ভবিষ্যৎটা জানিতে দোষ কি?"

তরুণেরা তখন জ্যোতিষঠাকুরকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। একে একে জানিতে লাগিল নিজের ভবিষ্যৎ।

তরুণ চিত্তরঞ্জনের হাতখানি দেখিতে দেখিতে জ্যোতিষঠাকুরের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিলেন, "বাবা! বড় হয়ে তুমি রাজা হবে।"

সকলের হাত দেখার শেষে জ্যোতিষঠাকুরকে তখন দক্ষিণা দেওয়ার পালা। সকলেই যে যাহার পকেট হইতে দক্ষিণা দিলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন কোন দক্ষিণা না দিয়া জ্যোতিষঠাকুরকে বলিলেন, "আপনি আমাকে যা বললেন তা আমি বিশ্বাস করছি না। আগে আমি রাজা হই, পরে আপনাকে আপনার দক্ষিণা দেব—কেমন?"

আত্মবিশ্বাসী গণকঠাকুর বলিলেন, "বেশ! দেখে নিয়ো আমার কথা সত্য হয় কি-না! কিন্তু যখন সত্য হবে তখন আমার দক্ষিণার কথা ভুলে যেও না।"

হাসিয়া চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "কক্ষনো আপনার দক্ষিণার কথা ভুলব না।"

এই ঘটনার পর অনেক বছর কাটিয়া গিয়াছে। চিত্তরঞ্জন তখন কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিস্টার, বিরাট তাঁহার পসার। বাড়ী, গাড়ী আর প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক তিনি।

একদিন চিত্তরঞ্জন আদালতে যাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইতেছেন। এমন

সময় সেই গণকঠাকুর আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত। অনেক বছর কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া গণকঠাকুরের চেহারায়ও সে-ছাপ পড়িয়াছে। চিত্তরঞ্জন তাই প্রথম দর্শনে তাহাকে চিনিতে পারেন নাই।

অভিমানে আহত হইয়া সেই গণকঠাকুর বলিলেন "এখন তুমি সত্য সত্যই রাজা হইয়াছ, আজ আমাকে চিনিতে পারিবে কেন? তোমার বোধহয় মনে আছে যে তোমার হাত দেখিয়া আমি বলিয়াছিলাম—তুমি রাজা হইবে।"

বিগত দিনের সেই হাত দেখার কথা চিত্তরঞ্জনের মনে পড়িল—সেই ছাত্রজীবন, সেই ফুটপাথ! গণকঠাকুরকে না চিনিতে পারার জন্য যে অপরাধ হইয়াছে সেজন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "ঠাকুরমশাই! দয়া করে আজ সন্ধ্যার সময় আপনি একবার আসুন।—আপনার দক্ষিণা দেওয়া হয়নি সে কথা আমার মনে আছে। আজকে আমি তা' মিটিয়ে দেব।"

সন্ধ্যা হইয়াছে। গণকঠাকুর আবার আসিলেন দক্ষিণা পাইবার আশায় কিন্তু চিত্তরঞ্জন তখনও আদালত হইতে বাড়ীতে ফেরেন নাই। অবশ্য গণকঠাকুরকে বেশী দেরী করিতে হইল না। একটু পরেই চিত্তরঞ্জন ফিরিলেন। গণকঠাকুরকে দেখামাত্রই পকেট হইতে কয়েক তাড়া নোট বাহির করিয়া গণকঠাকুরের হাতে দিয়া বলিলেন, "আমি ঠিক করেছিলাম—যত টাকাই আজ আমি রোজগার করব তা সবটা আপনার দক্ষিণা হিসাবে আপনাকে দেব। আজ আমার রোজগার হয়েছে পঁচিশ হাজার টাকা। তাই আজকের সব টাকাই আপনার প্রাপ্য, আপনার দক্ষিণা।"

দক্ষিণা গ্রহণ করিতে আসিয়া এমন পরিমাণে যে দক্ষিণা পাইবেন ইহা গণকঠাকুরও ভাবিতে পারেন নাই। তিনি অবাক! তিনি বিস্মিত!

ছাত্রজীবনে একদিন যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন ব্যারিস্টারী জীবনে তাহা পালন করিয়া চিত্তরঞ্জনের মুখখানি যেন তখন ঋণের দায় হইতে মুক্ত হওয়ার আনন্দে উদ্ভাসিত!

তিনি বলিতেন, "টাকা কি আমার?" উপরের ঘটনায় টাকা যে তাঁহার নয় তাহারই প্রমাণ। আবার নিম্নোক্ত ঘটনায়ও সে-প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

সাঁওতাল পরগণায় দুমকা জিলায় মহেশপুর স্টেট। সেখানকার কুমারের সঙ্গে ভাগলপুরের শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের সহিত এক মোকদ্দমা হয়।

মোকদ্দমাটি মর্গেজ ও রিডেম্পসনের। প্রায় ৬।৭ মাস এই মোকদ্দমাটি চলিয়াছিল এবং এই ব্যাপারে চিত্তরঞ্জনকে দৈনিক প্রায় ষোল ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত চিত্তরঞ্জনের আন্তরিক চেষ্টায় এই মোকদ্দমার একটি মিটমাট হইয়া যায়। এই উপলক্ষে মহেশপুর রাজ স্টেট হইতে চিত্তরঞ্জনের ফি-হিসাবে নগদ প্রায় লক্ষ টাকা আসিয়াছিল। চিত্তরঞ্জনের অফিস ঘরে সে-টাকা স্তূপীকৃত করিয়া আট দশজন লোক সে-টাকা গুনিয়াছিল। টাকা গুনিবার সময় সহসা চিত্তরঞ্জন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এক মুহূর্ত টাকার দিকে তিনি তাকাইলেন, কি ভাবিলেন, কি হিসাব করিলেন মনে মনে। পরক্ষণেই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমরা এক আঞ্জলায় যে যতো পারো ততো টাকা নাও।"

এমন আদেশ শুনিয়া সকলে তো অবাক !

চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "নাও।"

কেহ কেহ টাকা নিল। কেহ আবার নিল না। একজন ভদ্রলোক পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "কৈ আপনি তো টাকা নিলেন না ?"

সে ভদ্রলোক টাকা নেবে কি ! জীবনে এমন কথা সে শোনে নাই,— শুনিয়া তাই সে অবাক ! সে নির্বাক !

চিত্তরঞ্জন নিজেই তাহাকে দেওয়ার জন্য অগ্রসর হইলেন। এক আজ্‌লা নয়, নিজের হাতে দুই আজ্‌লা টাকা তিনি তুলিয়া দিলেন ভদ্রলোকটিকে।

অবাক্ হইতে তখনও যেটুকু বাকী ছিল ভদ্রলোকের তখন তাহা পূর্ণ হইল। একি দান ! কে দেখিয়াছে এমন দান ! কে শুনিয়াছে এমন দানের কথা !

দানে ছিল চিত্তরঞ্জনের পরম আনন্দ ! তিনি বিশ্বাস করিতেন, দান করিলে দশগুণ পাওয়া যায়। তিনি নিজে তাঁহার দানের মধ্য দিয়া তাঁহার এই ধ্রুব-বিশ্বাসকে যেমন সত্য বলিয়া জানিয়াছেন অপরের জীবনেও উহা তেমন সত্য হইয়া উঠুক ইহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। সে-ইচ্ছাও তাঁহার পূর্ণ হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর ঘটনা ঘটিয়া উহাকে সত্যে পরিণত করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভবানীপুরের একজন যশস্বী সঙ্গীতজ্ঞ

ছিলেন। যন্ত্রশিল্পেও তাহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। এই প্রমথবাবু চিত্ত-রঞ্জনের দুই কন্যা অপর্ণা দেবী ও কল্যাণী দেবীকে গান শিখাইতেন। ইহা ছাড়া চিত্তরঞ্জন যদি কোন সময় একটু অবসর পাইতেন, প্রমথবাবু রুদ্রবীণায় ঝঙ্কার তুলিয়া তাঁহার অবসর বিনোদন করাইতেন। ইহার জন্য প্রমথবাবুকে চিত্তরঞ্জন মাসিক দেড় শত টাকা পারিশ্রমিক দিতেন।

প্রথম মাস পূর্ণ হইলে চিত্তরঞ্জন প্রমথবাবুকে তিন শত টাকা দিলেন। হাতে তিন শত টাকা পাইয়া প্রমথবাবু বিস্মিত। তিনি জানেন তাহার মাসিক বেতন দেড় শত টাকা, তবে তিন শত টাকা দিলেন কেন? তবে কি আগামী মাসের জন্যও অগ্রিম দিয়া রাখিলেন? ভাবিতে লাগিলেন প্রমথনাথ······বাকী দেড় শত টাকা······শেষ পর্যন্ত অতি বিনীত ও কুণ্ঠিত-ভাবে প্রমথনাথ জিজ্ঞাসা করিয়াই বসিলেন, "বাকী দেড় শত টাকা আমি কিভাবে খরচ করবো?"

চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "আমার কথা কি আপনি শুনবেন?"

"—বলুন।"

—"যাওয়ার সময় যে ভিক্ষুকটি প্রথমে আপনার নিকট একটি পয়সা চাইবে, আপনি যদি নির্বিচারে ঐ সমস্ত টাকাগুলি তাকে ফেলে দেন, তবে ঐ দুঃখীর সমস্ত প্রাণের ভেতর থেকে যে আশীর্বাদ আসবে, সজলচক্ষে একটিবার যে আঃ উচ্চারণ করবে, তার প্রভাব যদি দশগুণ না আপনার কাছে আসে তবে আমি পুনরায় এই টাকাটা আপনাকে দিয়ে দেব।"

প্রমথবাবু চিত্তরঞ্জনের কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু এক পয়সা চাহিলে সেই ভিখারীকে দেড় শত টাকা তিনি দিতে পারিবেন না ইহা অকপটে স্বীকার করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে অন্তরের সঙ্গে আমি তাহা পারিব না; আর পরে যে সেই জন্য আপনার নিকট আবার টাকা চাহিব তাহাও পারিব না।"

চিত্তরঞ্জনের বাড়ী হইতে প্রমথনাথ যখন রাস্তায় বাহির হইলেন তখন একটি ভিখারী সত্য সত্যই তাহার নিকট একটি পয়সা ভিক্ষা চাহিল। প্রমথ-নাথের মনে পড়িল চিত্তরঞ্জনের কথা। কিন্তু পকেট হইতে দেড় শত টাকা তিনি বাহির করিয়া দিতে পারিলেন না; ভিখারীকে তিনি একখানা দশ টাকার নোট অন্তরের সঙ্গে দান করিয়াছিলেন।

বাড়ীতে পৌছিয়া যাহা শুনিলেন এবং দেখিলেন তাহাতে প্রমথনাথ বিস্মিত হইয়া গেলেন। যাহা প্রমথনাথ ভাবেন নাই বা কল্পনাও করিতে পারেন নাই এমন এক অপ্রত্যাশিত জায়গা হইতে পারিতোষিক হিসাবে প্রমথনাথের এক শত টাকা আসিয়াছে।

গল্প নহে, সত্য ঘটনা; সত্য ঘটনা গল্পের চাইতেও বিস্ময়কররূপে প্রমথ-নাথের জীবনে দেখা দিল। তিনি যখন চিত্তরঞ্জনের নিকট তাহার এই বিস্ময়কর অপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছিলেন তখন বক্তার চোখে যেমন জল, শ্রোতার চোখেও তেমনি জল!

চিত্তরঞ্জন শুধু নিজেই দান করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, অপরেও দান করুক ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দান করিলে যে দশগুণ পাওয়া যায় তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাসের মূল অনুসন্ধান করা কঠিন। তিনি নিজের জীবনে উহাকে সত্য বলিয়া জানিয়াছেন কিন্তু অপরের জীবনেও যে উহাই সত্য হইবে এ দৃঢ় বিশ্বাসের মূল কারণ সত্যই অজ্ঞাত।

ঠিক নিজের জীবনেও এমন একটি ঘটনা তাঁহার ঘটিয়াছিল। এই ঘট-নারও মূল ইঙ্গিত,– যাহা দান করা যায়, ঈশ্বর তাহার অনেক গুণ দাতাকে অন্য পথে ফিরাইয়া দেন।

চিত্তরঞ্জন ১৯১৭ সালের শেষের দিকে ময়মনসিংহে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেই সময় একদিন সকালবেলা তাঁহার নিকট একজন দর্শনপ্রার্থী আসিয়া উপস্থিত। দর্শনপ্রার্থী কন্যাদায়গ্রস্ত একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ, মেয়েকে বিবাহ দিতে পারিতেছে না জানিয়া চিত্তরঞ্জনের দয়া হইল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে চেক্ বহিখানি আনিবার জন্য বলিলেন। চেকে টাকার অঙ্ক বসাইলেন দুই এক শত টাকার নহে, পূর্ণ একটি হাজার টাকা।

পাশেই ছিলেন সুগায়ক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র ঘোষ, সূর্যকুমার সোম ইত্যাদি। চেকে লিখিত টাকার অঙ্ক দেখিয়া তাহারা তো অবাক! সূর্যকুমার সোম মহাশয় বলিয়াই ফেলিলেন, "মিঃ দাশ, আপনার কি লিখতে ভুল হয়েছে? এক শত টাকার জায়গায় কি হাজার টাকা লিখে ফেলেছেন?"

চিত্তরঞ্জন তাহার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন, "ভুল আমি করিনি মিঃ সোম, ভুল আপনার ভাবার।"

সূর্যবাবু তখন আর কি বলিবেন! তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "অবশ্য দান করা খুবই ভালো। কিন্তু যে ভাবে দান করছেন, এত দান করলে আপনি যে শুধু খেটেই মরবেন।"

দিন চলিয়া গেল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। সন্ধ্যার সময়ে চিত্তরঞ্জনের সব বন্ধু-বান্ধব আসিয়া আবার সমবেত হইয়াছে। হাসি-গল্প আর নানা রকম কথা-বার্তায় আসর তখন জমিয়া উঠিয়াছে। এমন সময় দুয়ারে দাঁড়াইয়া পিয়ন—একটি টেলিগ্রাম। তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামখানি পড়িয়া চিত্ত-রঞ্জন মনে মনে হাসিলেন, মুখেও ফুটিয়া উঠিল সে-হাসির রেখা। কিন্তু তিনি নীরব। নীরবেই টেলিগ্রামখানি সূর্যবাবুর হাতে দিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। টেলিগ্রামে চিত্তরঞ্জনকে জানান হইয়াছে যে, ডুমরাওনের মোকদ্দমায় দৈনিক পনের শত টাকায় তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। সূর্যবাবু উহা পড়িলেন। টেলিগ্রামখানি হাতে করিয়া তিনি নীরব।

এবার কথা বলিলেন চিত্তরঞ্জন, "সূর্যবাবু, এইবার আপনি আমার কাছে হেরে গেলেন তো? বুঝলেন—দেনেওলা ভগবান। আমার কি সাধ্য আমি দান করি।"

জীবনে চিত্তরঞ্জন প্রচুর উপার্জন করিয়াছেন এবং প্রচুর দান করিয়াছেন। প্রচুর উপার্জন করিয়াছেন বলিয়াই দান করিয়াছেন—তাহা নহে। দান ছিল তাঁহার নেশা, এবং এই নেশা তাঁহার চিরদিনের। যখন প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন না তখনও তিনি এমনই দান করিয়াছেন, তখনও ছিল তাঁহার বেহিসেবী দান। নিজের সচ্ছল অবস্থা নহে, আগামীকাল তাঁহার কি করিয়া চলিবে তাহা একবারও না ভাবিয়া সেই অসচ্ছল দিনেও তিনি তাঁহার দানের হাত কখনও সঙ্কুচিত করেন নাই।

তখন ১৯০১ সাল। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি হাইকোর্টে যোগ-দান করিয়াছেন। ব্যবসায়ে তেমন অর্থাগম হইতেছিল না, সংসার অসচ্ছল। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাইবার জন্য তখন অর্থের প্রয়োজন হয়। মিঃ পোলক উক্ত ফণ্ডের জন্য কলিকাতায় চাঁদা সংগ্রহ করিতেছিলেন। তিনি আসিলেন চিত্তরঞ্জনের নিকট। চিত্তরঞ্জনের নামে ব্যাঙ্কের হিসাবে তখন মাত্র ৩০৫০ টাকা গচ্ছিত ছিল। চিত্তরঞ্জন তাঁহার একাউণ্টে মাত্র

পঞ্চাশ টাকা রাখিয়া বাকী তিন হাজার টাকা দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ ফণ্ডে দান করিবার জন্য মিঃ পোলকের হাতে দিয়া দিলেন।

এ-দান তাঁহার নিঃস্ব হইয়া দান।

চিত্তরঞ্জন দান করিতেন নির্বিচারে, তাই তিনি দাতা এবং দেশের মানুষ তাই তাঁহাকে দাতা আখ্যা দিয়াছে। কিন্তু তিনি উহাতে দুঃখ পাইতেন। তিনি বলিতেন, "আমাকে দাতা বোলো না, আমি ব্যথা পাই। মনে করো না দান করছি। ওদের পাওনা ছিল তাই পেয়েছে। ওদের প্রাপ্য ছিল তাই তো ভগবান আমার কাছে ওদের সব গচ্ছিত রেখেছেন। চেয়েছেন যেদিন সেদিনই দিয়ে দিয়েছি।"

অভাবী মানুষ যখন তাহার প্রয়োজনের চরম মুহূর্তে দাতার নিকট হইতে দান লাভ করে সেই দানই অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত। চিত্তরঞ্জনের দানও তেমনি। প্রার্থীর প্রার্থনার অঙ্ককে এতটুকু না কমাইয়া তাহাকে তাহার চাহিদার পরিপূর্ণ অঙ্কটি দান করাই চিত্তরঞ্জনের দানের একটি মহান বৈশিষ্ট্য। বরং দেখা গিয়াছে, যে যাহা চাহিয়াছে তিনি তাহার চাইতেও বেশী দিয়াছেন। আবার কি অভাবের জন্য প্রার্থী হইয়াছেন তাহা জানাইয়া, যে ব্যক্তি টাকার অঙ্ক মুখে বলে নাই, সে পাইয়াছে আশাতীত, যেমন গণকঠাকুরের দক্ষিণা। গণকঠাকুর তাঁহার দক্ষিণা হিসাবে সেদিন যত বেশীই আশা করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়ই পঁচিশ হাজার টাকা নহে। এমনই ছিল চিত্তরঞ্জনের প্রাণ; দানের হাত।

এত বড় দাতার নিকট আবার যখন কাহারো নিকট অতি ক্ষুদ্র প্রার্থনা আসিয়াছে সে প্রার্থনাও তাঁহার মমতাময় মনে সমান ভাবেই আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার মন যে কতখানি আলোড়িত হয় সে সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। কালীঘাট অঞ্চলের একটি ভদ্রলোক তাহার মেয়ের বিবাহের দিন ধার্য করিয়াছেন। বরপক্ষের সঙ্গে এই কথাই ঠিক হয় যে বিবাহের দিন বরপক্ষকে নগদ এক শত টাকা দিতে হইবে। ভদ্রলোক অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন জায়গা হইতে সে-টাকার ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। তখন তাহার মনে পড়িল এই দানবীর চিত্তরঞ্জনের কথা। নামটি মনে পড়িতেই ভদ্রলোক মনে মনে আশ্বস্ত হইলেন,—চিত্তরঞ্জনের নিকট গিয়া একবার পৌছিতে পারিলে ঐ টাকার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই

হইবে। মনে মনে এই আশা পোষণ করিয়াই ভদ্রলোক চিত্তরঞ্জনের নিকট তাহার বক্তব্য বলিয়া প্রার্থনা জানাইলেন। চিত্তরঞ্জনও সঙ্গে সঙ্গে রাজী হইলেন। কিন্তু সারাদিন নানা কাজে তিনি এমন ব্যস্ত ছিলেন যে, ভদ্রলোককে যে এক শত টাকা দিতে হইবে সে কথা তিনি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ভুল, ভুল হইয়াই রহিল না। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া যখন বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছেন, তখন হয়তো সারাদিনের কর্মতালিকার কথা মনে করিতে করিতেই সেই কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি তখন আর বিছানায় শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। দ্বিতল হইতে সোজা নীচে নামিয়া আসিলেন এবং বাড়ীর ক্যাশিয়ার ললিতমোহন সেন মহাশয়কে বলিলেন, "ললিত, সকালে কে টাকা নিতে এসেছিল, বোধ হয় এতক্ষণে বিয়ে হয়ে গেছে ; তুমি শীগ্‌গীর যাও।"

চিত্তরঞ্জন ললিতবাবুর হাতে এক শতটি টাকা দিয়া তখন শুইতে গেলেন।

বিপদে পড়িল ললিতবাবু—সকালে কে আসিয়াছিল, কাহার মেয়ের বিবাহ—রাতও হইয়াছে অনেক !—কোথায় তাহার ঠিকানা ? কিন্তু ললিত-বাবু জানিতেন, সব রকম অসম্ভবকেই সম্ভবে পরিণত করিতে হইবে কারণ দাতা চিত্তরঞ্জন যে দান করিতে চাহেন এবং ঐ টাকা প্রার্থীর হাতে না পৌছিলে তাঁহার সারা মন অশান্তিতে ভরিয়া উঠিবে। সুতরাং বেশী রাতেও ললিতবাবু পথে বাহির হইলেন।

এমনই ছিল চিত্তরঞ্জনের দানের মন ! টাকার অঙ্ক সেখানে বিচার্য ছিল না। বিচার্য ছিল সাহায্যের টাকা প্রার্থীর হাতে ঠিক মত পৌছাইল কি-না। আবার দান করিবার সময় পাত্রাপাত্র তিনি বিচার করিতেন না ঠিকই, কিন্তু মুহূর্ত মধ্যেই প্রার্থী সম্বন্ধে অনেক কিছু ভাবিতেন, তেমন প্রমাণও রহিয়াছে।

একদিন আলিপুর আদালতে তাঁহার একটি মোকদ্দমা ছিল। আদালতে যাইবেন, সেজন্য তিনি প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল কয়েকজন জুনিয়র আইনজীবী। ঠিক সেই সময় একজন ভদ্রমহিলা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। ভদ্রমহিলার চোখে জল, মুখখানিতে বিষাদের ছাপ। তাহার কোলে একটি রুগ্নশিশু এবং হাতে একখানি কাগজ।

চিত্তরঞ্জন দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ভদ্রমহিলার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা

করিলে মহিলাটি হাতের কাগজখানি চিত্তরঞ্জনের দিকে আগাইয়া ধরিলেন।

চিত্তরঞ্জন কাগজখানি হাতে ধরিয়া উহা পড়িলেন,—একখানি প্রেস্‌ক্রিপসন; রুগ্ন শিশুটির জন্য ঔষধের নাম।

কত চাই আপনার? চিত্তরঞ্জন জানিতে চাহিলেন।

"বাবা, আড়াই টাকা হ'লে ছেলেটির ঔষধ কিনে দিতে পারি," খুব বিনীতভাবে ভদ্রমহিলা জানাইলেন।

এক মুহূর্ত সময়। চিত্তরঞ্জন পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া ভদ্রমহিলার হাতে দিলেন।

চিত্তরঞ্জনের সঙ্গীদের মধ্যে একজন না বলিয়া পারিল না. চেয়েছে আড়াই টাকা; আড়াই টাকার স্থলে দশ টাকা কেন?

উক্ত অভিমত চিত্তরঞ্জন পছন্দ করিলেন না। তিনি বলিলেন, "এখন বেশ বেলা হয়েছে। মনে হয় স্ত্রীলোকটির আহারেরও কোন সংস্থান নেই, কি খাবে! সে ব্যবস্থা করতে গিয়ে হয়তো ঠিক সময়ে ঔষধ-ই আনবে না, ঔষধের অভাবে ছেলেটির অযত্ন হবে।—এ সব চিন্তা করেই আমি দশ টাকা দিয়েছি।"

এই দানবীরের দানের কাহিনীতে বাংলা দেশভরা। যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে তাহারা তো নিশ্চয়ই, যাহারা এই মহাদানব্রতের কাহিনী পড়িয়াছে বা শুনিয়াছে তাহারাও ভক্তি ও শ্রদ্ধাপ্রণতচিত্তে চিত্তরঞ্জনের দানের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকে। এ-দান যে কত প্রকারে, কত প্রণালীতে, কত বিভিন্ন উপায়ে তাহারও ইয়ত্তা নাই।

এ পর্যায়ে উল্লেখ করা যায়, দেশপ্রেমিকদের জন্য চিত্তরঞ্জনের সহানুভূতিপূর্ণ মনটির কথা। অরবিন্দকে জেলের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিপিন পাল মহাশয় ছয় মাসের জন্য কারাবরণ করিয়াছিলেন। এক দেশপ্রেমিককে রক্ষা করিলেন আর এক দেশপ্রেমিক। চিত্তরঞ্জন উভয়ের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিপিনবাবুর সংসার পরিচালনা করিতে মাসিক যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল চিত্তরঞ্জন তাহা বহন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বিপিনবাবুকে নিশ্চিন্ত করিয়াছিলেন। শুধু এই ছয় মাস কাল সময়ই নহে, জানা গিয়াছে যে, তাঁহার এই রাজনৈতিক গুরু যাহাতে সর্বসময়ের জন্য একমনে দেশের মুক্তির জন্য অবিরত সংগ্রাম করিয়া যাইতে পারেন তজ্জন্য

চিত্তরঞ্জন দীর্ঘদিন সাধ্যমত বিপিনবাবুর সংসার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত সহৃদয়তায় তাঁহার একভাবের দানের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার নিম্নে যে ঘটনাটির কথা উল্লেখ করা যাইতেছে তাহার মাধ্যমেও তাঁহার অন্য এক প্রকার দানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা সর্বজন বিদিত যে, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যখনই কেহ আর্থিক অসুবিধায় পতিত হইয়াছে তিনি তখনই তাঁহার সহৃদয় মনটি লইয়া সাহায্যের দক্ষিণ হাতখানি বাড়াইয়া দিয়াছেন। একবার এক আত্মীয়ের কিছু টাকার একান্ত প্রয়োজন হয়। টাকার পরিমাণ অবশ্য বেশীই ছিল, দশ হাজার টাকা। চিত্তরঞ্জনের হাতেও তখন টাকা ছিল না, অথচ আত্মীয়কে টাকা দিতেই হইবে। নিরুপায় হইয়া চিত্তরঞ্জন শতকরা ৯টাকা সুদে দশ হাজার টাকা ঋণ করিয়া তাহাকে দিয়াছিলেন।

দিন চলিয়া গেল। সেই আত্মীয় টাকা পরিশোধ করিবার নাম করিল না। ঋণ করা হইয়াছিল খত করিয়া। খতের মেয়াদও ফুরাইয়া আসিল। যথাসময়ে এটর্নী চিত্তরঞ্জনের কাছে আসিয়া উপস্থিত।

চিত্তরঞ্জন তখন বাড়ী ত নহেন, জেলে। জেলে বসিয়াই তিনি ঐ দশ হাজার টাকার ঋণের বোঝাকে নতুন করিয়া আবার বহন করিতে লাগিলেন। পুরান খত বদলাইয়া লেখা হইল নতুন খত।

জেলে বসিয়াও দান। দান বলা যায় এই কারণে যে, চিত্তরঞ্জন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ঐ আত্মীয় তাঁহাকে টাকা ফেরত দিবে না।

এমন ঋণ করিয়া একটি কাগজের সম্পাদককেও তিনি বিশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। সে টাকাটাও যে ফিরি পাইবেন না তাহা জানিতেন। জানিয়াও তিনি দিতেন। এই সম্বন্ধে ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লেখা সুভাষচন্দ্রের একখানি চিঠির একটু অংশ উদ্ধৃত করা হইতেছে: জেলখানার আলোচনার মধ্যে তাঁহার নির্বিচার বদান্যতার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিলে তিনি বলিতেন—"দেখো, তোমরা মনে করিবে আমি নিতান্ত বোকা, লোকে আমাকে ঠকিয়ে টাকা নিয়ে যায়। কিন্তু আমি সব বুঝতে পারি, আমার কাজ দিয়ে যাওয়া, তাই আমি দিয়ে যাই। বিচার করবার ভার যাঁর উপর তিনি বিচার করবেন।"

অফুরন্ত দান তাঁহার।

সকালের দিকে বাড়ীতে বাহিরের লোকজন আর মক্কেলের ভিড়। বেলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে-ভিড় কমিয়া গিয়াছে। আদালতে যাইবেন চিত্তরঞ্জন, তাহারই প্রস্তুতি চলিতেছে। বাড়ীর দরজায় দারোয়ান রহিয়াছে। সে সময় সাধারণতঃ বাহিরের অপরিচিত কাউকে বাড়ীর ভিতরে আসিতে দারোয়ান আপত্তি করে।

সেই সময় বাড়ীর দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণটির দেশ পূর্ববঙ্গে। দারোয়ান তাহাকে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে না দিলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি বাহিরেই চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করিবার আশা নিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রাহ্মণ শুনিয়াছে—চিত্তরঞ্জন দানবীর, তাঁহার কাছে সাহায্য চাহিলে কেউ কোন দিন শূন্য হাতে ফিরিয়া যায় নাই। তিনি দেবতা।

ব্রাহ্মণের প্রয়োজন, তাই ব্রাহ্মণ বাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার যে বিশেষ দরকার, দেখা না করিলেই নয়।

বাড়ীর দরজার সম্মুখে চিত্তরঞ্জনের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। চিত্তরঞ্জন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। ব্রাহ্মণটি ভাবিল, এই বোধহয় তাহার সেই দাতাকর্ণ, দেবতা। মনে মনে ইহা ভাবিতে ভাবিতেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ধীর পায়ে গাড়ীর নিকট গিয়া বিনীতভাবে দাঁড়াইলে চিত্তরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাকে চান ?"

ব্রাহ্মণ জানাইলেন, "আমি সি. আর. দাশের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি।—আমার বড় দরকার।"

চিত্তরঞ্জন বুঝিলেন, ব্রাহ্মণ তাহাকে চেনে না। বলিলেন, "তিনি তো কাজে বিশেষ ব্যস্ত আছেন এবং কাছারীতে চলে গেছেন।"

"কিন্তু আমার যে বিশেষ প্রয়োজন।"

"তবে আপনি আমার সঙ্গে আসুন—আসুন এই গাড়ীতে। আমি আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তখন মোটরে উঠিয়া যেন কোন রকমে ছোট হইয়া বসিয়া রহিলেন। যেন জড় পদার্থের মত। গাড়ী তখন দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। চিত্তরঞ্জন যেন তখন আর চিত্তরঞ্জন নহেন; তৃতীয় ব্যক্তির

মত বৃদ্ধের নিকট অভিনয় করিয়া চলিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন বৃদ্ধের দেশ কোথায় ছিল, কলকাতা কোথায় থাকেন, সংসারে আর কে কে আছেন? সংসারের আয় কত ইত্যাদি?—এই সঙ্গে তখন সি. আর. দাশের সঙ্গে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কি দরকার তাহা জানিতে চাহিলে ব্রাহ্মণ জানাইলেন, "আমার মেয়ের বিবাহ ঠিক হইয়াছে। যাহা হয় যোগাড় করিয়াছি। এখন যদি নগদ আর তিন শত টাকা পাই তবে আমার মেয়ের বিবাহ দিতে পারি। এই টাকাটাই তাঁহার কাছে চাহিব।" শুনিয়া চিত্তরঞ্জন একটু হাসিলেন। বলিলেন, "দেখি যদি কাছারীতে দেখা হয়।"

মোটর আসিয়া চিত্তরঞ্জের অফিসের সামনে থামিল। সকলেই গাড়ী হইতে নামিলে চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্মণটিকে একস্থানে বসিতে বলিয়া নিজের অফিস ঘরে চলিয়া গেলেন।

বৃদ্ধ বসিয়া আছেন,—বেশীক্ষণ নহে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই একজন ভদ্রলোক আসিয়া ব্রাহ্মণের হাতে পাঁচ শত টাকার একখানি চেক দিলেন।

বৃদ্ধ অবাক। সে বিস্মিত! বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, আমি সি. আর. দাশের হাত হইতে টাকাটা নেই। তিনি কোথায় আছেন?"

ভদ্রলোক জানাইল, "তিনি যে এখন অত্যন্ত জরুরী কাজে ব্যস্ত রহিয়াছেন, তাই তিনি না আসিয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

—"কিন্তু আমি যে তাঁহাকে দেখিতে চাই।"

—"তিনি যে অত্যন্ত ব্যস্ত। কাছারীর সময় হইয়াছে।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জিদ্ ধরিলেন। চিত্তরঞ্জন যে অত্যন্ত ব্যস্ত রহিয়াছেন তাহা শুনিতে ব্রাহ্মণ রাজী নহেন। তাহার মনের মধ্যে তখন এক প্রশ্ন, এক জিজ্ঞাসা, সি. আর. দাশ তাহাকে না দেখিয়াই, তাহার মুখের কথা না শুনিয়াই টাকাটা দান করিয়া দিলেন। আর সে দানও যাহা চাহিয়াছিলেন প্রায় তাহার দ্বিগুণ!—এ কি মহান দাতা! এ ভাবনা তাহার মনের মধ্যে যতই জাগিল, সি. আর. দাশকে দেখিবার জন্য তাহার মনোবাসনা ততই তীব্র হইয়া উঠিল। সুতরাং চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত ব্যস্ত রহিয়াছেন বা তাঁহার কাছারীর সময় হইয়াছে কিছুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পথে বাধা হইয়া থাকিতে পারিল না। শেষ পর্যন্ত চেকখানি যে বহন করিয়া আনিয়াছিল সে বাধ্য হইয়াই ব্রাহ্মণকে চিত্তরঞ্জনের অফিস ঘরে লইয়া আসিতে বাধ্য হইল।

বৃদ্ধ দেখিলেন, চিত্তরঞ্জন বড় একটি টেবিলের সামনে একখানি চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছেন। পরিচয় জানিয়া আর এক বিস্ময়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তখন বিস্মিত।—পলকহীন তাহার চোখ দুইটি—সে চোখ দুইটিতে কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা আর ভক্তি। বেশ কিছুক্ষণ চিত্তরঞ্জনের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া ভাবিলেন, ইনিই সেই দাতাকর্ণ, দেবতা সি. আর. দাশ!—ইঁহারই সঙ্গে বাড়ী হইতে মোটরে করিয়া অফিস পর্যন্ত আসিয়াছেন—তখন চিনিতে পারেন নাই, জানিতে পারেন নাই; তাহাকে চিনিতে দেওয়া হয় নাই; জানিতে দেওয়া হয় নাই তাঁহার পরিচয়।

আলোয় উদ্ভাসিত চিত্তরঞ্জনের মুখমণ্ডলের দিকে বৃদ্ধ তখনও পলকহীন চোখে তাকান। মুখে স্মিত হাসি চিত্তরঞ্জনের। ব্রাহ্মণের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "এখন আপনি এই টাকাটা নিয়ে যান, পরে যদি আপনার আবার আবশ্যক হয় আমাকে লিখিবেন।"

ভগবানের দেওয়া জগতের আলো বাতাসের উপর যেমন সব মানুষের সমান অধিকার, চিত্তরঞ্জনের অর্থের উপরও যেন সব শ্রেণীর মানুষের ঠিক তেমন অধিকার ছিল। তাহা না হইলে, তাঁহার নিকট একবার পৌঁছাইতে পারিলে প্রার্থনা পূর্ণ হইবেই এমন আশা ও মনের বিশ্বাস সকলের মনে থাকিবে কেন? সময়-অসময় তিনি যে খুচরা টাকা অনেকের হাতে দান হিসাবে তুলিয়া দিয়াছেন তাহার হিসাবও ছিল না, সীমাও ছিল না।

একবার বেলুড়ে এক উৎসব হইয়াছিল। সে-উৎসব উপলক্ষ্যে ঘৃত ব্যয় হইয়াছিল ২৫০ টাকার। ঐ সম্পূর্ণ টাকাটি চিত্তরঞ্জন দান করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের এই আড়াই শত টাকা দানের উল্লেখ করিবার জন্যই বেলুড় উৎসবের কথা উল্লেখযোগ্য নহে। বেলুড় উৎসবের কথা উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, উৎসব উপলক্ষ্যে যে কয়েকজন পাচক রান্না করিয়াছিল চিত্তরঞ্জন বখশিশ হিসাবে তাহাদিগের জন্য পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

আর একবার সাইক্লোন হয়। সাইক্লোনের পর রিলিফের কাজের জন্য চিত্তরঞ্জন ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই রিলিফ কাজের জন্য চিত্তরঞ্জন সেই সময়কার ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ লেমবোর্ণ কর্তৃক প্রদত্ত একখানি জাহাজে ঘুরিতেছিলেন। জনসাধারণ রিলিফ পাইয়া উপকৃত হইয়াছিল নিশ্চয়ই কিন্তু জাহাজের যাহারা কর্মী ছিল তাহারা উপকৃত হইয়াছিল যথেষ্ট।

জাহাজের কর্মচারী, সারেং, সুকানী প্রভৃতি চিত্তরঞ্জনের নিকট হইতে এত অধিক পরিমাণে বখশিশ পাইয়াছিল যে জীবনে বখশিশ হিসাবে তত অধিক পরিমাণে টাকা তাহারা আর পায় নাই।

একবার তিনি কার্যোপলক্ষে মহেশপুর যাইতেছিলেন। যাইতেছিলেন ট্রেনে! ট্রেনে তো কতো রাজা মহারাজা ধনীলোকই যাতায়াত করিয়া থাকে। কিন্তু রেলের গার্ড কাহারও কাছে বখশিশ চাহে বলিয়া তেমন শোনা যায় না। চিত্তরঞ্জনের এই ভ্রমণকালে একজন গার্ড তাঁহার নিকট বখশিশ চাহিয়াছিল। চিত্তরঞ্জন গার্ডের ঐ প্রার্থনা শুনিবামাত্র পকেট হইতে তিন শত টাকা তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন। টাকাটা গ্রহণ করিবার সময় রেলের গার্ডটি তো অবাক!

আবার দেখা গিয়াছে যে, রেলেই তিনি ভ্রমণ করিতেছেন। রাত গভীর হইয়াছে। স্টেশনে চা বিক্রেতা থাকেই। এক স্টেশনে তিনি এককাপ চা লইয়া চা বিক্রেতাকে একটি টাকা দিয়া দিলেন। এক পেয়ালা চায়ের দাম এক টাকা নহে মনে করিয়া তাঁহার সঙ্গের লোক বেশী চা বিক্রেতার নিকট হইতে বাকী পয়সা আনিবার জন্য ছুটিয়া যাইবার মুখে চিত্তরঞ্জন ধমক দিয়া তাহাকে বাধা দিলেন, "গরীব মানুষ, আমাকে এত রাতে গরম চা দিয়েছে, তুই আবার পয়সা আনতে যাচ্ছিস!"

আবার ক্ষৌরকার্যের জন্য নাপিতকে যাহা দিয়াছিলেন তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে তদানীন্তন এডভোকেট্‌ জেনারেল ও পরবর্তী সময়ের রাজ্যপাল স্যার বি. এল. মিত্র মহাশয় বেঙ্গলী কাগজে লিখিয়াছিলেন, "এক সময়ে আমরা একসঙ্গে বিলাত ছিলাম। আমি হে মার্কেটে অবস্থান করিতাম, আর সি. আর. দাশ থাকিতেন সাউথ কেনসিংটান। একদিন তিনি একখানি বৃহৎ মোটরে চড়িয়া আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, যত দিন ইংলণ্ডে থাকিবেন, মোটরখানি তিনি ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি শারীরিক স্বচ্ছন্দতার জন্য অর্থব্যয়ে কখনও কুণ্ঠা করেন নাই। এক সময়ে গাড়ীতে ক্ষৌরকার্যের জন্য নাপিতকে ১০ টাকা দিয়াছিলেন। আমি বিস্মিত হইলে তিনি উত্তর করেন—ভ্রমণের সময় এই সামান্য ব্যয়ে আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু ইহাতে তাহার খুব লাভ। এইরূপ মুক্ত হস্তই ছিলেন সি. আর. দাশ।

নিজে তো ইচ্ছামত তিনি দান করিয়াছেন-ই তাঁহার মাতা নিস্তারিণী দেবীও যে সময় যাহাকে যাহা দান করিতে ইচ্ছা করিয়া চিত্তরঞ্জনকে জানাইয়াছেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাতার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। সে-টাকার অঙ্কও কম নহে, কাহাকেও দিয়াছেন ৫০০ শত টাকা কাহাকেও এক হাজার এবং কাহাকেও দুই হাজার টাকা। এই টাকা তিনি হাসিমুখেই দিতেন, কখনও মাতাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই কাহার কি প্রয়োজন ঐ টাকার দরকার। যেমন নিজের দানের সময় পাত্রাপাত্র বিচার করিতেন না, মাতার আদেশ বা ইচ্ছাপূর্ণ করিতেও তেমনি তিনি কোন খোঁজ-খবর লইতেন না। দেখা যায় যেমন ছিলেন মা তেমন তাঁহার ছেলে। এই প্রসঙ্গে আধ্যাত্ম জগতের একজন মহান সাধক ভোলাগিরি মহারাজ হরিদ্বারে বলিয়াছিলেন, "হাঁ মা থি তো, ইনহোকা মা, ব্যাটা জিস্ কো এইসা ভাগ্যবান, সো কেই সি পুণ্যবতী থি।"

পুণ্যবতীর পুত্র পুণ্যবান।—তাই তো দেশের মানুষ তাঁহাকে দেবতার আসনে বসাইয়াছেন এবং এই দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করিবার কারণ তাঁহার কোমল মন, অন্তরভরা অপরের জন্য সহানুভূতি, অপরের দুঃখে কাঁদা। পরের দুঃখে কাঁদাই তো চরম কান্না। চিত্তরঞ্জন সারা জীবন এমন কান্না কাঁদিয়া চলিয়াছেন। এই কান্নার অশ্রু চোখে লইয়াই তিনি তাঁহার দাতা মনের সকল দুয়ার খুলিয়া রাখিয়াছিলেন। পত্রিকার সম্পাদক টাকার অভাবে কাগজ চালাইতে পারিতেছিলেন না, চিত্তরঞ্জন তাঁহার দানের হাতের ছোঁয়ায় উহাকে সচ্ছলগতিতে চলিতে সাহায্য করিলেন। কোন কবি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন অথবা আর্থিক কষ্টে পড়িয়া দিন কাটাইতেছেন, সে সংবাদটি একবার চিত্তরঞ্জনের কানে গিয়া পৌছিলেই হইল, চিত্তরঞ্জন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যে সমস্ত ব্যক্তি প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে অথবা ইতিহাস লইয়া গবেষণা কার্য চালাইয়াছেন চিত্তরঞ্জন তাহাদের উৎসাহিত করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। যাহারা দেশকে ভালোবাসিয়া বিদেশী শাসকের রোষে পতিত হইয়া অন্তরীণাবদ্ধ রহিয়াছেন চিত্তরঞ্জন ছিলেন তাহাদের পশ্চাতে।

আবার জাতির মুক্তির জন্য দেশের বুক হইতে অশিক্ষার অন্ধকার দূর করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষার আলো বিস্তারের প্রয়োজন ছিল। এই উদ্দেশ্যে

যখনই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার নিকট সাহায্য চাওয়া হইয়াছে তিনি তাহাতে বিশেষ উৎসাহিত হইয়া দান করিয়াছেন।

আবার দেশেরই সন্তান অথচ যাহারা সমাজ পরিত্যক্ত, তাহাদের জন্য অনাথ-আশ্রম স্থাপনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন মুক্ত হস্ত।

ক্লাবে শারীরিক ব্যায়াম করিয়া দেশের যুবকবৃন্দ শরীরকে সুগঠিত করিবে এবং সেই সুগঠিত দেহে সুস্থ-সবল মন গঠিত করিবার জন্য পাঠাগারের প্রয়োজন। চিত্তরঞ্জন 'ক্লাব' এবং 'পাঠাগার' এই দুই প্রতিষ্ঠানকেই আর্থিক সাহায্য করিয়া উহার পৃষ্ঠ-পোষকতা করিয়াছেন।

আবার তিনি দান করিয়াছেন চতুষ্পাটিতে। দান করিয়াছেন, সন্ধ্যায় যেখানে বাংলার প্রাণ কেন্দ্রীভূত হইয়া কীর্তনের সুরে সুরে অঞ্জলি হইয়া ওঠে সেই হরি সংকীর্তন সভায়।

মৃত্যুর একদিন পূর্বে চিত্তরঞ্জনের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী মায়া বসু তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতেছিলেন। সেই সময় চিত্তরঞ্জন তাহাকে বলিলেন, "দেখ আমি তোদের শ্মশানের জন্য দিঘাপাতিয়াকে বলেছিলাম, তিনি সাহায্য কর্বেন, আমি ভাল হয়ে উঠে শ্মশানটাকে চমৎকার করে তুলবো।"

শ্মশানে মানুষের জীবনের সব শেষ। জগৎ হইতে বাহিরে যাইবার বহির্দ্বার। সেই জন্য তিনি উহাকে যেমন সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তেমনি জগতে আসিবার প্রবেশপথ 'মাতৃ-মন্দির' স্থাপন ব্যাপারেও যেমন ছিল তাঁহার উৎসাহ তেমন ছিল তাঁহার সাহায্য। মাতৃ-মন্দিরের জন্য তিনি যথেষ্ট দান করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া বক্তা তাঁহার নিকট হইতে দান পাইয়াছে, অসংখ্য ছাত্র তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছে। রাস্তায় রাস্তায় কীর্তন গাহিয়া চলিয়াছে এমন কীর্তনীয়ার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়াছে তাঁহার দয়ায়। কীর্তন তিনি ভালোবাসিতেন, অন্তরের ভক্তি আর শ্রদ্ধা সহকারে তিনি উহা শুনিতেন কিন্তু কীর্তনীয়াকে যে-টাকা দেওয়া হইত উহার মধ্যেই চিত্তরঞ্জনের দাতা-মনটি দেখা যাইত। শুধু বাদ্যযন্ত্র শুনাইবার জন্য প্রমথনাথকে তিনি মাসিক দিতেন দেড় শত টাকা। এক কীর্তনীয়া তাঁহাকে কীর্তন গাহিয়া শুনাইত। চিত্তরঞ্জন নিজেও কয়েকটি কীর্তন গান লিখিয়াছিলেন। ঐ

কীর্তনীয়া উহা তাঁহাকে গাহিয়া শুনাইয়াছেন। চিত্তরঞ্জন তাহাকে মাসিক দেড় শত টাকা করিয়া দিতেন।

অর্থাৎ দেখা যায় যে, অত্যন্ত অর্থের অভাব হইতে সচ্ছলতার পরিবেশে পৌঁছাইতে চিত্তরঞ্জনের যেমন বেশী সময় লাগে নাই ঠিক তেমনি আবার সচ্ছল পরিবেশ বা অতুল ঐশ্বর্যকে মাটির পাত্রের মত মনে করিয়া ত্যাগীরাজ, সন্ন্যাসী সাজিতেও তাঁহার মুহূর্ত সময় লাগে নাই। পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, "টাকা মাটি, মাটি টাকা।" রামকৃষ্ণদেবের এই কথাটি চিত্তরঞ্জনের জীবনে সত্যরূপে দেখা যাইতেছে।

সুতরাং টাকা ছিল যাহার কাছে মাটির মত, সারা জীবন দান করিয়াও যিনি দাতা আখ্যা শুনিলে মনে ব্যথা পাইতেন, তাঁহার নিকট দেশের, সমাজের সর্বশ্রেণীর, সর্বস্তরের মানুষ যে সহানুভূতি ও সাহায্য পাইবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু না থাকিলেও বিস্মিত হইতেই হয়। কারণ দান করিবার সময় তিনি কখনও পশ্চাতে ফিরিয়া তাকাইতেন না, তাঁহার গতি' ছিল সম্মুখে, তাঁহার কাগজ ছিল ফরোয়ার্ড, দানের 'খাতায় তাঁহার ছিল প্রথম নাম।

কিন্তু এত দান করিয়াও দেশপ্রেমিক ও মহান দাতার মন ভরিয়া ওঠে নাই। দানের মাধ্যমে জাতীয় জীবনকে, সমগ্র দেশকে সর্বাঙ্গীণ উন্নত করিয়া তুলিবার জন্য তিনি মনে মনে একটা হিসাব কষিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এই হিসাবকে তিনি জাতীয় নাট্যশালার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছিলেন। কারণ, দেশের জনগণকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করিয়া দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য নাট্যশালাই হইল শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। এই ব্যাপারে চিত্তরঞ্জন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গেও কথা বলিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

তখন ১৯২১ সাল। নাট্যাচার্য ভাদুড়ী মহাশয় তখন অধ্যাপনার কার্য পরিত্যাগ করিয়া ম্যাডান থিয়েটারে যোগদান করিয়াছিলেন। তখনকার পরিবেশে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করা সামাজিক দৃষ্টিতে শোভন ছিল না। কিন্তু চিত্তরঞ্জন সে পরিবেশেও নাট্যাচার্যকে তাঁহার ঐ নৈতিক সাহসের জন্ত সাদর সম্ভাষণ জানাইয়াছিলেন। ১৯২১ সালেই ১০ই ডিসেম্বর শিশির বাবু ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলমগীর' নাটকখানি প্রথম অভিনয়ের

ব্যবস্থা করেন। চিত্তরঞ্জন নাটক পছন্দ করিতেন। তাহা ছাড়া আলমগীর নাটকের বৈশিষ্ট্য হইল উহার ঐতিহাসিক পটভূমিকার জন্য। নাটকখানির মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ দেখাইয়াছেন সম্রাট আলমগীরের সঙ্গে রাজসিংহের মিলন; মুসলমান সম্রাটের সঙ্গে হিন্দুরাজার মিলন-বন্ধন। উদ্দেশ্য মহৎ, ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলমানের মিলিত শক্তিকে পরাস্ত করিতে পারে এমন শক্তি কাহারও নাই। এই কারণেই চিত্তরঞ্জন প্রথম অভিনয়ের রজনীতেই ঐ নাটকখানি দেখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

অভিনয়ের সব ব্যবস্থা হইয়াছে। অভিনয় দেখিবার জন্য প্রেক্ষাগৃহে জন সমাগমও প্রচুর হইয়াছিল কিন্তু আসিলেন না চিত্তরঞ্জন। শিশির বাবুর নিকট সমস্ত আয়োজন যেন ম্লান হইয়া গেল। কিন্তু নিরুপায়; ইংরেজ সরকার চিত্তরঞ্জনকে কারারুদ্ধ করিয়াছে।

প্রেক্ষাগৃহে তখন আরেক আলোড়ন, অভিনয় কি হবে?—না বন্ধ থাকিবে।—কিন্তু না, অভিনয় হইল: কারাগার হইতেই চিত্তরঞ্জন চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন অভিনয় চালাইয়া যাইবার জন্য যেমন চলিতে থাকিবে ইংরাজের অধীনতা হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিবার আন্দোলন।

পরে চিত্তরঞ্জন শিশির বাবুর সঙ্গে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আলাপ-আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শিশির বাবুর নিকট জানিতে চাহিয়াছিলেন যে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার জন্য কত টাকার প্রয়োজন হইবে এবং একটা খসড়াও তিনি করিতে বলিয়াছিলেন।

শিশির বাবু ইহাতে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিলেন। তিনিও চিত্তরঞ্জনের ঐ ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়া চিত্তরঞ্জনকে জানাইয়াছিলেন, দেড় লাখ টাকা লাগিবে।

জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য এমন একটি মহান কাজের জন্য মাত্র দেড় লাখ টাকার প্রয়োজন হইবে শুনিয়া চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন,—'মাত্র দেড় লাখ টাকা! সব ব্যবস্থা আমি করে দেব। দেশের লোকের কাছে চাইলে দেড়-দু লাখ টাকা তুলতে এক মাসও লাগবে না।—আর জমি! সে আমি করপোরেশন থেকে ব্যবস্থা করে দেব। কদিনের জন্য দার্জিলিং যাচ্ছি—ফিরে এসে সব ব্যবস্থা করব। জাতীয় নাট্যশালা চাই-ই আমাদের।"

কিন্তু জাতির জীবনে ইহা অতীব দুঃখের বিষয় যে, চিত্তরঞ্জন তাঁহার এই

ঐকান্তিক বাসনাকে রূপদান করিয়া যাইতে পারেন নাই; পারেন নাই তাহার কারণ দার্জ্জিলিং হইতে তিনি আর ফিরিয়া আসেন নাই; সেখান হইতেই তিনি যাত্রা করিয়াছেন মহাপ্রস্থানের পথে।

প্রশ্ন হইতে পারে, দানের প্রসঙ্গে এ আখ্যানের উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা কি? প্রয়োজন এই জন্য যে, ইহা দেশবন্ধুর একটি বড় দান-ই কারণ তিনি যে টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, সে টাকা তিনি সংগ্রহ করিয়া দিতেন। দাতা-কর্ণ চিত্তরঞ্জন টাকা দিবেন বলিয়া কাহাকেও কথা দিলে উহা দানের সমান অন্ততঃ তাঁহার জীবনব্যাপী দানের নেশা দানের প্রবৃত্তি উহাই উচ্চস্বরে বিঘোষিত করিবে।—উহার সত্যতার প্রমাণ তাঁহার নিজের বসত বাটিখানি দান করিবার মধ্যেও।

নিজের বাড়ী, বসত বাড়ী। রসারোডের সেই বাড়ীখানা পর্যন্ত নিজের বলিয়া তিনি না রাখিয়া জাতির উদ্দেশ্যে দান করিয়া যান।

চিত্তরঞ্জনের বসত বাড়ীখানা তখন ঋণের দায়ে আবদ্ধ ছিল। বন্ধু বান্ধবের চেষ্টায় হয়তো সেই ঋণ হইতে বাড়ীখানা মুক্ত করা যাইত কিন্তু চিত্তরঞ্জন উহা চাহিলেন না। তিনি বাড়ীখানা বিক্রয় করিয়া ঋণের টাকা পরিশোধ করিয়া যে টাকা অবশিষ্ট ছিল সেই অবশিষ্ট টাকায় তাঁহার ইচ্ছামত কিছু সৎকার্য করিবার জন্য একটি "ট্রাস্টনামা" স্বাক্ষর করেন। উহাতে ট্রাস্টী ছিলেন (১) শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী (২) ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় (৩) শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চন্দ (৪) সত্যধেনু ঘোষাল (৫) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার।

যে যে সৎকার্যের জন্য চিত্তরঞ্জন তাঁহার ঐ অর্থ এই ট্রাস্টীবোর্ডের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন তাহা হইতেছে:—(১) ভারতবাসীর শিক্ষা (২) একটি মন্দির নির্মাণ উহাতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হইবে এবং ঐ বিগ্রহের দৈনিক ও সাময়িক সেবার ব্যবস্থা (৩) হিন্দু বালকগণের ধর্মশিক্ষা (৪) মাতৃমন্দির স্থাপন (৫) দরিদ্র ও দুঃস্থ ভারতবাসীর সাহায্য ও এইরূপ অন্য কোন দানের কার্য।

দেশবন্ধুর বাড়ীখানা এখন ঋণদায় হইতে মুক্ত এবং এখন সেখানেই মহিলাদের জন্য চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রতিষ্ঠিত হইয়া জাতিধর্ম নির্বিশেষে দেশের হাজার হাজার মা বোনের সেবা করিয়া চলিয়াছে।

এইরূপে নিজের যাহা কিছু ছিল তাহা সবই নিজের করিয়া না রাখিয়া দানপত্র করিয়া তিনি জাতির হাতে তুলিয়া দিলেন। চতুর্দিকে রব উঠিল চিত্তরঞ্জন সব দান করিয়াছেন।

এই সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দুইজন পণ্ডিত মহাশয় একজন তারা-প্রসন্ন কাব্যতীর্থ এবং অপরজন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিজেদের মধ্যে চিত্ত-রঞ্জনের দান সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছিলেন। কাব্যতীর্থ মহাশয় বলিলেন, শুনলাম যথাসর্বস্বই দান করে ফেলেছেন কিন্তু ওঁর বাংলা পুঁথিগুলো পেলে সাহিত্য পরিষদের বড় উপকার হ'ত।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে লোকটা এই সব বই সংগ্রহ করেছেন। এই পুঁথিগুলি তাঁহার বড় শখের। মানুষ সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারলেও শখের জিনিস কেউ ত্যাগ করতে পারে না।

কাব্যতীর্থ মহাশয় বলিলেন, একবার চেষ্টা করা যাক্, যদি পেয়ে যাই।

কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সঙ্গে মতে না মিলিলেও শাস্ত্রী মহাশয় একটু কুণ্ঠিত-ভাবেই চিত্তরঞ্জনের বাড়ী আসিলেন এবং চিত্তরঞ্জনের নিকট বলিলেন, আমরা সাহিত্য পরিষদ হইতে আসিয়াছি।

একটু হাসিলেন চিত্তরঞ্জন। বলিলেন, কিন্তু সাহিত্য পরিষদের কাজে লাগতে পারে এমন কিছু তো দান করার মত আমার নেই!

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একটু ঢোক গিলিয়া বলিলেন, আজ্ঞে আপনার ঐ পুঁথিগুলো যদি পরিষদকে দান করেন তবে পরিষদের বড় উপকার হয়।

চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, হাঁ...হাঁ আপনি ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন। সেগুলো তো আছে···বলিতে বলিতেই বাড়ীর সরকার মহাশয়কে হুকুম দিলেন, আলমারিগুলোর চাবিগুলো সব নিয়ে এসো তো!

সরকার মহাশয় চাবি আনিলে চিত্তরঞ্জন সেই সব চাবি পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন,—যা দরকার সব নিয়ে যান।

আশ্চর্যের এই যে, এত দিনের শখের বই দান করিবার সময়ও তাঁহার এতটুকু দ্বিধা হইল না, চাবিগুলিই তুলিয়া দিলেন শাস্ত্রীর হাতে আর নিজে

মন দিলেন তখন তিনি যে-কাজ করিতেছিলেন সেই কাজে। বইয়ের কথা আর তিনি উল্লেখই করিলেন না বা করেন নাই।

এই হইল সর্বস্বত্যাগী চিত্তরঞ্জনের দান, নিঃস্ব হইয়া দান। এই সর্বত্যাগীকে চিত্তরঞ্জনের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী তরলাদেবী বর্মাদেশ হইতে একখানি বৌদ্ধমূর্তি আনিয়া উপহার দিয়াছিলেন। তাঁহার কোন মনোভাব হইতে উহা তিনি উপহার দিয়াছিলেন জানা না থাকিলেও উপহারের বস্তুটি যে উপযুক্ত পাত্রকেই দেওয়া হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ কারণ সর্বত্যাগীকে দেওয়ার মত ইহার চাইতে ভাল উপহার আর হয় না। চিত্তরঞ্জনও ঐ বৌদ্ধমূর্তিটিকে তাঁহার বাড়ীর উপরে উঠিতে সিঁড়ির বাঁ দিকে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। মূর্তিটিকে তিনি এক অভিনব পদ্ধতিতে শ্রদ্ধা জানাইতেন। প্রত্যেক দিনই উপরে উঠিবার সময় চিত্তরঞ্জন মূর্তিটিকে চুম্বন করিতেন এবং উহার গায়ে ও মাথায় হাত বুলাইতেন। একদিন ভারতবর্ষের অন্য অন্য প্রদেশের কয়েকজন নেতৃবৃন্দসহ উপরে উঠিবার সময় তিনি তাহার নিজস্ব পদ্ধতিতে শ্রদ্ধা জানাইয়া বলিলেন, "He has made many-a families beggars" অর্থাৎ ইনি অনেক পরিবারকে ভিখারী করিয়াছেন। নেতৃবৃন্দ হাসিয়া উঠিলেন এবং একজন হাসিয়াই বলিয়া উঠিলেন. "So it has come here." অর্থাৎ তাই ইনি এখানে আসিয়াছেন।

ইঙ্গিতটি অতি পরিষ্কার। প্রকৃতপক্ষেও বুদ্ধের শিক্ষাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিয়া চিত্তরঞ্জন জাগতিক জীবনে নিজের বলিতে যাহা কিছু তাহা সবই দান করিয়া, ত্যাগ করিয়া মানব সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার জীবনের একটি বিশিষ্ট দান।

কিন্তু আর একদিকে বিচার করিলে তিনি জীবনে যত ত্যাগ ও যত অর্থই দান করিয়া থাকেন না কেন,—উহার চাইতে মহত্তর আর একটি দান তাঁহার আছে। সে-দান রাজার রাজত্ব, রাজ ঐশ্বর্য এবং কোটি কোটি টাকা দানের চাইতে বেশী।—তাহা হইতেছে, ঈশ্বর বিশ্বাসী, ধার্মিক এবং পরমভক্ত বৈষ্ণব হইয়াও তিনি আধ্যাত্মিক মুক্তির সাধনা না করিয়া মাতৃভূমির রাজনৈতিক মুক্তির জন্য সমগ্র জীবনব্যাপী বীর সৈনিকের মত যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণবের পক্ষে নিজের মুক্তির সাধনা ত্যাগ অতুলনীয়, কল্পনাতীত।

রসরাজ চিত্তরঞ্জন

ভারতমাতার মহান সন্তান, দেশবরেণ্য, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসে, ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এই বীর যোদ্ধার পবিত্র নামটি অনাগত ভবিষ্যতেও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

কিন্তু স্বতঃই প্রশ্ন উদ্দিত হয়, শুধু মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে কেন? তাঁহার আরও পরিচয় রহিয়াছে। কিন্তু সে পরিচয় শুধু পরিচয় দিবার জন্যই নহে,—প্রত্যেকটি দিগন্তের তিনি দিক্‌পাল। তিনি যখন আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন তখন সমগ্র ভারতবর্ষের তিনি শ্রেষ্ঠ আইনজীবী। পরের দুঃখে তিনি যেমন অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন এত অশ্রুবারি আর কে ফেলিয়াছেন? দাতা হিসাবে তিনি ছিলেন কর্ণসম। সাহিত্যিক এবং কবি হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি দেশজোড়া। স্থতরাং দিকে দিকে রবির বিস্ফুরিত রশ্মির মত এক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতিভা ও মনীষা বহুমুখে প্রবাহিত হইয় াঁহার শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু রবি রশ্মির প্রখরতার মত শ্রেষ্ঠ আইনজীবী ও শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তি-মানস শুধু আইনের নীরস বস্তু ও রাজনীতির ক্রূর হিসাবেই পরিপূর্ণ ছিল না,—উহা ছিল হাস্য রসেরও প্রস্রবণ। এমন গম্ভীর মানুষ,—মনের খাতায় যাঁহার মক্কেলের ব্রীফ্, হৃদয়ে যাঁহার ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনের উদগ্র বাসনা, তাঁহার অন্তরে রহস্যের একটি স্রোতস্বিনী ফল্গুধারার মত সদা প্রবাহিত ছিল। তাহারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই একটি রহস্য-তরঙ্গ এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

কলিকাতা করপোরেশনের নির্বাচনে স্বরাজ্য দল জয়লাভ করিলে চিত্তরঞ্জন উহার প্রথম মেয়রের পদ অলঙ্কৃত করেন। কাউন্সিলারদের মধ্যে কেহ কেহ তখন চিত্তরঞ্জনের নিকট বলিলেন, "Beggar nuisanceটা এবার বন্ধ করতে হবে।"

একটুও বিলম্ব না করিয়া চিত্তরঞ্জন তাহাদের দিকে তাকাইয়া উত্তর দিলেন, "তা হলে আমাকেই প্রথম বন্ধ করতে হয় কারণ I am the biggest

beggar, আমার চেয়ে বড় ভিক্ষুক আর কেহ নাই।"

জীবনে কয়েকবার চিত্তরঞ্জন দেশের জনসাধারণের নিকট ভিক্ষাপাত্র লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। একবার পূর্ববঙ্গের ঝড়-বন্যা পীড়িত অগণিত জনগণের জন্য বাহির হইয়াছিলেন, একবার তিলক ফাণ্ডের জন্য এবং আর একবার স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্য। নজরুল এই ভিখারীকে 'রাজ-ভিখারী' রূপে আখ্যা দিয়াছিলেন।

যাহারা কলিকাতা করপোরেশনের প্রধানরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন তাহা-দিগকে এক ভোজ-সভার আয়োজন করিয়া সংবর্ধিত করিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছিল। চিত্তরঞ্জন মেয়র নির্বাচিত হইলে শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু মহাশয় সেই প্রথা রক্ষা করিবার জন্য চিত্তরঞ্জনকে বলিয়াছিলেন, "ট্রাডিশন্ রক্ষা করিবার জন্য এবার আপনাকে ডিনার দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার।"

একটু হাসিয়া চিত্তরঞ্জন সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন, "কোন লাভ নেই। মেয়র Pauper, রিটার্ণ দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।"

আইন ব্যবসায়ে চিত্তরঞ্জন লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছেন। কিন্তু মেয়র হইবার কয়েক বৎসর পুর্বে দেশসেবার জন্য তিনি আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তাহার দানের হাত ছিল মুক্ত, অর্থাৎ উপার্জন ছিল না, ব্যয় ছিল, তাই তখন তিনি অর্থশূন্য।

আবার এই মেয়রকে কেন্দ্র করিয়াই আর একটি হাস্যরসের অবতারণা হয়। এই হাস্যরসের মধ্যে চিত্তরঞ্জনের কবি-মন, কাব্যপিপাসু মন এবং স্মৃতি শক্তিরও পরিচয় প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। চিত্তরঞ্জন মেয়র; হারাধন দত্ত মহাশয় ছিলেন করপোরেশনের চিফ্ অফিসার। স্বাভাবিকই মেয়রের টেবিল-খানি সুন্দর হওয়ার কথা। প্রকৃত পক্ষেও সুন্দর। দত্ত মহাশয় একদিন টেবিলখানি সম্বন্ধে বলিয়া উঠিলেন,—বড় সুন্দর।

দেশবন্ধুও জানাইলেন, হ্যাঁ বেশ!

দত্ত মহাশয় চিত্তরঞ্জনের মতামত জানিতে পারিয়া উৎসাহিত হইয়া পুনরায় কাব্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, সত্যি খুব সুন্দর! It is a thing of beauty.

মুহূর্তের মধ্যেই চিত্তরঞ্জন বলিয়া উঠিলেন, "But to me it is not a joy for ever."

বিদেশী কবির বিখ্যাত কবিতার ঠিক পরবর্তী পঙ্‌তি চিত্তরঞ্জনের স্মৃতির পটে জাগিয়া উঠিল। Keats-এর কবিতা "Ode to the Grecian Urn" এ আছে

"A thing of beauty,
Is a joy for ever."

মেয়রকে কেন্দ্র করিয়া এই রহস্য-প্রিয়তা ছাড়িয়া নির্বাচন বিষয়ে তিনি একটি সুন্দর রসিকতা করিয়াছিলেন। তখন নির্বাচন আসন্ন। সকলে ঐ সম্বন্ধেই একদিন আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় চিত্তরঞ্জনেরই একজন বিশ্বস্ত সূর্যকুমার গুহ মহাশয় আসিয়া বলিলেন, "বড়বাজার কেন্দ্রটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে আমাদের কাজ তেমন আশাপ্রদ হইতেছে না। অপর পক্ষ মিঃ এস, আর, দাশের চেষ্টার কোন ত্রুটি নাই। তাহার পক্ষে বিধু আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে।"

সূর্যবাবুর কথা শুনিয়া চিত্তরঞ্জন হাসিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "সতীশের পক্ষ সমর্থন করে বিধু কিছু কর্তে পারে ঠিকই কিন্তু সাতকড়ির হয়ে সূর্য নিশ্চয়ই তার দশগুণ করতে পারবে। বড়বাজারে আমাদের জয় নিশ্চিত ; বিধু বনাম সূর্য।"

গয়া কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি গয়া গিয়াছেন। সেখানে নির্বাচন কমিটির বৈঠক আরম্ভ হইবার পূর্বে অন্যান্য সভ্যগণের সঙ্গে তিনি বিশ্রামের সঙ্গে গল্পগুজবও করিতেছিলেন। সভ্যগণের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, "Sir, when will the proceedings commence ?"

গল্পের আসরটিকে চিত্তরঞ্জন হাসির ফোয়ারায় পরিণত করিলেন তাঁহার উত্তরে। সভ্য ভদ্রলোকটিকে বলিলেন, "As soon as you stop."

আরেকবার। চিত্তরঞ্জন তখন পাটনায় গিয়াছিলেন। ভোজন বিষয়ে তিনি চিরকালই বিলাসী ছিলেন। পাটনাতে ইচ্ছা হইল, ইঁচড়ের তরকারি খাইবেন। খাইলেন এবং হয়তো বেশী পরিমাণেই খাইয়াছিলেন। কিন্তু ইঁচড় খাওয়ার পরই দেখা দিল রক্ত আমাশয়। সকলেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। পূর্ব হইতেই ডাঃ শেষপ্রকাশ সান্যাল চিত্তরঞ্জনকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতেছিলেন। তাহা সত্ত্বেও সকলে আলোচনা করিতে লাগিল, কলিকাতা

হইতে ডাঃ সরকার অথবা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে চিঠি লিখিয়া পাটনাতে আনা হউক।

আলোচনান্তে তাহাদের এই সিদ্ধান্তের কথা চিত্তরঞ্জনের কানে পৌছিতেই তিনি বলিলেন, "কেন ডাঃ সান্ন্যাল মহাশয় পায়ে স্টকিং পরেন না বলে ?"

বাংলা সাহিত্যে 'খাসদখল' একটি উল্লেখযোগ্য স্থান করিয়া আছে। উহাতে উল্লিখিত আছে যে, কোনো এক ডাক্তার পায়ে স্টকিং পরিত না বলিয়া তাহার ফি ষোল টাকা হইতে কমাইয়া দশ টাকায় আনিবার কথা হইয়াছিল। অসুস্থ অবস্থায়ও চিত্তরঞ্জন সেই ডাক্তারটির কথা মনে করিয়া রহস্য করিতে ছাড়িলেন না।

আরেক বারের ঘটনা। দেশবন্ধু তখন জেলে বন্দী জীবন যাপন করিতে-ছিলেন। একদিন ঘরের বাহিরে' চিত্তরঞ্জন এবং আরও কয়েকজন সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া কথাবার্তা বলিতেছিলেন। ঠিক সেই সময় আসিলেন কিশোরী বাবু। কিশোরী বাবুর একটা ফোঁড়া হইয়াছিল। অস্ত্রোপচারের জন্য তিনি কয়েকদিন হাসপাতালে ছিলেন। হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিয়াও তিনি কাহারও সম্পূর্ণ সাহায্য ব্যতীত হাঁটিতে পারিতেন না। চিত্তরঞ্জনের নিকট তখন যে গিয়াছিলেন তাহাও একজন বাহকের স্কন্ধে উপবিষ্ট হইয়া। চিত্তরঞ্জন কিশোরী বাবুকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিশোরী বাবু কবে এলেন ? ভালো আছেন তো ?"

কিশোরী বাবু উত্তর দিলেন, "এখনো হাঁটতে পারি না। রথে চড়েই এসেছি।"

একটুও বিলম্ব না করিয়া চিত্তরঞ্জন কিশোরী বাবুর দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, "কিশোরীপতি তো রথে চড়েই আসেন, হেঁটে আসবেন কেন ?"

এমন সরস কথা তিনি বন্ধু-বান্ধব সকলের সঙ্গেই বলিতেন। জেলের মধ্যেই মুজিবর রহমন (বর্তমান আওয়ামি লীগ নেতা মুজিবর নহেন) সাহেবের সঙ্গে তিনি যে একদিন রহস্য করিয়াছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হইতেছে। মুজিবর সাহেব একদিন হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া যান এবং তাঁহার হাতে অত্যন্ত ব্যথা পান। এই সংবাদ শুনিয়া সকলেই মুজিবর সাহেবকে দেখিতে আসিলেন। চিত্তরঞ্জনও সঙ্গে সঙ্গেই ছুটিয়া আসিয়া

প্রাথমিক শুশ্রূষার সব ব্যবস্থা করিয়া রহমান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা মুজিবর সাহেব! আপনার এখন বয়েস কত হয়েছে ?"

মুজিবর সাহেব জানাইলেন, "আমার বয়েস এখন পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে।"

চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "এমন বৃদ্ধ বয়সে পতন ?"

এমন রহস্তপ্রিয় চিত্তরঞ্জনের রসিকতার কোন স্থান-কাল বা পাত্রাপাত্র বিচার ছিল না। যাহারা বয়স্ক তাহাদের সঙ্গে যেমন রসিকতা করিতেন, যাহারা বয়সে তরুণ তাহাদের সঙ্গেও তাঁহার রসিকতার মাত্রা সীমাবদ্ধ ছিল না। একবার তিনি ঢাকা যাইতেছিলেন। প্রথম শ্রেণী রিজার্ভ করিয়াছিলেন, সঙ্গে ছিল দুইজন বন্ধু।

চিত্তরঞ্জন নীচে ছিলেন এবং সুগন্ধযুক্ত তামাক খাইতেছিলেন। বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজন বাঙ্কের উপরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেখানে বসিয়াই সিগারের ধূমপান করিতেছিলেন। তামাকের ধুঁয়ার সঙ্গে সিগারের ধুঁয়া না হয় মিশ্রিত হইয়া যাইতে পারে কিন্তু সিগারের ছাই লুকান গেল না। দুই একবার সিগারের ছাই চিত্তরঞ্জনের গায়ে আসিয়াও পড়িল। একবার তিনি সেই ছাই গায়ের জামা হইতে ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিয়াই ফেলিলেন, "এর চেয়ে যে নীচে এসে সা‌মনে বসে খাওয়াই ভাল ছিল।"

স্বাভাবিকই লজ্জায় তখন বন্ধুটির অধোবদন।

এই বন্ধুটিকে লইয়া চিত্তরঞ্জনের রহস্তপ্রিয়তা তখনই শেষ হইল না। বন্ধুটির সঙ্গে তিনি আবার রসিকতা করিলেন। বন্ধুটি তখন নীচে নামিয়া আসিয়াছেন। চুপ করিয়া বসিয়া, একদৃষ্টে তাকাইয়া কি যেন তিনি ভাবিতেছিলেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ঐ বন্ধুটির সঙ্গে পূর্বে ব্রাহ্ম পরিবারের বেশ যোগাযোগ ছিল। সেদিকে ইঙ্গিত করিয়াই চিত্তরঞ্জন তাহার ঐ একমনে, একদৃষ্টে তাকান দেখিয়া বলিলেন, "আপনি কি উপাসনা করছেন ?"

বন্ধুটি জানাইলেন, "না তো! ব্রাহ্মসমাজের উপর আমার আর charm নাই।"

চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "charm না থাকতে পারে কিন্তু germ এখনও আছে।"

দেশবন্ধু তখন মায়াবতীতে। সঙ্গে ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বাড়ীর ক্লার্ক ললিতবাবু এবং আরও অনেকে। ললিত বাবু

ছিলেন বেশ রোগা। সেই রোগা শরীরে তিনি একটি কালো লম্বা কোট পরিয়া মাথায়ও একটি টুপি দিয়াছিলেন। ঐ পোশাকে তাহাকে অত্যন্ত বিশ্রী দেখাইতেছিল। চিত্তরঞ্জন হঠাৎ উপেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপেন বাবু! আপনার মায়াবতী প্রবন্ধে কোন ফটো তোলার দরকার নাই ?"

উপেন বাবু জানিতে চাহিলেন, "কেন ?"

চিত্তরঞ্জন ললিত বাবুর দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "তবে ললিতের ফটোটা অবশ্যই তুলে নেবেন।"

সকলে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন, কিন্তু আশ্চর্য, যিনি হাসাইলেন তিনি কিন্তু হাসিলেন না।

ললিত বাবু ছিলেন বাড়ীর ক্লার্ক। কিন্তু বাড়ীর যিনি কর্তা লোকের সম্মুখে তাঁহার সহিতও এমন রহস্যপ্রিয়তায় তিনি দ্বিধা করিতেন না। কে. জি. গুপ্ত মহাশয়, চিত্তরঞ্জন এবং বাসন্তী দেবী প্রভৃতি সকলে বসিয়া একদিন গল্প করিতেছিলেন। গল্প আর আলোচনা নানাদিকে প্রবাহিত হইয়া শেষ পর্যন্ত পৌঁছাইল হিন্দুত্ব আর ব্রাহ্মণত্ব বিষয়ে। গুপ্ত মহাশয় ও চিত্তরঞ্জন উভয়েই ব্রাহ্মণত্ব লইয়া খুব গর্ব করিতেছিলেন। পার্শ্বেই ছিলেন বাসন্তী দেবী। তিনি বলিলেন, "তোমরা আবার ব্রাহ্মণ ?"—আর চিত্তরঞ্জনকেও প্রশ্ন করিলেন, "তোমার মধ্যে আবার ব্রাহ্মণত্ব কোথায় ?"

সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জন বলিয়া উঠিলেন, "কেন ! তোমাকে বিবাহ করিয়া।—সেই জন্যই লোকের সন্দেহ দূর করতে নামের পেছনে 'শ' রহিয়াছে।"

সবাই তখন একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন। সে-হাসি চলিল অনেকক্ষণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাসন্তী দেবী ঢাকার অন্তর্গত নওগাঁও গ্রামস্থ বিজনী স্টেটের ম্যানেজার বরদা হালদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠাকন্যা।

রসিক যিনি তাহার রসধারা কথার মাধ্যমে প্রকাশিত হইবেই। দেখা গিয়াছে যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি যাহাদের সঙ্গে মিশিয়াছেন তাহাদের সঙ্গেই তিনি এমন সরস ও মধুর রহস্যালাপ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার জীবনের বহুবিধ অধ্যায়ের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। কারণ মানুষের প্রকৃত পরিচয় ফুটিয়া ওঠে তাঁহার কথায়—তাহার রসিকতায়। এই মধুর রসিকতা, মানুষটিও যে মধুময় তাহাই প্রমাণ করিয়া দেয়।

চিত্তরঞ্জনের একজন কৌন্সিলী বন্ধু ছিলেন। তিনি একদিন চিত্তরঞ্জনকে একটি বাড়ীতে অভ্যর্থনা জানাইতে গিয়া বলিয়া উঠিলেন, "Hallo, the Mohant of Tarakeswar."

চিত্তরঞ্জনও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "When I am on the Godi, you would be a welcome guest অর্থাৎ আমি গদিতে বসিলে আপনাকে সেখানে সাদরে অভ্যর্থনা জানাইব।"

ইহার কিছুদিন পরে চিত্তরঞ্জন এবং ঐ কৌন্সিলী বন্ধু উভয়েই একটি বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনকে দেখিতে পাইয়া সেই বন্ধুটি বলিলেন, "C. R. you are living in the clouds now—অর্থাৎ আপনি তো এখন আকাশে।"

পূর্ব হইতেই যেন প্রশ্নটি জানিতে পারিয়া চিত্তরঞ্জনের উত্তরটা তাঁহার প্রস্তুতই ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "But the Gods live there অর্থাৎ দেবতাগণ তো আকাশেই থাকেন।"

এমন রসিকতা তিনি যখনই সুযোগ পাইতেন তখনই করিতেন অর্থাৎ চিত্তরঞ্জনের ব্যারিস্টারের কালো পোশাক আর গম্ভীর মূর্তির আড়ালে যে ভিতরের মানুষটি কত সু.র ছিল তাহারই স্বাক্ষর বহন করিয়া চলিত। একদিন এক কবিরাজ মহাশয় একজন ভদ্রলোককে অনেক বুঝাইয়া শেষ পর্যন্ত সমাপ্তির মুখে বলিলেন, "এই হচ্ছে আমাদের সম ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা honesty and etiquette."

কথাটি চিত্তরঞ্জনের কানে গিয়াছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "দেখবেন কবিরাজ মশাই! honesty between thieves নয়তো?"

আবার আর একদিন সুর সাধক শ্রী - দিলীপকুমার রায় মহাশয় তাঁহার পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কর্তৃক রচিত একটি হাসির গান গাহিয়াছিলেন:

"বিলাত দেশটা মাটির সেটা সোনা রূপার নয়,
তার আকাশেতে সূর্যি ওঠে মেঘে বৃষ্টি হয়।"

মনোযোগ দিয়া গানখানি শুনিয়া চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "কিন্তু সেখানে তো আকাশে সূর্যি ওঠে না।"

আর একবার দার্জিলিং-এ। সেইবারেই তাঁহার শেষবারের দার্জিলিং যাত্রা এবং সেখান হইতেই তাঁহার মহাপ্রস্থান। আলিপুর বারের একজন

উকিল রামতরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চিত্তরঞ্জন দার্জিলিং-এর পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহাদের সঙ্গে Mr. Swan নামে একজন ভদ্রলোকের দেখা হয়। Mr. Swan রামতরণ বাবুর পরিচিত সুতরাং তিনি Mr. Swan এর সঙ্গে একটু কথা বলিয়া উভয়ে আবার চলিতে থাকিলে চিত্তরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে রামতরণ বাবু।"

রামতরণ বাবু জানাইলেন, "ইনি একজন ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট্ Mr. Swan !"

চিত্তরঞ্জনের শরীর তখন ভালো নয়। কিন্তু প্রকৃতই যিনি রসিক, রসিকতা করাই যাঁহার প্রকৃতি, বাহ্যিক দেহের অসুস্থতা তাঁহার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।—এখানেও পারিল না। চিত্তরঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "ইনি তবে রাজহংস,—পরমহংস নন।"

চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জনের জীবন-পঞ্জী

ঢাকা জিলার অন্তর্গত তেলিরবাগ গ্রামে প্রসিদ্ধ আইনজীবী দাশ পরিবারে, আইনজীবী ভুবনমোহন দাশ ও নিস্তারিনী দেবীর পুত্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

ইংরাজী ১৮৭০ সালের ৫ই নভেম্বর, বাংলা ১২৭৭ সালের ২০শে কার্তিক, শনিবার কলিকাতার পটলডাঙ্গা স্ট্রীটের এক ভাড়া বাড়ীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৮৬ সালে ভবানীপুরে অবস্থিত লণ্ডন মিশনারী স্কুল হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৮৯০ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করেন এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যান। ছাত্র-জীবনেই কাব্য এবং সাহিত্য চর্চা করিয়া তিনি যেমন সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তেমন সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন বাগ্মিতায়। তখন হইতেই বক্তৃতা করিয়া তিনি সকলকে মুগ্ধ করিতে পারিতেন।

১৮৯১: বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন। বিলাতে পার্লামেণ্ট নির্বাচনে দাদাভাই নৌরজী নির্বাচন প্রার্থী হইলে তিনি দাদাভাই নৌরজীর পক্ষে প্রচার কার্য চালাইবার জন্য অসংখ্য সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করিয়া নিজের রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় প্রদান করেন।

১৮৯২: ব্যারিস্টারী পরীক্ষা দিয়া তাহাতে তিনি সফলতা অর্জন করেন। বিলাতের পার্লামেণ্টের জনৈক সদস্য মিঃ জেমস ম্যাকলীন ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে অসম্মানজনক মন্তব্য প্রকাশ করিলে চিত্তরঞ্জন উহা নীরবে সহ্য না করিয়া সমগ্র ইংলণ্ডে উহার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। বক্তা হিসাবেও তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন মহামতি গ্লাডষ্টোন কর্তৃক আহূত এক জনসভায় বক্তৃতাদানের জন্য আমন্ত্রিত হইয়া। মিঃ জেমস ম্যাকলীনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে মিঃ ম্যাকলীনকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় এবং পার্লামেণ্টের সদস্য পদ হইতে তাহার পদচ্যুতি হয়।

১৮৯৩ : চিত্তরঞ্জন ব্যারিস্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আইনজীবী হিসাবে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন।

১৮৯৫ : চিত্তরঞ্জনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ মালঞ্চ প্রকাশিত হয় এবং কবি হিসাবে চতুর্দিকে তাঁহার সুনাম প্রচারিত হয়।

১৮৯৬ : পিতা ভুবনমোহন দাশের ঋণের জন্য চিত্তরঞ্জন আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন।

১৮৯৭ : ঢাকা জিলার অন্তর্গত নওগাঁও গ্রামস্থ বিজনীর ম্যানেজার বরদা হালদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা বাসন্তী হালদারের সঙ্গে ৩রা ডিসেম্বর তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এই শুভকার্য কলিকাতাতেই সম্পন্ন হয়।

১৮৯৮ : জ্যেষ্ঠা কন্যা অপর্ণা দেবীর জন্ম।

১৮৯৯ : একমাত্র পুত্র চিররঞ্জনের জন্ম।

১৯০১ : কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণী দেবীর জন্ম হয়।

১৯০২ : দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মালা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯০৫ : রাজনৈতিক জীবনের পথে তিনি যাত্রা আরম্ভ করিলেন। প্রবীণদের সঙ্গে নবীন দলের সেই সময় মতবিরোধের সূত্রপাত হয়। চিত্তরঞ্জন নবীন দলের নেতা। নবীন দলের জয়লাভ। নবীন দলের প্রধান হিসাবে তাঁহার খ্যাতিলাভ।

১৯০৬ : বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, উহার প্রধান প্রস্তাব চিত্তরঞ্জন রচনা করিয়াছিলেন।

১৯০৭ : ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও বিপিন পাল মহাশয় রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হইলে চিত্তরঞ্জন ঐ মোকদ্দমায় উহাদের পক্ষ সমর্থন করেন।

১৯০৮ : একদিকে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের বিদেহী আত্মার নির্দেশ ও অন্যদিকে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতির অনুরোধে চিত্তরঞ্জন ভারতের জাতীয় জীবন ও রাজনৈতিক জীবনের বিখ্যাত আলিপুর মোকদ্দমায় প্রতিবাদী অরবিন্দ ঘোষের পক্ষ সমর্থন করিয়া অনন্যসাধারণ বক্তৃতা করেন। এই মোকদ্দমা স্বদেশী মোকদ্দমা। ইহা বুঝিয়াই চিত্তরঞ্জন পারিশ্রমিকের কথা না ভাবিয়া পরিবর্তে নিজের প্রভূত ক্ষতি করিয়াও দীর্ঘ আট মাস নিরলস পরিশ্রম করিয়া অরবিন্দকে অভিযোগ হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম হন। এই মোকদ্দমায় জয়লাভ করিবার পর হইতে চিত্তরঞ্জন যে

আইনজীবী হিসাবে অত্যন্ত কূটনৈতিক ও ধী-শক্তিসম্পন্ন এই সুনাম প্রচারিত হইতে থাকে। সমগ্র ভারতবর্ষেই তখন তাঁহার নাম।

১৯০৯: ডুমরাঁও মামলা গ্রহণ।

১৯১০: পূর্ববঙ্গ সরকারের অভিযোগ,—ঢাকার পুলিনবিহারী দাস প্রভৃতি ৪৪ জন যুবক সরকারকে অমান্য করিয়া গদিচ্যুত করিবার জন্য গুপ্ত অস্ত্র চালনা শিক্ষা করিয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ইহা ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা নামে বিখ্যাত। চিত্তরঞ্জন আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেন এবং তাহাদিগকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন।

১৯১১: চিত্তরঞ্জন দ্বিতীয়বার বিলাত যান এবং 'সাগর-সঙ্গীত' রচনা করেন।

১৯১৩: যত দূর সম্ভব পাওনাদারদের খুঁজিয়া তাহাদিগকে প্রতিটি পয়সা মিটাইয়া দিয়া দেউলিয়া হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ঐ বৎসরই তাঁহার পরমারাধ্যা মাতা নিস্তারিনী দেবী পরলোক গমন করেন। গ্রন্থাকারে সাগর-সঙ্গীত প্রকাশিত হয়।

১৯১৪: দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি আসামী পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এই বৎসর তাঁহার পরমারাধ্য পিতৃদেব ভুবনমোহন দাশ পরলোক গমন করেন। তাঁহার সম্পাদনায় মাসিক পত্রিকা 'নারায়ণ' প্রকাশিত হইতে থাকে এই বৎসর হইতেই। এই বৎসরই তাঁহার চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'অন্তর্যামী' প্রকাশিত হয়।

১৯১৫: পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'কিশোর-কিশোরী' প্রকাশিত হয়। ১৯১৭: বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সম্মেলনীর সভাপতিরূপে ভবানীপুরে 'বাংলার কথা' অভিভাষণ। বাঁকিপুরে যে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হইয়াছিল তিনি উহাতে সাহিত্য শাখার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এই বৎসর বাংলায় মডারেট ও চরমপন্থীদল মত বিরোধের ফলে বিভক্ত হইয়া যায় এবং চিত্তরঞ্জন চরমপন্থী দলের অবিসম্বাদিত নেতা এবং মুখপাত্ররূপে দেশব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেন। বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জনের নাম তখন হইতেই সকলের মুখে মুখে। এই বৎসর তিনি ভারতসচিব মণ্টেগুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

১৯১৮: বোম্বাইতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। চিত্তরঞ্জন উহাতে যোগদান করেন। দিল্লী কংগ্রেস রাউলট কমিটি যে প্রস্তাব

করিয়াছিল তিনি উহার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে বক্তৃতা করেন।

১৯১৯ : তিনি এই বৎসর সুবিখ্যাত কলিকাতা কংগ্রেসে যোগদান করেন। ময়দানের জনসভায় সত্যাগ্রহের জন্য শপথ গ্রহণ করেন। এই বৎসর ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তিনি উহাতে যোগদান করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের জন্য ভারতীয় কংগ্রেস একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। চিত্তরঞ্জন উহার অন্যতম সদস্য হিসাবে সপরিবারে কয়েক মাস সেখানে তদন্ত কার্য পরিচালনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। জানা গিয়াছে যে ঐ সময় তাঁহার পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অমৃতসরে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি উহাতে যোগদান করেন এবং ভারত সরকার কর্তৃক নূতন শাসক-সংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন।

১৯২০ : এই বৎসর তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সম্মেলনীর সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি মহাত্মা গান্ধীজী কর্তৃক প্রবর্তিত অসহযোগ নীতি গ্রহণ করিয়া সেই পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। রাজার ভোগ-বিলাসের মত যাহার ভোগ বিলাস ছিল তিনি তখন তাহা সব পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার এই মানসিক প্রস্তুতি পরিপুর্ণরূপ পরিগ্রহ করিল নাগপুর কংগ্রেসের পুর্ণ অধিবেশনে যোগদান ও অসহযোগ নীতির সমর্থন করিবার পর হইতেই। মাসিক ৫০।৬০ হাজার টাকার আইনজীবীর পসার পরিত্যাগ করিলেন। তখন হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে ভারত-মাতার মুক্তি সাধনায় নিজের মন-প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। দেশের মুক্তি-যুদ্ধে তাঁহার এই সাধনায় দেশবাসী তাঁহাকে 'দেশবন্ধু' আখ্যায় ভূষিত করে এবং বাংলায় অবিসম্বাদিত এবং একচ্ছত্র জননেতা বলিতে যে একমাত্র তাঁহাকেই বুঝায় ইহা সকলেই অবগত হয়।

১৯২১ : বাংলা দেশে তখন যে অসহযোগ আন্দোলন চলিয়াছিল তিনি উহার নেতৃত্ব করেন। আই. সি. এস সুভাষচন্দ্র সরকারী কার্যে যোগদান না করিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গুরুর আদর্শেই জীবনকে উৎসর্গ করিলেন। আইন অমান্যের অভিযোগে পুত্র চিররঞ্জনের গ্রেপ্তার বরণ ৬ই ডিসেম্বর। ৭ই ডিসেম্বর বড় বাজারে খদ্দর বিক্রয় করিতে গিয়া শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী গ্রেপ্তার বরণ করেন। ১০ই ডিসেম্বর শনিবার বৈকাল সাড়ে চার ঘটিকার সময় চিত্তরঞ্জন প্রথম গ্রেপ্তার বরণ করেন। গ্রেপ্তার

বরণের সময় অসংখ্য শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি করিয়া পুরনারীবৃন্দ তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানায়।

১৯২২: সরকারের আদালত, ৬ই জানুয়ারী রায় দান করিয়া চিত্তরঞ্জনকে বিনাশ্রমে ছয়মাস কাল কারাদণ্ড প্রদান করেন। এই কারাদণ্ড ভোগের সময় তিনি ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির গয়া অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন। ছয়মাস কাল কারাদণ্ড ভোগ করিয়া তিনি যখন মুক্তিলাভ করেন তখন দেশের জনসাধারণ স্বতস্ফূর্ত ভাবে মির্জাপুর পার্কে এক মহতী জনসভায় তাঁহাকে সংবর্ধিত করেন। এই বৎসর মহাত্মা গান্ধীজী তাঁহার কাউন্সিল প্রবেশ নীতির বিরোধিতা করায় চিত্তরঞ্জন তাঁহার স্বরাজ্য দল সংগঠন করেন।

১৯২৩: পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তাঁহার সহিত যুক্ত হওয়ায় স্বরাজ্য দলের শক্তি বৃদ্ধি হয়। বোম্বাইতে যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় চিত্তরঞ্জন উহার সভাপতি নির্বাচিত হন। এই বৎসরই তাঁহার দৈনিক ইংরাজী 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আর সব চাইতে উল্লেখ-যোগ্য, নির্বাচনে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি উদার নৈতিক দলের প্রার্থীগণকে বিভিন্ন কেন্দ্রে পরাজিত করিয়া কাউন্সিলে স্বরাজ্য দলের বিজয় তাকা উড্ডীন করেন। শাসন প্রথা অনুযায়ী ছোটলাট লর্ড লিটন স্বরাজ্য দলের নেতা হিসাবে চিত্তরঞ্জনকে মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের যে শর্ত তাহা গৃহীত না হওয়ায় চিত্তরঞ্জন ঐ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯২৪: বিক্রমপুর-মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনীর যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় চিত্তরঞ্জন উহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। অর্ডিনান্স আইনের বলে সরকার সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র ও অনিল বরণ রায় প্রভৃতিকে বিনা বিচারে দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ রাখার প্রতিবাদে 'টাউন হলে' অনুষ্ঠিত এক জনাকীর্ণ সভায় চিত্তরঞ্জন দেশপ্রেমকে ভিত্তি করিয়া এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন। মন্ত্রী অবস্থায় স্যার সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন কার্যকর করিলে পৌর প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল প্রাধান্য লাভ করে এবং কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন। এই বৎসর তিনি তারকেশ্বর মন্দিরের মোহান্তের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া সত্যাগ্রহ পরিচালনা

করেন। সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনীতে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বেলগাঁও অধিবেশনে তিনি যোগদান করেন; জীবনে উহাই তাঁহার ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে শেষ-বারের মত যোগদান করা।

১৯২৫: মে মাস। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনী ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত হয়, চিত্তরঞ্জন উহাতে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতিরূপে তিনি যে ভাষণ দেন উহা জাতির জীবনে এক নির্দেশনামা এবং দেশের জনজীবনে সর্বদিক হইতে প্রণিধানযোগ্য।

১৬ই জুন। হিমালয়ের পাদদেশে হিম-আলয় দার্জিলিং শহরে চিত্তরঞ্জনের মহাজীবন-নাটকের যবনিকাপাত হয়।

দেশবন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশের

সুভাষচন্দ্রের পত্র

Censored and Passed
3. 3. 26

জনসাধারণের পাঠের জন্য স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু লেখার মত সাহস আমার এখনও নাই, কখনও হইবে কি না জানি না। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ এত গভীর রকমের ছিল যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কাহারও নিকট তাঁহার বিষয় কিছু বলিবার ইচ্ছা হয় না। অধিকন্তু তিনি এত বড় ছিলেন এবং আধার হিসাবে আমি এত ক্ষুদ্র, যে আমার সর্বদা মনে হয় যে তাঁহার প্রতিভা কত সর্বোতোমুখী, হৃদয় কিরূপ উদার ও চরিত্র কত মহান্ ছিল তাহা আজ পর্যন্ত আমি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। এরূপ অবস্থায় আমার ক্ষুদ্র হৃদয়, ক্ষীণ চিন্তা শক্তি ও দীন ভাষার সাহায্যে সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের বিষয় কিছু বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। তবে ইচ্ছা ও সামর্থ্য না থাকিলেও বন্ধুর অনুরোধে অনেক কাজ এ জীবনে করিতে হয়-তাই আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে আমার এই প্রচেষ্টা। দেশবন্ধু সম্বন্ধে আমি প্রত্যক্ষভাবে যতটুকু জানি এবং গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণের দ্বারা তাঁহার জীবনের ও তাঁহার পুণ্যময় কর্মের গূঢ় অর্থ আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা লিখিতে গেলেও একটি পুস্তক হইয়া পড়িবে। অত কথা লিখিবার মত ক্ষমতা বা মনের অবস্থা আমার এখন নাই, এই বন্ধুর অনুরোধ রক্ষার নিমিত্ত আমি মাত্র কয়েকটি কথার উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব।

দেশবন্ধুর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের সকল কথা আমি অবগত নই। জীবন

চরিত্তের মধ্যে যে সব কথা আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও বোধহয় আমি জানি না। তাঁহার জীবনের মাত্র তিনবৎসর কাল আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম এবং অনুচর হইয়া তাঁহার কাজ করিয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যেও চেষ্টা করিলে তাঁহার নিকট অনেক কিছু শিখিতে পারিতাম, কিন্তু চোখ থাকিতে কি আমরা চোখের মূল্য বুঝি? বিশেষতঃ দেশবন্ধু সম্বন্ধে আমার ধারণা ও বিশ্বাস ছিল যে তিনি অন্ততঃ আরও অনেক বৎসর জীবিত থাকিবেন, এবং তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপন না হওয়া পর্যন্ত তিনি মর্তলোকের কর্মভূমি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন না। দেশবন্ধু নিজের কোষ্ঠীতে খুব বিশ্বাস করিতেন। আমি অবিশ্বাসী হইলেও তাঁহার বিশ্বাস যে আমার মনের উপর সংক্রামক প্রভাব বিস্তার করে নাই, একথা বলিতে পারি না। আমার যতদূর স্মরণ আছে তিনি বহুবার আমায় বলিয়াছেন যে সমুদ্রপারে দুই বৎসর কারাবাস তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে। কারাবাসের অবসানে তিনি সসম্মানে প্রত্যাবর্তন করিবেন; কর্তৃপক্ষের সহিত মিটমাট হইবে এবং তিনি রাজসম্মানে ভূষিত হইবেন; তারপর তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিবে। সে সময়ে আমি বলিয়াছিলাম যে তাঁহার সহিত সমুদ্রপারে যাইতে আমিও প্রস্তুত। সত্য কথা বলিতে কি, সমুদ্র পারে আসার পর তাঁহার কোষ্ঠীর কথা স্মরণ করিয়া আমার মনে সর্বদা আশঙ্কা হইত পাছে তাঁহাকেও আসিতে হয় কিন্তু সে দুর্ভাগ্য অপেক্ষা শতগুণে দারুণ দুর্ভাগ্য বাঙ্গলার, তথা ভারতের ভাগ্যে ঘটিল।

দেশবন্ধুর সহিত আমার শেষ দেখা আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। আরোগ্য লাভের জন্য এবং বিশ্রাম পাইবার ভরসায় তিনি সিমলা পাহাড়ে গিয়াছিলেন, আমাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সিমলা হইতে রওনা হইয়া কলিকাতায় আসেন। আমাকে দেখিতে তিনি আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে দুইবার আসেন এবং আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয় আমার বহরমপুর জেলে বদলী হইবার পূর্বে। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ হইলে আমি তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া বলিলাম, "আপনার সঙ্গে আমার বোধহয় অনেকদিন দেখা হইবে না।" তিনি তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ও উৎসাহের সহিত বলিলেন, "না, আমি তোমাদের শিগ্‌গির খালাস করে আনছি।" হায়, তখন কে জানিত যে ইহজীবনে আর তাঁহার দর্শন পাইব না? সেই সাক্ষাতের প্রত্যেক ঘটনাটি, প্রত্যেক দৃশ্যটি প্রত্যেক ছায়াটি পর্যন্ত আমার মানসপটে

চিত্রের ন্যায় আজও অঙ্কিত আছে এবং বোধকরি চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে। তাঁহার সেই শেষ স্মৃতিটুকু আমার প্রাণের সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জনমণ্ডলীর উপর দেশবন্ধুর অতুলনীয় অলৌকিক প্রভাবের গূঢ় কারণ কি, এ প্রশ্নের সমাধান করিবার অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন। আমি সর্ব প্রথমে অনুচর হিসাবে তাঁহার প্রভাবের একটি কারণ নির্দেশ করিতে চাই। আমি দেখিয়াছি তিনি সর্বদা মানুষের দোষগুণ বিচার না করিয়া তাহাকে ভালবাসিতে পারিতেন। তাঁহার ভালবাসার উৎপত্তি হৃদয়ের সহজ প্রেরণা হইতে; সুতরাং তাঁহার ভালবাসা গুণীর গুণের উপর নির্ভর করিত না। যাহাদিগকে আমরা সাধারণতঃ ঘৃণায় ঠেলিয়া ফেলি, তিনি তাহাদিগকেও বুকে টানিয়া লইতে পারিতেন। কত বিভিন্ন রকমের লোক তাঁহার হৃদয়ের টানে নিকট আসিত এবং জীবনের কত ক্ষেত্রে এই নিমিত্ত তাঁহার প্রভাব ছিল! সমুদ্রে প্রকাণ্ড ঘূর্ণাবর্তের ন্যায় এই বিপুল জন সমাজে তিনি চারিদিক হইতে সকল প্রাণকে আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া শেষে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন এরূপ কত দৃষ্টান্ত এখন চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। যাহারা তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিক৮ মাথা নত করেন নাই, অসাধারণ বাগ্মিতায় বশীভূত হয়েন নাই, বিক্রমের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন নাই অলৌকিক ত্যাগে মুগ্ধ হয়েন নাই তাঁহারা পর্যন্ত ঐ বিশাল হৃদয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আর তাঁহার সহকর্মীরা ছিলেন তাঁহার পরিবারবর্গের অন্তর্ভূক্ত। তিনি তাহাদের উপকার অথবা মঙ্গলের জন্য কি না করিতে প্রস্তুত ছিলেন? জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না—একথা একশো বার সত্য। দেশবন্ধুর জীবন ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ত৺৺র অনুচরবর্গ এবং তাঁহার সহকর্মীগণ তাঁহার আদেশে কি না করিতে পারিতেন? কোনও ত্যাগ, কোনও কষ্ট, কোনও পরিশ্রম কি তাহাদের বিচলিত করিতে পারিত? অবশ্য জীবন দানের পরীক্ষা কোনও দিন হয় নাই কিন্তু সে কথা বাদ দিলে * বোধহয় বলা যাইতে পারে যে তাঁহার অনুচরবর্গ তাঁহার কাজ করিতে গিয়া সানন্দে সকল প্রকার দুঃখ ও কষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছিল, এবং তাহাতে গৌরব

* তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে ও কংগ্রেসের কাজ করিতে করিতে কয়েকজনের দেহত্যাগও ঘটিয়াছিল।

অনুভব করিয়াছিল। দেশবন্ধুও জানিতেন যে তাঁহার অহিংস সংগ্রামে তাঁহার এমন কতকগুলি সৈনিক আছে যাহাদের উপর তিনি সর্বাবস্থায় নির্ভর করিতে পারিতেন। আজ আমি গর্বের সহিত বলিতে পারি যে দেশবন্ধুর পুণ্যজীবনের শেষ দিবস পর্যন্ত তাঁহার শান্তিসেনা অটল অচলভাবে সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই যে দেশবন্ধুর সুসংযত কর্তব্য পরায়ণ নির্ভীক অনুচর-বৃন্দকে দেখিয়া অনেক তথাকথিত জননায়ক ঈর্ষাপরায়ণ হইতেন, তাঁহারাও হয়ত মনে মনে ঐরূপ অনুচরবর্গ পাইতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু মূল্য দিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। সহকর্মী বা অনু-চরকে ভাল না বাসিতে পারিলে বিনিময়ে তাহার প্রাণ পাওয়া যায় না। সাধারণ সাংসারিক জীবের ন্যায় দেশবন্ধুর আত্ম-পর জ্ঞান ছিল না। তাঁহার বাড়ী সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছিল। সর্বত্র—এমন কি তাঁহার শয়ন প্রকোষ্ঠেও সকলের গতিবিধি ছিল। তাঁহার অন্তরের এবং বাহিরের সম্পদের উপর সকলের দাবী ছিল। তিনি তাঁহার অনুচরবৃন্দকে যে শুধু ভালবাসিতেন তা নয়, তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা সহিতেও প্রস্তুত ছিলেন। একদিন তাঁহার একজন নিকট আত্মীয় তাঁহার কোনও সহকর্মীর দোষ ও ত্রুটির উল্লেখ করিয়া বলেন—"I hate him"—তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলেন, "আমার মুস্কিল এই যে আমি তাহাকে ঘৃণা করিতে পারি না।" ইহা ব্যতীত বহিরঙ্গ লোকদের সহিত তাঁহার সহকর্মীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহাকে অনেক ঝগড়া-বিবাদ করিতে হইত। এইরূপ বিবাদের সময় আমি স্বয়ং কয়েকবার উপস্থিত ছিলাম এবং আমি লক্ষ্য করিয়াছি তাঁহার অনুচরবর্গের প্রতি তাঁহার কত গভীর ভালবাসা, তাহাদের জন্য তাঁহার কত গভীর বেদনা, তাহাদিগকে সমর্থন করিতে গিয়া তাঁহার কত লাঞ্ছনা!

যাঁহারা ভিতরের খবর রাখেন না তাঁহারা দেশবন্ধুর সঙ্ঘ গঠনের অপূর্বশক্তি দেখিয়া বিমোহিত হইতেন—হইবারও কথা। কারণ দেশবন্ধু যাহা দেখাইয়া গেলেন তাহা ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন। আমি এস্থলে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে পর্বতের ন্যায় অটল সঙ্ঘ গঠন করিয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল নায়ক ও অনুচরবর্গের মধ্যে প্রাণের সংযোগ। ইহা ব্যতীত দোষগুণ নির্বিশেষে ভালবাসিবার ক্ষমতার সাহায্যে এবং তাঁহার অসাধারণ

বুদ্ধি কৌশলের দ্বারা তিনি ভিন্ন ভিন্ন পন্থী ও ভিন্ন-রুচি লোকদিগকে একত্র চালাইতে পারিতেন। তাঁহার মত পোষণ করেন না এরূপ বহুলোক গোপনে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন।

অনেক তথাকথিত জননায়ক স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে দেশবন্ধুর অনুচরবর্গ বা সহকর্মিগণ দাসত্বপরায়ণ ছিলেন। দেশবন্ধুর মন্ত্রণাগৃহে যাঁহারা কখনও উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা এ কথা আদৌ সমর্থন করিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না। আলোচনা ও পরামর্শের সময় যাহারা নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী ছিল, তাহাদিগকে আমি কি করিয়া দাসত্বপরায়ণ বলি? অধিকন্তু আলোচনার সময় নায়কের সহিত অনুচরবর্গের প্রায়ই তুমুল ঝগড়া হইত, দেশবন্ধু আলোচনার সময় কখনও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন বটে কিন্তু স্পষ্টবাদীর উপর তিনি কোনও দিন মনে বিরক্ত হইতেন না। এমন কি অনেকের ধারণা ছিল যে যাহারা বেশী আপত্তি তুলিত তাহাদের কথা তিনি বেশী শুনিতেন। অবশ্য এ কথা সত্য যে মতভেদ হইলেও তাঁহার অনুচরেরা অসংযত বা উচ্ছৃঙ্খল হইত না অথবা নেতার উপর আক্রোশ বশতঃ প্রকাশ্যে গালাগালি করিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করিত না। দেশবন্ধুর সঙ্ঘের প্রধান নিয়ম ছিল সংযম ও শৃঙ্খলা। পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিতে পারে কিন্তু ভোটের দ্বারা একবার কর্তব্য স্থির হইয়া গেলে সকলকে সেই পন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। সঙ্ঘের নিয়মানুবর্তী হওয়ার শিক্ষা এই পবিত্র ভারতভূমিতে নূতন নয়। ২৫০০ বৎসর পূর্বে ভগবান্ বুদ্ধ সর্বপ্রথমে ভারতবাসীকে এই শিক্ষা দিয়া যান। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র বৌদ্ধগণ প্রার্থনার সময়ে বলিয়া থাকেন:

(ব্রহ্মভাষায়)

বৌচান্দরণ গিম্‌সামি (বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি)
চম্মান্দরণ গিম্‌সামি (ধর্মং শরণং গচ্ছামি)
তঙ্গান্দরণ গিম্‌সামি (সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি)

বস্তুতঃ কি ধর্ম প্রচারে, কি স্বদেশসেবা সঙ্ঘ ও সঙ্ঘানুবর্তিতা ভিন্ন কোনও মহান্ কাজ এ জগতে সম্ভবপর নয়।

আর একটি অভিযোগ আমি শুনিয়াছি—রাজনীতির আবর্তে পড়িয়া দেশবন্ধুকে নাকি শিক্ষা-দীক্ষা হিসাবে নিম্নস্তরের লোকদিগের সাহচর্য করিতে হইত। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার জীবনের শেষ দিবস পর্যন্ত যে সকল

কর্মীদের সংস্পর্শে দেশবন্ধু আসিয়াছিলেন তাহাদিগকে তিনি নিম্নস্তরের লোক বলিয়া মনে করিতেন কিনা আমি জানি না। কথাবার্তায় সেরূপ ভাব কখনও প্রকাশ করেন নাই। হইতে পারে যে তাঁহার পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল না বলিয়া এবং তাঁহার স্বাভাবিক বিনয় বশতঃ তিনি অন্তরের ভাব গোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু একটা ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তাঁহার কারামুক্তির পর কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদানের জন্য সভা করেন। অভিনন্দন পত্রে দেশবন্ধুর গুণগ্রামের উল্লেখ ছিল এবং দেশের জন্য তিনি কিরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহারও বর্ণনা ছিল। তরুণের ভক্তি ও ভালবাসার পূর্ণ অর্ঘ যখন তাঁহার নিকট নিবেদিত হইল তখন দেশবন্ধুর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি ছিলেন চির নবীন, চির তরুণ; তাই তরুণের বাণী তাঁহার মরমে গিয়া আঘাত করিত। তিনি যখন সভায় অভিনন্দন পত্রের উত্তর দিবার জন্য উঠিলেন, তখন তাঁহার অন্তরে ভাবের জোয়ার ছুটিতেছে। নিজের ত্যাগ ও কষ্টের কথা তুচ্ছ করিয়া তিনি বাঙ্গলার তরুণ সম্প্রদায়ের ত্যাগের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু বেশী দূর বলিতে পারিলেন না। উচ্ছ্বসিত ভাবরাশি তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল। তিনি নির্বাক নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, দুই গণ্ড বহিয়া পবিত্র অশ্রুবারি ঝরিতে লাগিল! তরুণের রাজা কাঁদিলেন, তরুণেরাও কাঁদিল।

যাহাদের জন্য তাঁহার এত সমবেদনা, যাহাদের প্রতি তাঁহার এত ভালবাসা, তাহাদিগকে তিনি কি করিয়া নিম্নস্তরের লোক বলিয়া মনে করিতে পারেন তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না।

অবশ্য যাহারা দেশবন্ধুর কাজ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছে তাহাদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা, বিদ্যাবুদ্ধি অথবা আভিজাত্যের গর্ব নাই।' আশা করি বিনয়রূপ পরম সম্পদ তাহারা কোনও দিন হারাইবে না।

দেশবন্ধুর শেষ পত্র আমি পাই পাটনা হইতে, সে পত্র আজ সুদূর ব্রহ্মদেশে আমার নিকট তাঁহার অমূল্য শেষ স্মৃতি-চিহ্ন। তাঁহার সহকর্মী ও অনুচরদের গ্রেপ্তারের পর তিনি যেরূপ যন্ত্রণায় কালক্ষেপ করিতেছিলেন তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন সেই পত্রে ছিল। সে যন্ত্রণা যে কত তীব্র তা শুধু তিনি বুঝিতে পারেন যিনি তাঁহার প্রাণের পরিচয় পাইয়াছেন।

১৯২১ ও ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে দেশবন্ধুর সহিত ৮ মাস কাল কারাগারে কাটাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তন্মধ্যে দুই মাস কাল আমরা পাশাপাশি "সেলে" প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলাম এবং বাকী ৬ মাস কাল কয়েকজন বন্ধুর সহিত আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের একটি বড় ঘরে ছিলাম। এই সময়ে তাঁহার সেবার ভার কতকটা আমার উপর ছিল। আলিপুর জেলে শেষ কয়েক মাস তাঁহার একবেলার রান্নাও আমাকে করিতে হইত। গভর্ণমেণ্টের কৃপায় আমি যে ৮ মাস কাল তাঁহার সেবা করিবার অধিকার ও সুযোগ পাইয়াছিলাম—ইহা আমার পক্ষে চরম গৌরবের বিষয়। ১৯২১ খ্রীঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে আমি ৩।৪ মাস কাল তাঁহার অধীনে কাজ করিয়াছিলাম। সুতরাং সেই সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে তাঁহাকে ভালো রকম বুঝিবার সুবিধা আমার হয় নাই। তারপর যখন আট মাস একত্র বাস করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য ঘটিল তখন খাঁটি মানুষকে আমি চিনিতে পারিলাম। ইংরাজীতে কথা আছে 'Familiarity breeds contempt'—বেশী ঘনিষ্ঠতা হইলে নাকি অশ্রদ্ধা জন্মায়, কিন্তু দেশবন্ধু সম্বন্ধে বলিতে পারি যে ঘনিষ্ঠতার ফলে তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা শতগুণে বাড়িয়াছে; এ কথা বোধহয় অন্যান্য সকলে সমর্থন করিবেন।

দেশবন্ধু যে সহজ ও অনাবিল রসিকতার অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন একথা আমি জেলখানায় ভাল রকম বুঝিতে পারি। কত রকমের রসিকতার দ্বারা তিনি দিনের পর দিন সকলকে আমোদিত করিয়া রাখিতেন। প্রেসিডেন্সী জেলে আমাদের পাহারার জন্য সঙ্গীনধারী গুর্খা সৈনিক নিযুক্ত হইয়াছিল।

একদিন সকালে উঠিয়া তিনি দেখিলেন গুর্খা সৈনিকের পরিবর্তে এ কজন রুলধারী হিন্দুস্থানী সেপাহী উপস্থিত। অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন—"কি হে সুভাষচন্দ্র, শেষটা অসি ছেড়ে বাঁশী; আমরা কি এতই নিরীহ?" চেষ্টা করিয়া অথবা ভাবিয়া চিন্তিয়া রসিকতা করিতে হইত না। পর্বত নির্ঝরিণীর ন্যায় তাঁহার রসিকতা আপনার প্রেরণায় আপনি ছুটিত, আমি তাঁহার সেই গুণের বিশেষ উল্লেখ করিলাম তার কারণ এই যে, আমি মনে করি যে জাতি হিসাবে আধুনিক বাঙালীর মধ্যে রসের বোধ কিছু কম। আমি অন্যান্য বিদেশীয় জাতিদের সহিত তুলনা করিয়া এ কথা

বলিতেছি ; হইতে পারে ভারতের অন্যান্য জাতির অপেক্ষায় এখনও বাঙালীর রসবোধ বেশী।

রসবোধ থাকিলে মানুষ প্রতিকূল ঘটনার আঘাতে সহজে কাতর হয় না, বরং সর্বাবস্থায়ই মজা লুটিতে পারে। জেলখানার একঘেঁয়ে জীবনের আবর্তে পড়িলে এ কথার সত্যতা হাড়ে হাড়ে বুঝা যায়। দেশবন্ধুর রসিকতা এত সহজ ও অনাবিল ছিল যে বয়সের তারতম্য অথবা আমাদের সম্বন্ধের দরুন আমরা কোনরূপ সঙ্কোচবোধ করিতাম না।

ইংরাজী ও বাঙলা সাহিত্যে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল এবং ইংরাজী কবিদের মধ্যে তিনি ব্রাউনিং-এর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। ব্রাউনিং-এর অনেক কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল তথাপি কারাগৃহে ব্রাউনিং-এর কবিতাগুলি তিনি বারংবার পাঠ করিতে ভালোবাসিতেন। দৈনন্দিন কথাবার্তা ও রসিকতার মধ্যে তিনি সাহিত্য হইতে এত কথা উদ্ধার করিতেন যে তিনি নিজে ভাষ্য করিয়া না দিলে আমার পক্ষে সময়ে সময়ে রসবোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। তিনি মানুষের নাম ভাল মনে রাখিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু সাহিত্য বিষয়ে যে তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে সাহিত্যের অবতারণা করিয়া তিনি যেরূপ সাহিত্যকে সজীব করিয়া সর্বসাধারণের উপভোগের বস্তু করিতে পারিতেন এরূপ আর কয়জন সাহিত্যিক করিতে পারিতেন বা পারেন, তাহা আমি বলিতে পারি না।

তাঁহার কোনও আত্মীয়ের জন্য দেশবন্ধু এক সময়ে শতকরা ৯৲ সুদ হিসাবে দশ হাজার টাকা ধার করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা শোধ দিতে পারেন নাই বলিয়া উত্তমর্ণের এটর্নি খত পরিবর্তন করিবার জন্য তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। দেশবন্ধু তখন আলিপুর জেলে এবং আমরা তাঁহার নিকেটেই। তাঁহার পুত্র চিররঞ্জনও সেখানে ছিলেন ; তাঁহার নিকট শুনিলাম যে এই ঋণের কথা পরিবারবর্গের মধ্যে আর কেহ ইতিপূর্বে জানিতেন না। খত পরিবর্তনের সময়ে যে আত্মীয়ের জন্য টাকা ধার করা হইয়াছিল তিনি লক্ষপতি। কিন্তু দেশবন্ধু দ্বিরুক্তি না করিয়া নূতন খতে দস্তখত দিলেন। স্ত্রী, পুত্র কিংবা অন্য কোন আত্মীয়কে না জানাইয়া বহু ঋণ করিয়া তিনি অপরের সাহায্য করিতেন।

দেশবন্ধু নিন্দা ও কুৎসা না করিয়া যাঁহারা জলগ্রহণ করেন না এইরূপ অনেক ব্যক্তিকে আমি দেখিয়াছি বিপদের সময়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে। এই জাতীয় কোনও ভদ্রলোক এক সময়ে দুই শত টাকার দাবী লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলেন—আমার তহবিলে মাত্র ৬০০৲ টাকা আছে, আমি কি করিয়া ২০০৲ টাকা দিই। ভদ্রলোকটি জিদ করিলেন—তিনি বিলম্ব না করিয়া দুই শত টাকা তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিলেন। এই ব্যাপারটা দেশবন্ধু কারামুক্তির পর ঘটিয়াছিল।

যে আট মাসকাল তাঁহার সঙ্গে ছিলাম সেই সময়ে তাঁহার অন্তরের সকল কথা ও অনুভূতি জানিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল, কিন্তু আমি কোনও দিন কোনও কাজে অথবা কোনও কথার মধ্যে নীচতার চিহ্ন পর্যন্ত পাই নাই। তাঁহার শত্রু রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেক ছিলেন এবং তিনি তাঁহাদের কথা জানিতেনও। কিন্তু কাহারো প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না—এমন কি প্রয়োজন হইলে তিনি তাঁহাদের সাহায্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না।

কারাগারে দেশবন্ধু অধিকাংশ সময়ে অধ্যয়নে নিরত থাকিতেন। ভারতের জাতীয়তা সম্বন্ধে পুস্তক লিখিবার অভিপ্রায়ে তিনি রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক অনেক নূতন পুস্তক আনাইয়া ছিলেন। প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহে করিয়া তিনি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু সময়ের সঙ্কীর্ণতার দরুন তিনি জেলখানায় থাকিতে পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে পুনর্বার কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইল বলিয়া তিনি জীবদ্দশায় তাঁহার আরব্ধ কাজ শেষ করিতে পাবেন নাই। সে সময়ে রাজনীতি ও জাতীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার অনেক আলোচনা হইয়াছিল। তিনি কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি ধর্মনীতি—জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই মতের অনুকরণ বা অনুসরণ পছন্দ করিতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে ভারতের জাতীয়তা শিক্ষা ও জাতির প্রয়োজন হইতে আমাদের সমাজ-তত্ত্ব, রাজনীতি ও দর্শনের উদ্ভব ও বিকাশ হইবে। এই জন্য তিনি বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম বা বিবাদ পছন্দ করিতেন না এবং তিনি এ বিষয়ে কার্ল মার্কসের বিরোধী ছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার আশা ছিল যে ভারতের সকল ধর্ম সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে

চুক্তিপত্রের (pact) সাহায্যে সকল বিবাদ দূর হইবে এবং জাতি-ধর্ম-শ্রেণী নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী স্বরাজ আন্দোলনে যোগদান করিবে। অনেকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন যে চুক্তিপত্রের সাহায্যে প্রকৃত মিলন সংঘটিত হইতে পারে না, কারণ উহা সমবেদনা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে, দর কষাকষির উপর নির্ভর করে না। দেশবন্ধু ইহার উত্তরে বলিতেন যে আপসে মিটমাট না করিয়া লইতে পারিলে মানুষ একদিনও এ সংসারে বাঁচিতে পারে না এবং মনুষ্য সমাজও একদিনও টিকিতে পারে না। কি পরিবারে কি বন্ধুমহলে কি সমাজ জীবনে কি রাজনীতি ক্ষেত্রে জীবনের প্রতি মুহূর্তে ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের মধ্যে আপসে মিটমাট সাধিত না লইলে মানুষের পক্ষে একত্র বাস করাই অসম্ভব। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ব্যবসায় বাণিজ্য চলে শুধু চুক্তিপত্রের উপর, তাহার মধ্যে ভালবাসার নাম গন্ধ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ভারতের হিন্দু জননায়কদের মধ্যে দেশবন্ধুর মত ইসলামের এত বড় বন্ধু আর কেহ ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না—অথচ সেই দেশবন্ধুই তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অগ্রণী হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু ধর্মকে এত ভালবাসিতেন যে তার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন অথচ তাঁর মনের মধ্যে গোঁড়ামি আদৌ ছিল না। সেই জন্য তিনি ইসলামকে ভালবাসিতে পারিতেন। আমি জিজ্ঞাসা করি 'কয়জন হিন্দু নায়ক বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন তাঁহারা মুসলমানকে আদৌ ঘৃণা করেন না? কয়জন মুসলমান জননায়ক বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন তাঁহারা হিন্দুকে ঘৃণা করেন না?' দেশবন্ধু ধর্মমত হিসাবে বৈষ্ণব ছিলেন।০ কিন্তু তাঁহার বুকের মধ্যে সকল ধর্মের লোকের স্থান ছিল। চুক্তিপত্রের দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন হইলেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না যে শুধু তাহারই দ্বারা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসা জাগরিত হইবে। তাই তিনি শিক্ষার (culture) দিক দিয়া হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে মৈত্রী সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেন। হিন্দু শিক্ষা ও ইসলামীয় শিক্ষার (culture) মধ্যে কোথায় মিল পাওয়া যায় এ বিষয়ে কারাগারে মৌলানা আক্রাম খাঁর সহিত তাঁহার প্রায়ই আলোচনা হইত। আমার যতদূর স্মরণ আছে হিন্দু মুসলমানের "শিক্ষার

মিলনের” বিষয়ে মৌলানা সাহেব পুস্তক বা প্রবন্ধ লিখিতে রাজী হইয়াছিলেন।

ভারতের স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে উচ্চশ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয় জনসাধারণের উপকার ও মঙ্গলের জন্য ; এ কথা যেরূপ দেশবন্ধু জোর গলায় প্রচার করিয়াছিলেন প্রথম শ্রেণীর আর কোন নেতা সেরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। “স্বরাজ জনসাধারণের জন্য” এ কথা পৃথিবীতে নূতন নয়। ইউরোপে বহুকাল পুর্বে এ মন্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল কিন্তু ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এ কথা নূতন বটে। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর “বর্তমান ভারতে” প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে এ কথা লিখিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু স্বামীজির সে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিধ্বনি রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে শুনা নাই।

তাঁহার কারামুক্তির পর হইতে দেহত্যাগ পর্যন্ত দেশবন্ধু যে সব কথা প্রচার করিয়াছিলেন সে সব বিষয়ে তিনি তাঁহার কারাবাসের সময়ে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে সে সকল বিষয়ে আমাদের সহিত আলোচনা হইত। কাউন্সিল প্রবেশের কথা তিনি সেখানেই স্থির করিয়াছিলেন এবং বহু তর্কের পর আমরা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করি। কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব লইয়া তখন জেলখানার মধ্যে খুব দলাদলিও হইয়াছিল। দৈনিক ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্পও আমরা সকলে জেলখানায় করি। তবে দুঃখের বিষয় তাঁহার কতকগুলি মহৎ সঙ্কল্প আজও কাজে পরিণত হয় নাই।

জেলখানার আর একটি ঘটনার উল্লেখ আমি এস্থলে না করিয়া পারি না। কয়েদীদের প্রতি তাঁহার ভালোবাসা। আমরা যে সময়ে প্রেসিডেন্সী জেল হইতে আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত হই, সে সময়ে আলিপুর জেলে আমাদের ওয়ার্ডে [ward] মথুর নামে একজন কয়েদী কাজ করে। জেলের ভাষায় যাহাকে বলে “পুরানো চোর” মথুর তাহাই ছিল। তাহাকে বোধ হয় চোর বলিলে অন্যায় করা হয়, সে ছিল ডাকাত। ৮।১০ বার সে জেলখানায় ঘুরিয়াছে। কিন্তু অন্যান্ত ডাকাতদের ন্যায় তাহার অন্তঃকরণ খুব সরল ছিল। কিছু দিন কাজকর্ম করিবার পর দেশবন্ধুর উপর মথুরের ভক্তি ও ভালবাসা জন্মিল—সে তাঁহাকে “বাবা” বলিয়া ডাকিতে লাগিল। মথুরের প্রতিও দেশবন্ধুর সমবেদনা ও ভালবাসা জাগরিত হইল। ক্রমশঃ সে আমাদের সকলের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। রাত্রে অথবা দিনের বেলায় তাঁহার

পা টিপিবার সময়ে মথুর তাহার জীবনের সকল ইতিহাস তাঁহাকে বলিত। মুক্তির সময় নিকটবর্তী হইলে দেশবন্ধু তাহাকে বলিলেন যে তাহার খালাসের পর তিনি তাহাকে নিজের বাড়ীতে রাখিবেন যাহাতে সে অসৎ সঙ্গে পড়িয়া পুনরায় ডাকাতিতে মন না দেয়। মথুরও এই প্রস্তাবে যারপরনাই আনন্দিত হইল এবং সে সঙ্কল্প করিল যে অতঃপর অসৎ সংসর্গ ও অসৎকর্ম ছাড়িয়া দিবে। মথুরের খালাসের দিন দেশবন্ধু লোক পাঠাইয়া তাহাকে জেলখানা হইতে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসেন। তারপর পরিচালক হইয়া সে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পযন্ত ঘুরিযাছে। দাগী চোর বলিয়া পুলিশে কিছুকাল তার পশ্চাতে ঘুরিয়াছিল—তারপর যখন দেখিল সে বাস্তবিকই দেশবন্ধুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিল। জমাদার তাহাকে দেখিলে প্রায়ই বলিত 'তুই বেটা মানুষ হ'য়ে গেলি।' আমার খুব ভরসা ছিল মথুরের আর পতন হইবে না। কিন্তু দেশবন্ধু দেহ-ত্যাগের পর পত্রদ্বারা যখন মথুরের খবর লইলাম তখন শুনিলাম সে ইতিপূর্বে তাঁহার দার্জিলিং বাসের সময় রসা রোডের বাড়ী হইতে অনেকগুলি রূপার জিনিসপত্র লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এ অদ্ভুত কথা শুনিয়া আমার Les miserable-এর গল্পের কথা মনে পড়িল। আমার এখনও বিশ্বাস যে, মথুর তাঁর সঙ্গে থাকিলে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবের দরুন লোভের বশীভূত হইত না। ক্ষণিক দুর্বলতার বশে সে চুরি করিয়াছিল সন্দেহ নাই, তবে আমার বিশ্বাস যে তিনি জীবিত থাকিলে সে কোন দিনও কাঁদিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িত। এখন তাহার কি অবস্থা হইবে ভগবানই জানেন।

মানুষ একাধারে কি করিয়া বড় ব্যারিস্টার, উদার প্রেমিক, পরম বৈষ্ণব, চতুর রাজনীতিজ্ঞ ও দিগ্‌বিজয়ী বীর হইতে পারে এ প্রশ্ন স্বভাবতঃ সকলের মনে উদয় হয়। আমি নৃতত্ত্ব বিদ্যার সাহায্যে এই প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি—কৃতকার্য হইয়াছি কি না জানি না। আর্য, দ্রাবিড় ও মঙ্গোল এই তিনটি জাতির মধ্যে রক্ত সংমিশ্রণের ফলে বর্তমান বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি। প্রত্যেক জাতির মধ্যে কতকগুলি গুণ বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে সুতরাং রক্তের সংমিশ্রণ হইলে গুণের সংমিশ্রণও হইয়া থাকে। রক্ত সংমিশ্রণের ফলেই বাঙালীর প্রতিভা এত সর্বতোমুখী এবং বাঙালীর জীবন এত বৈচিত্র্যপূর্ণ: আর্যের ধর্মপ্রাণতা ও আদর্শবাদ, দ্রাবিড়ের কলাবিদ্যা ও

ভক্তিমত্তা এবং মঙ্গোলের বুদ্ধি-কৌশল, অনুচীকীর্ষা ও বাস্তববাদ বাঙ্গলার সাগর সঙ্গমে আসিয়া মিশিয়াছে। বাঙ্গালী যে একসঙ্গে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ভাবুক, মায়াবাদ বিদ্বেষী ও আদর্শবাদী, অনুকরণপ্রিয় ও সৃষ্টিক্ষম তাহা এই রক্ত সংমিশ্রণের ফল। যে জাতির রক্ত কাহারও ধমনীতে প্রবাহিত হয় সেই জাতির গুণ ও শিক্ষা (culture) জন্মের সময়ে সংস্কাররূপে তাহার চিত্তের মধ্যে স্থান পায়। বাঙ্গালী যেরূপ এক বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হইয়াছে বাঙ্গলার শিক্ষা (culture)-ও তদ্রূপ বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে।

বাঙ্গলার ইতিহাস ও সাহিত্যের সহিত যাঁহার পরিচয় আছে, তিনি বোধহয় স্বীকার করিবেন যে, বাঙলার সভ্যতা আর্য সভ্যতা হইলেও তাহা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। স্বামী দয়ানন্দ উত্তর ভারত জয় করিয়া আর্য সমাজে আন্দোলন চালাইতে পারিয়াছিলেন কিন্তু তিনি বাঙলা দেশে আমল পাইলেন না কেন? আর কালীর ভক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সহস্র সহস্র শিক্ষিত বাঙালা কেন এত ভক্তি করে বা অনুসরণ করে? বাংলার দায় ভাগের প্রচলন কেন? বৌদ্ধধর্ম সর্বত্র বিতাড়িত হইলে অবশেষে বাঙ্গলা দেশে কেন শেষ আশ্রয় পাইল? বাঙ্গলা দেশে কেন নব্য ন্যায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল? বাঙ্গলা শঙ্করের মায়াবাদ গ্রহণ করে নাই কেন? বৌদ্ধধর্ম বাঙ্গলা দেশ হইতে বিতাড়িত হইলে শঙ্করের মায়াবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের কেন সৃষ্টি হইল? এই সব প্রশ্ন তুলিলেই বুঝা যাইবে যে বাঙ্গালীর শিক্ষা-দীক্ষার একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বাঙ্গলার শিক্ষার মধ্যে প্রধানতঃ তিনটা ধারা দেখিতে পাওয়া যায় (১) তন্ত্র (২) বৈষ্ণব ধর্ম (৩) নব্য ন্যায় ও রঘুনন্দন স্মৃতি। ন্যায় ও স্মৃতির দিক দিয়া আর্যাবর্তের সহিত বাঙ্গলার প্রাণের সংযোগ আছে। তন্ত্রের দিক দিয়া তিব্বতীয়, ব্রহ্ম ও হিমালয় প্রান্তবাসী জাতিদের সহিত বাঙ্গলার সম্বন্ধ আছে।

ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলন বাঙালীকে তার্কিক ও নৈয়ায়িক প্রকৃতি করিয়াছে; এই প্রকৃতি দেশবন্ধুর চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাকে বড় ব্যারিস্টার করিয়া তুলিয়াছিল। কি নৈয়ায়িক কি ব্যবহারজীবী উভয়েরই চুলচেরা তর্ক লইয়া কারবার। দেশবন্ধু প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কি না আমি জানি না—তবে পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল।

খুব বড় নৈয়ায়িক পণ্ডিতের ন্যায় তিনি চুলচেরা তর্ক করিতে পারিতেন এবং অবিরাম বাক্যস্রোতের দ্বারা শত্রুপক্ষকে বিধ্বস্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। দুই তিন শত বৎসর পূর্বে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে বড় নৈয়ায়িক হইতেন সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলার বৈষ্ণব ধর্ম ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ দেশবন্ধুকে নাস্তিকতা হইতে টানিয়া নীরস বেদান্তের ভিতর দিয়া প্রেমমার্গে লইয়া গিয়াছিল, দার্শনিক মত হিসাবে তিনি অচিন্ত্য ভেদাভেদকে সবচেয়ে খাঁটি মত বলিয়া মনে করিতেন। তিনি অনেক বিষয় সন্ন্যাসীর মত হইলেও সন্ন্যাস তাঁহার ধর্ম ছিল না। ভগবান যেরূপ সত্য, তাঁহার লীলাও তদ্রূপ সত্য; ব্রহ্ম সত্য বলিয়া জগৎ মিথ্যা নয়। অতএব ভগবানকে পাইতে হইলে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এ সব বর্জন করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ভগবানের লীলা অনন্ত; সেই লীলার রঙ্গমঞ্চ শুধু বহির্জগতে নয় মানুষের অন্তরেও। মনুষ্য হৃদয় নিত্য বৃন্দাবন; সেই বৃন্দাবনে জীবের সহিত ভগবানের, রাধার সহিত কৃষ্ণের অনন্ত-লীলা চলিয়াছে। তিনি রসময়; তাই সকল রসের মধ্যে দিয়া তাঁহাকে পাইতে হইবে। এরূপ মত যিনি পোষণ করেন তিনি যে নেতি মার্গ হইতে পারেন না—এ কথা বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ দেশবন্ধু বিশ্ব-সংসারকে তথা মনুষ্য জীবনকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সাহায্যে সে জীবনের সকল প্রকার বিরোধ দূর হইয়া যায় এবং সর্বত্র সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হয়—এ কথা তিনি বিশ্বাস করিতেন। তাই বৈষ্ণব ধর্ম হইয়াছিল তাঁহার জীবনের শেষ আশ্রয়। তিনি কথাবার্তায় এবং বক্তৃতায় প্রায়ই বলিতেন যে রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্য ধর্ম এ সব আলাদা করিয়া দেখিলে চলিবে না, পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে এবং একটিকেও বাদ দিলে জীবন পূর্ণ হইবে না।

যে দার্শনিক তত্ত্ব তাঁহার ধর্মরাজ্যের সকল বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছিল তাহার বাস্তব রূপ প্রেমের মধ্য দিয়া তাঁহার ব্যবহারিক জীবনে সকলের মধ্যে প্রীতি ও মৈত্রী সংস্থাপন করিয়াছিল। তিনি তাঁহার জীবনে সামঞ্জস্য (Synthesis) লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কর্মক্ষেত্রে ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিতেন। তাঁহার নিজের মধ্যে বিরোধ বা গোঁজামিল সহ্য করিতে পারিতেন না।

জেলখানার আলোচনার মধ্যে তাঁহার নির্বিচার বদান্যতার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিলে তিনি বলিতেন—"দেখো, তোমরা মনে করবে আমি নিতান্ত বোকা ; লোকে আমাকে ঠকিয়ে টাকা নিয়ে যায়। কিন্তু আমি সব বুঝতে পারি, আমার কাজ দিয়ে যাওয়া, তাই আমি দিয়ে যাই। বিচার করবার ভার যাঁর উপর তিনি বিচার করবেন।"

যে তন্ত্রের উপদেশে বাঙ্গালী শক্তিপূজা শিখিয়াছে সেই তন্ত্রের প্রভাবে দেশবন্ধু অসাধারণ তেজস্বী বীর হইয়াছিলেন। দেশবন্ধু অবশ্য কোনও দিন তান্ত্রিক সাধনা করেন নাই অন্ততঃ করিয়াছিলেন বলিয়া আমি জানি না। কিন্তু কুলাচার, বীরাচার, চক্রানুষ্ঠান প্রভৃতি সাধনা না করিলে যে শক্তিমান হওয়া যায় না……এ কথা আমি স্বীকার করি না। তন্ত্রের সার কথা শক্তি-পূজা। জগতের মূল সত্য আদ্যাশক্তি, যাহা হইতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় অথবা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। সেই আদ্যাশক্তিকে সাধক মাতৃরূপে আরাধনা ও পূজা করিয়া থাকে। বাঙ্গালীর উপর তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব খুব বেশী বলিয়া বাঙ্গালী জাতি হিসাবে মায়ের অনুরক্ত এবং ভগবানকে মাতৃরূপে আরাধনা করিতে ভালবাসে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ও ধর্মাবলম্বীরা (যথা ইহুদী, আরব, খ্রীষ্টিয়ান) ভগবানকে পিতৃরূপে আরাধনা করিয়া থাকে। ভগিনী নিবেদিতার মতে যে সমাজে নারী অপেক্ষা পুরুষের প্রাধান্য সেখানে ভগবানকে লোকে পিতৃরূপে কল্পনা করিতে শেখে। অপর দিকে যে সমাজে পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রাধান্য সেখানে লোকে ভগবানকে মাতৃরূপে কল্পনা করিতে শেখে। সে যাহা হউক, বাঙ্গালী যে ভগবানকে—শুধু ভগবানকে কেন, বাঙ্গলা দেশকে এবং ভারতবর্ষকে মাতৃরূপে কল্পনা করিতে ভালবাসে—এ কথা সর্ববিদিত। দেশকে আমরা মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া থাকি—কিন্তু মাতৃভূমির ইংরাজী তর্জমা Fatherland। আমরা অবশ্য motherland কথাটি চালাইয়া থাকি কিন্তু ইংরাজী ভাষার দিক হইতে তাহা শুদ্ধ নয়।

বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের লেখার মধ্যে মাতৃভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :

"সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্"

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন গাহিয়াছিলেন :

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ"

এবং রবীন্দ্রনাথ যখন গাহিয়াছেন :

"ও আমার জন্মভূমি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

তখন তাঁহারা তন্ত্রোপদিষ্ট মাতৃরূপের প্রভাবই দেখাইয়াছিলেন। দেশবন্ধুও মাতৃরূপের অনুরাগী ছিলেন। পারিবারিক জীবনে তাঁহার মাতৃভক্তির কথা অনেকেই জানেন। আলিপুর জেলে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা প্রায়ই পড়িয়া আমাদিগকে শুনাইতেন। বঙ্কিম লিখিত মায়ের তিনটি রূপের বর্ণনা পড়িতে পড়িতে তিনি বিভোর হইয়া যাইতেন। তখন তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যাইত তাঁহার মাতৃভক্তি কত গভীর! তাঁহার "নারায়ণ" পত্রিকায় বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা হইত শক্তি ধর্মেরও সেইরূপ অনুশীলন হইত। দুর্গা-পূজা সম্বন্ধে যে কয়টি প্রবন্ধ "নারায়ণে" প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলি উচ্চ ভাবে পরিপূর্ণ।

দেশবন্ধুর ব্যবহারিক জীবনেও আমরা তন্ত্রের প্রভাব দেখিতে পাই। পারিবারিক জীবনে দেশবন্ধুর মাতৃভক্তির কথা অনেকে জানেন। তিনি স্ত্রী শিক্ষার ও স্ত্রী স্বাধীনতায় যে বিশ্বাস করিতেন এ কথাও সর্বজনবিদিত। শঙ্করপন্থীদের উপদেশ "নারী নরকস্য দ্বারম" এ কথা তিনি আদৌ স্বীকার করিতেন না। বস্তুতঃ তাঁহার চিন্তাজগতে ও কর্মজীবনে তন্ত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গলার সভ্যতা ও শিক্ষার সার সঙ্কলন করিয়া তাহাতে রূপ দিলে যেরূপ মানুষের উদ্ভব হয় দেশবন্ধু অনেকটা সেইরূপ ছিলেন।

তাঁহার গুণ বাঙ্গালীর গুণ, তাঁহার দোষ বাঙ্গালীর দোষ। তাঁহার জীবনের সব চেয়ে বড় গৌরব ছিল যে তিনি বাঙ্গালী। তাই বাঙ্গালী জাতিও তাঁহাকে এত ভালবাসিত। তিনি প্রায়ই বলিতেন যে বাঙ্গালীর দোষগুণ লইয়াই বাঙ্গালী বাঙ্গালী। কেহ বাঙ্গালীকে ভাবপ্রবণ বলিয়া ঠাট্টা বা বিদ্রূপ করিলে তিনি ব্যথিত হইতেন। তিনি বলিতেন—আমরা ভাবপ্রবণ ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়। তার জন্য লজ্জিত হইবার কারণ নাই।

বাঙ্গলার যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, বাঙ্গলার প্রাকৃতিকরূপে, বাঙ্গলার সাহিত্যে, বাঙ্গলার গীত-কবিতায়, বাঙ্গালীর চরিত্রে যে সে বৈশিষ্ট্য মূর্ত

হইয়া উঠিয়াছে—এ কথা দেশবন্ধু যেরূপ জোরের সহিত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পূর্বে সেরূপ আর কেহ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। অবশ্য এ ভাব তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়। বঙ্কিম, ভূদেব প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ এই ভাবের সূত্রপাত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সাহিত্য ও শিক্ষার দিক দিয়া যে বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন দেশবন্ধু তাহা অনুসরণ করিয়াছিলেন। তথাপি আমি বলিতে বাধ্য যে দেশবন্ধু যেরূপ গভীরভাবে এই চিন্তার ধারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, "নারায়ণ" পত্রিকার ভিতর দিয়া ও অন্যান্য উপায়ে তিনি এই ভাবের জন্য এবং তদ্বিষয়ে মৌলিক গবেষণার সহায়তার নিমিত্ত এত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন যে বাঙ্গালী চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বলিতে পারি যে বাঙলার বৈশিষ্ট্যের কথা আমি তাঁহার মুখের বাণী ও লেখা হইতে শিখিয়াছি।

মনুষ্য জাতির শিক্ষা এক না বহু—এ প্রশ্ন অনেকে তুলিয়াছেন। কেহ বলেন যে শিক্ষার মধ্যে ভেদ নাই—শিক্ষা একই—তাঁহারা অদ্বৈতবাদী। অপরে বলেন যে, শিক্ষার মধ্যেও জাতি আছে অতএব শিক্ষা বহু—দেশবন্ধু কিন্তু ছিলেন দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। শিক্ষা বহু বটে একও বটে। মূলতঃ যদিও মনুষ্য জাতির শিক্ষা এক—তথাপি সেই একের বিকাশ বহুর মধ্য দিয়া, বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া। উদ্যানে যেরূপ নানা প্রকার বৃক্ষ থাকে এবং সেই সকল বৃক্ষে বিভিন্ন রকমের ফুল ফুটিয়া থাকে, মানব সমাজের মধ্যেও তদ্রূপ নানা প্রকার শিক্ষা (culture) বিকাশ লাভ করে। এই সকল পুষ্প ও বৃক্ষ লইয়া যেরূপ একটা উদ্যানের সত্ত্বা, বিভিন্ন শিক্ষার সমাবেশে সেরূপ মনুষ্য জাতির শিক্ষা। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ শিক্ষার বিকাশ সাধন করিলে তার ফলে বিশ্বমানবের শিক্ষা পরিপুষ্ট হয়। জাতীয় শিক্ষাকে বর্জন করিয়া, অথবা অবহেলা করিয়া বিশ্বমানবের সেবা সম্ভব হয় না। দেশবন্ধুর স্বদেশপ্রেমের পরিণতি বিশ্বপ্রেমে; কিন্তু তিনি স্বদেশপ্রেমকে বাদ দিয়া বিশ্বপ্রেমিক হইবার প্রয়াস পান নাই। অপর দিকে তাঁহার স্বদেশপ্রেম তাঁহাকে আত্যান্তিক স্বার্থপরতার দিকে লইয়া যাইতে পারে নাই।

দেশবন্ধু তাঁহার স্বদেশপ্রেমের মধ্যে বাঙ্গলাকে ভুলিয়া যাইতেন না।

অথবা বাঙ্গলাকে ভালবাসিতে গিয়া স্বদেশকে ভুলিতেন না। তিনি বাঙ্গলাকে ভালবাসিতেন প্রাণ দিয়া, কিন্তু তাঁহার ভালবাসা বাঙ্গলার চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। বাঙ্গলার বাহিরে তাঁহার যে সকল সহকর্মী ছিলেন তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি যে দেশবন্ধুর সংস্পর্শে আসিবার অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারা তাঁহার হৃদয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র দেশে তিনি তিলক মহারাজের ন্যায় ভক্তি ও ভালবাসা পাইতেন। মহারাষ্ট্রীয়গণও তাঁহার নিকট তদনুরূপ ভালবাসা ও সহানুভূতি পাইতেন।

দেশবন্ধু বলিতেন বাঙ্গলাকে স্বরাজ আন্দোলনের অগ্রণী হইতে হইবে। ১৯২০ খ্রীঃ বাঙ্গলা স্বরাজ আন্দোলনের নেতৃত্ব হারাইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে বাঙ্গলা আবার ১৯২৩ খ্রীঃ নেতৃত্ব ফিরিয়া পায়। দেশবন্ধুর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা আবার নেতৃত্ব হারাইয়াছে, কবে ফিরিয়া পাইবে ভগবানই জানেন।

Visva Bharati
Santiniketan, India
১লা জুলাই, ১৯২৫

Man truly reveals himself through his gift and the best gift that Chitta Ranjan has left for his country men is not any particular political or social programme, but creative force of a great aspiration that has taken a deathless form in the sacrifice which his life represented.

Rabindra Nath Tagore

বাংলায় অনুবাদ :—

আপন দানের দ্বারাই মানুষ আপন আত্মাকে যথার্থভাবে প্রকাশ করে। চিত্তরঞ্জন তাঁহার যে সর্বশ্রেষ্ঠ দান দেশকে উৎসর্গ করিয়াছেন তাহা কখনও বিশেষ রাষ্ট্রিক বা সামাজিক কর্তব্য পালকের আদর্শমাত্র নহে, তাহা সেই সৃষ্টিশক্তিশালী মহাতপস্যা যাহা তাঁহার ত্যাগ সাধনের মধ্যে অমৃতরূপ ধারণ করিয়াছে।

M. K. Gandhi 28. 8. 25

I must not any longer write an appreciation of Deshabandhu. A brother does not sing the praises of his father's son. If he bears true love to him, he does what he knows to be his wishes. So must it be with me and all those who loved Deshabandhu as brother, father or Guru. There is no mistaking his wishes. He has left what was now turned out to be his last testament regarding one of his many activities. He bequeathed his mansions for charitable and educational purposes. The ameliaration of the condition of women was a dear object with him. And so Bengal has decided to perpetuate his memory by freeing the mansion from debts and by using it as a hospital for women and as an institution for training nurses. Careful enquiry shows that both these are a crying need. In order to make an unpretentions beginning at least 10.00000 are required. An appeal for that amount signed by leading men of all parties is now before the public. It is then the fir t duty of every Bengali whether living in Bengal or residing elsewhere to ensure the success of the appeal by himself or herself contributing the maximum amount possible and inducing friends to do likewise. There should be no procrastination in the matter. It is a true saying that he gives twice who gives promptly.

For many of us, I hope, the giving of a subscription must mean not the end of our contribution to the perpetuation of the memory of our deceased Country man but merely the beginning of it. We must follow out his wishes in other things in so far as it is possible for us. He had been placing of late more and more emphasis on village work. He has left tes-

tament regarding this also of this later. But every one must realise in thinking of villages the necessity of the use of khadar. The public should know that after his adoption of Khadar Deshabandhu never gave up the use of Khadar. He used often to say that he preferred it to the fine stuff he wore before. * * *

শ্রীমতী আনি বেশান্ত বলিয়াছিলেন :—

দেশনায়ক চিত্তরঞ্জনের ভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইলেও তাঁহার অমর আত্মা ইহ-জীবনের আরব্ধ অসমাপ্ত ব্রতের উদ্‌যাপন করিবে।

শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল বলিয়াছিলেন :—

রাষ্ট্রনীতি ভ্রাতা ও ভ্রাতার মধ্যে, পিতা ও পুত্রের মধ্যে, বন্ধু ও বন্ধুর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে। গত ৫ বৎসর যাবৎ তাঁহারা সাধারণ কার্যে পরস্পরের বিরোধী হইয়াছিলেন কিন্তু তাহাদের ভালবাসার বন্ধন অটুট ছিল। জীবনের শেষের দিকে দাশ মহাশয়ের ব্যবহারে এক অদ্ভুত মধুরত্ব দেখা গিয়াছিল। দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য সকল প্রকার মতাবলম্বীদের লইয়া একতাবদ্ধ হইয়া কার্য করিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রাণে জাগিয়াছিল। জাতিধর্ম এবং বর্ণ নির্বিশেষে তিনি তাহাদের সহিত একতাবদ্ধ হইয়া একযোগে কার্য করিবার মানস করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মা তাহাদিগকে সেই বাণীই শুনাইতেন। মতের বৈষম্য ঘটিতে পারে, কিন্তু দেশের জন্য ভালবাসা বদলাইতে পারে না।

স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র বলিয়াছিলেন : —

দেশের প্রতি দেশবন্ধুর ভালবাসা ওজন করা ভালবাসা নয়। তিনি সর্বত্যাগী হইয়াছিলেন শুধু তাঁহার দেশপ্রেমের জন্য। মাতা তাহার মৃতপ্রায় পুত্রের জন্য যেরূপ কাতর হয়েন, দেশবন্ধু তাঁহার পরাধীন দেশের জন্য তাহা অপেক্ষা অধিক কাতর হইয়াছিলেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বলিয়াছিলেন :—

তিনি মানুষ ও মানুষের মধ্যে, দল এবং দলের মধ্যে, শত্রু এবং মিত্রের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য দেখিতেন না। কন্যাদায়গ্রস্ত কোন গরীব হিন্দু, ব্যবসায়ে নষ্ট সর্বস্ব ব্যবসাদার, গরীব অক্ষম ছাত্র, কোন দেশহিতকামী কর্মী অথবা কোন নষ্ট সর্বস্ব রাজনীতিক বিরুদ্ধবাদী যে কেহই তাঁহার নিকট যাইত সকলকেই তিনি সমান চক্ষুতে দেখিতেন, তাঁহার নিকট কোন ভেদাভেদ ছিল না। এই প্রকার প্রার্থীদের তিনি অর্থ দান করিতেন। দেশের জন্য তাঁহার আজন্ম সঞ্চিত ভালবাসা তাঁহার আত্মত্যাগের মহান দৃশ্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁহার অদম্য যুদ্ধ—এই সকল কার্যের জন্যই তিনি দেশবাসীর হৃদয়ে দেবতার আসন পাতিয়া বসিয়াছিলেন , প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাদের মধ্যে দেবতা ছিলেন।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী বলিয়াছিলেন :—

দাশ মহাশয় কলিকাতায় ব্যারিস্টারী আরম্ভ করার পর তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। তাঁহাকে প্রথম জীবনে অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং পরে নিজের শক্তির দ্বারা তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেন। তাঁহার আদর্শ পিতৃভক্তি ও অপূর্ব স্বদেশ প্রেমের কথা সকলের নিকট সুবিদিত।

তিনি কাহারও দারিদ্র্য বা অভাব দেখিতে পারিতেন না। দেশের সেবার জন্য তাঁহার হৃদয় সর্বদা উন্মুখ ছিল, তাই তিনি বিপুল আয়ের ব্যারিস্টারী ছাড়িয়া দিয়া দারিদ্র্য বরণ করিতে পারিয়াছিলেন।

নির্মলচন্দ্র চন্দ বলিয়াছিলেন :—

পূর্ব বঙ্গের বন্যাপীড়িত দেশবাসীগণের সাহায্যের জন্য চাঁদা সংগ্রহার্থে তাঁহার সহিত কয়েক জায়গায় ঘুরিয়াছিলাম। কোথাও তিনি চাঁদা পাইয়াছিলেন, কোথাও মাত্র গালাগালি খাইয়া ফিরিয়াছিলেন।

পরে তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারের জন্য তাঁহাকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছি। এ ভিক্ষায় দৈন্য ছিল না, জোর ছিল।

দেশবন্ধু শেষবার ভিক্ষা করিয়াছিলেন পল্লী সংস্কারের জন্য—স্বয়ং মহাদেব ভিক্ষায় নামিয়াছিলেন। কিন্তু কুবেরের ভাণ্ডার যিনি ইচ্ছা করিলে করতলগত করিতে পারিতেন, চঞ্চলা লক্ষ্মীকে যিনি চাহিবামাত্রই ঘরে আনিতে পারিতেন, তিনি যখন আশানুরূপ ভিক্ষা পাইলেন না—তখন ভাবিয়াছিলাম হায় রে বাঙালী! দেবতা ভিখারী মানব দুয়ারে আর তাহাকে চিনিলে না, প্রত্যাখ্যান করলে।

মিসেস্ এস্ রহমান বলিয়াছিলেন :—

আজ বঙ্গ গগনের মধ্যাহ্ন তপন, বীরপ্রসূ ভারতমাতার দানবীর, ত্যাগী-পুত্র দেশবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু চিত্তরঞ্জন জাতির মুক্তির কামনায় ত্যাগের ক্রুশ মঞ্চে আত্মবলি দিয়া মৃত্যুকে জয় করিয়া গিয়াছেন।

মহফুজা খাতুন বলিয়াছিলেন :—

দেশপূজ্য দেশবন্ধু! আশীর্বাদ কর, তোমার ত্যাগ মন্ত্রে দেশবাসী দীক্ষিত হউক; তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাহারা দ্বেষ-হিংসা দলাদলি ভুলিয়া যাউক। তোমার পুনরাবির্ভাবের পথ, একতাবর্ত্ম গড়িয়া তুলুক। তোমার সাধনার সিদ্ধিরূপে স্বরাজ-মহীরুহে মুক্তি ফল ফলিয়া উঠুক।

মিঃ থর্ণ বলিয়াছিলেন :—

একজন ব্যারিস্টার হিসাবে, ইংরাজ জনসাধারণের একটি দলের প্রতিনিধি হিসাবে এবং ইংরাজ শ্রমিকদের পক্ষ হইতে আমি একজন উদার হৃদয় বন্ধু, একজন রাজভক্ত প্রজা এবং সর্বোপরি একজন অদম্য দেশ-প্রেমিকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছি।......দেশবন্ধুর মৃত্যু হইয়াছে, দেশবন্ধু চিরজীব হউন।

আংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে মিঃ এইচ্. ডবলিউ. বি. মরগো বলিয়াছিলেন :—

আমি দেশবন্ধুর শেষ বাণী শুনিয়াছি। আমি আশা করি, স্বরাজ সংগ্রামের যোদ্ধা নিহত হইলেও এই সংগ্রাম অকালে শেষ হইবে না।

বিনোদচন্দ্র মিত্র বলিয়াছিলেন :—

তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে স্থানলাভ করিবেন বলিয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি সুরেন্দ্রনাথের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ্ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন :—

দেশবন্ধুকে প্রথম দেখি ১৯০৮ সালে—আলিপুরের প্রথম বোমার মামলার সময়। আমরা তখন পিঁজরার ভিতর শিকল বাঁধা কয়েদী, আর তিনি আসিয়াছিলেন আমাদের সেই পিঁজরার ভিতর হইতে উদ্ধার করিতে। তখন উকিল, ব্যারিস্টারের জেরা বা বক্তৃতা শুনিবার মত মনের অবস্থা আমাদের ছিল না। কিন্তু যে ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া চিত্তরঞ্জনের প্রতি আমার চিত্ত প্রথমে আকৃষ্ট হয় তাহা আজও আমার বেশ মনে আছে। বীচ্ক্রফ্ট সাহেব আমাদের বিচারক। কি একটা আইনের অর্থ লইয়া চিত্তরঞ্জনের সহিত তাঁহার মতভেদ হইয়াছিল। খানিকটা তর্ক বিতর্কের পর জজ সাহেব বলিয়া উঠিলেন—**You are talking nonsense.**

আমরা ছিলাম নিজেদের খোসগল্পে মশ্গুল। হঠাৎ ঐ কথাটি শুনিয়া আমাদের গল্পগুজব থামিয়া গেল। আমরা চিত্তরঞ্জনের মুখের দিক চাহিয়া দেখিলাম। চোখে-মুখে এমন ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে যাহা একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না। চিত্তরঞ্জন আইনের পুঁথি বন্ধ করিয়া বুক ফুলাইয়া একেবারে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। খুব ধীরে ধীরে প্রত্যেক কথাটি স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া, তীব্র ও গম্ভীর কণ্ঠে সাহেবের দিকে চাহিয়া

বলিলেন—You are on the Bench, Sir, and that language should not come from your mouth. Had we been anywhere else, I would know how to answer.

সাহেবের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। চিত্তরঞ্জন আর সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া পূর্ববৎ আইনের তর্ক জুড়িয়া দিলেন। মানুষটার প্রাণের ভিতর যে কতখানি আগুন চাপা ছিল, এক মুহূর্তের জন্য তাহা চোখের কোণে ও ভাষার ভঙ্গীর ভিতর দেখা দিয়া চলিয়া গেল। আমরা আবার নিজেদের খোসগল্প জুড়িয়া দিলাম।

১৯০৯ সালে আলিপুরের বোমার মামলা শেষ হয়। তাহার পর ১৯২২ সালের আগে আর চিত্তরঞ্জনের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "বাংলার কথা" যখন ১৯২২ সালে কিছু দিনের জন্য দৈনিকে পরিণত হয়, তখন সেই সূত্রে তাঁহার সহিত সামান্য ভাবে পরিচিত হইবার সুবিধা হইয়াছিল, কিন্তু তখনও সম্পর্কটা বেশ ঘনিষ্ঠ হইয়া ওঠে নাই। কিন্তু গয়া কংগ্রেসের পর বন্ধু ও শত্রু উভয় পক্ষের বাধা সত্ত্বেও যখন তিনি বলিয়া উঠিলেন 'এক বৎসরের মধ্যেই আমি সারা দেশকে নিজের মতে আনিয়া ফেলিব' তখন আমার মাথাটা আপনা হইতেই তাঁহার পায়ের কাছে নত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল যে এদেশের পরাধীনতার জ্বালা তাঁহাকে একেবারে পাগল করিয়া তুলিয়াছে, স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষার তিনি মূর্ত প্রকাশ। তাঁহার রাজনৈতিক মতামতের সবটা গ্রহণ করিতে পারিব না—সে কথার বিচার তখন অনাবশ্যক বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, শুধু এই কথাই মনে হইয়াছিল যে অনেক দিন পরে আবার এমন একজন বাঙ্গালীর দেখা পাইয়াছি যাঁহার কাছে দেশের স্বাধীনতাই একমাত্র সত্য—স্ত্রী, পুত্র, ধনসম্পদ, মান, যশ, প্রতিষ্ঠা যাঁহাকে আর লক্ষ্য হইতে বিচলিত করিতে পারিবে না।

পাগলামি জিনিসটার উপর আমার বেশ একটু শ্রদ্ধা আছে। তাই এমন আত্মভোলা নেতার কাছে আপনাকে বিলাইয়া না দিয়া থাকিতে পারি নাই।

১৯২৩ সালের মাঝামাঝি তাঁহার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের দুই একটা জায়গায় ঘুরিবার সুবিধা হইয়াছিল। নাছোড়বান্দা সুভাষচন্দ্রই আমাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তখন যাইবার খুব ইচ্ছা ছিল না কিন্তু এখন মনে হয়

সে সময় দেশবন্ধুর নিভৃত সঙ্গ লাভের অবসর মিলিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার আদর্শ ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ মিটিয়া গিয়াছিল। পূর্বে মনে করিতাম দেশবন্ধু ব্যারিস্টার হিসাবে অদ্বিতীয় হইলেও তাঁহার লোক চরিত্র জ্ঞান তেমন মুখর নয়। তাঁহার পার্শ্বচরদিগের মধ্যেও অনেকেই তাঁহাকে প্রতারিত করে। কিন্তু এ সময় বুঝিতে পারিয়াছিলাম আমার এ ধারণা কতদূর ভ্রান্ত। মানুষের দুর্বলতা সম্বন্ধে তিনি অত্যধিক উদার ছিলেন বলিয়াই কাহাকেও জানিতে দিতেন না যে সব ফাঁকিই তাঁহার চোখে ধরা পড়ে।

এই সময় আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কর্মীদিগের উপর তাঁহার অসীম ভালবাসা। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী এত লোককে তিনি যে এক উদ্দেশ্যে চালিত করিতে পারিয়াছিলেন তাহার কারণই এই। হিংসা ও অহিংসা, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন, শ্রমিক ও ধনিক প্রভৃতি হাজার বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক ও মতভেদ হইত কিন্তু তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিবার সময় সর্বদাই এ কথা মনে থাকিত যে এ সমস্ত মতভেদ অবান্তর। আসল কথা এই যে তিনি দেশের প্রতি অগাধ ভালবাসার জোরে আমাদের সকলকে পিছনে টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন।

বিপ্লববাদীদের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে এ কথাও বলিয়াছে যে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে উহাদিগকে প্রশ্রয় দিতেন। এ সব কথা যে কতদূর হেয়, তাহা আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই জানি। আমি যখন স্বরাজ্য দলের সংস্রবে আসি তখন তিনি আমার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলেন যে অহিংসা সম্বন্ধে স্বরাজ্য দলের আদর্শ ও কার্যপ্রণালী আমি নিজে মানিয়া চলিব, এবং এমন কোন লোককে স্বরাজ্য দলে টানিয়া আনিব না যিনি ঐ আদর্শে আস্থাবান নহেন। আমি এ কথা ভাল করিয়াই জানি যে অহিংসাকে তিনি নিজে creed হিসাবেই মানিয়া লইয়াছিলেন।

এখন আর এ সব কথা আলোচনায় লাভ নাই। এখন শুধু মনে পড়ে সেদিনের কথা যে দিন জেলের ভিতর শুনিলাম দেশবন্ধু আর ইহলোকে নাই। সেই দিন মনে হইয়াছিল বাংলাদেশে আর আমাদের দাঁড়াইবার ঠাঁই রহিল না। স্বরাজ্য দলের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে দিন অনেক দুশ্চিন্তা মনে উঠিয়াছিল। আজ বাহিরে আসিয়া মনে হইতেছে, জেলেই ছিল ভাল।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছিলেন :—

Censored

আমরা আন্দামান হইতে আসিয়া, যখন আলিপুর জেলে ছিলাম তখন দেশবন্ধুও সেখানে ছিলেন। একদিন একজন ভদ্রলোক তাঁহার কাছে আমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গিয়াছিলেন। দেশবন্ধু তখন উক্ত ভদ্রলোকটিকে বলিয়াছিলেন, "এদের কথা আর কি বলিব? যখন এদের সুগঠিত চরিত্রের কথা মনে হয়, তখন আমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়। আবার ইচ্ছা হয় এদের সঙ্গে থাকি।" একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার ইচ্ছা হয় এদের ২।১ জনকে প্রত্যহ আমার এখানে আনাইয়া খাওয়াই।" তিনি হয়ত মনে করিয়াছিলেন এরা ৮।১০ বৎসর যাবৎ জেলে আছে, ভাল খাবার এরা চোখেও দেখে নাই। যাহা হউক প্রথম দিনের নিমন্ত্রণ খাওয়ার সৌভাগ্য আমার এবং অমৃতবাবুর অদৃষ্টে ছিল। যখন খেতে গেলাম তখন দেশবন্ধু বলিয়াছিলেন, "এরা আমার সঙ্গে বসে খাবে।" দেশবন্ধু, আমি এবং অমৃতবাবু আমরা এক পংক্তিতে খাইতে বসিলাম। দেখিলাম মাটিতে সাধারণ আসনের উপর বসিয়া সাধারণ বাঙ্গালীর খাদ্য খাইতেছেন। আমাদিগকে খাওয়াইয়া তাঁর কত আনন্দ। তাঁর মুখে শুধু এদের এটা দাও ওটা দাও, আরও দাও, এই রব। দেশবন্ধুর জন্য বাড়ী হইতে তরকারি মিষ্টি আসিয়াছিল, অবশ্যই তাঁহার অসুখ থাকায় তিনি বিশেষ কিছু খান নাই। খেতে খেতে একটা তরকারির কথা তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, বলত এটা কিসের তরকারি? আমি কিছু বলিতে পারিলাম না। অমৃতবাবু তরকারিটা পরীক্ষা করিয়া তার মধ্যে ডিমের একটা অংশ দেখিয়া বলিলেন, এর মধ্যে ডিম আছে। তারপর তিনি বলিলেন, "এটা আমার মাত্র আবিষ্কার। এই তরকারিটা আমি পছন্দ করি। এর মধ্যে ডিম এবং বেগুন আছে।" খাওয়াটা সেদিন খুব প্রচুর পরিমাণেই হইয়াছিল, আমরা ৮।১০ বৎসর যাবৎ বাড়ীর রান্না খাই নাই বুঝিতে পারেন। বাহির হইতে তাঁহার জন্য যে ফল আসিত তাহা তিনি প্রায়ই আমাদের জন্য পাঠাইয়া দিতেন।

আমি আন্দামানে Burmese massage শিখিয়াছিলাম। আলিপুর জেলে দেশবন্ধুর অসুখ লাগিয়াই ছিল। রাত্রে প্রায়ই তাঁর ঘুম হইত না।

জেলে আমি মাঝে মাঝে massage করিয়া দিতাম। বাহিরে আসিয়া যখন দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছিলাম তখন দেশবন্ধুর অসুখ হইলে প্রায়ই দেবেন বাবু আমাকে বলিতেন, "কর্তার অসুখ, আপনি রাত্রে এসে একটু massage দিয়ে তাঁহাকে ঘুম পাড়িয়ে যাবেন।" আমি প্রায় রাত্রেই massage দিতে যাইতাম, কিন্তু রাত্রি ১১টা ১১৷৷টার পূর্বে ভিড় কমিত না। কোন কোন সময় তিনি বলিতেন, "আজ অনেক রাত্রি হইয়াছে, তুমি এখন যাও।" একদিনকার কথা মনে পড়ে, তখন তাঁর শরীর ছিল অসুস্থ, সেই সময় Council-এর একটা কি গণ্ডগোল চলিতেছিল, আমি তাঁকে ঘুম পাড়াইবার জন্য বসিয়া আছি। রাত ১২টা হইল, ভিড়ও কমিয়া গিয়াছে, তিনি শুইতে যাইবেন, এমন সময় বড়বাজার হইতে কয়েকজন ফোন (Phone) করিয়া জানাইল দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করিবার প্রয়োজন। উত্তরে বলা হইল তাঁর অসুখ, আজ দেখা না হইলে কি চলে না? তারা জানাইল—আজ দেখা হইলেই ভাল হয়। দেশবন্ধু শুনিয়া একটুও বিরক্ত হইলেন না। তাঁর আলস্য বোধ নাই, তিনি বলিলেন, "তাহাদিগকে আসতে বল'। তারপর অনেকক্ষণ কথাবার্তা চলিল।

নেতার যে সব গুণ থাকার প্রয়োজন তা তাঁর ছিল। দেশের মঙ্গলের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা তিনি করিতে দ্বিধা করিতেন না। তাই অবস্থা বিশেষে তিনি Policy change করিতেন। সকল মতের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া চলিবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাঁর খাঁটি দেশপ্রেমের জন্য সকল দলই তাঁর নিকট মাথা নত করিয়াছিল। তাঁহার অভাবে দেশ আজ অন্ধকার!

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের পত্র :—

Censored.

দেশবন্ধুর মহিমাময় জীবনের কথা এবং আরও মহিমাময় মরণের কথা জাতির জীবনে অমৃতের সঞ্চার করিবে। বিস্তৃত জীবনী সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করা যে একটা মস্ত বড় দেশের কাজ, সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। দেশবন্ধুর আশা ছিল এবং সে আশার কথা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেন যে তিনি ভারতের স্বরাজের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করিয়া যাইবেন—এমন ভিত্তি

স্থাপন করিয়া যাইবেন যাহা হইতে পূর্ণ স্বরাজ আপনা হইতেই automatically আসিবে। স্বরাজের ভিত্তি মানুষের অন্তঃকরণে। দেশের জন্ম কেমন করিয়া নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতে হয়, সর্বস্ব পণ করিতে হয়, দেশের জন্ম কেমন করিয়া তিল তিল করিয়া জীবন বিসর্জন দিয়া অমরত্বলাভ করিতে হয়, দেশবন্ধুর জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেশের সম্মুখে ধরিতে পারিলে সকলের অন্তঃকরণের মধ্যে স্বরাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়া দেওয়া যায়। দেশবন্ধু তাঁহার অপূর্ব জীবন ও অপূর্ব মরণের ভিতর দিয়া স্বরাজের এই সূক্ষ্ম বনিয়াদ সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, ইহা হইতেই ভারতের স্বরাজ আপনা হইতেই আসিবে।

দেশবন্ধু ভারতের জন্ম পূর্ণ স্বরাজ চাহিতেন অথচ তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিতেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াও এই পূর্ণ স্বরাজ সম্ভব; শুধু তাহাই নহে মানবজাতির ক্রম বিকাশে ভারতবর্ষকে যে স্থান অধিকার করিতে হইবে তাহার জন্ম ব্রিটেনের সহিত ভারতের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা আছে। দেশবন্ধু বরাবর বলিতেন যে যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির একটা বৈশিষ্ট্য আছে—'স্বধর্ম আছে', তেমনি প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক জাতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে 'স্বধর্ম' আছে। প্রত্যেক জাতিকে তাহার এই বৈশিষ্ট্য বিকাশ করিবার, স্বধর্ম অনুসারে গড়িয়া উঠিবার সম্পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। এবং এইখানেই সার্থকতা। পরধর্ম, তাহা যতই কেন, মনোহর, মহান বা মহিমাময় হউক না, সকল সময়ই তাহা ভয়াবহ; মৃত্যু পর্যন্ত পণ করিয়া স্বধর্ম অনুসরণ করাই প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য, জাতিরও কর্তব্য। যখন জগতের সকল দেশ সকল জাতি, আপন আপন বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিকশিত হইবার সুযোগ লাভ করিবে, যখন জগতের বিভিন্ন বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের ভিতর দিয়া সেই এক ভগবানের বহুরূপ লীলা ফুটিয়া উঠিবে, তখনই হইবে স্বর্গরাজ্য, Kingdom of Heaven সত্যযুগ। জগৎকে এই মহান আদর্শের দিকে লইয়া যাইবার জন্ম ভারতবর্ষকে যে ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে, যত দিন ভারতবর্ষ তাহার জন্ম পূর্ণভাবে সাজিতে না পারিতেছে, ততদিন আর কোন চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হইবে না। পাশ্চাত্ত্য জগতে মানবজাতির মঙ্গলের জন্ম যে সব চেষ্টা চলিতেছে সে সব হইতেছে বাহিরের দিক দিয়া কল-কবজার দ্বারা, শাসনতন্ত্রের বিশিষ্টরূপ

ও প্রণালী দ্বারা, নূতন নূতন Political and social institutions-এর দ্বারা, সেখানে মানুষের বর্তমান সমস্ত দুঃখ, বিপদ, অশান্তি দূর করিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং এইরূপ বহির্মুখী হওয়ার জন্যই সেখানকার বিপুল প্রয়াস সমস্ত নিষ্ঠুরভাবে ব্যর্থ হইতেছে। যতক্ষণ আমরা ভিতরের সত্ত্বাকে প্রকাশিত করিতে, ফুটাইয়া তুলিতে না পারিব, মানব প্রকৃতির রূপান্তর সাধনে যত্নবান না হইব, ততদিন বাহিরের দিকে কোন চেষ্টার দ্বারাই আর মানুষ বর্তমান অবস্থা হইতে উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না এবং এই জন্যই ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার জগতের প্রয়োজন আছে। জগৎকে এই আভ্যন্তরিণ সাধনার নবদীক্ষা দিবার জন্য ভারত নূতনভাবে সাজিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং যাহাদের সাধনায় ভারতবর্ষ এই মহাগৌরবের যোগ্য হইয়া উঠিতেছে তাহাদের মধ্যে চিত্তরঞ্জনের স্থান খুব উচ্চ। বাস্তবিক দেশবন্ধুর জাতীয়তা সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতা Patriotism নহে। দেশবন্ধু ভারতের স্বাধীনতা চাহিয়াছেন জগতের মঙ্গলের জন্য এবং এই জন্যই তিনি ব্রিটিশ সম্পর্কের মূল্য বুঝিয়াছিলেন।

দেশবন্ধু সম্বন্ধে এখানে আর একটি কথা বলিব। দেশবন্ধু যখন কোন গুরুতর বিষয়ে কি করিবেন সহজে স্থির করিতে পারিতেন না, তিনি তখন একা কোন নির্জন স্থানে প্রবেশ করিতেন এবং তাঁহার এক বিশিষ্ট প্রণালীর দ্বারা মনকে সম্পূর্ণভাবে খালি ও শান্ত করিয়া উপরের আদেশের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতেন। সেই অবস্থায় তাঁহার ভিতরে যে সমাধান আপনা হইতেই উঠিত, তাহাকে দৈববাণী বলিয়া গ্রহণ করিয়া অদম্য উৎসাহের সহিত পালন করিতে লাগিয়া যাইতেন। দেশবন্ধু কেমন সহস্র বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আপনার সিদ্ধান্তে অবিচলিত থাকিয়া গ্রহ নক্ষত্রাদি প্রাকৃতিক শক্তির ন্যায় একাগ্রভাবে কার্য করিয়া যাইতেন, তাহা যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা দেশবন্ধুর এই পদ্ধতির মর্ম বুঝিতে পারিবেন। 'অন্তর্যামীতে' আমরা এই ভাবেরই ইঙ্গিত পাই :

যখন দেখিতে নারি, অন্ধকার আসে।
পথ খুঁজে মরে প্রাণ, তারি চারি পাশে!
কোথা হ'তে জ্বলে দীপ সম্মুখে তাহার?
নয়নে দরশ আসে—চলে সে আবার!

Mrs. Sarojini Naidu.

India is bowed with sorrow at the passing of a king, for kingly was Deshabandhu Das in every impulse and gesture of his life, royal alike in the Splendour of his bounty and the Splendour of his renunciation. He died as all great men should, swiftly translated from mortality to immortality in the richest hour of his achievement, in the full glamour of his fame and prestige and power. As the idol of the nation he served with surpassing devotion. Thus is his illustrious memory secure from the impious and importunate challenge of time and change enduring as the mighty Himalayas that stood sentinel at his, death-bed and saluted his heroic soul. The generations which he swayed by his wonderful personality will find perennial inspiration, in the record of his incomparable sacrifice, his invincible Courage, his incorruptible passion for liberty. To the generations of to-morrow be will grow into a radiant figure of historic legend and romance, a vital portion of epic beauty and grandeur of their spiritual heritage. The ashes of his suffering flesh lie scattered on the sacred Ganges, but his matchless spirit broods over us in devine benediction and in his own exquisite phrase his love like a lighted lamp will lead up on the way to Swaraj.

বাসন্তী দেবীকে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু লিখিয়াছিলেন :—

ভগ্নি ধৈর্য ধারণ করুন। এ ক্ষতি অপূরণীয় কিন্তু সবই সর্বময়ের হাত। এত দূর হইতে যাওয়া আমার সাধ্যাতীত হইলেও সত্বর আপনার সহিত মিলিত হইব।

বাসন্তী দেবীকে রঙ্গস্বামী বলিয়াছিলেন :—

এই দুঃখ দুঃসহ, মনের ভাব বাক্যে প্রকাশ করা অসম্ভব। আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানিবেন। প্রার্থনা করি ভগবান আপনাকে শক্তি ও সান্ত্বনা দিউন।

বাসন্তী দেবীকে তেজবাহাদুর সাপ্রু বলিয়াছিলেন :—

আমার সশ্রদ্ধ সহানুভূতি গ্রহণ করুন। দৃঢ় চরিত্র, সাহসী, জলন্ত দেশ-ভক্তির ও অতুলনীয় স্বার্থত্যাগের অবতার এই দেশ নায়কের বিয়োগ বেদনা ভারতকে অভিভূত করিয়াছে।

বাসন্তী দেবীকে এ. এইচ. গজনভী বলিয়াছিলেন : —

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে আমি একজন শ্রদ্ধেয় সহকর্মী হারাইলাম আর দেশ-মাতা তাঁহার একটি মহদন্তঃকরণ, উপযুক্ত সন্তান হারাইলেন। এই দুঃখে বাক্যে সান্ত্বনা দেওয়া বৃথা, ঈশ্বর আপনাকে এই দুঃসহ বেদনা সহ্য করিবার শক্তি দিবেন।

বাসন্তী দেবীকে ফুকন জানাইয়াছিলেন :—

অসহ্য দুঃখের মধ্যে এইটুকু সান্ত্বনা সমস্ত ভারত আজ দেশবন্ধুর বিয়োগে সমদুঃখে দুঃখী, আপনার ব্যথায় ব্যথী। তিনি দেশের মুক্তির জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছিলেন। মঙ্গলময় ভগবান ক্লান্ত সন্তানকে বিশ্রামের কোলে টানিয়া লইয়াছেন।

নেলী সেনগুপ্তা বলিয়াছিলেন :—

......আমরা আজ এইখানে একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের স্মৃতির প্রতি সম্মানের জন্য আসিয়াছি। 'দেশবন্ধু' নামেরই কি মাহাত্ম্য!......বঙ্গের

মহামানব; ভারতের শ্রেষ্ঠ জননায়ক, সমস্ত জগৎ পরিচিত দেশবন্ধু দাশের ন্যায় অপর কাহাকেও আমরা পাইব কিনা সন্দেহ…। প্রত্যেক বিষয়ে, প্রত্যেক দিকে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিবার পূর্বে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী এবং বক্তা ছিলেন। তাঁহার স্বর অত্যন্ত মধুর ছিল, যখন তিনি কথা বলিতেন সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই কথা শ্রবণ করিত। তাঁহার ব্যক্তিত্ব অসাধারণ এবং মন উদার ছিল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেছে তাঁহার ত্যাগ।

Calcutta Literary Society :—

The Calcutta Literary Society convened an open air public meeting at Beadon Park on Wednesday morning the 17th June, 1925 under the presidency of the Venerable Kaviraj Jatindra Nath Sen. Kaviranjan to express its heartfelt grief at the death of Deshbandhu Chittaranjan Das who was a member of the Society till the last days of his life and always took great interest in its affairs. The Office of the Society remained closed for three days in honour of his memory.

Mr. M. R. Jayakar :—

Mr. Das has passed away at the most Critical time when the country needed his services most urgently. In the first shock of our grief it is difficult to accurately assess the immensity of our loss but as days go by and events close upon one another, the country will realise what a colossal figure he was.

Moonjee :—

A great and noble soul has passed away quietly leaving the whole nation to mourn his loss. His stately figure

appeared before my minds eye and I could hardly bring myself to believe that such an embodiment of self-sacrifice could really depart leaving his task unfinished and his devoted followers in darkness to grope for ways and means for the accomplishment of the task. His inspiring spirit will always be on our side to guide us and cheer us up in battling the forces of determined die-hardism opposing us at every step in the realisation of our goal. God is great and His will has prevailed. His soul will be at peace being fortified with the assurance that his faithful soldiers shall not falter or hesitate in Carrying the battle begun by him, to a finish,

My Dear Mrs Das

Pray accept my heartfelt condolence on your terrible bereavement. No words of mine I am afraid, can condole you. Consideration must come from above ; but you will find some comfort and solace in the knowledge that the nation grieves with you in the great loss which you have sustained,

I am your Sincerely
Surendra Nath Banerjee

Shocked to learn untimely and heart-rending demise of great Deshbandhu Das at this juncture when struggling for freedom of India. Pray accept our heartfelt condolence and sincere sympathies. In your bereavement may God console his soul and give patience you all.

Begam Ansari.

The following letter received by sj J. M. Sen Gupta from Sir Hugh Stephenson, Member, Executive Council. Bengal.

Dear Mr. Sen Gupta,

I don't want to intrude on Mrs. Das in her great sorrow but I should be much obliged if you could take a convenient opportunity to convey to her my very sincere sympathy to her over whelming loss. Mr. Das's politics were widely divergent from mine but I look back with pleasure on our personal intercourse. He was a great and stimulating personality ; he may have had the defects of his qualities, as we all have, but there was nothing little or petty about him and Bengal is greatly the poorer by his loss.

H. I. Stephenson.

Mrs. C. R. Das

I have just heard with great regret of death of your husband and send you my sympathy in your bereavement.

Viceroy 17. 6. 25
Simla

Andrews :—

Very deeply shocked at the news of your husband's sudden death. He has made the last sacrifice for his country My deepest sympathies with you.

Vallabhai Patel :—

Pray accept sincere condolence from me. Gujrat shares national grief.

Maharaja Kashim bazar :—

Please accept my sincere heartfelt condolence at your sad bereavement.

Madan Mohan Malaviya :—

Distressed to hear of your sad bereavement. Your loss is country's loss. It's national calamity. Your esteemed husband has passed away at a time when his services were most needed. May God comfort you and yours in your just sorrow.

Lajpat Rai :—

Shocked to hear of Deshbandhu's sudden death. India has lost one of her greatest sons who was quite unique in his self-sacrifice and generosity. The whole country mourns with you his great loss. Please accept my humble but sincerest condolence in this great bereavement.

Message from Hanover :—

A public meeting of the Hanover citizens, express sense of deep sorrow at the sudden death of Deshbandhu Das and humbly pray to Almighty to give his soul eternal peace.

British committee on Indian affairs meeting in House of Commons to-day passed resolution of deepest sympathy and regret to you and your family at loss of your husband.

George Lansbury
Chairman
Graham Pole
Secretary

Message from Eden :—

Indian passengers on board the S. S. "Naldera" learning through wireless the sad news of the passing away of India's illustrious leader Deshbandhu Das assembled expressing deep sorrow at the irretrievable loss of one whose life was inspired by a noble ideal, who worked solely in sublime self sacrifice pursuing his mission unwearied, and without rest, and who sacrificed all in life and held on to his way till the last rejoicing and glorying in martyrdom itself.

California

Mr. Rahamat Ali Khan, secretary United India League wires from California on June 17.

"Hindustanies here deeply affects hearing of the sudden death of Deshbandhu Das. Convey our sympathies to his relatives, friends and co-workers and request them to take his place immediately for India's rescue.

Cairo

The sindhi community at cairo has been shocked. Assembled in a meeting they mourned the irreparable loss suffered by the death of the great leader Deshbandhu Das. Convey condolence to the family.

Landon Tributes :—

About 200 persons, the majority being Indians, attended a meeting at the Essex Hall to-day presided over by Mr. George Lansbury, Labour member for Bow and Bromley.

A resolution was a dopted, recording the meeting's great sense of loss at the death of Mr. C. R. Das and sympathizing with the bereaved family, and pledging itself to Co-operate with the people of India to secure the triumph of the principles of the freedom of speech for which Mr. Das lived and died.

Letters were read from Lord Birkenhead and Lord Reading, regretting that they could not be present. The former wrote. : "It would be an affection which you would despise if I preten ded I was in sympathy with many of Mr. Das's views, but it has long been our habit to lay aside our differences in the presence of death. No one questioned the intense sincerity with which Mr. Das flung himself into the causes in which he believed, still less the grave and sustained sacrifices which he made without counting the cost, on their behalf. At the moment of his premature death we mourn the extinction of a vivid arresting and versatile personality.

Lord Reading wrote :—

The death of Mr. Das will be deeply regretted in India, especially Bengal, not only by those whoa greed with his views but also, by those who were opposed to him. In the presence of death differences of opinion, however acute, are forgotten. It will be universally acknowledged that Mr. Das was sincerely and devotedly attached to India and strove patriotically according to his conceptions, to further the interests of Indians to the utmost of his towers.

Lord Reading sympathaized with the family in the loss.

of one who was dear to them and one who made personal sacrifices for his ideals.

Mr. Garvin's Tribute

London, June 21.

Writing about the death of Mr. C. R. Das. in the "Observery" Mr Garvin says, "we must regard this mourning with sympathy and respect, apart from any reasoned difference of ideas about the future of the Indian Government."

Referring to the impressiveness of the Das funeral he hopes that the spirit of the Late Mr. Das, in his later moderate phase, may prevail, and trusts that a very strong commission, including full representation of all main elements in the Indian life, will be appointed before long to examine fresh the unparalleled problem of how to reconcile costittutional progress with social peace,—"English man" Cable.

Deepest sorrow at your and National loss—Birmingham Indian Association, Birmingham.

Johannesburg, June 19.

Mundal mourns your great loss. May God. grant you strength to bear of all.

Transvaal Dharjee Mundal.

London, June 19.

The Communist Party of Great Britain joins India in mourning over her great leader Mr. C. R. Das. who inspired her to a new fight and trusts the younger generation will

further push forward the anti-Imperialistic struggle for freedom of workers and peasants. The Communist Party pledges fullest possible support and Co-operation in the struggle·

Saklatvala M. P.

Mc. Manus.

Baghdad, June 19.

Kindly convey Mrs. Das, Iraq Indian Community's sincere sympathies.

Indian Association.

Alexandra, June 18.

•We deeply deplore the death of our beloved grand leader. Please accept our sincere condolence. May God rest his soul.

Sindhi Merchants.

Pretoria, June 18.

Sincerest condolences from all our people in your breave-ment. We mourn loss India's great Swarajist leader.

Transvaal Memin Association.

London, June 20.

Indian students assembled at 21, Cromwell Road, London, express their heartfelt sorrow and send sympathy to the family at the great national loss consequent on Sj Das's death.

Imtiaz Mohamad Khan.

কবিকুলের শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিশ্বকবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :—

"এনেছিলে সাথে ক'রে
মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি,
ক'রে গেলে দান।"

বাসন্তী দেবীকে 'শোকে আশীর্বাদ' নামক কবিতায় শ্রীমতী কামিনী রায় :—

* * * *

সে নহে তোমারি শুধু। তারে ভালবাসি
লয়েছে আপন করি তব দেশবাসী,
তোমারেও করিয়াছে তাই আপনার,
বাঁটিয়া লইছে তব বেদনার ভার।

অপরেশ মুখোপাধ্যায় :—

কোন্ অসীমের কোন্ স্বরগে
পেতে আসনখানি !—
ওহে বাঙ্গালার মণি
ছুটছ তুমি আপন মনে—
কি ভাবে কি জানি ॥

* * * *

কবিশেখর কালিদাস রায় 'অশ্রুতর্পণ' করিয়াছিলেন :—

* * * *

কাঁদ বঙ্গবাসী আজ, দগ্ধ-চিতা কাষ্ঠ বুকে ধরি,
কাঁদ মাতা, তারি ভস্ম মাখি অঙ্গে মুষ্টি মুষ্টি করি,
শব তার বক্ষে চাপি' কেঁদে গলে' যাও শৈলরাজ,

ভীষ্মেরে হারায়ে পুন মা জাহ্নবী কাঁদো কাঁদো আজ।
বিদ্যুৎ কঙ্কণ হানি, ঘন ঘন পাষাণ ললাটে,
বর্ষার ভারত কাঁদ, হারাইয়া প্রাণের সম্রাটে।
নিসর্গ সুন্দরী কাঁদ চিতা ধূমে আলুলিত কেশে,
আষাঢ় গগন কাঁদ', হতভাগ্য দেশ যাক্ ভেসে।

দেশবন্ধুর 'স্বর্গারোহণ' কবিতায় কাজী কাদের নওয়াজ বলিয়াছিলেন :—

আস্মানে আজ বাংলাদেশের নিভ্‌ল উজল একটি তারা,
রইল হা হুতাশের বাতাস, রইল কেবল অশ্রুধারা।
কাঁদল শ্মশান-সৈকতে হায় বঙ্গবাসী বন্ধু হারা
নাম্‌ল ধরায় 'পুষ্পকরথ' চৌদিকে তার অপ্সরীরা।

* * * *

'অবসান' কবিতায় শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বলিয়াছেন :—

নারায়ণে ভক্তিমান্ জ্ঞানী কর্ম্মবীর
হে মহাপুরুষবর, ইন্দ্রালয়ে আজি
চলিলে করিয়া সাঙ্গ কর্ম পৃথিবীর—
দুন্দুভি জানা. বার্তা সুরপুরে বাজি'।
একদা প্রভূত শক্তি করি' কেন্দ্রীভূত
সৃজিলা তোমারে ধাতা —অভিনব দান—
মরণে সে শক্তি হ'য়ে বিশর্পিত দ্রুত
প্রতি বঙ্গবাসি হৃদে লভিলেক স্থান।
একতার সে বিচ্ছিন্ন শক্তিরাশি যবে
একীভূত হবে—হবে মঙ্গল মহান্।
উদিবে স্বরাজ-সূর্য, কিরণ বৈভবে
অযুত বিদ্যুৎ-দীপ্তি করি' পরি ম্লান।
কোটি কণ্ঠে নর-নারী গাহিবেক তবে
তব জয়—মহাত্মার অতুল গৌরবে।

'চিত্তরঞ্জন' কবিতায় শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন :—

জীবনের কবি, জাতির শিল্পী, নবভারতের স্রষ্টা,
বাংলার রাজা, প্রাচ্যের গুরু মুক্তি মন্ত্র দ্রষ্টা !
নব আদর্শ স্বপন-পসারী, নব সত্যের বুদ্ধ ;
আপন পাঁজরে বজ্র বানায়ে ইন্দ্র করেছে যুদ্ধ,—
সে ঋষি দধিচী সেই দেবরাজ অগ্নি-অশ্রু-নেত্রে,
সেই ছিল একা কৃষ্ণার্জুন নবীন কুরুক্ষেত্রে ।—

'শোকাশ্রু' কবিতায় শ্রী শ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ বি. এল. বলিয়াছেন :—

নাহি সাগরের সঙ্গীত আর,
মালঞ্চ আজ সুরভিহীন ;
'কিশোর কিশোরী' লুটায় ভূমিতে,
কোথা সে কবির আনন্দবীণ ।
নর-নারায়ণে নিয়েছে গোপনে
দেব-নারায়ণ বুকেতে ধরে,
বরষার মেঘে ভুবন ভরিয়া
সে আজি অমরা উজল করে ।
কোথায় দেশের দরদী বন্ধু,
কোথা মমতার প্রস্রবণ ,
সোনার কাঠির জীয়ন-পরশে
কে আর জাগায়ে তুলিবে মন ।

সংবাদ-পত্র জগতের শোকপ্রকাশ

আনন্দবাজার বলেন :—

বহু শতাব্দীর শৃঙ্খলভারে জর্জরিত আমরা গণশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি। তথাপি রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত কর্ম-সন্ন্যাসী তুমি—জীবন-দীপে সহস্র নর কঙ্কালের

জীবন-প্রদীপ জ্বালাইয়া দিলে—আর সেই নব গঠিত মুষ্টিমেয় সৈন্যদল লইয়া স্বাধীনতার রণক্ষেত্রে ছুটিয়া গেলে। সমগ্রজাতি সুদীর্ঘকালের মোহ ঘুম ঘোর আচ্ছন্ন চক্ষু কোন মতে মেলিয়া তোমার সে জীবন-মরণ তুচ্ছকারী যুদ্ধ দেখিল—কিন্তু অসাধ্য সাধনের প্রাণপণ প্রয়াসে সেই তিলে তিলে আত্ম বিসর্জনের নিগূঢ় ভাব সম্পদ, কর্ম গৌরবের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল কি? লক্ষ লক্ষ মুদ্রা তুমি ধুলিমুষ্টির মত দু'হাতে বিলাইয়া দিয়াছ—অর্থ তোমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে তিলমাত্র প্রশমিত করিতে পারে নাই। তুমি তদপেক্ষাও বড় জিনিস জাতির নিকট চাহিয়াছিলে। অর্থ নহে-জীবন; দেশের কার্যে জীবন দান—ইহাই তুমি চাহিয়াছিলে। তাই কেমন করিয়া জীবনদান করিতে হয়, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যুগযুগান্তর ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্য রাখিয়া গেলে।

দৈনিক বসুমতী বলেন :—

জাতির বহু ভাগ্যফলে এমন জননায়ক মিলিয়া থাকে। চিত্তরঞ্জনের সহিত রাজনৈতিক অভিমত লইয়া দেশের কাহারও যে মত বিরোধ ছিল না, এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু তুচ্ছ সে বিরোধ—জাতির ঘোর দুর্দিনে চিত্তরঞ্জন বিরাট ত্যাগের যে জলন্ত বর্তিকালোক লইয়া জাতিকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত পাইব কোথায়? দেশনায়ক মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁহার মতবিরোধ ঘটিয়াছিল কিন্তু ভবিষ্যদ্দর্শী নেতা চিত্তরঞ্জনের মধ্যে যে শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি তাঁহাকে কংগ্রেসের রাজনীতিক্ষেত্রে পথি প্রদর্শকরূপে বরণ করিয়াছিলেন। এ শক্তি সামান্ত শক্তি নহে।

বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভরসা, বাঙালীর বুদ্ধিবল, বাঙালীর শক্তি, বাঙালীর বিরাট পুরুষ আজ কোথায় কোন্ অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া গেলেন। যে পুরুষসিংহ কম্বুনাদে বলিয়াছিলেন, "আমার নিজের ঘরেই যদি আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া চলিতে না পারি নিজের দেশেই যদি পশুর মত থাকিতে হয়, তবে আমার মান, আমার ধর্ম থাকিল কোথায়?"

বাঙালী! আজ তাঁহার অভাব কে পূর্ণ করিবে? সেই শক্তিধরের

নেতৃত্বে বঞ্চিত হইয়া আজ তুমি কাহাকে তাঁহার আসনে বরণ করিবে? সমগ্র দেশ ও জাতিকে কাঁদাইয়া কোথায় কোন্ দেশে সে শক্তিধর মহা-প্রস্থান করিলেন।

সাপ্তাহিক বসুমতী বলেন :—

আজ জননীর মন্দিরে, বেদীমূলে, পুরোহিতের মৃত্যু-স্তম্ভিত হস্ত হইতে আরতির পঞ্চ প্রদীপ ভূমিতে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ যুদ্ধক্ষেত্রে জয়োল্লাসে অগ্রসর সেনাদলের নায়কের হস্ত হইতে তাঁহার মুখ মারুত প্রপূরিত তূর্য পড়িয়া গিয়াছে। ভারতের মুখ আজ অন্ধকার।

স্বরাজ :—

চিত্তরঞ্জন যে পথে দেশের হিত হইবে মনে করিতেন, সেই পথে চলিতে কোন কারণেই পিছাইতেন না। নিজ বিশ্বাসানুযায়ী কর্মপন্থায় প্রশংসনীয় সাহসিকতা সহকারে অগ্রসর হইতেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া, সকল শক্তি সামর্থ্য লইয়া যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু যখনই তিনি বুঝিলেন ঐ অসহযোগের পথে কিছু হইবে না তখন প্রতিপত্তি লাঘবের ভয়ে বা আর কোন কারণেই মহাত্মার অসহযোগ বা বর্জননীতি আঁকড়াইয়া থাকিলেন না। মহাত্মার মতানুযায়ী না হইলেও কাউন্সিলে প্রবেশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। সেই উদ্দেশ্যে স্বরাজ্য দল গঠন করিলেন। তারপর কাউন্সিল প্রবেশ, কাউন্সিল ধ্বংস চেষ্টা চলিল। সেই প্রচেষ্টার পরিণতি যাহা হইবার হইল। যে ভাবেই হউক—বাংলার দ্বৈতশাসন সমস্যা দূর হয় নাই, বরং সমস্যা আরও জটিল হইয়াছে। ইংরেজ সাধারণের মধ্যে অবিশ্বাস, আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াই সমাধানের উপায় নির্দেশে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাহারই ফলে পাটনার পত্র, ফরিদপুরের অভিভাষণ। এইখানে নিজ বিশ্বাসানুযায়ী পথ চলিবার সেই সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফরিদপুরে আপোষের কথা, সম্মানকর সহযোগিতার কথা বলিতে যে কতখানি মনের জোরের প্রয়োজন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

তাঁহার ফরিদপুরের উক্তির ফলে যে তাঁহার অনেক তরুণ অনুগামী নারাজ হইবেন, তাহা তিনিও জানিতেন। কিন্তু যে আন্তরিকতার জোরে নিজের বিশ্বাসানুযায়ী পথে চলিতে গিয়া তিনি মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলনকে ছাড়িয়া নূতন দল গঠনের সাহসিকতা দেখাইয়াছিলেন, ফরিদপুরের অভিভাষণেও নিজ বিশ্বাসানুযায়ী পথে চলিবার সেই সাহসিকতাই তিনি দেখাইলেন।

হিন্দুস্থান বলেন :—

* * * *

দাশের শক্তি কোথায়, আজও তাহা বুঝিতে পার নাই কি? স্বরাজ্য দলের নেতা তিনি, তাই তিনি শক্তিধর, ইহা নহে। তাঁহার টাকা পয়সা এক সময়ে ছিল, তাই তিনি শক্তিশালী, ইহা সত্য নহে; আজ যে শক্তির খেলা দেখিলে, টাকা-পয়সা এ খেলা খেলাইতে পারে না। দাশের শক্তি ছিল তাঁহার অন্তরভরা ভালবাসায়। দাশ দেশকে—দেশের লোককে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয় তাহা জানিতেন। তিনি দেশকে ভালবাসিয়াছিলেন, দেশবাসীকে আপনা‍র করিতে পারিয়াছিলেন তাই তাঁহার এই শক্তি, তাই তিনি শক্তিধর হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার সঙ্কল্পের কাছে শক্তিশালী আমলাতন্ত্রকেও নাজেহাল হই‍তে হইয়াছিল।

নায়ক বলিয়াছেন :—

দলে দলে সহস্র সহস্র লোক নগ্ন পদে শোকপূর্ণ উদ্বিগ্ন মনে দেশবন্ধুর বাসভবনে সমবেত হইয়া সেই ম‍হাপুরুষের মুক্ত আত্মার উদ্দেশ্যে যে শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করিয়াছে তাহা ইতিহাসে প্রথম। দেশবন্ধু পার্থিব নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া ভারতের স্বাধীনতার এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আজ হইতে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে প্রতিপদবিক্ষেপে জাতি দেশবন্ধুর প্রদর্শিত পথে চলিয়া তাঁহার প্রতি ভক্ত্যবনত চিত্তে শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করিবে।

* * * *

বঙ্গবাসী বলেন :—

* * * *

চিত্তরঞ্জনের সহিত আমাদের অনেক বিষয় মতানৈক্য ছিল, তাঁহার সকল কার্যের সমর্থন করিতে পারি নাই, কিন্তু চিত্তরঞ্জনের শক্তি, মনীষা, ঐকান্তিকতা, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি আমারা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহি।

* * * *

সঞ্জীবনী বলেন :—

বঙ্গ দেশের রাজনৈতিক আকাশ বিরোধ-বিবাদে সমাচ্ছন্ন; কলহ-কলরবে নিত্য মুখরিত, বিদ্বেষ-বহ্নির ধূলিজালে বিমলিন। কিন্তু আজ সকল ছাপাইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে চিত্তরঞ্জনের অপূর্ব স্বার্থত্যাগের মহিমা; অপূর্ব দেশাত্মবোধের প্রেরণা; অপূর্ব কর্মশক্তির দ্যোতনা। ইহা চিত্তরঞ্জনের অনন্ত জীবন। * * *

চিত্তরঞ্জন মহাত্মা গান্ধীর অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন। চিত্ত-রঞ্জনের অভাবে আজ মহাত্মা গান্ধী শক্তিহীন হইলেন।

* * * *

মোহাম্মদী বলেন :—

* * . * *

কি ছাত্রজীবনের তেজস্বীতা, কি কর্ম জীবনের সততা, কি রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের গরিমা সর্বত্রই তাঁহার সেই একই মহান্ আদর্শবাদিতা ফল্গু নদীর ন্যায় প্রবাহিত ছিল। আমরা "নারায়ণে" যে আদর্শবাদী চিত্তরঞ্জনের দেখা পাইয়াছিলাম ময়মনসিংহের বক্তৃতায়, ঢাকা সাহিত্য সম্মিলনীর অভিভাষণে, "বাঙলার কথায়" আহমাবাদ ও গয়াতে, এমন কি তাঁহার শেষ কথা ফরিদপুর

অভিভাষণে, কোথাও আমরা সেই বাঙলার বৈশিষ্ট্যবাদী চিত্তরঞ্জনকে হারাই নাই।

* * * *

হিতবাদী বলিয়াছিলেন :—

চিত্তরঞ্জন বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি দীন সমাজে দানবীর, জ্ঞানী সমাজে জ্ঞানবীর এবং কর্মীসমাজে কর্মবীর ছিলেন। তাঁহার বীরত্ব তাঁহাকে অমর করিয়াছে। তাঁহার নশ্বর দেহের অবসানে শাশ্বত দেহের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ভৌতিক শরীর ধ্বংস হইয়াছে বটে কিন্তু যশঃ শরীর কখনও ধ্বংস হইবে না।

চিত্তরঞ্জনের দানের কথা লিখিতে আমাদের শরীর শিহরিয়া ওঠে। তিনি সংসারী হইয়াও দানের সময় সন্ন্যাসী হইতেন; পুত্রকন্যা ও সহধর্মিণীর কথা ভুলিয়া যাইতেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলিমেল (বোম্বাই) বলিয়াছিলেন :—

বাঙ্গলায় শাসন-সংস্কার ব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ায় মিঃ দাশের আর কোন রাজনীতিক কার্যপদ্ধতি ছিল না। কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে একমাত্র তিনি মিঃ গান্ধীকে সর্বতোভাবে তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে দেন নাই। মিঃ দাশের দেশভক্তিতে কেহ সন্দেহ করে না, কিন্তু দেশভক্তির সহিত রাজনীতিজ্ঞান না থাকিলে সুফল লাভ করা যায় না।

ট্রিবিউন (লাহোর) বলিয়াছিলেন :—

মিঃ দাশের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে বাঙ্গলার একজন শক্তিশালী পুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। মিঃ দাশ বর্তমান সময়ে দেশের মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছিলেন। ভারতের রাজনীতিক সম্প্রদায়ের তিনি বিশ্বাসভাজন নেতা ছিলেন। ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা প্রধানতঃ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া

ছিল। তিনি তাঁহার যোগ্য ও তাঁহারই মত বিখ্যাত সহযোগীদের সাহায্যে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে মহাত্মার সহিত একযোগে নিরাপদে স্বরাজ স্বর্গে পৌছাইয়া দিবেন বলিয়া সকলেই আশা করিত।

মোসলেম আউট-লুক (লাহোর) বলিয়াছিলেন :—

মিঃ দাশের মৃত্যুতে আমাদের সময়ের একজন নেতার অভাব ঘটিল। তিনি অকৃত্রিম দেশভক্ত, হিন্দু-মুসলমান একতার অকপট সমর্থক ছিলেন। ভারতের রাজনীতিতে তাঁহার যেরূপ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ছিল, সেরূপ আর কোন হিন্দু নেতার নাই। তিনি যেভাবে মহাত্মা গান্ধীর কাউন্সিল বয়কট নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং ধীরে ধীরে দেশের পরিবর্তনশীল অবস্থা অনুসারে স্বরাজ্যদলের কার্য পদ্ধতি স্থির করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যে রাজনীতি ক্ষেত্রে একজন বিশেষ কাজের লোক এবং একজন প্রতিভাশালী নেতা তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল। তিনি সিরাজগঞ্জের ভুল স্বীকার করিয়া প্রকাশ্যভাবে অত্যাচার নীতির নিন্দা করিয়া তিনি যেঁ সততা দেখাইয়াছেন তাহা আমাদের মধ্যে দুর্লভ। বর্তমানে যে সাম্প্রদায়িক বিবাদে দেশে দলাদলি ঘটিতেছে, তাহার মীমাংসায় তাঁহার মত সিদ্ধহস্ত কেহ ছিলেন না। বাঙ্গলার প্যাক্ট তাঁহার দূরদৃষ্টি, বিচক্ষণতা ও মহত্ত্বের স্মৃতিস্তম্ভ স্বরূপ বিরাজ করিবে।

সিভিল মিলিটারী গেজেট (লাহোর) বলিয়াছিলেন :—

মিঃ দাশ রাজনীতি ক্ষেত্রের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। কাউন্সিলে তিনি গভর্ণমেণ্টকে পরাজিত করিবার জন্যই সকল শক্তি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার নিজের প্রদেশে সংস্কার ব্যবস্থা পণ্ড করিতে পারিয়াছিলেন। যদি ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি তাহা বেশ ভাল রকম করিয়াই সিদ্ধ করিয়াছেন।

জমীন্দার (লাহোর) বলিয়াছিলেন :—

হিন্দু মুসলমান একতার প্রধান সমর্থকরূপে মিঃ দাশ মহাত্মা গান্ধীর নীচেই ছিলেন।, ভারতের একতা আনয়নের জন্য যে কয়েকজন দেশভক্ত

পর্বতপ্রমাণ বাধার বিরুদ্ধে কার্য করিতেছেন, মিঃ দাশের বিশিষ্ট প্রভাবে তাহারা শক্তিশালী ছিলেন। হিন্দুদের মতই মুসলমানরা তাঁহার মৃত্যুতে শোক করিতেছে।

ইণ্ডিয়ান ডেলী টেলিগ্রাফ [লক্ষ্ণৌ] বলিয়াছিলেন :—

মিঃ সি. আর. দাশের মৃত্যু সংবাদে দেশবাসী বিশেষ বিচলিত হইয়াছে। মিঃ গান্ধী ছাড়া আর কোন ভারতবাসী তাঁহার মত সাধারণের মনে এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নাই। দেশের জন্য তিনি যে স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, তাহা জগতে সকল জাতির ইতিহাসেই অশ্রুতপূর্ব। তাঁহার বিয়োগে আজ দেশে কেবল একজন মানুষের অভাব ঘটিল না—রাজনীতিক শক্তি নষ্ট হইল। তিনি দ্বৈত শাসনের বিরুদ্ধে চারিদিক হইতে যে যুদ্ধ চালাইতেছিলেন তাহার প্রথম সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মারা যাইলেন।

লীডার [এলাহাবাদ] বলিয়াছিলেন :—

মিঃ দাশের মৃত্যু সংবাদে দেশের সর্বত্র গভীর শোকের ছায়া পড়িবে, দেশবাসী বিশেষ বিচলিত হইবে। মিঃ দাশ প্রতিভাশালী অক্লান্ত কর্মী, সাহসী, ধৈর্যশীল ও দাতা ছিলেন। দেশের মুক্তির জন্য তিনি বিশেষ ব্যাকুল ছিলেন। সে জন্য সকল কার্য করিতে, যে কোন প্রকার মূল্যে সে মুক্তি ক্রয় করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন, যে সময় তাহার রাজনীতিক মত সুন্দর-ভাবে পরিবর্তিত হইতেছিল, ঠিক সেই সময় তাঁহার মৃত্যু দেশবাসীর দুর্ভাগ্য।

রেঙ্গুন গেজেট বলিয়াছিলেন :—

মিঃ দাশের মৃত্যুতে ভারতের স্বরাজী সৈন্যরা একজন নেতা হারাইলেন। মিঃ দাশ তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যুদ্ধে আপনাকে সর্বতোভাবেই নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি যদি অন্য কাজে তাহার এই আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়োগ করিতেন তাহা হইলে আরও অধিক প্রশংসা পাইতেন। বাঙ্গলার একজন

বড় ব্যবহারজীব হইয়াও তিনি দ্বিধাশূন্য চিত্তে মিঃ গান্ধীর অনুসরণ করেন। মিঃ গান্ধী নিজের নামের জোরে জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করেন, মিঃ দাশ তাহার বিশিষ্ট নীতির রাজনীতিক মতের উপর নির্ভর করিতেন।

রেঙ্গুন ডেলী নিউজ বলিয়াছিলেন :—

বাঙ্গালার বিশেষ ক্ষতি হইল। ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী রাজনীতিক সম্প্রদায় নেতাশূন্য হইল। মিঃ দাশের বিয়োগে আজ সমগ্র ভারত শোকাচ্ছন্ন। বাঙ্গালা শোক করিতেছে, বর্মাও শোক করিতেছে। মিঃ দাশের মত লোক জগতের এক স্থানে সীমাবদ্ধ নহেন। তাঁহার নিকট ভারতমাতা সকল জাতির সম্মিলনে একীভূত জগন্মাতার প্রতীকরূপে বিবেচিত হইতেন।

ইভনিং নিউজ [বোম্বাই] বলিয়াছিলেন :—

মিঃ দাশ বর্তমান সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এক মহাপ্রভাবশালী ব্যক্তির অভাব ঘটিল। দেশবন্ধু সুবক্তা ছিলেন, বক্তৃতা শক্তি তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তিনি তাহার আদর্শের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে—সর্বান্তকরণ দিয়া পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত ছিলেন। রাজনীতিক কৌশলে তিনি তাঁহার সহকর্মীদের শীর্ষস্থানে অবস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার সম্মুখে উচ্চ আদর্শ রাখিয়াছিলেন এবং যেরূপ সাহসের সহিত তাহার অনুসরণ করিতেন তাহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না।

The Servant: —

Deshbandhu Das is dead. Bengal, if you have tears, prepare to shed them now. It is a blow too stunning for words. A genious in sacrifice and patriotism has died of

efforts to make his country a power. The passion for freedom has consumed his physical frame. It is a death which is the envy of mortals. The burden of all his song was that his whole being burned within him because of the condition of his country. The manner and process of his death has brought the fact home to us. Even the hill-air proved unavailing for this hectic fever which had its root elsewhere than in a mere bodily distemper. He was wrestling with the Destroyer since he began an unusual mortification of the flesh. The Prince chose to be a pauper for his people. Death has been vanquished in him and by him through the release of a spirit which will sit incubating over the germs he has sown in life to their certain fructification. He set himself with a death-defying determination to destroy what he felt to be a sham and an untruth. That has been accomplished and he forthwith yields to the chilling embrace, which everybody perceived had long been on him. Truth stranger than romance! Few could have died in a brighter blaze of glory. So shall we know the heroes in their death.

The Statesman :—

With dramatic and awful suddenness death has called the tribune of Bengal. To friend and foe alike the news of Mr. Das's premature passing will come as a stunning blow. We all knew that he was in feeble health; that his days, humanly speaking, were numbered; and the knowledge softened the asperities of debate where he was concerned, and invested his later speeches and writings with a certain pathos. But he was not to fade gradually from the scene. His

sun has gone down while it was yet day. He has not outlived his power and influence. He was not fated like Napoleon a character with whom he had much in common—to eat out his heart in exile, or to bury himself during the closing years of his life in bitter memories of a stirring past. He warmed both hands as saith the poet, before the fire of life; it sank and he was ready to depart.

Writing within an hour or two of his death it is not possible fully to appraise his policy. To its destructive aspects we have always been firmly opposed; and yet to those who looked below the surface it was evident that Chitta Ranjan Das had the makings of a statesman, and that he often saw further than he seemed to do. Looking back one feels that he was caught in a political current which proved too strong for him, and that on more than one critical occasion it swept him far from the reaches which he knew to be safe and profitable. In this of course he resembled most men great or small. who have ever dabbled in politics.

On C. R. Das. as a personality all voices are unanimous. He had a remarkable influence upon all those with whom he came into contact, wheather friend or foe. Those who expected to find him half ogre and half demagogue fell irresistibly under the sway of a cultured mind, a courteous manner and a keen and subtle intellect. Upon his followers this influence—compact of eloquence, inspiration and the prestige of his self denying ordinance was unbounded. Hero worship has never gone further in Bengal than the homage paid to Deshabandhu – the name explains the homage. Whatever controversies may have raged round his actions and career, these fact stand out—that he was a leader in a thous-

and, and a power in the land. If as the greatest of our pacts says, "the evil that men do lives after them, the good is oft inter red with their bones", we can truthfully echo the sentiment of wordsworth :—

"Men are we and must grieve when
ever the shade,
of that which once was great has
passed away."

The Englishman :—

It is with deep regret that we have to record the death of Mr. C. R. Das which accurred with startling and tragic sudden ness from heart failure at Darjeeling yesterday M. Das, whose immense exertions on behalf of the political party which he led had made great demands on his physique, had been in indifferent health for some time, but since he had been resting in the summer capital of his beloved Province it was believed that he was regaining strength and that he would shortly be able once more to resume his incessant activities in current politics. But it was not to be, Mr. Das has passed to the other side, and we feel that we are only voicing the thoughts of all Englishmen, however rennously they may have been opposed to him in the bitter and eager controversies into which he plunged his singularly vivid and powerful personality, when we offer to his relatives and to the political Party of which he was the distinguished leader, our most sincere condolence on the heavy loss which they—and indeed all India—have sustained.

A man who in his time had savoured all the things which

make life enjoyable and who had a constant appetite for the amenities of existencc, he abandoned everything for the cause in which he believed.

Like Robert Louis Stevenson's Alan Break Mr. Das was always a bonny fighter and as vetern opponents of the Party he led and of the causes for which he stood, we have ourselves had many a rough and tumble with him. Mr. Das himself would be the last man to demand that we should now apologise for our frankness. He was too big a man to want that.

Daily Express :—

It is with profound grief that we have to announce the death of Mr. C. R. Das, the great Nationalist leader of Bengal and one of the most distinguished sons of the Motherland. His health had for the past few months been giving intermittent cause for anxiety, but no one dreamed that the end was so near. It is impossible to imagine that Volcanic energy is quenched, that giant intellect is at rest, that great heart lies still in the repose of death. But Fate is inexorable. India mourns to-day one of her noblest and best-beloved sons.

Mr. Das was the fine flower of that spiritual synthesis which is India's most distinctive Contribution to the uplift of the human race.

The two distinctive notes of Mr. Das's character—both of which he derived from the twin roots of life, race and religion—were "tyaga" and "bhakti".

রেঙ্গুন টাইম্‌স্ :—

মিঃ দাশ মিঃ গান্ধীর মত আদর্শবাদী ছিলেন। অধীরতার জন্য মিঃ দাশের দেশ ভক্তিতে সময় সময় বাধা পড়িত, এমন কি, তাঁহার বিচার-শক্তিও

প্রভাবিত হইত। রাজনীতিতে প্রবেশ করিবার পূর্বেই তিনি তাঁহার অসামান্য বুদ্ধিশক্তি ও অক্লান্ত অধ্যাবসায়ের গুণে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পরার্থে কার্য করিতেন। তিনি যদি আর কিছুদিন দেশের কার্য করিতে পাইতেন, তাহা হইলে দেশের মুক্তি সংগ্রামে বিশেষ সাহায্য করিতে পারিতেন। মিঃ দাশ যে একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন, এ কথা শত্রুপক্ষও অস্বীকার করিতে পারেন না।

টাইম্‌স্ অফ ইণ্ডিয়া :—
(বোম্বাই)

মিঃ দাশের মৃত্যুতে ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্র হইতে এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অপসৃত হইলেন। বামনদের মধ্যে তিনি দৈত্য স্বরূপ ছিলেন। ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট হয়ত তত বড় বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, কেন না, যাঁহারা বড় বড় কার্য করিয়া যায়েন, তাঁহারাই পরে মহৎ ও উন্নত বলিয়া বিবেচিত হয়েন, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা সেরূপ বিবেচিত হন না। বড় ব্যবহারজীব হইতে নিরপেক্ষ ও সন্দিগ্ধ রাজনীতিকে পরিণত হইয়া তিনি হয়ত ভুল করিয়াছিলেন, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তিনি সেরূপ হইয়াছিলেন, তাহা সামান্য নহে। আর সে কথা স্বীকার করিলেই বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার দেশ সেবার শক্তিতে যে বিশ্বাস ছিল, তাহারও কিছু প্রভাব তাঁহার কর্মক্ষেত্রের উপর পড়িয়াছিল।

The Hindusthan Times : –

At a time when all eyes have been turned on this hero of the Indian political tago and the future in Bengal teems with possibilities demanding the superb valiance of the Deshbandhu and all his powers of statesmanship the cruel hand of death has rung down the curtain on his life. A man of indomitable courage, an unrelenting patriot, a passionate

philanthropist, the Deshbandhu was one of those all too few, whose presence influences the destinies of any country. Before his fiery will quailed the elements of reaction and he stood out as the intrepid warrior who led the forces of his compatriots in a righteous cause. His entire life was a poem of sacrifice and self abnegation—a devout offering at the Altar of the mother. To a great and noble ideal he surrendered all the material acquisitions of an eventful carrer and there are not many such striking illustrations of renunciation and service. Informed by the strain of the ascetic, he drew himself away from the smaller pleasures and devoted the whole of plentiful resources earned in a brilliant and successful carrer to the redemption of suffering humanity. That self respect which expressed itself in the early days in meeting the liabilities of a father's undischarged bankruptcy tingled with concern for the condition of those who were in want. With princely lavishness and with all the reticence of true charity, he relieved the needs of political workers and others, thus attaching to himself by the silken bonds of love, not alone those who benefited by his disposition but every one who was touched by his generosity of his soul. A poet who denied himself the privilege of pursuing his successful wooing of the Muse, a brilliant lawyer who forsook his forensic glory for the larger cause of his country, a favourite of Fortune who discarded ignoble ease for the trying elevation of public service, the Deshbandhu's association with politics was the finest assertion of the spirit which seeks fulfilment in a mighty endeavour.

পরিশিষ্ট (১)

পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে যে বিখ্যাত সেই আলিপুর বোমা মোকদ্দমায় চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। অরবিন্দ যে নির্দোষ তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি অরবিন্দ-সাহিত্যের সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়া আদালতকে ইহাই বুঝাইলেন যে এমন ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তি কখনও সরকার কর্তৃক আনীত ঐ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিতে পারেন না। অরবিন্দ-সাহিত্যের উল্লেখ প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ বেদ-বেদান্ত হইতেও উপমা তুলিয়া রাজনৈতিক বিষয়-বস্তুকেও নিখুঁত বৈদান্তিক ব্যাখ্যা করিয়া জনাকীর্ণ আদালতকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। আজ পর্যন্ত ভারতীয় কোন আদালতে এমন ব্যাখ্যা আর শোনা যায় নাই।

এই মোকদ্দমাটি একখানি চিঠিকে কেন্দ্র করিয়া জটিল আকার ধারণ করে। সরকার বলিয়াছিলেন, ঐ চিঠিখানি অরবিন্দের নিকট তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্র ঘোষের লেখা। চিঠিখানি এই :

Dear brother,

We must have sweets all over India, readymade for imergency. I wait for your answers.

Yours, Barindra Kr. Ghosh

সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল 'Sweets' শব্দের অর্থ 'বোমা'।

চিত্তরঞ্জন চিঠিখানিকে অবিকল নকল করিয়া নিয়াছিলেন। 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের' সুচতুর গোয়েন্দার চাইতেও অধিকতর সন্ধানী মন এবং চোখ লইয়া তিনি সেদিন সারারাত চিঠিখানিকে বার বার, বহুবার পড়িয়া স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন,—চিঠিখানি জাল, কিছুতেই বারীন্দ্র ঘোষের লেখা হইতে পারে না। তাঁহার সিদ্ধান্তই যে নির্ভুল তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি এগার দফা অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিলেন যাহাতে সত্য সত্যই প্রমাণিত হইল যে প্রবঞ্চক সরকার ঐ চিঠিখানি জাল করিয়াছিলেন।

সরকার বলিয়াছিলেন, সুরাট কংগ্রেসের সভা ভাঙ্গিয়া গেলে পরই ১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ঐ চিঠিখানি অরবিন্দকে লিখিয়া-

ছিলেন। জনাকীর্ণ মাননীয় আদালতে দাঁড়াইয়া চিত্তরঞ্জন সেদিন ঐ চিঠি-খানিকে জাল প্রমাণ করিবার জন্য গভীর আত্মপ্রত্যয় লইয়া বলিয়াছিলেন :—

(১) পুলিশের অভিমত এই যে, যখন ঐ চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন তখন বারীন্দ্র আর অরবিন্দ দুই ভাই-ই সুরাটে ছিলেন। যদি উহাই সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তবে এক ভাই অপর ভাইকে, তাহার যাহা জানাইবার তাহা চিঠির মাধ্যমে জানাইবেন কেন? একই জায়গায় উপস্থিত থাকিয়া চিঠি লেখা অস্বাভাবিক এবং বাস্তব ক্ষেত্রে ইহা কখনই প্রচলিত নহে।

(২) সরকার বলিয়াছেন, বারীন্দ্রকুমার সুরাটে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু আদালত সমক্ষে বারীন্দ্রের সুরাটে উপস্থিতির কোন প্রমাণ দিতে পারেন নাই।

(৩) অরবিন্দ বারীন্দ্রের তৃতীয় ভাই এবং বারীন্দ্র তাঁহাকে সর্বদা 'সেজদা' বলিয়া ডাকিতেন। সুতরাং এই স্বাভাবিক ডাক না ডাকিয়া বারীন্দ্র চিঠিতে 'Dear brother' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন ইহা অস্বাভাবিক।

(৪) বিপ্লবীগণ কম কথা বলেন, কিছু লিখিতে হইলেও কম লেখেন। তাহারা দরকারী গোপন চিঠি লিখিতে হইলে বা এমন ধরনের কোন গুরুত্বপূর্ণ চিঠি লিখিবার প্রয়োজন হইলে কিছুতেই সম্পূর্ণ নাম সহি করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত: এই চিঠি ছোট ভাই সেজদাকে লিখিয়াছেন, এখানে সেজদার কাছে ছোট ভাই তাহার নাম সহি করিবেন কেন? ইহা তো অপরিচিতের নিকট অপরিচিতের চিঠি লেখা নয়? এখানে যে স্বাভাবিক সহি থাকা উচিত ছিল তাহা হইতেছে বারীন অথবা বারী।

(৫) পুলিশ ঐ চিঠিখানি কলিকাতায় অরবিন্দের 'গ্রে স্ট্রীটের' বাসস্থান হইতে আবিষ্কার করিয়াছে। অরবিন্দ একজন বিপ্লবী। তিনি ঐ চিঠিখানি সুরাটে পাইয়াছিলেন। চিঠিখানি পড়াশেষে না পোড়াইয়া ফেলিয়া সুরাট হইতে সঙ্গে করিয়া কলিকাতা লইয়া আসিয়াছেন ইহা অবিশ্বাস্য। অরবিন্দের মত বিপ্লবী এমন কাঁচা কাজ করিতে পারেন না।

(৬) বারীন্দ্রকুমার উচ্চ শিক্ষিত। চিঠিখানিতে 'এমারজেনসি' শব্দটির ভুল বানান রহিয়াছে—'imergency'। উচ্চ শিক্ষিত বারীন্দ্র এমন ভুল বানান লিখিতে পারেন না। ইহা অল্প শিক্ষিত পুলিশেরই কারসাজি এবং তাহারাই emergencyর জায়গায় imergency লিখিয়াছে।

(৭) চিঠিখানি কবে, কিভাবে পাওয়া গিয়াছে সে-সম্বন্ধে সরকার পক্ষের

সাক্ষী হিসাবে মিঃ ক্রিগেন, মিঃ গুপ্ত প্রভৃতি ইনস্পেকটরগণ যে সাক্ষ্য দিয়াছে তাহাতে যথেষ্ট গরমিল দেখা গিয়াছে।

(৮) পুলিশ যখন কোন বাড়ীতে খানাতল্লাসী চালায় তখন সাক্ষী হিসাবে তৃতীয় ব্যক্তি কাহাকেও উপস্থিত রাখিতে হয়। অরবিন্দের বাসস্থান খানা-তল্লাসীর সময় তেমন কোন সাক্ষী উপস্থিত ছিল না। যে সাক্ষী উপস্থিত ছিল সে সরকারের একজন কর্মচারী—গোয়েন্দা বিভাগের একজন কর্মী।

(৯) গোয়েন্দা বিভাগের সেই কর্মচারীকেও সরকার সাক্ষী হিসাবে আদালতে হাজির করিলেন না।—কেন হাজির করিলেন না তাহা গভীর সন্দেহজনক।

(১০) এই চিঠিখানি জাল চিঠি। এমন জাল চিঠি এই নূতন নহে, প্রয়োজন মত পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মচারীগণ এমন অনেক জাল চিঠি বিগত কালে অনেক সৃষ্টি করিয়াছে।

(১১) শরৎ নামে একজন গোয়েন্দা কর্মচারী ছিল। এই জাল চিঠির সৃষ্টিকারী যে সে ই ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়া চিত্তরঞ্জন সেদিন আদালতে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার কিছু অংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

It is suggested that I preached the ideal of freedom to my country which is against the law, I plead guilty to the charge. If that is the law here, I say I have done that and I request you to convict me but do not impute to one crime I am not guilty of deeds against which my whole nature revolts and which having regard to my mental capacity is something which could never have been perpetrated by me. If it is an offence to preach the ideal of freedom, I admit having done it—I have never disputed it. It is for that I have given up all the prospects of my life. It is for that I come to Calcutta to live for it and to labour for it. It has been the one thought of my waking hours the dream of my sleep. If that is my offence, there is no necessity to bring witnesses into the box

to depose to different thing in connections with that. Here am I and I admit it—my whole submission before the court is this. Let not the Scene enacted in connection with the sedition trial of the Bandematoram be enacted over again but let the whole trial go into a side issue.

If that is my offence, let it be so stated and I am cheerful to bear any punishment. It pains me to think that crimes repellent to me and against which my whole nature revolts, should be attributed to me and on the strength not only of evidence on which the slightest reliance can not be placed but on my writings which breathe and breathe only of that high ideal which I felt I was called upon to preach, I have done that and there is no question · I have ever denied it. I have adopted the principles of the political philosophy of the west and I have assimilated that to the immortal teaching of vedantism. I felt I was called upon to preach to my country to make them realise that India had a mission to perform in the comity of nations. If that is my fault, you can chain me, imprison me, but you will never get of me a denial of that charge. I venture to submit that under no offence of the law do I come for preaching the ideal of freedom and with regard to which I have been charged, I submit there is no evidence on the record and it is absolutely inconsistent with everything that I thought that I wrote and with every tendency of my mind discovered in the evidence.

I appeal to you therefore that a man like this who is being charged with the offence with which he has been charged, stands not only before the bar of this court but before the bar of the High court of history and my appeal to you is this that long after this controversy will be hushed in silence,

long after this turmoil, this agitation will have ceased, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism aud the lover of humanity. Long after he is dead and gone, his words will be echoed and re-echoed not only in India but across distant seas and lands. Therefore I say that the man in his position is not only standing before the bar of this court but before the bar of the High-court of history.

The time has come for you, Sir, to consider your Judgment and for you gentlemen to consider your Verdict. I appeal to you, sir, in the name of all the traditions of the English Bench that forms the most glorious chapter of English history, I appeal to you in the name of all that is noble, of all the thousands of principles cf law which have emanated from the English Bench, and I appeal to you in the name of the distinguished Judges who have administered the law in such a manner as to compel not only obedience but the respect of all those in the cases in which he had administered the law. I appeal to you in the name of the glorious chapter of English history and let it not be said that an English Judge forgets to establish justice. To you gentlemen I appeal in the name of the traditions of our country and let it not be said that two of his countrymen were overcome by passions and prejudices and yielded to the clamour of the moment.

উপরোক্ত ইংরাজীর যথাসম্ভব বাংলা অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বলা হইয়াছে যে, জনসাধারণের মধ্যে আমি আইন বিরুদ্ধ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিয়াছি,—আমার সে অপরাধ আমি স্বীকার করি। উহাই যদি এখানে আইন হয়, আমি স্বীকার করি, আমি উহা করিয়াছি এবং আমি অনুরোধ করি, আপনারা আমাকে দণ্ড দিন। কিন্তু যে বিষয়ে আমার

অপরাধ নাই, যে জঘন্য বিষয় ভাবিলেও আমার অন্তর প্রকৃতি বিদ্রোহী হইয়া ওঠে, যাহা আমার মানসিক গঠন অনুসারে কখনও আমার দ্বারা সাধিত হইতে পারে না, আমাকে যেন সেই অন্যায় অপরাধে কখনও অপরাধী সাব্যস্ত না করা হয়। স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা যদি অপরাধ হয় তবে আমি স্বীকার করিব যে, আমি অপরাধী, কখনই আমি উহার প্রতিবাদ করিব না। ঐ জন্যই আমি আমার জীবনের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা পরিত্যাগ করিয়াছি। উহার জন্যই বাঁচিয়া থাকিতে পরিশ্রম করিতে আমি কলিকাতা আসিয়াছি। উহাই হইতেছে আমার জাগরণের একমাত্র চিন্তা, আমার নিদ্রার স্বপ্ন। উহা যদি আমার অপরাধ হয় তবে উহার সত্যতা প্রমাণীত করিবার জন্য সাক্ষী দাঁড় করাইবার প্রয়োজন নাই। আমি এখানে উপস্থিত এবং আমি ইহা স্বীকার করি, মাননীয় আদালতের নিকট ইহাই আমার সবিনয় নিবেদন। আমার নিবেদন এই যে, পুনরায় বন্দেমাতরম্ মোকদ্দমার আর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে। ইহাকে ভিত্তি করিয়াই মোকদ্দমার বিচার শেষ হউক।'

স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা যদি আমার অপরাধ হইয়া থাকে তবে আমার প্রতি দণ্ড বিধান করা হউক, আমি সানন্দে সে-দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। ভাবিতে অত্যন্ত বেদনাবোধ করিতেছি যে যাহা আমার সর্বান্তকরণের নিকট অসহ্য এবং যাহা আমি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করি, সেই সকল কার্যাবলীর শুধু দোষ-ই আমার উপর দেওয়া হয় নাই অধিকন্তু আমার বিরুদ্ধে উহা প্রমাণীত করিবার জন্য অবিশ্বাস্য প্রমাণাদি উপস্থাপিত করান হইয়াছে এবং যে প্রবন্ধগুলি বিবেক এবং আন্তরিক অনুভূতির দ্বারা আমার জীবনের আদর্শের অনুপ্রেরণায় রচিত, ঐ প্রবন্ধগুলিকেই আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হইয়াছে। পাশ্চাত্যের রাষ্ট্র দর্শনের সহিত আমি প্রাচ্যের বেদান্তের অমর বাণী মিশ্রিত করিয়া উহাই আমার জীবনের সাধনার মন্ত্ররূপে ধরিয়া রাখিয়াছি।

ভারতের যে নিজস্ব একটি সাধনা আছে তাহা সমস্ত জাতির নিকট তুলিয়া ধরিবার কথা আমি অনুভব করিয়াছি এবং আমার দেশের জনসাধারণের নিকট সেই বাণী হৃদয়ঙ্গম করানই হইতেছে আমার প্রতি বিধি নির্দেশ। উহা করা যদি আমার অপরাধ হইয়া থাকে তবে আপনারা আমাকে শৃঙ্খলিত করিতে পারেন, আমাকে বন্দী করিতে পারেন কিন্তু আমি উহা কখনই

অস্বীকার করিব না। কিন্তু আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবার জন্য যে প্রমান আমার বিরুদ্ধে উপস্থিত করান হইয়াছে উহা কোন প্রমানই নহে এবং যে স্বাধীনতার আদর্শ আমি প্রচার করিয়াছি অথবা যে আদর্শের বাণী প্রবন্ধে লিখিয়াছি এই প্রমাণও সঙ্গতভাবেই সেই আদর্শের কথাই সমর্থন করিতেছে।

সুতরাং আপনাদের নিকট আমার এই আবেদন যে, যে অপরাধের জন্য এই ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়াছেন আপনারা ভাবিবেন না যে তিনি শুধু আপনাদের এই আদালতেই অভিযুক্ত হইয়াছেন, মানব জাতির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ আদালতেও তাঁহার বিচার করিবার ভার নির্দিষ্ট আছে। আপনাদের নিকট আমার আবেদন এই যে, এই বিতর্ক নীরবতায় পরিণত হইবার দীর্ঘদিন পরে, এই উদ্বেলভাব এবং ক্ষুব্ধ আন্দোলন থামিয়া যাইবার অনেক দিন পরেও, তাঁহার মৃত্যুর বহুকাল পরেও মানুষ তাঁহাকে স্বদেশপ্রেমিক কবি, জাতীয়তার গুরু এবং মানব প্রেমিক বলিয়া পুজা করিবে। তাঁহার মহাপ্রস্থানের দীর্ঘদিন পরেও শুধু ভারতবর্ষেই নহে, মহাসাগরের পরপারের দেশে দেশে তাঁহার বাণী ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইবে। সেকারণেই আমি বলিতেছি, তাঁহার বিচার শুধু এই আদালতেই হইতেছে না, তাঁহার বিচার একদিন হইবে ইতিহাসের উচ্চতম ধর্মাধিকরণে।

মাননীয় মহাশয়! এইবার আপনার বিচারের বিবেচনা করিবার ও (এসেসারদের প্রতি) আপনাদের মতামত জ্ঞাপন করিবার সময় উপস্থিত। মাননীয় বিচারপতি মহাশয়! ইংলণ্ডের ইতিহাসের যে উজ্জ্বলতম অধ্যায় ইংরাজ বিচারকগণের ন্যায় বিচারের দ্বারা শোভিত হইয়া রহিয়াছে তাহার দোহাই দিয়া, মহত্বের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, ইংরাজ জাতির বিচারক সংসদ হইতে যে সমস্ত শত সহস্র নীতিসূত্র সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের নামে দোহাই দিয়া, যে সমস্ত বুদ্ধিমান বিচারকগণ অপরাধীর বিচার করিতে শুধু ন্যায় বিচারই করেন নাই উপরন্তু জনগণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন আমি তাঁহাদের নামে আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি যে অনাগত কালে এ-কথা কেহ যেন বলিতে না পারেন যে একজন ইংরাজ বিচারক এই মোকদ্দমার বিচারে ন্যায়নীতির মর্যাদা রক্ষা করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। আপনাদের (এসেসরগণের প্রতি) নিকট আমার নিবেদন যে, জনসাধারণের মধ্যে অরবিন্দ যে

আদর্শ প্রচার করিয়াছেন তাহার নামে, আমাদের দেশের শিক্ষাদীক্ষার কথা স্মরণ করাইয়া আমি আবেদন করিতেছি যে, আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস যেন এই অপবাদে দূষিত না হয় যে আমাদেরই দেশবাসী দুইজন ভুল সংস্কারবশতঃ ও প্রভাবিত হইয়া সাময়িক উত্তেজনায় নিজেদের ব্যক্তিগত ন্যায় বিচার-বুদ্ধির অমর্যাদা করিয়াছেন।

পরিশিষ্ট (২)

বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন

দশম অধিবেশন

স্থান—বাঁকিপুর [বিহার]

মূল সভাপতি—স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

সন তারিখ—১৩২৩ বং ৯ই, ১০ই ও ১১ই পৌষ

রবি, সোম ও মঙ্গলবার

সাহিত্য শাখার সভাপতি—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

সাহিত্য শাখার সভাপতি হিসাবে চিত্তরঞ্জন যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া 'সাহিত্য প্রাঙ্গণে' অধ্যায়ে সংযোজিত না করিয়া ভিন্নভাবে নিম্নে প্রদত্ত হইল। চিত্তরঞ্জন "বাংলার গীতিকবিতা" সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—

বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটির মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য, যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে, নব নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে। শত সহস্র পরিবর্ত্তন, আবর্তন ও বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, যুদ্ধে, বিপ্লবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অজ্ঞানে, অধর্মে, স্বাধীনতায়, পরাধীনতায়, সেই সত্যই আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে, এখনও করিতেছে। সে যে বাঙ্গলার প্রাণ,—বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল, সেই প্রাণেরই বহিরাবরণ। বাঙ্গলার ঢেউ-খেলান শ্যামল শস্য ক্ষেত্র, মধু-গন্ধ-বহ মুকুলিত আম্রকানন, মন্দিরে মন্দিরে ধূপ-ধূনা-জ্বালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মত কুটির প্রাঙ্গণ, বাঙ্গলার নদ নদী, খাল-বিল, বাঙ্গলার মাঠ, বাঙ্গলার ঘাট, তালগাছ-ঘেরা বাঙ্গলার পুষ্করিণী, পূজার ফুলে ভরা গৃহস্থের ফুলবাগান, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস, বাঙ্গলার তুলসীপত্র, বাঙ্গলার গঙ্গাজল, বাঙ্গলার নবদ্বীপ, বাঙ্গলার সেই সাগর তরঙ্গে চরণ-বিধৌত জগন্নাথের শ্রীমন্দির, বাঙ্গলার সাগর-সঙ্গম, ত্রিবেণী-সঙ্গম, বাঙ্গলার কাশী, বাঙ্গলার মথুরা-বৃন্দাবন, বাঙ্গালীর জীবন,

আচার-ব্যবহার, বাঙ্গলার সমগ্র ইতিহাসের ধারা যে, সেই চিরন্তন সত্য, সেই অখণ্ড অনন্ত প্রাণেরই পবিত্র বিগ্রহ। এই সবই যে সেই প্রাণ-ধারায় ফুটিয়া ভাসিতেছে, দুলিতেছে।

সেই প্রাণ-তরঙ্গে একদিন অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিল, এক অপূর্ব অসংখ্যদল পদ্মের মত বাঙ্গলার গীতিকাব্য! কিন্তু ফুল ত একদিনে ফুটে না। তাহার ফুটনের জন্য যে অতীতের অনেক আয়োজন আবশ্যক। তাহার প্রত্যেক দলের মধ্যে যে অনেক গান, অনেক কথা, অনেক কাহিনী। তাহার গন্ধের মধ্যে যে অনেক কালের অনেক স্মৃতি, অনেক মধু জড়াইয়া থাকে। তাহার ডাঁটায় যে জন্ম জন্মান্তরের চিহ্ন লুকান থাকে। ফুল যে অনন্তকাল ধরিয়া ফুটিতে ফুটিতে ফুটিয়া ওঠে।

বাঙ্গলার গীতকাব্য যে কখন্ কোন্ আদিম ঊষায় ফুটিতে আরম্ভ করিল, আমি জানি না। শুনিয়াছি সন্ধ্যা-ভাষায় লিখিত পুরাতন বৌদ্ধ দোঁহায় তাহার উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডিদাসের সময় সেই গীতি কাব্যের বিকশিত অবস্থা। কিন্তু তার আগে অনেক গীতি-কাব্য না লেখা হইয়া থাকিলে এরূপ কবিতা সম্ভব হয় বলিয়া আমার মনে হয় না। আজকাল আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান, অনেক আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে। আশাকরি, একদিন আমরা আমাদের গীতিকাব্যের এই হারাণ ধারাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব।

চণ্ডিদাসের লিখিত যে গীতিকাব্য, ইহাই বাঙ্গলার যথার্থ গীতিকাব্য। এই কবিতাগুলির মধ্যে যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, তাহাই বাঙ্গলা গীতিকবিতার প্রাণ। বাঙ্গলা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, রূপে রূপে এ বিচিত্র ভুবন ভরিয়া আছে। কত কাল, কত যুগ, কোন্ অন্ধকারের অন্ধকারে রূপের ধ্যানে মগ্ন আমার বাঙ্গলা জাগিয়া দেখিল, ঊর্দ্ধে অনন্ত নীল, নীলের পর নীল, অঞ্চল ধারে কল-কল্লোলে গঙ্গা বহিয়া যায়, চরণতলে কলহাস্যময় মহাসমুদ্র অনন্ত সুরে গাহিয়া উঠিয়াছে,—তাহার বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে; শিরে হিমালয় কাহার ধ্যানে নিমগন! বাঙ্গলা দেখিল, তাহার আশে পাশে এত রূপ, এত সুর, এত গান,—মন প্রাণ বিচিত্ররসে ভরিয়া উঠিল। ভরা মনে, ভরা প্রাণে ব্যাকুল হইয়া শুনিল, প্রাণের ভিতর কাহার সাড়া, কাহার আকুল আহ্বান! তখন বাঙ্গালীর

কবি গাহিয়া উঠিল,—

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ"।

বাঙ্গলা তখন প্রাণের ভিতর ডুব দিয়া দেখিত, কত মণি, কত মাণিক্য তাহার সেই আঁধার প্রাণের পরতে পরতে আলোক বিকিরণ করিতেছে। ভাবিল, আমার প্রাণে কে আছে, কি আছে? কে আমাকে বাহির হইতে রূপে, রসে, গানে, গন্ধে জড়াইয়া আকুল করে, আবার অন্তরের অন্তরে আসিয়া এমন করিয়া স্পর্শ করে? কাহাকে ব্যক্ত করিতে চাই? কে বিনা চেষ্টায় আপনা আপনি এমন করিয়া ব্যক্ত হইয়া ওঠে; এ যে বাহিরের ও ভিতরের এক অপূর্ব মিলন। এই মিলন উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল, অনন্ত সাগর দূরে যেখানে দিক্‌চক্রবালের পরিধি পারে মিলিয়াছে, সেখানে শুধু এক রেখার মত সরল, শান্ত, নিবিড়, যেন মিলাইয়াও মিলায় নাই, মিশিয়াও মিশে নাই, প্রভেদ অথচ অভেদ। আবার ফিরিয়া দেখিল, ধরণী মহাকাশকে চুম্বন করিতেছে, ঢলিয়া পড়িয়া বলিতেছে, "হে আকাশ, আমাকে লও, আমি যে তোমারই।" আকাশও ধরণীকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়াছে, বলিতেছে, "এস, এস, আমি ত তোমারই।" দেখিল, সে এক মহামিলন। বুঝিল, জন্মে জন্মে সকলই সার্থক! জন্ম সার্থক! মৃত্যু সার্থক! দেহ সার্থক! প্রাণ সার্থক! আত্মা সার্থক! এই মহামিলন সার্থক! বাহির শুধু বাহির নয়, অন্তর শুধু অন্তর নয়। ইন্দ্রিয় দিয়া যাহা প্রথম ধরা যায়, তাহা শুধু বহিরাবরণ। প্রত্যেক প্রত্যক্ষের, প্রত্যেক ভাবেরই একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সেই বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতি মিলিয়া মিশিয়া এক। তাহারই নাম বস্তু। জীবন এই মহামিলন-মন্দির। কত বিচিত্র রূপ, কত বিচিত্র গন্ধ, কত বিচিত্র রস, কত না সুরের খেলা, কত না রসের মেলা;—আমরা যে তিলে তিলে নূতন হইয়া উঠিতেছি। বাঙ্গলার কবি তখন চামর ঢুলাইতে ঢুলাইতে গাইলেন,—

"নব রে নব নিতুই নব,
যখনি হেরি তখনি নব!"

আদিম যুগ হইতে বাঙ্গলার বুকে অনেক আশা, অনেক ভাব আপনা আপনি জমাট বাঁধিতেছিল। সে যে হৃদয়ের মাঝে জানে কি অজানে

কাহার খোঁজ করিতেছিল, মিলন-পরশের জন্য আকুল হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। মনের ভিতর ডুবিয়া ডুবিয়া যেই দেখিতে পাইল, সে আর আনন্দ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তখন কবি গাইয়া উঠিলেন,—

"হৃদয়ে আছিল বেকত হইল
দেখিতে পাইনু সে"

হৃদয়ের মাঝে যে ভাব আপনা আপনি ফুটিতেছিল, সে যেন মূর্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে! সে রূপ কেমন? যেন,—

"চরণ-কমলে ভ্রমরা দোলয়ে
চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক"

তাহাকে দেখিয়া কবি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন, শুধু অন্তরের ভেতর মরমের সেই লুকান ঘরে বিভোর হইয়া দেখিতেছিলেন। যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিতে পাইলেন—তাঁহার সেই মানস-প্রতিমা, জীবন-প্রতিমা—

চম্পক-বরণী, হরিণ-নয়ণী
চলে নীল সাড়ী নিঙ্গাড়ী নিঙ্গাড়ী
পরাণ সহিত মোর।"

ইহাই বাঙ্গলা গীতিকবিতার প্রাণ। প্রাণের সঙ্গে, মর্মের সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে, ধর্মের সঙ্গে,—জীবনের সঙ্গে বাহিরের ও ভিতরের এমনই প্রাণস্পর্শী মিলন। বাঙ্গালী জানুক, বুঝুক, আর নাই বুঝুক, আমার বাঙ্গলার প্রাণ সে মহামিলনে ভোর হইয়া আছে। সেই মহামিলন-মন্দিরে পূজা যে নিয়ত চলিতেছে; বাঙ্গলার গান, তাহার আরত্রিক—বাঙ্গলার ভাষা তাহার মন্ত্র। সেই বাঙ্গলার কবি চণ্ডিদাস। সেই কবিতা বাঙ্গালীর কবিতা।

বাঙ্গলা দেশে সাহিত্যের অঙ্গনে এই গীতিকাব্য লইয়া আজকাল এক প্রকার মল্লযুদ্ধ বাঁধিয়াছে। নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক, দলাদলি, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা জাগিয়াছে। আজ দেখিতেছি, যে প্রাণের অনুভূতি লইয়া চণ্ডিদাস প্রভৃতি কবিরা গান গাইয়াছিলেন, সে ধারা, সে প্রাণের মতন, মনের মতন, সে "বিষামৃতে একত্র করিয়া" প্রাণরন্ধ্রে সে বংশী আর যেন ফুকারিয়া ওঠে না। কাব্য লইয়া, সাহিত্য লইয়া, রস-সৃষ্টি লইয়া, নানা বিশ্লেষণ, কঠোর অনুশাসন,

ধর্ম ও নীতির দোহাই, আদর্শের বড়াই, স্বজাতীয়তা ও বিজাতীয়তা, নিকৃতির ওজনে তৌল করিয়া, কষ্টি-পাথরে খাদ কত পড়ে, এই যাচাই, বাছাই, ঝাড়াই করিতেই দিন গত হয়, কিন্তু—

"দিন গত নহে শ্যাম, তব চরণে এ দিন গত"

সে সুরের, সে সৃষ্টির, সে জাগরণের, সে মিলনের কথা নাই, সে কথা বুঝিবার ইচ্ছাও নাই। সে বাঁশীর ধ্বনি আর শুনিতে পাই না—

"সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব
কে দূর করব পিয়াসা"

আমাদের ঠিক সেই অবস্থা।

আজ এই সাহিত্যের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সেই তর্ক, মীমাংসা, যুক্তি, এই ভাব-দৈন্যের কারণ বুঝাইতে হইলে, আমি যে খুব ভাল করিয়া তাহার ঠিক মীমাংসা, ভাষ্য ও টীকা-টিপ্পনীর সহিত দেখাইতে পারিব, এমন হয়ত নাও হইতে পারে; তবে বাঙ্গলা কবিতার প্রাণ ও বাঙ্গলা সাহিত্যের আদর্শ যে কি, তাহা বোধ হয় বলিবার সময় আসিয়াছে। তাই আজ এই সমবেত সাহিত্যের দরবারে আমি সেই সকল কথাই বলিতে চাই, কোন্ পথে যাইলে হৃদয়-উৎসের দেখা মিলিবে, তাহারই খোঁজ করিব।

আপনারাও যদি আমার সঙ্গে একবার এই বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের ভিতর দিয়া সেই অভিরাম কবি চিন্তামণির মণি-কোটার সন্ধানে আসেন, প্রাণ জুড়াইবে। ধৈর্য ধরিলে মুরারি মিলিবে। সে নূতনের সাক্ষাৎ মিলিবেই মিলিবে। সে যে "নিতুই নব।" নিজে নূতন হইতেছে, সাথে সাথে এই জাগ্রত বিশ্বও নব নব উন্মেষে মঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে।

এখন কথা হইতেছে কাব্য কি? গীতি-কবিতা কি? সাহিত্য কি? সাহিত্যের আদর্শ ই বা কি? ফুল যেমন তাহার ভরা রূপের ডালি লইয়া একদিনে ফুটিয়া ওঠে না, তেমনি আদর্শও একদিনে, এক মুহূর্তে প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে আসে না। অনন্তকালের যে অনাহত সঙ্গীতের আহ্বান চলিয়াছে, সেই আহ্বানের টানে ফুল আপনার সেই বিরাগ ও অনুরাগ লইয়া কত যুগ-যুগান্তরের স্মৃতির অক্ষুণ্ণ ধারার ভিতর দিয়া গৌরবে সৌরভে আপনার আত্ম বিকাশ করে। বিকাশই যে জীবনের ধর্ম :—রূপে রূপে বিকাশ, শতেক যুগের ফুল শত জন্ম ধরিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। ভাব-সাগরের প্রতি ঢেউ উঠিয়া,

দুলিয়া, আপনার ইচ্ছায় খেলিয়া, আবার সাগরে মিলাইয়া যায়। জীবনের ধর্ম ও বিকাশের ধর্মই তাই। অনন্তকাল হইতে তাহা আছে, অনন্তকালই থাকিবে, তাই চণ্ডীদাস গাইয়াছেন,—

মাটীর জনম না ছিল যখন,
তখন করেছি চাষ।
দিবস রজনী না ছিল যখন
তখন গণেছি মাস।”

সিতাসিত কালপক্ষ, দিবস রজনী, সবই ছিল, সবই আছে, সবই তেমনি করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।

প্রথম কথা, গীতি-কবিতার জন্ম কোথায়, কবিতা কি? সাধারণতঃ সোজা কথায় হয়ত বলিতে পারা যায় যে, ছন্দোবদ্ধ সুর-তালে বাঁধা কথাই কবিতা। সমাজ বিজ্ঞানবিদ তাহার এক সামাজিক তত্ত্ব বাহির করিতে চান, মনস্তত্ত্ববিদ্ তাহার মানসিক বিশ্লেষণ করিতে পারেন। কল্প-কলার স্রষ্টা যে কবি, সে তাহার হৃদয়-মাঝারে যে স্বচ্ছ দর্পণখানি আছে, সেইখানে নয়ন ডুবাইয়া দেখে, সে উৎস কোথায়! প্রথম যুগে আদিম মানব বহিঃপ্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বাস করিত, গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া তৃণ দিয়া ছাইয়া, পাতা দিয়া ঘিরিয়া, কুটির রচনা করিয়া, আপনাদের থাকিবার মত আশ্রয় করিয়া লইত; তখন হইতেই তাহাদের ভিতরে একটা সামাজিক ভাব পরস্পর পরস্পরের মধ্যে জাগিয়া উঠিত। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিত। তখন তাহাদের শিক্ষা, অনুশীলন, হাব-ভাব, আচার-ব্যবহারের ধারা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের স্বভাবের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিত। সেই স্বভাব-জাত সংস্কার, জ্ঞানে পরিণত হইবার পথে, স্বাভাবিক সুখ, দুঃখ, ভাব, অভাব যেমন জাগিত, তেমনি মিলিয়া মিশিয়া পূরণ করিতে চেষ্টা করিত। পূর্ণিমা রজনীতে যেমন জ্যোৎস্নার অনাবিল ধারায় ধরিত্রীকে স্নাত দেখিত, বিহগ-বিহগীর মধুর স্বরলহরী শুনিত, নির্ঝরের জল-ধারায় আলোড়িত উপলখণ্ডের ভাষা শুনিত, তাহারা দল বাঁধিয়া নৃত্য করিত, গান করিত, আনন্দ উদ্বেলিত হৃদয়ে অধীর হইয়া উন্মত্তবৎ কত ভাবের ও সুরের প্রকাশ করিত। পাখীর সমবেত কলরবোত্থিত গানের মত তাহাদেরও ভাষা ফুটিত, সেই প্রথম গান, সেই প্রথম প্রাণের আবেগ, সেই মানবের প্রথম রসানু-

ভূতি, ইহাই সমাজ-বিজ্ঞানবিদের বিশদ কথা।

দিন গেল, স্বভাব অভ্যাসে দাঁড়াইল, পরস্পর পরস্পরের অনুভূতি দ্বারা নানা রূপে ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। দশজনে মিলিয়া যে নৃত্য-গীত চলিত, তাহা ক্রমে অন্যরূপ আকার লইয়া অন্য আবেগের ধারায় নূতন রকমের সৃষ্টি হইতে লাগিল। স্ত্রী-পুরুষের সহজাত সংস্কার-বশে যুগল মিলিতে লাগিল। তখন সেই দুইয়ের ভিতরে আদান-প্রদান, ভাব-অভাব, মিলন ও বিরহের পাওয়া ও না-পাওয়ার রস উপজয় হইল। গানের ধারাও নূতন হইল, এমনি করিয়া কবিতার জন্ম। তুমি আমি, আমি তুমি, হাসি কান্নার বিলাস!

মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন যে, সেই সময়ে যত রকমের মানুষের মনে, যত রকমের সহজাত সংস্কারের খেলা হইতে লাগিল, তত রকমেই তাহার ভাব ও আকার পরস্পর আপেক্ষিক পরিবর্তন হইতে লাগিল। প্রত্যেক পরিবর্তনই এক এক পৃথক্ ভাবের প্রকাশ, প্রত্যেক সেই প্রকাশের সঙ্গে সুরের ও ভাষার স্ফূর্তি হইতে লাগিল। যেখানে যেমন ভাবটি ভিতরে ছিল, তেমনটিই বাহিরের আকার লইয়া প্রকাশ পায়। না-পাওয়ার জন্য যে ক্রন্দন সেই ক্রন্দনে এক অপূর্ব সুর ওঠে, সেই সুর গানে পরিণত হয়। জীবন ও মৃত্যু, শোক ও আনন্দই সেই সংস্কার যুগের বিশেষ লক্ষণ।

তারপর, দিন গেল, নানারূপে তাহা পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে লাগিল। শীত কাটিয়া গেলে যেমন বসন্ত আসে, আদিম যুগের সে জড়তা কাটিয়া গেলে, তেমনি জীবনের সরসতা আসিল। বিচিত্র রসানুভূতিতে মানব উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন কাঁদিত, দেহের স্বাভাবিক অভাবে; ক্রমে তাহার ভিতরে মনের ভাবাভাব জাগিল, রূপ-তৃষা আসিল, ভালবাসিতে শিখিল, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইতে লাগিল।

কিন্তু কল্পনার যে স্রষ্টা,—যে কবি,—সে তাহার অনুভূতির ভিতর দিয়া বলিবে, এ যে লীলা! আনন্দ ঘন-রসাধার মায়াধীশ এমনি করিয়া রসভোগ-লীলা যুগে যুগে করেন। পাখীর বুকের ভিতরেও তিনি গান, সমীর-হিল্লোলেও তিনিই তান, জলের বুকে যে আলোকের নৃত্য সত্য রংরাজের রংএর খেলা! তাঁহার ত আদি অন্ত নাই। কেবল ফুটাইয়া ফুটাইয়া রূপে রূপে বিলাস করিয়া, ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া জীবনের চিদানন্দঘন-রস পান করিতেছেন,

বিশ্ব প্রকৃতিও সেই রস পান করিতেছে। সৃষ্টির আদি অন্ত কে খুঁজিয়া দিবে? আগে পরে কে বলিবে? ছোট বড় বিচার করিবে কে?

এই সমগ্র জীবনের অনুভূতিই সাহিত্য। প্রত্যেক পা ফেলা ও প্রত্যেক পা ফেলার দাগটি। মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন, এই রূপ-তৃষ্ণা-স্বভাব, সৃষ্টি-রক্ষার জন্য মিলিবার পন্থা। কল্পকলার স্রষ্টা বলে, এ তৃষ্ণা নয়, এ স্ফূর্তি, রূপের ভিতর দিয়া রূপকে পাইবার, আপনাকে ফুটাইবার, খেলা করিবার, লীলার মাধুর্য। মাটি ফাটিয়া তৃণ তাহার শ্যাম সুন্দর কোমলতা বিছাইয়া দেয়, ফুল ফোটে, পাখী গায়, আকাশে মেঘ রৌদ্রের রঙের পর রং ঝলকিয়া যায়, এ সবই আপনিই হয়; সে 'আপনি' সেই লীলামৃত রসাধার। এ সবই তাঁরই প্রেমের বিচিত্র রূপ-রস! গভীর পঙ্ক হইতে পঙ্কজিনী শতদল বিকশিত করিয়া মৃদুল বাতাসে দুলে, সেও তাঁহারি লীলা। এ বিশ্ব-সৃষ্টি তাঁহারই, এ জীব-সৃষ্টির সকল খেলাই তাঁহারই; ইহা মায়া নয়, মিথ্যা নয়, কৈতব নয়। ইহা পূর্ণ, রূপে রূপে পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর বিলাস-লীলার বিচিত্র ক্রীড়া। এই অনুভূতির জীবন্ত, জলন্ত প্রকাশই শ্রেষ্ঠ কল্পকলা, সেই অনুভূতিই সাহিত্যের রস।

কল্পকলার মূল কথা হইল সত্য। জীবনের বিশিষ্ট অনুভূতির সত্য। সে চিরন্তন সত্য কাল-দেশের পরিবর্তনের ভিতরেও তাহার অন্তরঙ্গকে বদল করে না। কল্পকলার অন্তরঙ্গের আদর্শও দেশ-কাল অতীত। সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধির নীতি ও ধর্মের অতীত। কল্পকলা সেই দিব্যদৃষ্টির কথা। এই যে সাধারণ মানুষের অনুভূতি, কল্পকলাবিদ্ তাহার ভিতরে দেখেন, সেই অনন্তের রসাভার, সেই রসাভারের জাগ্রত ছবিখানি তাহার জীবনের এক অনন্ত মুহূর্তের ঋদ্ধি।

কলাবিদের কাছে ভিতর বাহির একই পদার্থ, পরস্পরকে ধরিয়া আছে। শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ Idealistও নয়, Realistও নয়, Naturalist; শুধু ভাব লইয়াও সে স্বপ্নের দেশে ফুল ফুটায় না, শুধু দেহের রস-রক্তের সন্ধানেই কাটায় না। অনন্ত যেমন অনন্ত মুহূর্ত ধরিয়া আপনা আপনি নিজেকে স্বাভাবিক পরিণতিতে লইয়া আসে, কলাবিদও তেমনিভাবে জীবনের ধারার সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া সৃষ্টি করেন। জীবন যে সাধনা, সে ত স্বপ্ন নয়। এই বিশ্ব যে অনুপম বিশ্বনাথের বিরাট শিল্প, এ মহাকাব্যে সকলেরই যথাযথ

স্থান আছে, আলোও আছে, আঁধারও আছে। আদর্শ-জগৎই এই প্রত্যক্ষ জগৎ। বেদান্তের মায়াবাদ ভুল। এ প্রাণ সত্য, এ শ্রবণ সত্য, এ চক্ষু সত্য, এরূপ সত্য, প্রতি অণুরেণু ধূলিকণা হইতে এই মহাবিশ্ব এক জাগ্রত প্রাণময় সত্য। মায়া বলিয়া কোন জিনিসই নাই। জগন্মিথ্যা নয়, এই রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী পৃথিবীই কলাবিদের প্রাণ। প্রকৃতির প্রাণে যেমন অন্ধকারা যামিনীতে ঝড়াকারা নিশীথিনীর বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হয়, কবির প্রাণেও তেমনি হয়। এমন কোন ক্রিয়াই নাই যাহা কলাবিদের সৃষ্টির ভূমি হইতে দেখিবার বস্তু নহে। ইহাই সত্য হিন্দুর প্রাণের কথা, যিনি ভাবুক, যিনি রসিক, এই রস-সাধনা যাঁহার অন্তরঙ্গের ভিতর জাগিয়াছে, তিনি সকল কথা বুঝিবেন, তাই চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

"বড় বড় জন রসিক কহয়ে
রসিক কেহ ত নয়।
তর তম করি বিচার করিলে
কোটিকে গুটিক হয়।"

আমি যে মিলনের কথা বলিয়াছি, যিনি যথার্থ কবি, সত্যদ্রষ্টা তিনি সেই মিলনের উদ্দেশেই বিভোর হইয়া আছেন।

যেমন বিশ্বপ্রকৃতির সকল সৃষ্টি, কল্পকলা-সৃষ্টিও ঠিক সেইরূপ। কারণ ও অকারণের ভিতর দিয়া স্রষ্টা এই মহারূপের বিলাস করিতেছেন, কারণ ও অকারণের মধ্য দিয়া আমরাও জীবনের সেই একই বিলাস-লীলা সাধন করিতেছি। এই যে সাম্য, এই যে সমদর্শন, ইহাই জগতের শ্রেষ্ঠ দান। এই সাধনার ধারায় মানুষ জীবন্মুক্ত। কলাবিদের জীবন এই ধারায় গঠিত। পাপ-পুণ্যের বিচার তাঁহার নাই, পাপও সত্য, পুণ্যও সত্য, ত্যাগের বিরাট ভাবও তাঁহার কাছে যেমন সুন্দর, সংসারের স্বার্থপরতার খেলাও তাঁহার কাছে তেমনি মধুর। সবই তাহার কেন্দ্র, সব কেন্দ্র হইতেই সকলকে এ সমদর্শনের চক্ষু দিয়া দেখিবার ও অনুভব করিবার সাধন তাঁহার প্রাণে বর্তিয়া আছে। তিনি সেই সাধনা, সেই সমদর্শনের প্রেম-রাগিণীতে সকলকে মোহিত করেন, নিজেও সেই সুধা পান করেন, সেই লীলার সহচর হইয়া রহেন, তাই চণ্ডীদাস গাইয়াছেন,—

"রূপ করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্দা
কহে চণ্ডিদাস পুরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা

এই বিশ্ব-সৃষ্টির রস-মাধুর্য উপভোগ জীবনের চরম। নিজে আত্মস্থ হইয়া এই বিশ্ব-আত্মার সহিত একান্ত যোগই মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুশাসন। এই মানব-প্রাণের অন্তর-ভূমির সহিত বিশ্ব-প্রাণের যে মিলন-ভূমির অপরূপ দৃশ্য, এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের সহিত যে অতীন্দ্রিয় মহা-মিলনের রস, তাহাই শ্রেষ্ঠ কল্প কলার রাজ্য, তাহাই সংসার ও পরমার্থের মিলনে সম্পূর্ণ জীবন। এই মহামিলনের প্রধান দূতী প্রেম, বিশ্লেষণে কোন নূতন সম্পদ গড়িয়া ওঠে না। বিশ্লেষণে প্রাণের সমগ্র অনুভূতি হয় না, বিশ্লেষণ ভাঙ্গিতে পারে, সৃষ্টি করিতে পারে না। বিশ্লেষণ আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সমগ্রতা হইতে দূরে রাখে, একাত্মবোধে অসহায় করিয়া তোলে—একমাত্র প্রেমই এই মিলনের মহামন্ত্র, সেই সর্বস্বধন। সেই প্রেমের দেবতা, পরিপূর্ণ, সবল, সহজ, সরল সোহাগ ও আবেগে সকলকেই বুকের ভিতর টানিয়া লন, তিনি এই সারা বিশ্বের, এই বিশ্ব তাঁহার! কবিতা যদি এই প্রেমের রাজ্যে না পৌছায়, এই প্রাণ চিন্তামণির 'মণি কোটার' মণি না মিলাইতে পারে, তবে তাহা প্রাণের কবিতা নয়। গীতি কবিতা সেই প্রাণের সে অতল স্পর্শ রূপ-সাগরে ডুবিয়া সেই সাগরের কাহিনী ফুটাইয়া তুলে।

এইবার কবিতার ভাষা ও রীতির কথা। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে, "ছেঁদো কথায় ভুল না"—তাহার মানে ত সকলেই বুঝেন। কবিতার ছন্দ, তাল, সুর থাকিলেই যে তাহার মধ্যে সেই চিন্তামণির সাক্ষাৎকার মিলবে, এমন ত নহেই, বরং অনেক সময়ে সেই মিলনের অন্তরায়। এই জন্যই সেখানে ভাবের দৈন্ত, সেখানেই উপমার প্রাচুর্য। পরিষ্কার কাচ যেমন মানুষের দৃষ্টির অন্তরায় না হইয়া সাহায্য করে, কথাও ঠিক তেমনি ভাবকে জমাইয়া তুলে। কাচ যদি অপরিষ্কার হয়, চোখে ঝাপ্‌সা ঠেকে। ভাষাও তেমনি। কোন সুন্দর ভাবই সুন্দর আকার না লইয়া ব্যক্ত হয় নাই। ফুলের দেহ হইতে যেমন তাহার রং ও তাহার আকার, যে যে স্থানে তাহার সেই সুন্দর সুবাস ভরিয়া রাখে, তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেই ফুলকে

নষ্ট না করিলে তাহার সুগন্ধটুকু আলাদা করা যায় না, তেমনি ভাবও ভাষাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ভাষাও ভাবকে আশ্রয় করিয়াই ফুটিয়া উঠে। শ্রেষ্ঠ কবিতার ভাবও ভাষাকে ছাড়াইয়া উঠে না, ভাষাও ভাবকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। তাহা সুডৌল, নিখুঁত, সুন্দর, সহজ। তাহাকে গয়না পরাইতে হয় না। অলঙ্কার সৌন্দর্যকে বাড়াইবার জন্য; অলঙ্কার দিয়া সৌন্দর্য্যকে বাড়াইলে তাহাকে খর্ব করা হয়, তাহার রূপের জলন্ত সত্যকে অস্বীকার করা হয়। ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, ছন্দ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বটে। কবিতা ও গানে কিছু প্রভেদ আছে। গানে যখন আমরা নিজেদের ব্যক্ত করি, তখন সুরই আমাদের প্রধান সহায়, কথা ভাবানুযায়ী উপলক্ষ্য মাত্র। পর্বতের গায়ে ঘাত প্রতিঘাতে ঝরনা যেমন বিচিত্র ধ্বনিতে গিরি-গহন মুখরিত করিয়া আপনার পথ আপনি কাটিয়া অবাধে বহিয়া যায়, গানও তেমনি আপনার পথ আপনি কাটিয়া সুরের ভিতর দিয়া পরম চরমে মিলাইয়া যায়। এ জীবন অণু হইতে অনীয়ান, মহৎ হইতেও মহীয়ান্; জীবন ও মৃত্যু একই সুরের খেলা। আন্তরিকতা সেই জীবন ও মৃত্যুর বন্ধনী, আধ্যাত্মিকতা জীবনের প্রাণ—প্রাণের অন্তরতম জলন্ত পাবক-শিখা। মানব জীবন সেই শিখার জলন্ত জাগ্রত মূর্তি, ভাব ও ভাষা তাহার রং ও রঙের মিলন-মাধুর্য।

তাহার পর আর একটি কথা, তাহাকে বলে রূপান্তর। এই যে স্বাভাবিক মনের বিকাশ, তাহাকে ভাগবত-সত্যে তুলিয়া ধরা। সেই রূপান্তরই বস্তু ও ভাবের সমন্বয়। বস্তুর অন্তরের যে রূপ, তাহার উৎসকে খুলিয়া দিয়া তাহাকে সেই রূপচিন্তামণির অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈতের মধ্যে টানিয়া তোলাই কল্পকলার শেষ রঙের খেলা। এই যে দেহ মন, এই যে ইন্দ্রিয়, তাহার অন্তরঙ্গ ভাবের সহিত সাক্ষাৎ ও সহজ করিয়া দেওয়ার নামই রূপান্তর। এই রূপান্তর দেখাইতে পারিলেই ভোগের মধ্যে ত্যাগ আপনি ফুটিয়া ওঠে। ত্যাগের মধ্যে আনন্দ আপনি উছলিয়া ওঠে! সকল জিনিসকেই এই অনন্তের দিক হইতে দেখিলেই এই রূপান্তরে পৌছান সহজ হয়। শিল্পের সাধনা করিতে করিতে, রূপ হইতে রূপে বিলাস করিতে করিতে, জীবনে এমন এক মুহূর্ত আসে, সেই অনন্ত মুহূর্তে এই রূপ-রাগ ভরা শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী পৃথিবীর রূপের মাঝে আসল রূপ ঝলসিয়া ওঠে,

যাহাকে চাই, তাঁহারই সাক্ষাৎকার হয়। সেই শুভ-মুহূর্তের জন্যই সকল কলাকলাবিদের সাধন। সেই শুভ-মুহূর্তেই সকল সৃষ্টি সুন্দর, মধুর, কল্যাণ ও মঙ্গল হইয়া উঠে।

সকল সৌন্দর্যের মধ্যে বিশ্বের আত্মা জাগ্রত 'মুখরিত' বিকশিত, সৌন্দর্য-লীলায় লীলায়িত। প্রকৃতি ও মানব উভয়ের ভিতরই বিশ্বাত্মার সমান খেলা। সকল জীব, বৃক্ষ, লতা, পাতা, অণু, পরমাণু সকলই প্রকৃতির মধ্যে। সাধনার পথে সাধক বিশ্বের দর্পণে তাহার নিজের মুখের ছায়া যখন দেখে, তখন তাহার সত্যরূপ প্রকটিত হয়। সে দেখে, তাহার সম্মুখে এক নূতন জগৎ,—সেই জগতের ও তাহার এক নাড়ী,—তাহার এক বিরাট্ হৃদয়। সেই বিরাট্ হৃদ্‌পিণ্ড এই বিরাট্ প্রাণ-সমষ্টিকে বক্ষে করিয়া কালের ভিতর দিয়া অকালে ধাইতেছে। তখন তাহার মন সেই বিরাটের রূপের রসে মজিয়া এক অভিনব রূপান্তর সৃষ্টি করে। সেই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মহামিলনের অনাহত সঙ্গীত ধ্বনিয়া ওঠে। বাঙলার গীতি কবিতায় আমি তাহারি সন্ধান পাইয়াছি!

বাংলা সাহিত্যের গীতি-কবিতার ধারায় প্রথম যে ভাষায় আমরা আজকাল গান ও কবিতা পাই, তাহাকে নাকি সন্ধ্যাভাষা বলে।' সুপ্তি ও জাগরণের সন্ধি, নূতন ও পুরাতনের সন্ধি, আলো ও দো-আলোর খেলা। এই সন্ধ্যাভাষায় সহজিয়া ধর্মের সকল গানই রচনা, আর তাহাই নাকি বাঙলার সর্বপ্রাচীন সম্পদ্। তাহাতে যে সমস্ত পাওয়া যায়, তাহার অর্থ ও রহস্য এখনও ভাল করিয়া বুঝা যায় না। তবে সহজিয়ার মধ্যে স্ফূর্তির উপর জীবনকে গাঁথিয়া তুলিয়া আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়, এ কথার ভাব তাহার মধ্যে আছে, তা সে যত সন্ধ্যারই আলো-আঁধারি রউক না কেন। তাহার পর গৌড়ীয় যুগ, সেই গৌড়ীয় যুগে চণ্ডিদাস প্রভৃতি কবিদের পদাবলি-গান অতুলনীয়। আমার মনে হয়, সে ওই সন্ধ্যাভাষায় বৌদ্ধ সহজিয়ার পদ হইতে চণ্ডিদাসের রাগাত্মিকা পদের মধ্যে কালের বিপুল প্রভাব আছে। অনেক ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়া না যাইলে ভাষার ছাঁদ ও রীতি যাহা চণ্ডিদাসে, তাহা হইতেই পারে না। তবে এ সমস্ত মতামত লইয়া আলোচনা করিবার মত পাণ্ডিত্য আমার নাই। আমি শুধু ভাবের দরজার দ্বারী, সেই মন্দিরের পূজার কিঙ্কর, আমি তাহার কথা

কহিব এবং চণ্ডিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী বাঙ্গলা কবিতার প্রাণের সহজ সরল ভাবগুলি মিনিসূতার মালার মত গাঁথিয়া তুলিতে চেষ্টা করিব।

বৈষ্ণব-কবিতা রস ভরা পাকা ফলের মত, তাহার খোসা আছে; শাঁস আছে, রসের অনুপম মিষ্টতা আছে, এমন কবিতা বাঙ্গলা দেশের গৌড়ীয় যুগের চণ্ডিদাস ছাড়া আর কাহার গানে আজও পর্যন্ত মিলে না। চণ্ডিদাসের অনুভূতি আর কাহারও হয় নাই। একদিকে বাঙলার পর্ণকুটীরের কবি চণ্ডিদাস, অন্যদিকে মিথিলার রাজকবি বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতির শিবসিংহ ছিল, লছিমা ছিল, চণ্ডিদাসের ছিল—

"নান্নুরের মাঠে পত্রের কুটীর
নিরজন স্থান অতি"

আর ছিল রামী! একজন রাজ-অনুগ্রহে সম্মান সুখ ভোগের মধ্যে পালিত, আর একজন দুঃখ-দারিদ্র্য লাঞ্ছনা পীড়িত। বিদ্যাপতির লছিমা দূরে আকাশের কোলে উজ্জ্বল তারকার মত, আর চণ্ডিদাসের রামী তাঁহার বুকের ভিতর—প্রাণের ভিতর। দুই জনেই জীবনের সকল দিকের কথা ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, দুই জনে কিন্তু সমান পারেন নাই। দুই জনেই কবিতার মিলন মন্দিরের দ্বারে পৌঁছিয়াছেন। একজন মন্দির দ্বারে আসিয়া থমকিয়া গেলেন, আর একজন সেই মণি কোটার প্রাণ চিন্তামণিকে বুকের ভিতর ধারণ করিলেন, গাইলেন,—

"বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব
প্রেম-চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব।"

"রসেতে গাঁথিয়া" এও সেই হজিয়ারই কথা। এই রসের সাধনাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের সাধনা। এই রস যে সেই রসামৃত মায়াধীশের প্রেমের খেলা, যাহার কাছে—

"মায়া আসি প্রেম মাগে"

কেহ কেহ বলেন, চণ্ডিদাস দুঃখের কবি, বিদ্যাপতি সুখের কবি, তাঁহারা বোধহয়, জীবনের সুখ-দুঃখকে ভাল করিয়া বুঝেন নাই। সুখ যখন রূপান্তর হইয়া ভাগবত সত্যে ফুটিয়া ওঠে, তখন তাহা সুখ নয়, দুঃখ এবং দুঃখ যখন

ভাগবত সত্যে গিয়া পৌছায়, তখন তাহা দুঃখ নয়, সুখ ; তাই চণ্ডিদাস গাহিয়াছেন,—

'......সুখ দুখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তারি ঠাঞি।"

শ্যাম-বিরহে রাধিকা বিবশা, পীরিতি যে সুখের সাগর তাহা দুঃখের মকর, ফিরে নিরন্তর, প্রাণ টলমল করে, অন্তরে বাহিরে কুটু কুটু করে, সুখে দুখ দিল বিধি—এই অবধি যুগল প্রেমের লীলায় যে মিলন-বিরহের রস মাধুর্য, তাহাই ফুটিল, কিন্তু কতটুকু হইল ইন্দ্রিয়ের বিক্ষোভ, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, স্ত্রী পুরুষের সহজাত মিলনের রসাভাসের মধ্যে যেটুকু পাই, কিন্তু তাহার পরই বাহির ভিতর এক হইয়া গেল, মানুষের এই সুখ-দুঃখের ভিতর হইতে চণ্ডিদাস সেই ভাগবত সত্যকে রূপান্তরে টানিয়া তুলিলেন। ইহা নীতিবিদের নীতি নয়, ইহা শুধু রস পণ্ডিতের রসশাস্ত্রের আলাপ নয় ; এ যে জীবনের এক চরম অনুভূতির কথা। এই চরম অনুভূতি বিদ্যাপতির হয় নাই। অনুভূতি শুধু আনন্দের ভিতর দিয়া ত হয় না—সকল রকম বিচিত্রতা না আসিলে জীবন কে উপলব্ধি করিতে পারে ? এই সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়াই সেই প্রাণের সাক্ষাৎকার হয়, আর প্রাণের সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয় মন যে রসোচ্ছ্বাসে উথলিয়া ওঠে, তাহাই শ্রেষ্ঠ গীতি কবিতায় দাঁড়ায়। একদিকে জীবনের অনুভূতি, অন্যদিকে রসের ভিতর দিয়া রূপান্তর, চণ্ডিদাসের প্রায় প্রত্যেক কবিতায় তাহার আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু বিদ্যাপতির তাহা নয়, তিনি গানে, যে রসের মধ্যে যে অবস্থার কথা কহিয়াছেন, তাহাতে শুধু ইন্দ্রিয়ের ভোগ, রূপ-রস-গন্ধের অনুপম সামঞ্জস্য ও মিলন ; তিনি সেখানে স্বয়ং সেই রূপ 'রসের মধ্যে ডুবিয়া আছেন, কিন্তু চণ্ডিদাস সেই রূপ-রস-গন্ধের মধ্যে ডুবারির মত ডুব দিয়া মণি তুলিয়া উঠাইয়াছেন। বিদ্যাপতি গাইলেন, রাধার বিরহের কথা,—

আপনহি পেম তরু অর বাঢ়ল
কারণ কিছু নাহি ভেলা।
শাখা পলব কুসুমে বে-আপল

সৌরভ দশদিস গেলা।
সখি হে দুরজন দুর নয় পাএ।
মুর জঞো মূড়হি সঞো ভাগল
অপদহি গেল সুখাএ।
কুলক ধরম পহিলহি অলি অওল
কঞোণে দেব পালটাএ॥
চোর জননি নিজঞো মনে মনে ঝখঞো
রোঞো বদন ঝপাএ॥
অইসন দেহ গেহ ন সোহাবএ
বাহব বম জানি আগি।
বিদ্যাপতি কত আপনহি আউতি
সিরি সিবসিংহ লাগি॥

প্রেমের তরুবর আপনি বাড়িল, কারণ কিছু ছিল না, শাখা-পল্লব-কুসুমে ব্যাপ্ত হইল, সৌরভ দশদিকে গেল। হে সখি, দুর্জনের দুর্নীতি পাইয়া যেন মূল শীর্ষের সহিত ভাজিয়া গেল, অস্থানে পড়িয়া শুখাইয়া গেল। কুলের ধরম প্রথমেই আলি আসিল, কে ফিরাইয়া দিবে? চোরের মার মত মনে মনে শোক করিতেছি। এরূপ অবস্থায়, দেহ গৃহ ভাল লাগে না, বাহিরে যেন অগ্নি উদ্‌গিরণ করিতেছে। বিদ্যাপতি কহে, শ্রীশিবসিংহের লাগিয়া আপনি আসিবে। আর চণ্ডিদাস গাইলেন,—

"নিঠুর কালিয়া না গেল বলিয়া
জানিলে যাইত সাথে।
গুরু গরবিত বসতি আমার
পর.. লইয়া হাতে॥
সই, কি আর বলিব তোরে।
আপন অন্তর না কর বেকত
তবে সে কহি যে তোরে॥
মনের মরম জানিবে কে।
সেই সে জানে মনের মরম
এ রসে মজিল যে॥

চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া পীরিতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে॥
কে আছে ব্যথিত যাবে পরতীত
এ দুখ কহি যে কারে।
হয় দুখভাগী পাই তার লাগি
তবে সে কহি যে তারে॥
পর কি জানয়ে পরের বেদন
সে রত আপন কাজে।
চণ্ডিদাস বলে বনের ভিতরে
কভু কি রোদন সাজে॥

রসজ্ঞ সুজন মাত্রেই যিনি এই বিচ্ছেদ ও মিলনের রসে রসিক ও দরদী, তিনি উভয়ের এই দুই পদ আলোচনা করিলেই বুঝিবেন, বিদ্যাপতি শুধু মাত্র রসের কথায় মজিয়াছেন, কিন্তু চণ্ডিদাস তাহাতে মজিয়া ডুবিয়া জীবনে এক নূতন অনুভূতির কথা বলিতেছেন। দুইটি গানে একই রকমের ভাবের ও কথার মিল পাওয়া যায়, হয়ত উভয়ে স্বতন্ত্রভাবেই ইহার স্রষ্টা, অথবা একজন একজনের আগে কিংবা পরে, কিন্তু তাহা লইয়া এখানে আমরা আলোচনা করিতে চাই না। আমি শুধু এখানে ভাবের দিক্ দিয়াই বিচার করিব। বিদ্যাপতির রাধিকা কহিতেছেন, প্রেমের তরুবর আপনি বাড়িল কিন্তু দুর্জনের দুর্নীতিতে তাহা উপযুক্ত স্থানের অভাবে শুখাইয়া গেল। আর সেই স্থলে চণ্ডিদাসের রাধিকা কহিতেছেন,—

'গুরু গরবিত বসতি আমার'

আমি প্রাণ হাতে করিয়া বাস করিতেছি, সইরে, তোরে আর কি বলিব, এ রসে যে মজিল, সেই মনের মরম কথা জানিবে। বিদ্যাপতির রাধিকা বলিতেছেন, 'কুলের ধর্ম প্রথমেই অলি আসিল, কে ফিরাইয়া দিবে? চণ্ডিদাসের রাধা বলিতেছেন,—

'কুলবতী হইয়া পীরিতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে॥

চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে।'

এই জায়গায় উভয়েই একই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু "মনে মনে শোক করিতেছি, মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতেছি"-র ব্যঞ্জনা হইতে 'পোয়ের লাগিয়া ফুকরি কাঁদিতে নারে' এই কথা কয়টিতে ভাব ও ভাষার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে, ইহাতে ওই ভাবটির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাহার পর বিদ্যাপতির রাধার অবস্থা 'গৃহ ভাল লাগিতেছে না, বাহিরেও অনল ঢালিয়া দিতেছে' ভিতরে বাহিরে জ্বলিয়া মরিতেছেন, এমন অবস্থায় বিদ্যাপতি কহিলেন, শিবসিংহের লাগিয়া আপনি আসিবে। অর্থাৎ তাঁর শিবসিংহের প্রেমে বন্ধ, শিবসিংহ তাহাকে আনিয়া দিবেন। চণ্ডিদাসের শিবসিংহ ছিল না। তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে হয় নাই, রাজার মন রাখিতে হইত না। তিনি বলিলেন রাধিকার মুখে,

'কুলবতী হৈয়া পীরিতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে,'

শুধু এইখানেই তিনি তাঁহার রাধার অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—

'পর কি জানয়ে পরের বেদন
সে রহ আপন কাজে।
চণ্ডিদাস বলে, বনের ভিতরে
কভু কি রোদন সাজে॥'

এই সমস্তটাকে একটা সার্বভৌমিক সত্যের উপর তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন। বিদ্যাপতি শুধু রাধার অন্তরে প্রবেশ করিয়া রাধার কথার সঙ্গে নিজের প্রাণের ভাব মিশাইয়া জড়াইয়া দিলেন, শুধু রাধার মনের নয়, কুলবতীর মনের কথাটি এমন সহজ সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহার তুলনা হয় না। তারপর নিজে রাধা হইয়া অথচ দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার রাধার সমস্ত ভাবটিকে বিশ্বের সার্বজনীন সত্যের উপর রাখিয়া তাহাকে গাঁথিয়া দিলেন। ভারত-শিল্পের আদর্শে যেমন বিশ্বের সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তির কথা পাওয়া যায়, ইহাও ঠিক সেই রকম। দেবালয় প্রতিষ্ঠার মধ্যে যে ধারা ভারত-শিল্পে পাওয়া যায়, সে দেবমন্দিরের প্রত্যেক পাষাণ খণ্ডের সার্থকতা

থাকে; বিশ্বকে আদর্শ করিয়া সেখানে যেটি যেমন ভাবে থাকিলে সুন্দর হয়, বিচিত্র হয়, সেখানে ঠিক তেমনি ভাবে গাঁথিয়া তোলা, এমন কি, সেই মন্দিরের স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত প্রস্তরখণ্ড ও বালুর রাশ জমান থাকে, খণ্ড প্রস্তর যে পূর্ণতা ভাল করে নাই, তাহার স্বাধীন পরিণতি যে বিশ্বের স্থানে স্থানে হয় নাই, তাহার নিদর্শন। বিশ্বকে আদর্শ করিয়াই ইহার রচনা। কবি চণ্ডিদাসের পদাবলী তেমনি যেন প্রকাণ্ড মন্দির। ভারত-শিল্পে স্থাপত্য যেমন অতুলনীয়, চণ্ডিদাসের পদাবলী তেমনি সার্বজনীন ও অতুলনীয়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের পরম্পরের এই সমস্ত পদাবলী পূর্বরাগ হইতে শেষ পর্যন্ত দেখাইবার স্থান এখানে নাই, কেন না, তাহা অতি বিস্তৃত ভাবে, বিশদভাবে না দেখাইলে তাহার ঠিক চরম উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। তবে উভয়ের পদাবলীর রসবিভাগ করিয়া তাহার অনুভূতির কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বিদ্যাপতির প্রেমে বেদনা অপেক্ষা সুখের অতিশয্যই বেশী। তাহাতে দুঃখটুকু যেন সোহাগ করিয়া ঢালিয়া দেওয়া, তাহাতে প্রাণের সে তীব্রতা, আন্তরিকতা নাই। কিন্তু প্রাণের ভিতর যে অতলস্পর্শ সমুদ্র আছে, তাহাতে গাহন করিতে পারেন নাই। সে "ত্রিভুবনমত্তিতন্ময় বিরহ" বিদ্যাপতির ভিতর নাই। আছে ছন্দসুর তাল, অনন্যসাধারণ উপমার ছটা, ভিতরের কথা ভাল করিয়া অনুভূতিতে না আসিলে উপরের কথাই বেশী হইয়া পড়ে। অলঙ্কারেই সৌন্দর্যকে ম্লান করে। বিদ্যাপতির কাব্যে কতকটা তাহাই ঘটিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙ্গলার এই প্রেম-রসের সাধন রাধা-কৃষ্ণ-লীলার গানে গৌড়জনের প্রাণমন শীতল করিত। দেশে তখন অবধি হাওয়া, অজস্র জলস্রোত। পাখীতে রাধাকৃষ্ণ বুলি বলিত, মানুষে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের আদর্শে জীবনের অনুভূতি লাভ করিত। বাঙ্গলাদেশ তখন গানে গানে মুখরিত ছিল। সে কাল এখন নাই। সে পদাবলী সাহিত্যের গানগুলিকে বৈষ্ণব কবিরা এক এক রসে ভাগ করিয়া সমস্ত গাঁথিয়া দিয়াছেন। সমস্ত পদাবলী গানগুলি তাহাতে যেন ফুল-লতা-পাতার রঙের বিচিত্র সমাবেশ। প্রত্যেকটি যেন এক একটি খিলান, আর রস যেন সেই খিলানের চাবি, সেই খিলানের পর খিলান গাঁথিয়া এক বিশাল বিরাট মন্দির রচনা করিয়াছেন,—যাহাতে মানবের সকল অবস্থার রসলীলাই

তাহার মধ্যে ফুটিয়া আছে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের যে সকল পদাবলী ভাব-সম্মিলনে বা রাগাত্মিকায় আছে, তাহারই মধ্য হইতে আমি সেই শ্রেষ্ঠ অনুভূতির ও রূপান্তরের যে যেভাব, সুর ও ধারা পাইয়াছি, তাহাই বলিব। বিদ্যাপতির একটি সর্বজন বিদিত পদ আছে, তাহাকে লোকে পদাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা বলে ;—

"সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥
জনমি অবধি হম্ রূপ নিহারল
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল ॥
কত মধু যামিনী রভসে গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল !
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তৈঁও হিয় জুড়ন ন গেল ॥
যত যত রসিক জন রসে অনুগমন
অনুভব কাহে ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত
লাখে ন মিলল এক।"

আমার মনের ধারণা যে, লোকে এই কবিতাটিকে অতি শ্রেষ্ঠ বলেন, তাহার কারণ তাহারা চণ্ডিদাসের পদাবলী আলোচনায় যে রসজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাই বিদ্যাপতির এই পদের উপর আরোপ করিয়া তাহার এত গভীর অর্থ করেন। বিদ্যাপতির শেষ কথা হইল,—

"লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তৈঁও হিয় জুড়ন ন গেল,"

ইহা সেই চির-নূতন ভাবে রসোল্লাসের কথা। জন্ম হইতেই আমি রূপের মধ্যে নয়ন ডুবাইয়া রাখিয়াছি, তবু সে রূপের সীমা পাইলাম না, লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া বঁধুকে বুকে বুকে করিয়া রাখিলাম, তবু ত এ হৃদয় জুড়াইল না, নয়নের

তৃষ্ণা মিটিল না। বিদ্যাপতি এই মিলনের মধ্যে সেই মহামিলনের জন্য ব্যাকুল, তাহার আভাস জাগিয়াছে। বিশ্বের রূপ শব্দ স্পর্শ গন্ধকে তিনি জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, রূপ রস গন্ধও তাহাকে তেমনি আগ্রহে জড়াইয়াছিল, তিনি তাহাদের ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই, এদের সঙ্গে জন্ম হইতে দেখা শুনা, তবু তাহাদের পরিচয় ভাল করিয়া হয় নাই, আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে বুকে বুকে করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। তিনি "প্রেয়র" মধ্যেই ডুবিয়া ছিলেন, প্রেয়র মধ্যে শ্রেয়কে দেখিতে পান নাই; আর চণ্ডিদাস গাইলেন,—

"বঁধূ কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি
সব সমর্পিয়া এক-মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥

* * * *

আঁখির নিমিষে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডিদাস কয় পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি ॥"

সেই কথা শুধু আঁখির তৃপ্তির কথা নয়, না দেখিলে পরাণ যে বাঁচে না। বিদ্যাপতি সুর বদলাইয়া উপরের পর্দায় ওঠেন নাই, চণ্ডিদাস সুরের আসল রূপটি ধরিয়া একেবারে অন্তরের ভিতর চাহিয়া ডুবিয়া গেলেন, গাইলেন,—

"বঁধূ তুমি সে পরশ-মণি হে
তুমি সে পরশ-মণি।

* * * *

(এক) তিলে শত যুগ দরশন মানি
ছেড়ে কি রইতে পারি হে ॥"

এখানে যে সব মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেছে। এখানে শুধু ইন্দ্রিয়

গ্রামের সুর, এ সুর অন্তরের মিলন মন্দিরের অনাহত ধ্বনি।

তারপর বিদ্যাপতির 'প্রার্থনা'—

"যতনে যতেক ধন পাপে বটো বলো।
মিলি মিলি পরিজন খাব।
মরনক বেরি হেরি কোই ন পুছত
করম সঙ্গ চলি যাব॥
এ হরি বন্দো তুয় পদনায়।
তুয় পদ পরিহরি পাপ পয়োনিধি
পার হোয়ব কোন উপায়॥'

পাপ কর্ম দ্বারা যতেক ধন সঞ্চয় করিলাম, পরিজন মিলে মিলে খাবে, মরণের সময় কেহ জিজ্ঞাসা ত করে না, কর্ম সঙ্গে চলিয়া যাবে—

অন্যত্র—

আধ জনম হম নিদে গমাওল
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রস রঙ্গে মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসান
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরি সমান"

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, হে মাধব, আমার পরিণামে আর আশা নাই। কিন্তু প্রেমে যে মজিয়া ডুবিয়া, মরিয়া মরিয়া, বাঁচিয়া উঠিয়াছে, তার এ মরণ-ভয় কেন? প্রেম যে অমর, সে ত মরণের সময় ভয় পাইবে না, তার ত পরিণাম ও পরিণতি নাই। সে যে নিত্য সত্য জীবন্মুক্ত, তাহার এ ত্রাস কেন? তিনি বলিতেছেন,—

"আদি অনাদি নাথ কহাওসি
অব তারণ ভার তোহারা—"

তোমায় আদি অনাদির নাথ লোকে বলে, এখন তরাইবার ভার তোমার, হে মাধব আমায় তরাও। কিন্তু চণ্ডিদাস কি গাহিলেন—

"মরমে মরমে জীবনে মরণে
জীয়ন্তে মরিল যারা
নিতুই নূতন পীরিত রতন
যতনে রাখিল তারা ॥"

যাহারা প্রেমে এমন করিয়া মরিয়াছে, তাহাদের সবই সে নিতুই নব। তাহাদের ত পরিণাম ভয় নাই।

"সুজন পীরিতি পরাণ রেখ
পরিণামে কভু ন হবে টোট।
ঘষিতে ঘষিতে চন্দন সার
দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার ॥"

এ যে সুজনের পীরিতি, এ যে পরাণ মন ভরিয়া রাখিয়াছে, ইহাতে ত কাম-গন্ধ নাই। এ প্রেমে পরিণামে কভু টুটিবার ভয় নাই। সে যে নূতনকে আরো সৌরভে স্নিগ্ধ করিয়া আনিয়া দেয়। চন্দন যেমন ঘষিতে ঘষিতে দ্বিগুণ সৌরভে আমোদিত করে, এ প্রেম তেমনি।

"পুত্র পরিজন, সংসার আপন
সকল ত্যজিয়া লেখ
পীরিতি করিলে তাহারে পাইবে
মনেতে ভাবিয়া দেখ"

চণ্ডিদাসের পাপের ভার বোধ হয় নাই। যে প্রেমের আগুনে 'পুড়িয়া পুড়িয়া হেম হইয়াছে, তার আবার পাপ কি, তাহার সেই প্রেমের মধ্যে "তাহারে পাইবে।" এ বিশ্ব-সংসার তাঁহারি, তাঁহাকে যখন পাইলাম, তখন 'পুত্র পরিজন সংসার আপন' সকলিই ত মিলিল। তারপর চণ্ডিদাসের শেষ অনুভূতি। এখানে চণ্ডিদাস জন্ম-মৃত্যুর অতীত, সুখ-দুঃখের অতীত, ভয়-ভাবনার অতীত ইন্দ্রিয় গ্রাম সব ডুবাইয়া এক অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতের রস সিন্ধুর মাঝে ঢেউয়ের মত দুলিতেছেন।

"মা বাপ জনম না ছিল যখন
আমার জনম হ'ল
দাদার জনম না ছিল যখন
পাকিল মাথার চুল

ভগ্নীর জনম না ছিল যখন
ভাগিনা হল বুড়া।
অনিত্য কুলের একি বিপরীতে
ন পিতা ন পিতা খুড়া
শ্বশুর শাশুড়ী না ছিল যখন
তখন হয়েছে বউ
ঘরের ভিতরে বসিয়া রয়েছে
ইহা না বুঝয়ে কেউ
মাটীর জনম ছিল না যখন
তখন করেছি চাষ
দিবস রজনী না ছিল যখন
তখন গণেছি মাস
(এখন) একুল ওকুল দুকুল ডুবিল
পাথারে পড়িল দেহ
কহে চণ্ডিদাস কে আমি কে তুমি
ইহা না বুঝায়ে কেহ ॥"

ইহা চণ্ডিদাসের শেষ কথা, অনুভূতির চরমোল্লাস। এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যত রকমের প্রাণের সম্পর্ক, সকলঃ ছিল, আছে। অনন্ত অনন্ত কাল ধরিয়া আছে, খেলা চলিয়াছে, এখন একুল ওকুল দুকুলের ভাবনা নাই, লীলা-সাগরে দেহ পড়িয়া ভাসিতেছে। চিরকাল কল্পকাল ধরিয়া তুমি আর আমি এই খেলার রসে মজিয়া আছি। এ কেহ বুঝে না, যে রসিক হইয়াছে, যে ঘরের ভিতর ঢুকিয়াছে, সেই সে জানে ঘরের কথা।

চণ্ডিদাস জীবনে সকল অবস্থার ভিতর দিয়াই সকল রসের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার অনুভূতিতে সিদ্ধ হইয়া তবে এমন কথা বলিয়াছেন। চণ্ডিদাস আর বিদ্যাপতির আর বিশদ সমালোচনা করিবার স্থান এ নয়, সময়ও অল্প, এই কয়টা কথা যাহা বলিলাম, ইহাতেই আমি সে কথা বোধহয় বুঝাইতে পারিয়াছি। বিদ্যাপতির দোষের কথা যাহা বলিলাম, সে শুধু চণ্ডিদাসের সঙ্গে তুলনা করিয়া। কিন্তু বিদ্যাপতি যে খুব বড় কবি, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? আমি শুধু এই কথাই বলিতে চাই যে, চণ্ডিদাসের জীবনে যে

অনুভূতি পাওয়া যায় বিদ্যাপতিতে তাহা পাওয়া যায় না; সে অনুভূতি আর কোন কবির হয় নাই। তবে এইটুকু মাত্র বুঝা যায় যে, সেই আদর্শেই বাঙ্গলা এখন পৌছিতে চেষ্টা করিতেছে। আশা করা যায় বিমল রূপ মাধুরী আবার আমার দেশে ফুটিয়া উঠিবে। চণ্ডিদাস গাইয়াছেন,—

"মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা,
কায নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা
আমার বাহির দুয়ারে, কপাট লেগেছে
ভিতরে দুয়ার খোলা,
তোরা নিসাড় হইয়া আয় না সজনি
আঁধার পেরিলে আলা।
আলোর ভিতরে কালাটি আছে
চৌকি রয়েছে সেথা,
ও দেশের কথা এ দেশে কহিলে
লাগিবে মরমে ব্যথা॥"

যে দেশের কথা চণ্ডিদাস গাহিয়াছেন, সেই দেশের কাহিনী গানে না ফুটাইলে গানের সার্থকতা কই? কল্প কলা ও জীবনের আদর্শ তাহা না হইলে বা মিলে কই? তিনি বলিতেছেন, "বাহির দুয়ারে কপাট লাগিয়াছে, এখন ভিতর দুয়ার খোলা। তোরা নিসাড় হইয়া চুপে চুপে আয়, দেখ্‌বি আলোর মাঝে সেই কালো।" এ সবই সেই দেশের সেই ঘরের কথা।

চণ্ডিদাস বিদ্যাপতির পর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের আবির্ভাব। চণ্ডিদাসের ভালোবাসা যাহা ভাবের ও রসের অনুভূতি আশ্রয় করিয়াছিল, মহাপ্রভুতে তাহা জীবন্ত জাগ্রত জ্বলন্ত হইয়া উঠিল। দিনমণি-সূর্যের সঙ্গে যেমন উষার অরুণালোকের সম্পর্ক, চৈতন্যের সঙ্গে চণ্ডিদাসের ঠিক সেই সম্পর্ক; চণ্ডিদাস অরুণের রথ বাঙ্গলায় জানাইয়া গেলেন, রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী পৃথিবীর পূর্ণরূপ আসিতেছে, উঠ, উঠ, জাগ—

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দিব্যোন্মাদের পরে বলিলেন,—

"ন ধনং ন জন্ম ন সুন্দরী কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাত্তক্তির হৈতুকী ত্বয়ি ॥”

হে জগদীশ্বর! আমি তোমার নিকট ধন চাহি না, জন চাহি না মনোহর কবিতা চাই না, এ সকলের কিছুই আমি কামনা করি না কিন্তু জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী শুদ্ধাভক্তি জন্মে, আমাকে এই আশীর্বাদ কর।

চণ্ডিদাসের গানের যা অভাব ছিল, মহাপ্রভুর জীবনে তাহা পূরণ হইল। মহাপ্রভু বলিলেন, “অহৈতুকী ভক্তি দাও, জগদীশ, আর কিছুরই কামনা করি না।”

হে প্রাণবল্লভ! আমি তোমারই, আর যে কিছুই জানি না; ইচ্ছা হয় দয়া করিয়া আমায় আলিঙ্গন দাও। অথবা পায়ের তলে দলিত করিয়া সুখী হও, কিংবা অদর্শনে আমার মর্মকে ভাঙ্গিয়া ফেল। হে লম্পট, তুমি আমার যে বিধান করিলে সুখী হও, তাই কর, তাই আমার ভাল, কারণ আমি জানি তুমি যে আমার প্রাণনাথ—অপর কেউ ত নয়।

যখন রায় রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর তত্ত্ব-বিষয়ে প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল—তাহার কথা বলিব। যদিও তাহাতে গীতি-কবিতার কিছু নাই, তথাপি চণ্ডিদাসের উপলব্ধি জ্ঞানের ও রসের মধ্য দিয়া কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া মহাপ্রভুতে তাহার শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহার কথা চাই। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে তাহার সুন্দর বর্ণনা আছে। রায় রামানন্দকে মহাপ্রভু প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, রায় কহিতে লাগিলেন,—

প্রভু কহে পড শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্মার্পণ সর্ব সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে ইহা বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্মত্যাগ ভক্তি-সাধ্য-সার ॥
প্রভু কহে ইহা বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি সাধ্য-সার ॥
প্রভু কহে ইহা বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞান শূন্যাভক্তি সাধ্য সার ॥

প্রভু কহে ইহা হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেম-ভক্তি সর্বসাধ্য সার ॥
প্রভু কহে ইহা হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্বসাধ্য সার ॥
প্রভু কহে ইহা হয় কিছু আগে আর।
রায় কহে সখ্য প্রেম সর্বসাধ্য সার ॥
প্রভু কহে ইহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য-প্রেম সর্বসাধ্য সার ॥
প্রভু কহে ইহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তভাব প্রেমসাধ্য-সার ॥

ইহার পর যখন মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন রামানন্দ কহিলেন,—

'রায় কহে আর বুদ্ধি গতি নাহিক আমার'

তখন রায় রামানন্দ স্বরচিত একটি গান গাহিলেন, বলিলেন, "প্রভো, শুধু একটি কথা মনে পড়িতেছে, সেই কথাটি বলিলেই আমার বলার শেষ হয়, কিন্তু তাহাতে আপনার চিত্ত-বিনোদন হইবে কি না, তাহাতে যে সন্দেহ হইতেছে।" মহাপ্রভু ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "রামরায়, ব'ল, বল, সেই রাধা-কৃষ্ণের বিলাস বিবর্তের কথা শুনিতে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে।" তখন রায় গাইলেন। সর্প যেমন ফণা তুলিয়া বাঁশীর স্বর শুনে, মহাপ্রভু তেমনি ভাবে দুলিয়া দুলিয়া শুনিতে লাগিলেন।

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হম্ রমণী
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি ॥

মন এখানে প্রেম রসে ভরপুর। ভেদ-বুদ্ধি রসের অতলে ডুবিয়া গেছে। ইহাই কল্প কলার শ্রেষ্ঠ রূপান্তর।

যুগল প্রেমের এই যে বিলাস-পর্ব, চণ্ডিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যে তাহার অপরূপ স্ফূর্তি হইয়াছিল। সে শুধু ভাব রাজ্যের অনুভূতিতে নয়, দেহ মন কর্মে, ধ্যানে ধারণায়, তাহার সমাধিতে তাহা ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাই মনে হয়, চণ্ডিদাস যেন মহাপ্রভুর সৃষ্টিকে আনিতেছিলেন। শতেক

যুগের যে ফুল ফুটিবে, তাহাই বাঙ্গলার মনে লুকাইয়াছিল, যে—

'হৃদয় আছিল বেকত হইল,
এখন দেখিনু সে,'

এমন করিয়া ভাব-রাজ্যের খেলা সৃষ্টিতে সহজ সরলরূপে সত্যরূপে রূপান্তর হইয়া উঠিল। কবির ভাব জাগ্রত মূর্তি ধরিল, কবি যে স্রষ্টা, কবি যে ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলে। চণ্ডিদাস সেই রূপান্তরের স্রষ্টা। বাঙ্গলার গীতি-কবিতার যদি আদর্শ থাকে, প্রাণ থাকে, তবে ইহা বাঙ্গলার নিজস্ব শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। চণ্ডিদাসের গান আর মহাপ্রভুর জীবন ইহাই বাঙ্গলার সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব।

শ্রীচৈতন্য প্রভুর আবির্ভাবে বাঙ্গলা গানে ও প্রেমে মাতিয়া উঠিয়াছিল, চণ্ডিদাসের গৌড়ীয় যুগে যে সকল রসের লীলায় দেশ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পর তাহার ব্যাপ্তি ও পরিধি আরো বাড়িয়া উঠিয়াছিল, আরো সার্বজনীন হইয়া সেই ভাব গানে জীবনে ও কর্মে মুখর হইয়া উঠিযাছিল।

ভাগবতে ভগবানকে শুধু যুগল-রস মূর্তিতে দেখে নাই, তাহার ভিতর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের রসাবতারণা আছে। লীলা এই বিশ্বের চরমের মধ্য দিয়া শুধু মধুরেই খেলায় নাই, তাহাতে কল্যাণ ও মঙ্গলের কথাও আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব যুগে তাহার কিছু কিছু সাধনাও হইয়াছিল। এই ভাগবত ধর্মের সঙ্গে রামানুজ ও মাধ্বের ভাব শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেশে আসিয়াছিল। মহাপ্রভু তাহাকে আপনার করিয়া লইয়া নিজেতে তাহার সমন্বয় করিয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহার জন্মের পর, আমরা যে সমস্ত পদাবলী সাহিত্যের গান পাই, তাহাতে সেই পূর্বকার যুগল সম্বন্ধের কথার ভিতর দিয়াই সকলে পৌছিতে চেষ্টা করিয়াছেন সেই রূপান্তরই তাঁহার আদর্শ ছিল বটে, কিন্তু মহাপ্রভু যে পাপীর উদ্ধারের নূতন কথাটি আনিলেন, কাব্যে তাহার চরম পরিণতি ও রূপান্তর হয় নাই। জ্ঞানদাস গোবিন্দ দাস প্রভৃতি কবিরা সেই চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতিকেই অনুসরণ করিয়া সেই পথের পথিক হইয়াই চলিয়াছেন, চণ্ডিদাস হইতে কেহই অগ্রসর হইতে পারেন নাই, এমন কি, সে আদর্শেও পৌছিতে পারেন নাই। তবে এইটুকু বেশ বুঝা যায় যে, সকলেই সেই আদর্শের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাঁহাদের

সেই পদাবলীর ভিতর সেই একই সুর, একই ছন্দ, একই তাল।

কবি জ্ঞানদাসের একটি পদ কীর্তন তুলিয়া দেখাইব যে, সে একই ধারা অক্ষুণ্ণভাবে রহিয়াছে—

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে
পবাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে
কি আর বলিব সই কি আর বলিব
যে পণ করাছি চিতে সেই সে করিব
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে
বল কি বলিতে পার যত মনে ওঠে
দেখিতে যে সুখ ওঠে কি বলিব তা
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধীরে
লহু লহু কহে কথা পীরিতি মিশালে।
ঘরের সকল লোকে করে কানাকানি
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাব আগুনি।'

সেই একই কথা—'রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।'

রূপ দেখিয়া হৃদয়ের তৃষ্ণা ত মিটে না, সে যে কি সুখ, তা কেমন করিয়া বলিয়া উঠিব, তাহাকে দেখিয়া তাহার স্পর্শের জন্য গা যেন কেমন করিয়া উঠিতেছে। এত সেই পূর্বরাগ। জ্ঞানদাসের পদের একটু বিশেষত্ব আছে, সে বৈশিষ্ট্য—তাঁহার মুরলী শিক্ষা—

'মুরলী করাও উপদেশ
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম
কোন রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম।

*　*　*　*　*

জ্ঞান শুনিয়া কহএ হাসি হাসি
রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী'

জ্ঞানদাস বলিতেছেন, রাধা নামে সাধা-বাঁশী রাধার মুখেও 'রাধা' বলিবে, তার উপায় কি? বাঁশীরও সেই ভাব রূপান্তর হইয়া আছে, ত রাধা ছাড়া আর কিছু বোল বলিতে পারে না, তারও জীবন যে রাধা। কিন্তু এই সকল কবিতাই চণ্ডিদাসের ছাপ। এ কবিতাগুলির মধ্যে চণ্ডিদাসের হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করা যায়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের পর আমরা যে যে কবির পদাবলী পাই, তাহার ভিতরে সেই আগেকার রাগিণীই ফুকারিয়া উঠিতেছে। তবে বাঙ্গলা দেশের একেবারে ঘরের কোণের কথার ভিতর সেইভাব সত্যরূপে ফুটিয়াছে, এখানেও রসকলার সেই রূপান্তর। কবি লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল প্রণয়ন করেন। তাঁহার একটি পদে আমরা দেখিতে পাই, তাহা এই —

"এস এস বঁধু এস আধ আঁচরে বস
আঁখি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি
(আমার) অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি।
মণি নও মাণিক নও হার করে গলায় পরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
(আমায়) নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥
বঁধু তোমায় যখন পড়ে মনে (আমি) চাই বৃন্দাবন পানে
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি!
রন্ধন শালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণগাই
ধুঁয়ার ছলনা করে কাঁদি॥
কাজর করিয়া যদি নয়নেতে পরি গো
তাহে পরিজন পরিবাদ।
বাজন নূপুর হয়ে চরণে রহিব গো
লোচন দাসের এই সাধ॥"

ইহাঁর ভিতরে সেই প্রেম, প্রাণের ভিতর কুরিয়া কুরিয়া বাহির হইয়াছে। গৌরাঙ্গের জন্মের পর বাঙ্গলায় আর এত বড় কবি জন্মায় নাই। লোচন-

দাস গৌরাঙ্গের ভাবে বিভোর হইয়া গাহিয়াছিলেন,—

"আর শুনেছ আলো সই গোরা ভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুলবধূ কাঁদে আকুল তথা॥
হলুদ বাটিতে গোরী বসিল যতনে
হলুদ বরণ গোরাচাঁদ পড়ি গেল মনে॥
মনে প্রাণে মেল ধনী রূপ মন প্রাণ টানে।
ছন ছনানি মনে গো সই ছটফটানি প্রাণে॥
কিসের রাঁধন কিসের বাড়ন, কিসের হলুদ বাটা।
আঁখির জলে বুক ভিজিল ভেসে গেল পাটা॥
উঠিল গৌরাঙ্গভাব সমবরিতে নারে।
লোহেতে ভিজিল বাটন গেল ছারখারে॥
লোচন বলে আলো সই কি বলিব আর।
হয় নাই, হবার নয় এমন অবতার॥"

বাঙ্গলার ঘরকন্নার কথার ভিতর দিয়া এমন করিয়া আর কখনও কাব্যরস ফুটিয়া ওঠে নাই, এ অপূর্ব, অনুপম। গৌরাঙ্গ জীবন্ত প্রেমের ভাবে মাতোয়ারা হইয়া দেশকে প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করিয়া গিয়াছিলেন।

ভাগবতে যে মধুর ও মঙ্গলের আভাস আছে, চৈতন্যে তাহার সমন্বয় হইয়াছিল। একদিকে নিত্যানন্দ আর একদিকে যবন হরিদাসের মিলন, আর অন্য দিকে জগাই মাধাই উদ্ধার। এই সকল লইয়া অনেক পদকীর্তন আছে; এখনও বাঙ্গলায় তাহা ভিখারী বৈষ্ণবে গাইয়া বেড়ায়, কিন্তু তাহাতে কল্পকলার সে রূপান্তর কোথাও ফুটিয়া ওঠে নাই শুধু আভাসেই থামিয়া গিয়াছে। চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, লোচনদাস প্রভৃতি কবিরা যেমন রসের অনুভূতির সঙ্গে তাহাকে সেই রূপান্তর লইয়া গিয়াছেন। ইহাদের ভিতর অন্যান্য কবিরা আর তেমনটা পারেন নাই। কেহ বা বলিতেছেন,—

'হরি হরি আর কি এমন দশা হব
ত্যজ্য করি মায়ামোহ ছাড়িয়া পুরুষদেহ,
কবে হাম প্রকৃতি হইব॥'

ইহা কবি নরোত্তমদাসের পদে আছে। পুরুষ দেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতি হইবার সাধ পর্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে, কিন্তু চণ্ডিদাস প্রভৃতির

ভিতর বাহির এক হইয়া গেছে। চণ্ডিদাস যা গাইয়াছেন, কবি লোচনদাসও তাহাই গাইয়াছেন,—

"এ দেশেতে কবাট দিলে, সে দেশ তো পাই
বাহির গাঁয়ে কাম নাই চল ভিতর গাঁযে যাই ।।
সাপের মণি বাহির করিলে হারাই যদি মণি
মণি হারাইলে তবে না বাঁচয়ে ফণি ।।
যতন করে রতন রাখা বাহির করা নয়
প্রাণের ধনকে বার করিলে চৌকী দিতে হয ।।
লোচন বলে ভাবিস কেনে, ঢোক আপনার ঘর
হিয়ার মাঝে গোরাচাঁদে মন ডুবায়ে ধর ॥"

ইহা অবস্থার কথা, ভাষার জ্ঞানের দ্বারা ইহা বুঝান যায় না। চৈতন্যের যুগে পরবর্তী গীতি-কবিদের মধ্যে একমাত্র লোচনদাসই চণ্ডিদাসের ভাবের ও রসের অনুভূতির পর্দায় গাইয়াছিলেন, তাহার পর আর সমগ্র গৌর-পদ-তরঙ্গিনীর ভিতর এমন কেহ নাই, যাহার কবিতায় সে অনুভূতির লেশমাত্র পাওয়া যায়। সুর নামিয়া যাইবার কারণ কি? কারণ যে ঠিক কি, তাহা বুঝান কঠিন। তবে একটা কারণ বোধ হয় এই, যে ফুল শত যুগ ধরিয়া ফুটিতে চাহিতেছিল, যাহার জন্য সেই সান্ধ্য ভাষায় আঁধো আলো আঁধো আঁধারের ভিতর হইতে ভাব ফোট ফোট হইয়াও ফুটে নাই, তাহার পর দিন গেছে। মানব-মনের ভিতর দিয়া অজ্ঞানে সে ভাবের ধীরে ধীরে স্ফুরণ হইয়াছে, ধীরে ধীরে কত যুগ অন্ধকার ও আলোকের, আশা ও নিরাশার ভিতরে চণ্ডিদাস দেখা দিয়াছে, বিদ্যাপতির রূপ রসাভাসে ফুটিয়াছে। সেই ফুল যখন চৈতন্যে আসিয়া সাক্ষাৎ ফুটিয়া দশদিশি গন্ধে ভরিয়া গেল, তখনই সেই শত শত যুগের কল্পনা সত্যরূপে প্রতিভাত হইল। তাহার পূর্ণ হইবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতর হইয়া প্রকাশ হইল। ইহার পর ভাগবত ধর্মের সহিত রামানুজের যে লীলা ভক্তির ভাব দেশে আসিয়াছিল, সে ভাব এমন পূর্ণভাবে মুঞ্জরিত হয় নাই। চণ্ডিদাসের প্রেম, বিদ্যাপতির রূপ বিলাস, লোচনের গৃহ ধর্মের সরল সহজ প্রাণের কথার সঙ্গে যে দিন সেই সার্বভৌমিক কল্পকলার সূচনা হইবে, সেদিন জগৎ দেখিবে, এই বাঙ্গলার প্রাণ কোথায়! আবার বাঙ্গলার মাটিতে তেমনি আবেগে, তেমনি সোহাগে,

তেমনি মধুর করুণ উজ্জ্বল লীলায় ফুটিয়া উঠিবে। পূর্ণ হইতে পূর্ণতর, রূপ হইতে রূপান্তরে ফুটিয়া জাগিয়া উঠিবে।

এই নরদেহ ধারণ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া জগতের অজ্ঞ, বদ্ধ, শ্রান্ত, তৃষিত, তাপিতের জন্য যে করুণা, মহাপ্রভুকে তাহার পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। শ্রীনিত্যানন্দে আমরা তাহার জীবন্ত, সজীব, জাগ্রত মূর্তির ভাব পাই। যখন কলসীর কাণায় কপাল কাটিয়া দর দর ধারে রক্ত ঝরিতেছে, তখন গাইতেছেন,—

"মেরেছ কলসীর কাণা
তা বলে কি প্রেম দেব না॥"

এই দুই ছত্র যখন মনে পড়ে, তখন মন প্রাণ এক অদ্ভুত নব রসে উছলিয়া ওঠে, আঁখি ছল ছল করে, মনে হয় আমার জন্ম সার্থক, সার্থক আমি বাঙ্গলায় জন্মিয়াছি!

বৈষ্ণব কবিদের এই অফুরন্ত গানের সুধার ধারায় সারা বাঙ্গলা দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। সমাজে দেশে তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু কালে সকলি ত বদল হয়। সেই সব জড়ান প্রাণ মাতান সুধা স্রোতে ধীরে ধীরে চড়া পড়িল, সে ধারা শুখাইয়া আসিতে লাগিল। সাহিত্যের অন্যান্য ভাগ শাখা পল্লবে ভরিয়া গেল, কিন্তু যেমনটি ছিল, তেমনটি আর হইল না। যখন মুসলমান বাঙ্গলায় প্রবেশ করিল, তখন বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি একেবারে হারায় নাই, তখনও সমাজে মাঝে মাঝে বিপ্লব বাধিয়াছে, সুর উঠিয়া সুর নামিয়াছে, তাহার পর সে নিজেকে হারাইয়া ফেলিল। বাঙ্গলা আপনাকে ভুলিয়া গেল। মুসলমান ধর্ম হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য বাঙ্গলা আপনার চারিধারে আচার ব্যবহারের একটা গণ্ডী টানিয়া দিল—সেই তাহারি মধ্যে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিল। কিন্তু সাহিত্যের ভাবে ও ভাষায় মুসলমানদের হাত একেবারে এড়াইতে পারিল না। দেশ তখন নিজের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে। একদিকে শাক্তের পঞ্চ মকার, আর অন্যদিকে বৈষ্ণবের শুখনা মালার ঠক্‌ঠকি, আর চারদিকে যত শৈবের দল ধর্মের নামে ধর্মকে একেবারে বিসর্জন দিতেছিল। একদিকে দেশের পতি মুসলমান, অন্যদিকে সমাজের পতি অসংখ্য ভূত প্রেত। এতদিন ধরিয়া যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া বাঙ্গলা নিজেকে আদর্শের সমান করিয়া আনিয়াছিল,

সে শক্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল। অন্ধকারের ভিতর দিয়াই বাঙ্গলা চলিয়া আসিল। তাহার পর কত নিশি পোহাইয়াছে, কত পাখী গাহিয়াছে, অরুণ কিরণে শ্যামল অঞ্চল উড়িয়াছে, কিন্তু যে মিলনের কথা বলিয়াছি তাহা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গেল। মুসলমান বাঙ্গলায় আসিবার পর বাঙ্গলা শ্রীহীন হইয়াছিল। একে দেশ দুর্বল, তাহার উপর মানসিংহ বাঙ্গলার রাজা। প্রাণের কবিতা তখন দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল।

এমন করিয়া সুখে দুঃখে আলো অন্ধকারের ভিতর দিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের যুগ আসিল। রাজার পৃষ্ঠ পোষিত সাহিত্য যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছিল।

ভারতচন্দ্রের উপর বৈষ্ণবের প্রভাব থাকিলেও তাহার কবিতা মুসলমানী ফার্সীর আরাবির ছাব ও ছায়ায় পরিপূর্ণ। তাহার চরিত্র অঙ্কনে নিপুণতা থাকিলেও এ কথা বলিতেই হইবে যে, চণ্ডীদাস যুগের বৃন্দা ও বড়ায়ের জায়গায় তিনি আনিলেন, মুসলমানী কেতাবের কুট্‌নী দাসীর কেচ্ছা। সে প্রাণ খুলিয়া প্রাণের কথা নাই, সে সখীর মত সখী নাই, সে সখীর জন্য অন্ধকারে প্রাণের আবেগে তাহার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইবার কেহই রহিল না। ভিতরে বাহিরে প্রাণের রস মরিয়া সে ধারা শুখাইয়া গেল।

তাহার পর অকস্মাৎ কোন্ শুভ মুহূর্তে রামপ্রসাদের জন্ম হইল। দেশ আবার গানের আস্বাদ পাইল। বৈষ্ণব কবিদের ঘর সংসার ঘেরিয়া যে কাব্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপরে তিনি নূতন রসের অনুভূতি দেখাইলেন, তিনি গাইলেন,—

"ওরে সকলের মূল ভক্তি তার দাসী
নির্বাণে কি আছে ফল জলেতে মিশায় জল
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি।"

এও সেই বৈষ্ণবের অহেতুকী ভক্তির কামনা। বাঙ্গলা আবার সেই সুর খুঁজিয়া পাইল, সাধকের সাধনা, ভাবের সাধনা ফুটিয়া উঠিল, রামপ্রসাদ গাইলেন,—

"এখন সন্ধ্যা বেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো।"

এও সেই দেশের কথা, যে দেশের গান চণ্ডিদাস গাহিয়া ছিলেন। রামপ্রসাদের পর বাঙ্গলা আবার কিছু দিন গানে ভরিয়া উঠিল। কবি-

ওয়ালাদের গানে বাঙ্গলার পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল। এই যুগকে বাঙ্গলার 'গানের যুগ' বলা যাইতে পারে। বিচিত্রভাব, বিচিত্র স্বর, বিচিত্র পদাবলী, ভাষা ও ভাবের অপূর্ব সংমিশ্রণ। যে বাঁশী একদিন বাঙ্গলাকে জাগাইয়াছিল, যাহার স্বরে বাঙ্গলার সুখ দুঃখ জড়াইয়া জড়াইয়া দেশের জীবন-মরণের প্রাণ হইয়াছিল, সেই সুরে আবার বাঁশী ডাকিল। তাহাতে বিচিত্র স্বরের মেলা। মুসলমানী কেচ্ছার আবিল স্রোতে বাঙ্গলা সাহিত্য ঘোলা হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার জাত গিয়াছিল, তাহার ধর্ম গিয়াছিল। রামপ্রসাদের গানে আবার তাহা ফিরিয়া আসিল। রামপ্রসাদের মাতৃভাবে, বাঙ্গলা মায়ের রূপে দেখা দিলেন। কখন্ মা আমার বাপের ঘর হইতে শ্বশুর ঘরে যাইতেছেন, কখন্ কৈশোর ও যৌবনের মধুর অভিনয় করিতেছেন, কখন কোলের ছেলেকে হারাইয়া মা পাগলিনীর মত কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন,—

"আমার উমা এলো বলে রাণী এলোকেশে ধায়"

বাঙ্গলার সেই আলিপনা দেওয়া ঘর, সেই তুলসীবন। সেই গৃহস্থের আঙ্গিনা, সেই মৃদুল মধুর বাতাস বহিয়া যায়।

তারপর নিধু, রাম বসু, হরু ঠাকুর, রূপচাঁদ পক্ষী প্রভৃতি কবিওয়ালারা আসিলেন। গানে দেশ তোলপাড় হইয়া গেল। সকলেই সেই কল্পকলার রূপান্তরে পৌছিতে যথেষ্ট সাধন করিয়াছেন। সেই আদর্শে কেহই পৌছিতে পারেন নাই।

রামপ্রসাদের সমসাময়িক ছিলেন আজু গোঁসাই, তিনি কতকটা রাম-প্রসাদের ছাঁদ, ধরন লইয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মত অবস্থায়, নিজেকে সে রূপান্তরে দাঁড় করাইতে পারেন নাই। তাহার পর নিধুবাবুর গান। তাঁহার এক নূতন কথা, নূতন ভাব, ভাষার দিক দিয়া দেশের জীবনকে আত্মস্থ করিবার প্রথম চেষ্টা তাহাতেই প্রকাশ দেখিতে পাই। তিনি গাইলেন,—

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা,
বিনে স্বদেশী ভাষা, পুরে কি আশা ॥
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারা-জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ॥

তখন হইতে বাঙ্গলা জাগিতে শিখিয়াছে। সে গানের যুগের অবতার,

সাধক রামপ্রসাদ। পূর্বে কিছু দিন যে থামিয়াছিল, তাহার পর অবিরাম জলোচ্ছ্বাসের মত গান আসিতে লাগিল। আবার সেইরূপ প্রেম, সেই ভালবাসার গান ফুটিয়া উঠিল। নিধু গাইলেন,—

"তারে দেখতে এত সাধ কেন।
তিলেক না হেরি যদি সজল নয়ন ॥
আভরণ করিয়াছি লোকের গঞ্জন।
তাহার কারণে মরি সে নহে আপন ॥
তাহার রূপের কথা অকথ্য কথন।
তবে যে ভুলেছে মন জানি না কি গুণ ॥
আবার—
তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে
আকাশের পূর্ণশশী সেও কান্দে কলঙ্কছলে ॥
সৌরভে গরবে, কে তব তুলনা হবে,
আপনি আপন সম্ভবে,
যেমন গঙ্গা-পূজা গঙ্গা-জলে ॥

এই মিঠে ভাষা ই বাঙ্গলার প্রাণের রাগিণী। শুনা যায়, নিধু শোরির পাঞ্জাবী মুসলমানী টপ্পার অনুকরণে, সেই সকল সুরের ধরনে এই সব প্রেম ভালবাসার গান বাঁধিয়াছিলেন, এই গানগুলিকে লোকে নিধুর টপ্পাই বলে। কিন্তু সুরের মুসলমানী ঢঙকে এমন আপনার করিয়া লইতে আর কেহই পারে নাই। আবার দেখুন,—

"না হতে পতন তনু দহন হইল আগে
আমার এ অনুতাপ তারে যেন নাহি লাগে।
চিতে চিতা সাজাইয়ে তাহে দুঃখ-তৃণ দিয়ে,
আপনি হইব দগ্ধ আপনারি অনুরাগে ॥

ইহাতে প্রাণের গভীরতা আছে, সুরের অতি মিঠা রস আছে, বাঙ্গলার ইহা নিজস্ব সম্পত্তি। বিদ্যাসুন্দরি ফার্সী বয়েতের পর এমন মিঠা গান আর হয় নাই। তাহার পর রাম নৃসিংহের গান,—

"সখি এ সকল প্রেম, প্রেম নয়
ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখের উদয় ॥

সুহৃদ ভজন লোক গঞ্জন,
কলঙ্ক-ভাজন হতে হয় ॥
এমন পীরিতি করি যাতে ভরি দুদিক্
ঐহিক আর পারত্রিক।

* * * *

"মন মধুব্রত হয়ে যেন রত
সেই নামামৃত সুধা খায়"

ইহাতেও সেই প্রেমের আভাস, তবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার পর হরু ঠাকুরের গান –

"নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে (ওগো ললিতে)
না দেখি এমন রূপ বারি মাঝেতে।

* * * *

আজু সখি এ কি রূপ নিরখিলাম হায়
নীর মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায়
ঢেউ দিও না কেউ এ জলে বলে কিশোরী
দরশনে দাগা দিলে হবে পাতকী ॥

* * * *

কুল শীল ভয় লজ্জা তার যায়
না রাখে জীবন আশ
তার জলে বা স্থলে বা
অন্তরীক্ষে কিবা সন্দেহ নাহি মরিবার।"

তাহার পর রাম বসুর গান। কবি ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছেন, "যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গলা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র সেইরূপ কবি ওয়ালাদের কবিতায় রাম বসু। যেমন ভৃঙ্গের পক্ষে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে সন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ, সেই রূপ ভাবুকের পক্ষে রাম বসুর গীত।" রাম বসুর গানে বাঙ্গলার ঘরের প্রাণের কথা যেমন ফুটিয়াছে, এমন আজ পর্যন্ত হইল না।

"দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেও না
তোমায় ভালবাসি তাই চোখের দেখা দেখতে চাই

বালক চিত্তরঞ্জন

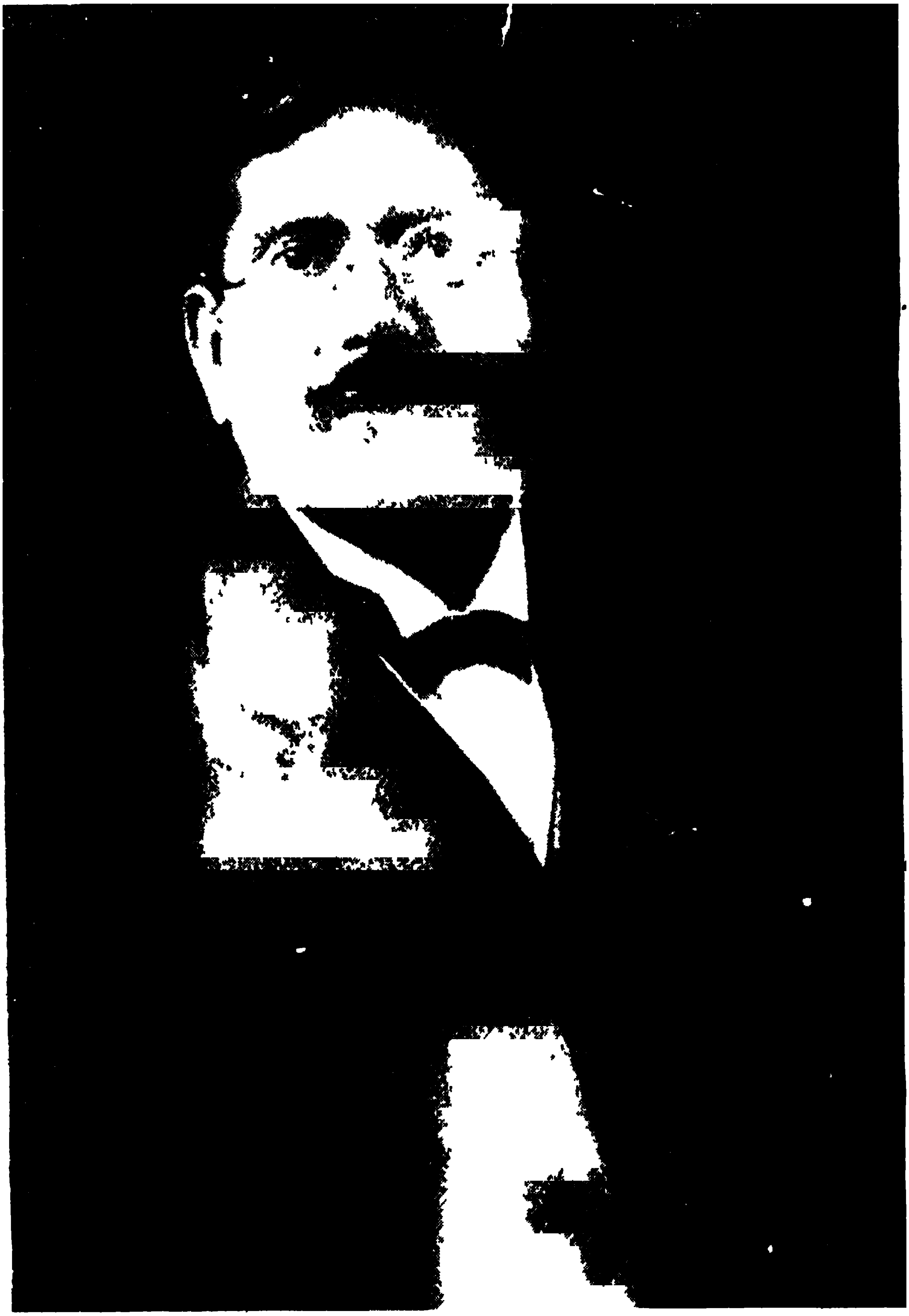

ব্যারিষ্টার মিষ্টার সি, আর, দাশ

সেদিনেব সুবিখ্যাত 'ফবওযার্ড' ইংবাজী দৈনিক পত্রিকার
প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক দেশবন্ধু চিত্তবঞ্জন

কারামুক্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

সপরিবারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

মাতা, স্ত্রী, পুত্র,
কন্যাদ্বয় ও জামাতাসহ
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

কলিকাতার প্রথম মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

কলিকাতা পৌরসভা-ভবনে
মেয়রের কক্ষ

কালকাতা পৌরসভা-ভবনে মেয়র দেশবন্ধুর বসিবার আসন

নাগপুরে মৃত স্বেচ্ছাসেবকের
পাশে দেশবন্ধু

পুণায় স্বাধীনতা-সংগ্রামী
নেতাদের সঙ্গে
দে... চিত্তরঞ্জন

দার্জ্জিলিং-এ মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেশবন্ধু

“ষ্টেপ এসাইড” দার্জ্জিলিং

ইখানে দেশবন্ধু থাকতেন

দি মল দার্জ্জিলিং" এখান থেকে দেশবন্ধুর মবদেহ কলিকাতায পাঠাবার উদ্যোগ হচ্ছে

নিদ্রায় দেশবন্ধু

দেশবন্ধুর মরদেহ -
দেখার আকুল প্রতীক্ষায়
নর্থ শিয়ালদা ষ্টেশনে
বিপুল জনতা

একটি অবিস্মরণীয় দৃশ্য····

কলিকাতাব রাজপথে দেশবন্ধুর শবাধাব

বহন করে নিয়ে চলেছেন মহাত্মা গান্ধী

কলিকাতা পৌরসভায়
শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন

চিরবিদায় দেবার উদ্দেশ্যে
বাড়ীর সামনে ব্যাকুল আগ্রহে
দাঁড়িয়ে আত্মীয় স্বজন

অশ্রুজলে বিদায়ের পর

শ্রাদ্ধবাসব

বব একাংশ

দেশের কল্যাণে
দাতাকর্ণ দেশবন্ধুর শেষ দান
১৪৮ নং রসা রোডে নিজভবন
এখানেই এখন জনকল্যাণে
নিযুক্ত চিত্তরঞ্জন সেবাসদন

কেওড়াতলা শ্মশানে দেশবন্ধুর স্মৃতিসৌধ

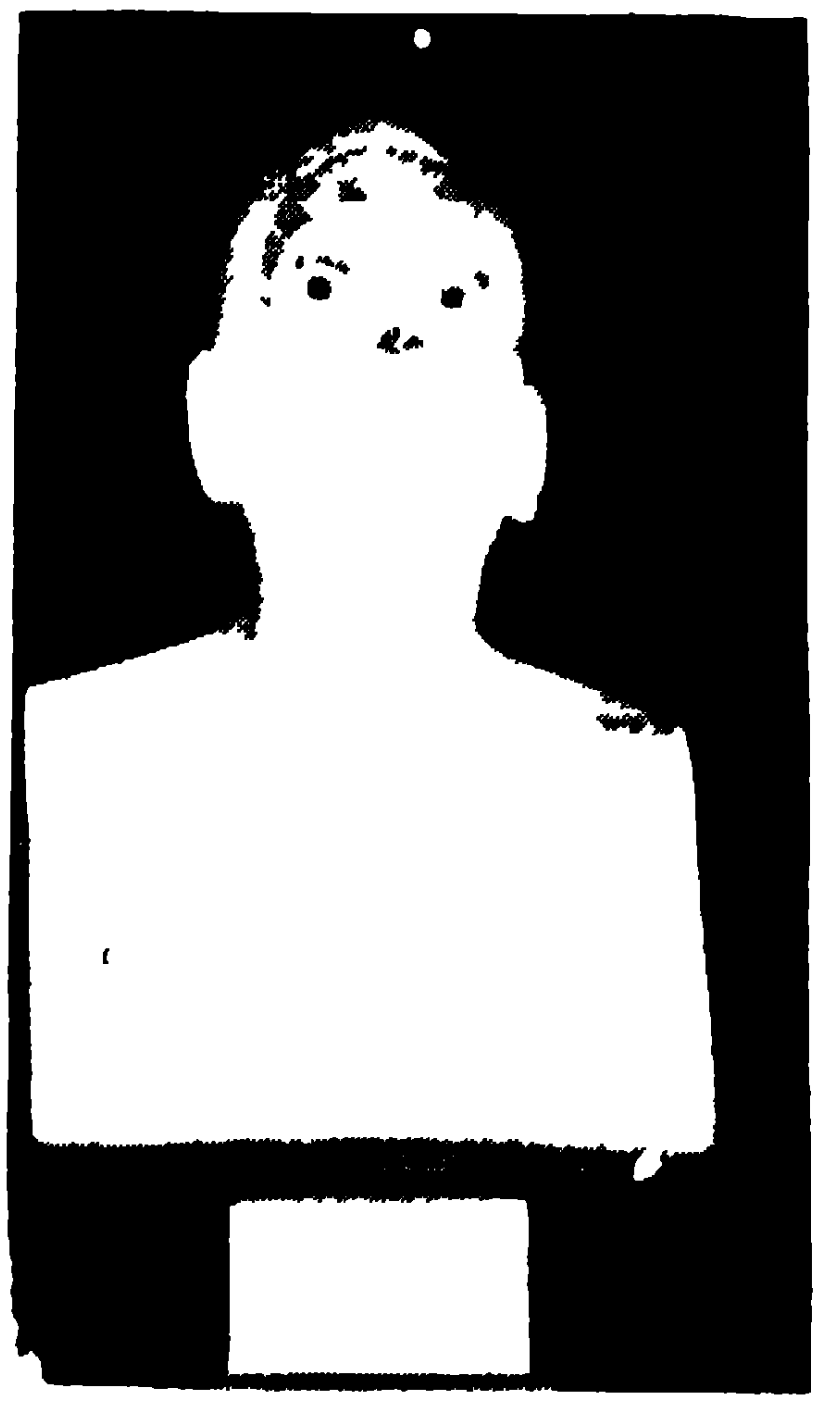

স্মৃতিসৌধে অবস্থিত দেশবন্ধুর মর্মরমূর্তি

কিছু কাল থাক, থাক বোলে ধরে রাখবো না
শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল
গেলো গেলো বিচ্ছেদে প্রাণ আমার গেল।
তোমার পরের প্রতি নির্ভর, আমি ত ভাবিনে পর
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না।"

এ সকল গানের তুলনা হয় না। তাহার পর—

"মনে রইল সই মনের বেদনা,
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি আর বলা হ'ল
সরমে মরম কথা কহা গেল না—
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে
নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিত লোকে—
সখি ধিক্ থাক্ আমারে ধিক্ সে বিধাতারে
নারী জনম যেন আর করে না॥"

রাম বসুর গানের অনুকরণে আজ কত গানই না বাঁধা হইল, কিন্তু তেমনটি আর হয় না। তেমং করিয়া প্রাণের মধ্যে ডুব দিয়া সরমে মরম কথা বলিবার ধরন আর নাই। আমার মনে হয়, রাম বসুর পর, বাঙ্গলায় আর এমন গান-বাঁধিয়ে জন্মায় নাই—

চণ্ডিদাস হইতে কৃষ্ণকমল পর্যন্ত সেই একই ধারা-স্রোতের মত বহিয়া আসিয়াছে। কৃষ্ণকমল গাইলেন,—

সখিরা বলিল,—

"রাই ধীরে ধীরে চল গজগামিনী
অমন করে যাস্‌নে যাস্‌নে যাস্‌নে গো ধনি,

* * * * *

না জানি কোন্ গহন বনে প্রাণ হারাবি গো
কত কণ্টক আছে গো বনে—
(দেখে চল গো কমলিনী)"

দিব্যোন্মাদে কৃষ্ণকমলের রাধিকা বলিলেন,—

আমার আবার কণ্টকাদির ভয় কি ?

"যখন নব অনুরাগে হৃদয় লাগিল দাগ
বিচারিলাম আগে, পাছে কাজে
(যা যা করতে হবে গো আমার সখি বঁধুর লাগি)
জানি প্রেম করে রাখালের সঙ্গে, ফিরতে হবে বনে বনে
ভুজঙ্গ কণ্টক পঙ্ক মাঝে
(সখি আমার যেতে যে হবে গো,
রাই বলে বাজিলে বাঁশী)
অঙ্গনে ঢালিয়া জল, করিয়ে অতি পিছল
চলাচল তাহাতে করিতাম ;
(সখি আমার চলতে যে হবে গো
বঁধুর লাগি পিছল পথে)
হইল আঁধার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি
গতাগতি করিয়ে শিখিতাম
(সদায় আমার ফিরতে যে হবে গো,—
কত কণ্টক কানন মাঝে)
এনে বিষ-বৈদ্যগণে বসিয়ে নির্জন স্থানে,
তন্ত্রমন্ত্র শিখেছিলাম কত ;
(যতন করে গো – ভুজঙ্গ দমন লাগি)
বঁধুর লাগি করলাম যত, এক মুখে কহিব কত
হত বিধি সব কৈল হত !
(হায় সে সব বৃথা যে হলো গো—সখি আমার করম দোষে)

এমন সরল গতিতে, সরল কথায় জীবনের খেলায় কেমন অনুভূতির প্রকাশ পাইয়াছে। এমন ভাষা এমন করিয়া প্রাণ মন ভরিয়া তোলা গান আর এখন শুনিতে পাই না।

কৃষ্ণকমল বৈষ্ণব গীতি পুনরুত্থান-কালের শ্রেষ্ঠ কবি।

এখানে চণ্ডিদাসের রাধিকা, বিদ্যাপতির রাধিকা আর কৃষ্ণকমলের রাধিকা এই তিনের মধ্যে এক অপূর্ব সামঞ্জস্য পাওয়া যায়, যদি এই তিনের সাধ্যভাব এক সঙ্গে সমন্বয় করিতে কেহ পারেন, সে মূর্তি জগতে

আজিও সৃষ্টি হয় নাই, কল্প-কলার সে রূপান্তরের জন্য বাঙ্গলা উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে। বিদ্যাপতির রূপ-বিলাস, চণ্ডিদাসের প্রাণের গভীরতা আর কৃষ্ণকমলের "স্বাদিতে নিজ মাধুরীতে" যে বিরহ, এই তিনের অপূর্ব্ব রস-রচনা, কোন দেশের সাহিত্যেই আজও পর্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই। বাঙ্গলার মাটিতেই সেই তিন ফুটিয়াছে, আবার বাঙ্গলার মাটিতে কি একে—তিন ফুটিবে না। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর যে রাধা-ভাব, সেই জীবন্ত রাধাভাবের ছাপ কৃষ্ণকমলের রাই উন্মাদিনীর রাধিকায় ফুটিয়াছে। ভাগবতের উক্তি চৈতন্যের প্রেমাশ্রুতে ধৌত করিয়া কৃষ্ণকমল রাধিকা গড়িয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অমৃত-রস ছাকিয়া কৃষ্ণকমল রাই উন্মাদিনীকে বসাইয়াছিলেন। কৃষ্ণকমলের রাধায় যে আত্মবিস্মৃতিতে রাধার বিরহ জাগিয়াছে, শ্রীচৈতন্যেও তাই। রাধিকা আত্মবিস্মৃত হইয়া বাহ্য প্রকৃতির রূপে রূপে কৃষ্ণ দেখিতেছেন। পূর্ব্বে যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা যেন রাধা আত্ম বিস্মৃত হইয়া বঁধূ পাইবার জন্য তাহার সে তপস্যার কথা কহিতেছেন। কৃষ্ণকমলের রাধিকা এক অভিনব সৃষ্টি।

বাঙ্গলার মধ্য যুগের 'গানের যুগের' এই বিচিত্র ভাব সম্পদের কথা আমি এইখানে শেষ করিলাম। তারপর অন্ধঘন মসীময় আকাশ—আর নাই। বাঙ্গলায় প্রতীচ্যের নব আগমনে, তাহার আলোক, তাহার বুকের সলিতা শুখাইয়া গেল, বাঙ্গলার দীপ নিভিয়া আসিল। বাঙ্গলা চিরদিন পূর্ব দিকেই সূর্য উঠিতে দেখিয়াছে, অকস্মাৎ পশ্চিম আকাশে বিজলী-ঝলকের মত আলোক দেখিয়া তাহার নয়নে ধাঁধাঁ লাগিল, বাঙ্গলা একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। তাহার প্রাণপুট বন্ধ করিয়া দিল।

ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাইলে যেমন সে আলোক সহ্য হয় না, বাঙ্গলার প্রাণেও ঠিক সেইরূপ ইউরোপ হইতে যে আলোক সহসা বর্ষিত হইল, তাহা সহ্য হইল না। সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। তারপর ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদন, সুরেন্দ্র মজুমদার, বিহারীলাল, নীলকণ্ঠ, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য অনেকেই গীতিকাব্য রচনা করিয়াছেন। এই যুগের এই কবিতার কথা অন্য সময়ে বলিবার চেষ্টা করিব। এখন শুধু একটি কথা বলিয়া রাখিব। আমি রূপান্তরের কথা বলিয়াছি, আজও পর্যন্ত আমাদের এই যুগের গীতিকাব্য সেই রূপান্তরের অবস্থায়

পৌঁছিতে পারে নাই। ঈশ্বর গুপ্তের লেখার কোনখানেই তাহা মিলে না। মাইকেলের অশেষ ক্ষমতা সত্ত্বেও তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা' সেই পর্দার কাছেও পৌঁছিতে পারে নাই, ব্রজ কবিতায় শুধু নিতান্ত বাহিরের জিনিস লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়াছিলেন মাত্র। সুরেন্দ্র মজুমদারের "মহিলা," বিহারী-লালের "বঙ্গ সুন্দরী ও সারদামঙ্গল" আমাদের আদরের সামগ্রী সন্দেহ নাই—কিন্তু ইঁহাদের কবিতাতেও সেই সুর সেই ভাব জাগে নাই। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য প্রতীচ্য এই উভয়কে মিলাইয়া মিশাইয়া কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা হইয়াছে কি না, সে বিচার করিবার সময় আমার বোধ হয় এখনও আসে নাই।

একমাত্র গিরিশচন্দ্র সেই গানের ধারা ও ভাবের আভাসকে কবিওয়ালা-দের পদানুসরণ করিয়া কতক পরিমাণে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। আর শুধু একজন নীলকণ্ঠ—যাঁর

"সজল জলদাঙ্গ ত্রিভঙ্গ বাকা তরুতলে
হেরিলে হরে জ্ঞান মন প্রাণ পড়ে পদতলে ॥"

সেই পুরান সুরকে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। আজও বাঙ্গলার ভিখারী বৈষ্ণব তাহা গাহিয়া বেড়ায়। কিন্তু কল্পকলার সেই রূপান্তরে কেহই পৌঁছিতে পারেন নাই। সকলেরি লক্ষ্য তাই, সাধ্য তাই, সাধনা তাই। সে সাধক এখনও আসেন নাই।

তবে বাঙ্গলা জাগিতেছে। দিনের লাগাল পাইবই পাইব। আবার সেই বাঙ্গলা কবিতা শুনিব। সে সাধক আসিবেই। আমি যে তাহার আগমনীর সুর শুনিতে পাইতেছি।